সাইয়্যেদ সুলাইমান নদভী রহ.

আল্লামা সাইয়্যেদ সুলাইমান নদভী রহ.

আল্লামা সাইয়্যেদ সুলাইমান নদভী রহ. (১৮৮৪-১৯৫৩) ছিলেন একজন ক্ষণজন্মা, বিরল ও অতুলনীয় ব্যক্তিত্ব। সে যুগেও এবং এ যুগেও তাঁর তুলনা শুধু তিনিই। যে কাজেই হাত দিয়েছেন আল্লাহর মেহেরবানীতে ও আপন যোগ্যতায় শীর্ষস্থানটা দখল করেছেন তিনিই। যে বিষয়েই কলম ধরেছেন, তাঁর রচনাই পেয়েছে 'সেরা রচনা'র স্বীকৃতি। তাঁর প্রতিভায় মুগ্ধ হয়ে উস্তাদ আল্লামা শিবলী নুমানী রহ. প্রচণ্ড উৎসাহে নিজের পাগড়ি খুলে তাঁর মাথায় পরিয়ে দিয়েছিলেন।

সাইয়্যেদ সুলাইমান রচিত *ওমর খৈয়াম* সম্পর্কে—যা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল—আল্লামা ইকবাল মন্তব্য করেছিলেন,
ওমর খৈয়াম-এর উপর আপনি যা লিখেছেন, তাতে পূর্ব-পশ্চিমের আর কারও পক্ষেই এ বিষয়ে নতুন কিছু লিখা সম্ভব হবে না। আলহামদুলিল্লাহ, আপনার হাতেই এ বিষয়ে রচনার সমাপ্তি ঘটে গেছে।

লেখক নদভী নিজে এ রচনা সম্পর্কে সাদামাটা মন্তব্য করেন–এই রচনা দ্বারা আমার উদ্দেশ্য পশ্চিমা পণ্ডিতদের এ-কথা জানানো যে, যেই ওমর খৈয়মের গবেষণা নিয়ে তোমরা এত গর্বিত, সেই বিষয়ে পূর্বদেশীয় আলেমদের গবেষণাও একেবারে কম নয়। তারাও তোমাদের চেয়ে পিছিয়ে নেই। আল্লাহর শুকরিয়া, এ রচনা দেখে পশ্চিমারা সেটা মেনেও নিয়েছে।
সাইয়্যেদ সুলাইমান নদভী রহ. নিজ উস্তাদ ও মুরব্বী আল্লামা শিবলী নুমানীর মতোই একজন হক্কানী আলেম, মুহাক্কিক, গবেষক, মুহাদ্দিস, ফকীহ, সাহিত্যিক ও বক্তা ছিলেন। সারাজীবন লেখালেখির মধ্যে কাটিয়েছেন। 'দারুল মুসান্নিফীন' (লেখক সংঘ) প্রতিষ্ঠা করে উর্দু ভাষা ও সাহিত্যকে এমন অসংখ্য কিতাবাদিতে সমৃদ্ধ করেছেন যা নিয়ে পাক-ভারত উপমহাদেশ গৌরব করতে পারে।

তাঁর সম্পর্কে মাওলানা শাহ মুঈনুদ্দীন নদভী লিখেছেন–
পরিপূর্ণ ইলমের অধিকারী ছিলেন তিনি। তিনি একাই ছিলেন তাঁর উদাহরণ। তাঁর মধ্যে ফুটে উঠেছিল ইবনে রুশদ ও ইবনে খালদূন, ইবনে তাইমিয়া, ইবনে কাইয়্যিম, গাযালী, রূমী, শাহ ওয়ালিউল্লাহ এবং মুজাদ্দিদে আলফেসানী প্রমুখের (রাহমাতুল্লাহি আলাইহিম) ইলমী আমলী নূর ও নূরের ঝলক। তাঁর রচনাবলী থেকে মুসলিম জাতি যে পরিমাণ উপকৃত হয়েছে তার উদাহরণ খুবই বিরল।

ড. ইকবাল তাঁর সম্পর্কে লিখেছেন–
'আজ সাইয়্যেদ সুলাইমান নদভী আমাদের ইলমী জগতের সর্বোচ্চস্থানে অধিষ্ঠিত আছেন। তিনি শুধু আলেমই নন; তিনি আমীরুল উলামা। শুধু মুসান্নিফই (লেখক) নন; বরং সকল মুসান্নিফের সরদার। তাঁর অস্তিত্ব ইলম ও ফযলের এক প্রবাহমান সমুদ্র—যে সমুদ্র থেকে শত শত নদীর শাখা বের হয়েছে এবং হাজারো শুকনো খেত-জমিন তরু-তাজা ও সজীব হয়েছে।

সাইয়্যেদ সুলাইমান নদভী রহ.-এর অপ্রসিদ্ধ আরও এক বিরল মর্যাদার হলো, তিনি ছিলেন হাকীমুল উম্মত মুজাদ্দিদে মিল্লাত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ.-এর মুজাজ ও খলীফা। তিনি ১৯৩৮ইং এর আগস্টে হযরত থানভী রহ.-এর হাতে বাইয়াত গ্রহণ করেন। আধ্যাত্মিক সাধনা পূর্ণ করার পর থানভী রহ. ২২ অক্টোবর ১৯৪২ তাঁকে খিলাফত প্রদান করে তাঁর প্রতি প্রচণ্ড খুশি ও আস্থা প্রকাশ করে বলেন–আলহামদুলিল্লাহ! এই কাজ নিয়ে আমার আর কোনো চিন্তা নেই। কারণ আমার পর এমন এমন সুযোগ্য লোক আমি রেখে যাচ্ছি!

ণনী™

উম্মুল মুমিনীন

সীরাতে আয়েশা

রাযিয়াল্লাহু আনহা

সাইয়্যেদ সুলাইমান নদভী রহ.

সাইয়্যেদ সুলাইমান নদভী রহ.

সীরাতে আয়েশা রাযি.

মাওলানা মুহাম্মাদ শফিকুল ইসলাম

সাইয়্যেদ সুলাইমান নদভী রহ.

সীরাতে আয়েশা রাযি.

মাওলানা মুহাম্মাদ শফিকুল ইসলাম

অনূদিত

মাওলানা মাসউদুর রহমান

সম্পাদিত

প্রকাশনায়

রাহনুমা প্রকাশনী™

সীরাতে আয়েশা রাযি.

মূল — সাইয়্যেদ সুলাইমান নদভী রহ.

অনুবাদ — মাওলানা মুহাম্মাদ শফিকুল ইসলাম

সম্পাদনা — মাওলানা মাসউদুর রহমান

চতুর্থ সংস্করণ — মার্চ ২০১৭
তৃতীয় মুদ্রণ — আগস্ট ২০১৬
দ্বিতীয় মুদ্রণ — জানুয়ারি ২০১৬
প্রথম প্রকাশ — জুন ২০১৫

গ্রন্থস্বত্ব — রাহনুমা প্রকাশনী

প্রচ্ছদ — মুহাম্মাদ মাহমুদুল ইসলাম

মুদ্রণ — শাহরিয়ার প্রিন্টিং প্রেস
৪/১ পাটুয়াটুলি লেন, ঢাকা ১১০০

একমাত্র পরিবেশক — রাহনুমা প্রকাশনী
ইসলামী টাওয়ার, ৩২/এ আন্ডারগ্রাউন্ড, বাংলাবাজার, ঢাকা।
যোগাযোগ : ০১৭৬২-৫৯৩৩৪৯, ০১৯৭২-৫৯৩৩৪৯

মূল্য : ৫০০.০০ (পাঁচশো টাকা মাত্র)

SIRATE AYESHA rz.
Writer : Sayed Sulaiman Nadvi rh., Published by : Rahnuma Prokashoni.
Price : Tk. 500.00, US $ 15.00 only.

ISBN 978-984-91118-7-0
Web : www.rahnumabd.com, E-mail: rahnumaprokashoni@gmail.com

উৎসর্গ

আমার জনমদুখিনী মায়ের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক সৌভাগ্য-কামনায়; তাঁর হায়াতে তায়্যিবা, তাবিলা এবং সিহ্হাত ও আফিয়াতের তামান্নায়; করুণাময় তাঁর করুণার ছায়াকে সুদীর্ঘ করুন সেই প্রত্যাশায়—আমার *সীরাতে আয়েশা রাযি.* অনুবাদকর্মটি উৎসর্গিত।

মুহাম্মাদ শফিকুল ইসলাম

অনুবাদকের আরজ

الحمد لله، والصلاة و السلام على رسول الله، أما بعد :

সীরাতে আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা আল্লামা সাইয়্যেদ সুলাইমান নদভী রহ. রচিত অনবদ্য গবেষণাগ্রন্থ। এতে উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার পুরো জীবনচরিত উঠে এসেছে সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য সূত্রগুলোর আলোকে—অসাধারণ বিন্যাসে; যাতে একজন নারী নিজ জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রকৃত আদর্শটি গ্রহণ করতে পারেন নির্দ্বিধায়।

গ্রন্থটি উর্দু ভাষা ও সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। দুর্বল অনুবাদকের ভাব ও ভাষার আলোকে এর বিচার করা নিঃসন্দেহে অবিচার হবে। উল্লেখ্য, মূলের অনুসরণে অনুবাদেও আরও দুটো অমূল্য গ্রন্থ অন্তর্ভুক্ত হয়েছে—আল্লামা সুয়ূতি রহ.-এর *আইনুল ইসাবাহ ফী মাসতাদরাকাতহু আয়িশা আলাস সাহাবা* এবং সাইয়্যেদ সুলাইমান নদভী রহ.-এর *হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা কী উমর পর তাহকীকী নযর*; এগুলো যথাক্রমে গ্রন্থের শেষে সংযোজিত।

ভেবে ভালো লাগছে যে, মহান আল্লাহর অপার অনুগ্রহে মুসলিম মা বোনদের একটি ভালো খেদমত করার সুযোগ পেয়েছি—সুযোগ্য না হয়েও। বিশেষত পুরো খেদমতটি ইলমী ও হাদীসনির্ভর হওয়ায় অন্যরকম সৌভাগ্য বোধ করছি। আব্বা, আম্মা, আসাতিযা কেরাম, ভাই-বোন ও প্রিয়তমা জীবনসঙ্গিনী-সহ কিছু কিছু মানুষের নেক দুআ ও অনেক দেওয়ার কথা স্মরণ করে ভীষণভাবে আবেগাপ্লুত হচ্ছি। আল্লাহ তাদেরকে মকবুল করুন। আমীন।

অনুবাদে অজ্ঞতা, অসাবধানতার দখল তো আছেই; তবে—আল্লাহর শোকর—আন্তরিকতার অভাব ছিল না। সর্বত্র অভিন্ন

রীতি অনুসৃত হয়নি। দু-একটি জায়গায় অনুবাদ অপেক্ষা অবলম্বনই প্রকট। শেষোক্ত রিসালায় শ্রদ্ধেয় উস্তায মাওলানা মুহাম্মাদ আলী দা.বা.-এর স্নেহদৃষ্টি আমাকে ধন্য করেছে। শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্ব মাওলানা মাসউদুর রহমান সাহেব সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করায় কিছুটা আশ্বস্ত ও আনন্দিত হয়েছি। বইটিকে সফল করতে আরও অনেকের অবদান অনস্বীকার্য। আল্লাহ সকলকে সর্বোত্তম বিনিময় দান করুন। আমীন।

শ্রদ্ধেয় উস্তায মাওলানা হাবীবুর রহমান নদভী (দা.বা.) এবং রাহনুমা প্রকাশনীকে কৃতজ্ঞতা জানানোর ভাষা আমার নেই। তাদের উসিলাতেই অনুবাদের জগতে আসার সুযোগ হয়েছে। আল্লাহ আমার সকল আসাতিযা কেরামকে আপন শান অনুযায়ী দান করুন; দানে-ফায়যানে দো-জাহানে মালামাল করুন। আমীন।

হে আল্লাহ, অধমের তাবৎ খেদমত কবুল করে নিন। ভুল-ভ্রান্তি ক্ষমা করে দিন। মুসলমানদের জন্য উপকারী বানান; অধমের আখেরাতের সঞ্চয় বানান। আমীন।

বিনীত–
মুহাম্মাদ শফিকুল ইসলাম
গার্লস স্কুল রোড, মহাদেবপুর, নওগাঁ
১২ রবিউল আওয়াল, ১৪৩৬ হি.

সম্পাদকের কথা

সীরাতে আয়েশা রাযি. একটি অসাধারণ ও অতুলনীয় জীবনীগ্রন্থ। রচয়িতা আল্লামা সাইয়্যেদ সুলাইমান নদভী রহ. এই জীবনী রচনার ক্ষেত্রে কোনো ইতিহাস কিংবা অন্য কোনো উৎসগ্রন্থের আশ্রয় গ্রহণ করেননি; আগাগোড়া এই অমূল্য রচনার ক্ষেত্রে উৎস হিসাবে তাঁকে অনুসন্ধান চালাতে হয়েছে হাদীস-ভাণ্ডারের মহা সমুদ্রে। এ জীবনীর প্রতিটি তথ্যকে তিনি দলিল-প্রমাণ ও উদ্ধৃতির অলঙ্কার দিয়ে এমনভাবে সাজিয়ে তুলেছেন যে, পাঠক এটা পড়ে আস্থাশীল ও মুগ্ধ না হয়ে পারবেন না।

উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা রাযি.-এর এই জীবনীগ্রন্থের আরও একটি অতুলনীয়তা হলো—হযরত আয়েশা রাযি.-এর বয়সকেন্দ্রিক লেখকের তাহকীক ও গবেষণা। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র স্ত্রীগণের মাঝে একমাত্র কুমারী হযরত আয়েশা রাযি.-এর ব্যাপারে সর্বসম্মত মত হলো—'নবীজীর সঙ্গে বিবাহের সময় তাঁর বয়স ছিল ছয়, রোখসতির সময় নয়।' বয়সের এই ব্যাপারটিকে কেন্দ্র করে ইসলামের দুশমনরা তো বটেই, এমনকি তথাকথিত কতিপয় ইসলামী পণ্ডিত ব্যক্তিরও পদস্খলন ঘটে গেছে। উম্মুল মুমিনীনের বয়স নিয়ে তারা নানারকম 'নয়ছয়' করেছেন। আল্লামা সাইয়্যেদ সুলাইমান নদভী রহ. বিষয়টি নিয়ে ব্যাপক অনুসন্ধান ও গবেষণা করেছেন। পক্ষ-বিপক্ষের সকল বক্তব্যের এমন চমৎকার সমাধান দিয়েছেন যে, নির্মোহ পাঠক তাঁর মুন্সিয়ানার প্রশংসা করতে বাধ্য হবেন।

আল্লামা সাইয়্যেদ সুলাইমান নদভী রহ. (১৮৮৪-১৯৫৩) ছিলেন একজন ক্ষণজন্মা, বিরল ও অতুলনীয় ব্যক্তিত্ব। সে যুগেও এবং এ যুগেও তাঁর তুলনা শুধু তিনিই। যে কাজেই হাত দিয়েছেন আল্লাহর মেহেরবানিতে ও আপন যোগ্যতায় শীর্ষস্থানটি দখল করেছেন তিনিই। যে বিষয়েই কলম ধরেছেন, তাঁর রচনাই

পেয়েছে 'সেরা রচনা'র স্বীকৃতি। তাঁর প্রতিভায় মুগ্ধ হয়ে উস্তাদ আল্লামা শিবলী নুমানী রহ. প্রচণ্ড উৎসাহে নিজের পাগড়ি খুলে তাঁর মাথায় পরিয়ে দিয়েছিলেন।

সাইয়্যেদ সুলাইমান রচিত *ওমর খৈয়াম* সম্পর্কে—যা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল—আল্লামা ইকবাল মন্তব্য করেছিলেন : *ওমর খৈয়ামের* ওপর আপনি যা লিখেছেন, তাতে পূর্ব-পশ্চিমের আর কারও পক্ষেই এ বিষয়ে নতুন কিছু লেখা সম্ভব হবে না। আলহামদুলিল্লাহ, আপনার হাতেই এ বিষয়ে রচনার সমাপ্তি ঘটে গেছে।

আর লেখক নদভী নিজে এ রচনা সম্পর্কে সাদামাটা মন্তব্য করেন এই বলে যে, এই রচনা দ্বারা আমার উদ্দেশ্য পশ্চিমা পণ্ডিতদের এই কথা জানানো, যে ওমর খৈয়ামের গবেষণা নিয়ে তোমরা এত গর্বিত, সে বিষয়ে পূর্বদেশীয় আলেমদের গবেষণাও একেবারে কম নয়। তারাও তোমাদের চেয়ে পিছিয়ে নেই। আল্লাহর শুকরিয়া যে, এ রচনা দেখে পশ্চিমারা সেটা মেনেও নিয়েছে।

সাইয়্যেদ সুলাইমান নদভী রহ. নিজ উস্তাদ ও মুরব্বী আল্লামা শিবলী নুমানীর মতোই একজন হক্কানী আলেম, মুহাক্কিক, গবেষক, মুহাদ্দিস, ফকীহ, সাহিত্যিক ও বক্তা ছিলেন। সারাজীবন লেখালেখির মধ্যে কাটিয়েছেন। 'দারুল মুসান্নিফীন' (লেখক সংঘ) প্রতিষ্ঠা করে উর্দু ভাষা ও সাহিত্যকে এমন অসংখ্য কিতাবাদিতে সমৃদ্ধ করেছেন যা নিয়ে পাক-ভারত উপমহাদেশ গৌরব করতে পারে।

তাঁর সম্পর্কে মাওলানা শাহ মুঈনুদ্দীন নদভী লিখেছেন : পরিপূর্ণ ইলমের অধিকারী ছিলেন তিনি। তিনি একাই ছিলেন তাঁর উদাহরণ। তাঁর মধ্যে ফুটে উঠেছিল ইবনে রুশদ ও ইবনে খালদুন, ইবনে তাইমিয়া, ইবনে কাইয়্যিম, গাজালী, রুমী, শাহ ওয়ালিউল্লাহ এবং মুজাদ্দিদে আলফেসানী প্রমুখের (রাহমাতুল্লাহি আলাইহিম) ইলমী-আমলী নূর ও নূরের ঝলক। তাঁর রচনাবলি থেকে মুসলিম জাতি যে পরিমাণ উপকৃত হয়েছে তার উদাহরণ খুবই বিরল।

ড. ইকবাল তাঁর সম্পর্কে লিখেছেন :

'আজ সাইয়্যেদ সুলাইমান নদভী আমাদের ইলমী জগতের সর্বোচ্চ স্থানে অধিষ্ঠিত আছেন। তিনি শুধু আলেমই নন, তিনি আমীরুল উলামা। তিনি শুধু মুসান্নিফই (লেখক) নন, বরং সকল মুসান্নিফের সরদার। তাঁর অস্তিত্ব ইলম ও ফজলের এক প্রবহমাণ সমুদ্র—যে সমুদ্র থেকে শত শত নদীর শাখা বের হয়েছে এবং হাজারও শুকনো খেত-জমিন তরতাজা ও সজীব হয়েছে।

সাইয়্যেদ সুলাইমান নদভী রহ.-এর অপ্রসিদ্ধ আরও এক বিরল মর্যাদার কথা দিয়েই এই সংক্ষিপ্ত লেখার ইতি টানতে চাই। তিনি ছিলেন হাকীমুল উম্মত মুজাদ্দিদে মিল্লাত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ.-এর মুজাজ ও খলীফা। তিনি ১৯৩৮ ঈসায়ীর আগস্টে হযরত থানভী রহ.-এর হাতে বাইয়াত গ্রহণ করেন। আধ্যাত্মিক সাধনা পূর্ণ করার পর থানভী রহ. তাঁকে চিঠি লিখলেন :

'আমার মনে চায় আপনাকে খেলাফত দিয়ে দিই। আপনার মত জানতে চাই।'

হযরত সুলাইমান নদভী এই চিঠির কোনো উত্তর দিলেন না। বরং তিনি দুই-তিন দিন পর থানাভবন গিয়ে হাজির হলেন। সেখানে অবস্থানকালেও এই বিষয়ে তিনি নীরবই থাকলেন; কোনো কথা বললেন না। থানাভবন থেকে বিদায় নিয়ে চলে এলেন। এরপর হযরত থানভী রহ. আবার সংবাদ পাঠালেন—আপনি আমার চিঠির কোনো জবাব দেননি। এরই প্রেক্ষিতে তিনি জানালেন—হযরত, আপনার টেলিগ্রাম পাওয়ার পর থেকেই আমার পায়ের নিচ থেকে যেন মাটি সরে গেছে। আমি পেরেশান হয়ে ভাবছি, আমি কে আর আমার ওপর এত বড় জিম্মাদারি! কী করে সম্ভব! হযরত থানভী রহ. এই জবাবে খুশি হয়ে বললেন, আমার কাঙ্ক্ষিত জবাব আমি পেয়ে গেছি। এরপর ২২ অক্টোবর ১৯৪২ থানভী রহ. তাঁকে খেলাফত প্রদান করে তাঁর প্রতি প্রচণ্ড খুশি ও আস্থা প্রকাশ করে বলেন—আলহামদুলিল্লাহ, এই কাজ নিয়ে আমার আর কোনো চিন্তা

নেই। কারণ আমার পর এমন এমন সুযোগ্য লোক আমি রেখে যাচ্ছি!

অনুবাদ, সম্পাদনা ও প্রকাশনা

সীরাতে আয়েশা রাযি. গ্রন্থটির বাংলা অনুবাদ করেছেন হাফেজ মাওলানা শফিকুল ইসলাম। আমার জানামতে এটি তার দ্বিতীয় অনুবাদগ্রন্থ। সে হিসাবে তিনি একজন নবীন। অথচ তার চমৎকার ও প্রাঞ্জল অনুবাদ পড়ার সময় আমার মনে হচ্ছিল কোনো পণ্ডিত ও প্রবীনের লেখা পড়ছি। আমি মাওলানা শফিকের লেখায় মুগ্ধ হয়েছি। আমার বিশ্বাস—তিনি এই সাধনা অব্যাহত রাখলে ভবিষ্যতে আরও অনেকেই তার কলমের যাদুতে মুগ্ধ হবেন।

রাহনুমা প্রকাশনী ইসলামী প্রকাশনার জগতে হঠাৎ এসে অতি অল্প সময়ে বিরাট আলোড়ন সৃষ্টি করে ফেলেছে। প্রথম দৃষ্টিতেই নজর কাড়ে এদের বইয়ের দৃষ্টিনন্দন প্রচ্ছদ। মজবুত বাঁধাই, উন্নত কালি ও কাগজের ব্যবহার—সর্বোপরি লেখার মান ও বাংলা ভাষার সাহিত্য ও সর্বশেষ বানানরীতির কারণে পাঠকসমাজ ও লেখকের একটি বড় অংশ এই প্রতিষ্ঠানটির প্রতি আস্থা ও শ্রদ্ধাশীল হয়ে উঠেছেন। আমার মনে হয়, এই অমূল্য গ্রন্থ *সীরাতে আয়েশা রাযি.* সর্বপ্রথম পাঠকদের হাতে তুলে দেওয়ায় পাঠকদের সেই আস্থা ও শ্রদ্ধায় নতুন মাত্রা যোগ হবে ইনশাআল্লাহ।

দয়াময় আল্লাহর কাছে আমাদের মিনতি—হে আল্লাহ, তুমি মেহেরবানি করে এই গ্রন্থটিকে মূল লেখক, অনুবাদক, সম্পাদক ও প্রকাশক-সহ সংশ্লিষ্ট সকলকে কবুল করে নাও। আমাদের সকলকে দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ দান করো; ঈমানের সঙ্গে, আসানির সঙ্গে আমাদের মৃত্যু দিয়ো। আমীন।

বিনীত
মাসউদুর রহমান
কমলাপুর, কুষ্টিয়া।

২০ রজব ১৪৩৬ হি.
২০ মে ২০১৫ ইং

রচনা এবং রচয়িতা সম্পর্কে

আল্লামা সাইয়্যেদ সুলাইমান নদভী, জন্ম : ২২ নভেম্বর ১৮৮৪, শুক্রবার; ভারতের বিহার প্রদেশের পাটনার প্রসিদ্ধ নগরী—ওয়াইসিনায়, সম্ভ্রান্ত সাইয়্যেদ বংশে। কিতাব ও সুন্নাহর সঙ্গে এই পরিবারের ছিল গভীর সম্পর্ক। তাদের ধর্মীয় জ্ঞানের গভীরতা, তাকওয়া ও পরহেজগারির স্বচ্ছতা ছিল সর্বজনবিদিত। তাঁর সম্মানিত পিতা মৌলভি আবুল হাসান ছিলেন সকলের সমীহের পাত্র, অত্যন্ত রুচিশীল ও পরহেজগার মানুষ। একজন বিজ্ঞ হেকিম হিসেবেও তাঁর সুনাম ছিল এলাকার সর্বত্র।

সাইয়্যেদ সুলাইমানের জ্ঞানচর্চার হাতেখড়ি স্থানীয় আলেম খলীফা আনওয়ার আলী রহ.-এর কাছে। অগ্রজ সাইয়্যেদ আবু হাবিবও ছিলেন প্রাথমিক কিছু কিতাবের শিক্ষাগুরু। প্রিয় অনুজকে তিনি মাওলানা শাহ ইসমাইল শহীদ রচিত *তাকবিয়াতুল ঈমান* বিশেষ পদ্ধতিতে অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে পড়িয়েছিলেন। তিনি লেখকের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং লেখার সারবত্তা ও মর্মবস্তু এমনভাবে খুলে খুলে তুলে ধরেছিলেন যে, সাইয়্যেদ সুলাইমানের কচি মনে এসব বদ্ধমূল হয়ে যায়। এবং এই বিষয়টিই তাঁর কর্ম ও চেতনাকে বেগবান করে আজীবন।

সেসময় ফুলবাড়ি পাটনার খানকায়ে মুজিবির একজন উচ্চমার্গের আলেম ছিলেন মাওলানা শাহ মুহিউদ্দীন (মৃত্যু : ২২ এপ্রিল ১৯৪৭)। কিছুকাল তাঁর ছাত্রত্ব-লাভেও ধন্য হন সাইয়্যেদ সুলাইমান—বেশ কিছু আরবী কিতাব অধ্যয়নের মধ্য দিয়ে। তিনি ফুলবাড়িতে দর্শন ও তর্কশাস্ত্রেরও কিছু কিতাব পড়েন।

শাহ সুলাইমান সমকালীন মুমতায উলামা, খুতাবা ও বরেণ্য

ব্যক্তিবর্গের তালিকায় ছিলেন অন্যতম। নদওয়াতুল উলামার মূল ব্যক্তি যাঁরা, তিনি তাঁদেরও একজন। ফুলবাড়ির শায়খের মসনদও তাঁর আলোয় ধন্য হয় কিছুকাল।

১৯০১ সালে শাহ সুলাইমান নদওয়ায় দাখিল হন এবং ১৯০৭ সাল পর্যন্ত আসাতিযা কেরাম থেকে ইসতিফাদা করে ফারেগি-সনদ হাসিল করেন।

১৯০৫ সালে হযরত মাওলানা শিবলী নুমানী রহ. নদওয়ার শিক্ষাসচিব নিযুক্ত হন। তিনি ছাত্রদের মেধা-যাচাই ও শিক্ষার মান-নির্ণয়ের উদ্যোগ নেন। এ সময় সাইয়্যেদ সুলাইমানের অনন্যসাধারণ মেধা ও প্রতিভা তাঁকে মুগ্ধ করে। হযরত শিবলী নুমানী রহ. নিজে তাঁর ইলমী তারবিয়াত শুরু করেন। বিশেষ করে আরবীসাহিত্যে হযরত শিবলী নুমানীর তত্ত্বাবধান খুবই ফলপ্রসূ হয়। সাইয়্যেদ সুলাইমান আরবীতে এতটাই উন্নতি করেছিলেন যে, খোদ আরবরাও তাঁর আরবী শুনে মুগ্ধ হতো। তা ছাড়া হাদীস, তাফসীর, রিজাল, তারীখ, মানতিক, ফালসাফা, নাহু, সরফ-সহ জ্ঞানের সকল শাখায় তাঁর ব্যুৎপত্তি ছিল অসাধারণ। জ্ঞানের জগতে তাঁর যোগ্যতা এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে, ১৯০৭ সালে তিনি নদওয়াতুল উলামার মুখপত্র *আন নাদওয়াহ*-এর সহকারী সম্পাদক হন, যার প্রধান সম্পাদক ছিলেন হযরত শিবলী নুমানী রহ. নিজে। ফেব্রুয়ারি ১৯১১ পর্যন্ত তিনি এ গুরুদায়িত্ব আঞ্জাম দেন। আবার ১৯০৮ সালে নদওয়ারই আরবী ও ফারসীর শিক্ষক নিযুক্ত হন সাইয়্যেদ সুলাইমান।

জ্ঞানচর্চা ও লেখালেখির জগতে সাইয়্যেদ সুলাইমানের সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। ওই সময় মাওলানা আবুল কালাম আজাদের সাপ্তাহিক *আল হেলাল* ছিল ভারতবর্ষের পত্রিকাজগতের উজ্জ্বল নক্ষত্র—ইসলামী জাহানের অদ্বিতীয় নাম। মাওলানা আবুল কালাম সাইয়্যেদ সুলাইমানকে *আল*

হেলাল-এ কাজ করার আহবান জানান। মে ১৯১৩ সাইয়্যেদ সাহেব কলকাতা আসেন এবং *আল হেলাল*-এর সম্পাদনা-বিভাগে কাজ শুরু করেন। কিন্তু বেশি দিন সেখানে থাকেননি। ডিসেম্বর ১৯১৩ পর্যন্ত—মাত্র সাত মাস দায়িত্ব পালন করে ইস্তফা দেন। এসময় তিনি মাওলানা আজাদের লিখনশৈলী রপ্ত করার চেষ্টা করেছিলেন।

শাহ সুলাইমান আরেকবার লক্ষ্ণৌ আসেন। কিছুকাল পর পুনায় চলে যান। ১৯১৪ সালে পুনার দাক্ষিণাত্য কলেজে সহকারী প্রভাষক নিযুক্ত হন। ১৯১৫ পর্যন্ত মাত্র এক বছর এ দায়িত্ব পালন করেন তিনি।

১৮ নভেম্বর ১৯১৪ ছিল মাওলানা শিবলী নুমানী রহ.-এর জীবনের অন্তিম দিন। ইতিপূর্বে তিনি *সীরাতুন-নবী*-এর দুই খণ্ড সমাপ্ত করেছিলেন। তাঁর প্রবল ইচ্ছা ছিল—অবশিষ্ট খণ্ডগুলোও সম্পূর্ণ হোক; কিন্তু মৃত্যু সন্নিকটে জেনে উদ্বিগ্ন ছিলেন। হঠাৎ সৌভাগ্যক্রমে সাইয়্যেদ সুলাইমান তাশরিফ আনেন। তখন মৃত্যুশয্যায় শায়িত হযরত শিবলী নুমানী এই শাগরেদকে *সীরাতুন-নবী* পূর্ণ করার নির্দেশ দেন। সৌভাগ্যবান শাগরেদ উস্তাযের অন্তিম ইচ্ছা পূর্ণ করার সংকল্প করেন। তাই পুনার দাক্ষিণাত্য কলেজ ছেড়ে ১৯১৫ সালে আজমগড় চলে আসেন। আজমগড়ই জ্ঞানচর্চার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়। তিনি 'দারুল মুসান্নিফীন' নামে একটি প্রকাশনাও প্রতিষ্ঠা করেন। এখান থেকেই—জুলাই ১৯১৬—মাসিকপত্র *মাআরিফ*-এর অগ্রযাত্রা শুরু হয়।

১৯৪৬ পর্যন্ত তিনি এ গুরুদায়িত্ব আঞ্জাম দেন। জুন ১৯৪৬ ভুপালের বিচারক ও জামিআর আমীর নিযুক্ত হওয়ায় ভুপাল চলে আসেন। *মাআরিফ*-এর দায়িত্ব অর্পিত হয় মাওলানা মুঈনুদ্দীন নদভীর ওপর। *মাআরিফ*-এর মানদণ্ড সবসময়ই উন্নত ছিল এবং এখনো—আল্লাহর অনুগ্রহে—সমান উন্নত। বিগত কয়েক বছর

ধরে এর সম্পাদনার দায়িত্বে আছেন মাওলানা জিয়াউদ্দীন ইসলাহি।

সাইয়্যেদ সুলাইমান ছাত্র-জমানা থেকেই লেখালেখির প্রতি আসক্ত ছিলেন। তাঁর প্রথম দিকের লেখাগুলো 'ওয়াকত্' শিরোনামে ১৯০৩ সালে *মাখযান*-এ ছাপা হয়। *মাখযান* ছিল শাইখ আবদুল কাদির কর্তৃক সম্পাদিত, লাহোর থেকে প্রকাশিত, সুধীমহলে সমাদৃত বিখ্যাত সাহিত্য ও গবেষণাপত্র। সে যুগে সাইয়্যেদ সুলাইমানের জন্মভূমি ওয়াইসিনায় আঞ্জুমানে ইসলাহ নামে একটি সংস্থা ছিল। তিনি ওই সংস্থার বার্ষিক সেমিনারে 'ইলম ও ইসলাম' শীর্ষক নিবন্ধ উপস্থাপন করেন। এটি সুধীমহলে ব্যাপক সাড়া জাগায়। লক্ষ্ণৌর *উধপাঞ্চ* ছিল তখনকার প্রসিদ্ধ দৈনিক। সাইয়্যেদ সুলাইমান বিখ্যাত আরব লেখকদের লেখা অনুবাদ করে *উধপাঞ্চ*-এ প্রকাশ করা শুরু করেন।

সাইয়্যেদ সুলাইমানের সমগ্র জীবন জ্ঞানের সাধনায় নিবেদিত ছিল। দারুল মুসান্নিফীন-এর জন্য তিনি নিজেকে সঁপে দিয়েছিলেন। প্রবন্ধ-নিবন্ধ ছাড়াও তিনি যে গ্রন্থগুলো রচনা করেছেন সেগুলোও সীমাহীন গুরুত্বের দাবিদার। নিম্নে কয়েকটি গ্রন্থের উল্লেখ করা হলো :

১. *সীরাতুন নবী* : মাওলানা শিবলী নুমানী রহ. রচিত দু'খণ্ড তিনি প্রকাশ করেন এবং অবশিষ্ট চার খণ্ড নিজে রচনা করেন। এটি সাইয়্যেদ সুলাইমানের অনন্যসাধারণ কীর্তি।

২. *আরদোল কুরআন* : এ গ্রন্থে কুরআনে বর্ণিত স্থানসমূহের ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক অবস্থান নির্দেশ করত সেগুলোর বাসিন্দাদের সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে। এ বিষয়ে রচিত এ গ্রন্থই প্রথম।

৩. *হায়াতে মালেক* : এটা ইমাম মালিক রহ.-এর জীবনীগ্রন্থ।

৪. *আরাবুঁ কি জাহাযরানি* : বইটি, যেমন নাম থেকেই অনুমেয়, আরব্য নাবিকদের রোমাঞ্চে ভরা।

৫. *সফর আফগানিস্তান*।

৬. *খৈয়াম*।

৭. *হায়াতে শিবলী* : এ গ্রন্থে তিনি উস্তাদ শিবলী নুমানী রহ. সম্পর্কে বিস্তারিত লিখেছেন।

৮. *লুগাতে জাদিদাহ*।

৯. *খুতুবাতে মাদ্রাজ* : এটি দক্ষিণ ভারতের ইসলামী তালীমি আঞ্জুমানের অনুরোধে—১৯২৫ সালে অক্টোবর ও নভেম্বর মাসে মাদ্রাজে—সাইয়্যেদ সুলাইমান রহ. প্রদত্ত আটটি বক্তৃতার অমূল্য সংকলন। এগুলো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র জীবন ও কর্ম এবং ইতিহাস ও ঐতিহ্যকে অবলম্বন করে রচিত। প্রতিটি কথা ও বক্তব্য হৃদয় ও অনুভূতিকে ছুঁয়ে যায়।

১০. *সীরাতে আয়েশা রাযি.* : এবার *সীরাতে আয়েশা রাযি.* সম্পর্কে কিছু কথা—

এটি সাইয়্যেদ সুলাইমান রহ. কর্তৃক নবী-পরিবারের এক অসামান্য খেদমত। তিনি এর সূচনা করেন ছাত্রজীবনের শেষ বছরে, এপ্রিল ১৯০৬, যখন তিনি ছিলেন *আন নাদওয়াহ*-এর সহকারী সম্পাদক—সম্মানিত উস্তায মাওলানা শিবলী নুমানী রহ.-এর উৎসাহ ও পরামর্শে। এপ্রিল ১৯০৮ *সীরাতে আয়েশা রাযি.*-এর কিছু অংশ আন নাদওয়ায় ছাপা হয়। কিন্তু অন্যান্য কাজের গুরুত্ব বিবেচনায় *সীরাতে আয়েশা রাযি.*-এর কাজে বিরতি পড়ে। অনেকদিন পর হলেও ১৯২০ সালে এটি সমাপ্ত হয় এবং প্রথমবারের মতো আলোর মুখ দেখে। পরে পুনর্মুদ্রণ হয়; কিন্তু অনিবার্য সম্পাদনা ছাড়াই। অবশ্য তৃতীয় মুদ্রণের সময় প্রয়োজনীয় সংশোধনীসহ বিশেষ কিছু বিষয়ের সংযোজনও করা হয়। পরিশেষে ইমাম সুয়ূতি রহ.-এর অনবদ্য রিসালা *আইনুল ইসাবাহ*ও অন্তর্ভুক্ত হয় বক্ষ্যমাণ গ্রন্থে।

গ্রন্থখানি অনেক গুরুত্ববহ। অসংখ্য জিজ্ঞাসার সুন্দর সমাধান আছে এতে। বলা যায়, এ বিষয়ে এমন গ্রন্থ এ-ই প্রথম এবং সন্ধানী দৃষ্টিতে এ-ই শেষ।

যেসব অমূল্য বিষয় নিয়ে গ্রন্থখানি রচিত :

হযরত আয়েশা রাযি.-এর প্রাথমিক অবস্থা, শিক্ষা-দীক্ষা, সামাজিক ও দাম্পত্য-জীবন, সৎ ছেলেমেয়ে ও সতিনদের প্রতি সদাচার, ইফকের ঘটনা, সংস্কারমূলক কার্যক্রম, কুরআনে ব্যুৎপত্তি, মাসায়েল-দক্ষতা, ইজতিহাদ-ক্ষমতা, হাদীসে নববীর অগাধ জ্ঞান, ফিকহ ও কিয়াসে অসাধারণ প্রতিভা, চিকিৎসা-শাস্ত্রে পারদর্শিতা, বক্তৃতা ও কাব্যে মুনশিয়ানা, ফতওয়াপ্রদানে পারঙ্গমতা, জগতের নারী-সমাজের প্রতি তাঁর অবদান ইত্যাদি। এ ছাড়াও আরও অনেক কিছু উঠে এসেছে অনিন্দ্যসুন্দর বিন্যাসে, গবেষণামূলক ও বিশ্লেষণধর্মী কায়দায়; যার গুরুত্ব সে যুগে এ যুগে সমানভাবে অপরিসীম।

উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা রাযি.-এর ব্যাপারে বহুল আলোচিত ও বিতর্কিত একটি বিষয়—তাঁর বয়স; অর্থাৎ যখন তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র জীবনসঙ্গিনীর ভূমিকায় আবির্ভূত হন এবং উম্মুল মুমিনীনের তাজ মস্তকে ধারণ করেন, তখন তাঁর বয়স কত ছিল। এ এমন এক প্রশ্ন, যার উত্তরে অনেকে অনেক কিছু লিখেছেন। আল্লামা সাইয়্যেদ সুলাইমান নদভী রহ. এ বিষয়টিকে বিশেষভাবে আলোচনায় এনেছেন এবং এ প্রসঙ্গে যত আপত্তি উত্থাপিত হয়েছে এবং হতে পারে, বলিষ্ঠ যুক্তিপ্রমাণের ভিত্তিতে তার নিরসন করেছেন। বইটি প্রত্যেকের পড়া উচিত। বিশেষ করে নারী-সমাজ বইটি পড়ে উপকৃত হবেন সবচেয়ে বেশি। এর পাতায় পাতায় গচ্ছিত আছে দীন ও শরীয়তের অমূল্য রত্নসম্ভার।

সাইয়্যেদ সুলাইমান রহ. ছিলেন একাধারে স্বনামধন্য লেখক,

বিদগ্ধ গবেষক, সব্যসাচী সাহিত্যিক, বিরল প্রতিভাধর কবি, সিদ্ধহস্ত জীবনীকার, দূরদর্শী ঐতিহাসিক, সর্বজনবিদিত আলেমে-দীন, প্রতিথযশা বিতার্কিক, মুখলিস মুবাল্লিগ, অনলবর্ষী বক্তা ও হৃদয়গ্রাহী আলোচক। কুরআন-হাদীসে তাঁর ব্যুৎপত্তি ছিল ব্যাপক বিস্তৃত। মানব-মনের গভীরে পৌঁছার অসাধারণ শক্তি ছিল তাঁর দৃষ্টিতে।

একজন আলেম হিসেবে সাইয়্যেদ সুলাইমান রহ.-এর চিন্তা-চেতনা ছিল সুদূরপ্রসারী, মন-মানসিকতা ছিল সুউচ্চ। অধম তাঁর সাক্ষাতে ধন্য হয়েছে। তাঁর মজলিসে বসার ও উপদেশ শোনারও সৌভাগ্য লাভ করেছে। তাঁর শাগরেদ, মুহিব্বীন, মুতাআল্লিকীনের সুবাদেও তাঁর সম্পর্কে অনেক কিছু জানার সুযোগ পেয়েছে। তিনি ছিলেন উত্তম চরিত্রের উজ্জ্বল প্রতিবিম্ব।

দীর্ঘদিন তিনি দেশীয় রাজনীতিতে সক্রিয় ছিলেন। কিন্তু ১৯২০-এর অব্যবহিত পরেই রাজনীতি থেকে মুখ ফিরিয়ে নেন এবং সর্বান্তঃকরণে মনোনিবেশ করেন লেখালেখির প্রতি। তাঁর সবকিছুর কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয় আজমগড়ের দারুল মুসান্নিফীন ও তার ইলমী কার্যক্রম। দেশ-বিভাগের (ভারত-পাকিস্তান) দু'বছর দশ মাস পর জুন ১৯৫০ তিনি পাকিস্তান আসেন। ২২ নভেম্বর ১৯৫৩ করাচিতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন এবং সেখানেই সমাহিত হন।

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلَهُ وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ

মুহাম্মাদ ইসহাক
ইসলামিয়া কলোনি, সানদা, লাহোর
১১ রমযান, ১৪২৪ হি.

তৃতীয় সংস্করণের নিবেদন

সীরাতে আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা আমার প্রথম দিকের রচনা। সূচনা করেছিলাম ছাত্রজীবনেই; কিন্তু সমাপ্ত হয়েছিল উস্তাদ মরহুমের মৃত্যুর পর। ১৯২০ সালে যখন রচনাটি আলোর মুখ দেখে তখন আমি প্রতিনিধি হিসেবে লন্ডনপ্রবাসী। পরে অবশ্যি পুনর্মুদ্রণ হয়েছিল; কিন্তু অনিবার্য সম্পাদনা ছাড়াই। অনেক দিন ধরে, কিছু ফিকহী মাসায়েলে আমার যে দৃষ্টিভঙ্গিগত পরিবর্তন ঘটেছে, তা ঠিক করার প্রয়োজন বোধ করছিলাম তীব্রভাবে। আল্লাহর শোকর, এখন সে সুযোগ এসেছে। মূল বক্তব্য, সূত্র ও উদ্ধৃতি এবং তথ্য-উপাত্তের পরিমার্জনসহ অনেক অমূল্য তত্ত্বের সংযোজনও সম্ভব হয়েছে। পরিশিষ্ট হিসেবে গ্রন্থের শেষাংশে আল্লামা সুয়ূতি রহ.-এর *আইনুল ইসাবাহ* গ্রন্থখানি সংযোজিত হলো, যাতে এ দুর্লভ রচনা সর্বসাধারণের নাগালে এসে যায় এবং হাদীসে নববীরও সামান্য খেদমতে ধন্য হই।

আল্লাহর শোকর—অসংখ্যবার শোকর যে, তাঁর অপার অনুগ্রহ আমার মতো হীন-দীন-নীচকেও গ্রহণ করেছে নবীপরিবারের সে লুকিয়ে-থাকা আলোকরশ্মিকে পৃথিবীর আকাশে ফুটিয়ে তুলতে, যাতে মুসলিম রমনীগণ খুঁজে পান নববী শিক্ষার পূর্ণ জীবন্ত আদর্শ—সমশ্রেণির মহামানবীর রূপে। অধমের জন্য এ মহা সৌভাগ্য নয় তো কী ?

গ্রন্থটি রচনাকালে লেখকের প্রবণতা ছিল ছাত্রসুলভ; সমাপ্তিকালে ছিল যুগোপযোগিতা ও যুগশ্রেষ্ঠতার চিন্তা; কিন্তু

আলহামদুলিল্লাহ, এবার—তৃতীয় সংস্করণে—আল্লাহ ও আল্লাহর সন্তুষ্টি ছাড়া কিছুই মনে নেই। দুআ করি, এ গুটিকয়েক পাতার কল্যাণে যেন মুসলমানদের, বিশেষভাবে মুসলিম মা-বোনদের, নবীপরিবারকে ভালোবাসার ও কায়মনোবাক্যে তাদের আদর্শ অনুসরণ করার তাওফিক হয় এবং অধমের সুন্দর মৃত্যু ও ব্যাপক মার্জনা নসীব হয়।

অধম
সুলাইমান
রবিউল আওয়াল, ১৩৬৪ হি.

প্রথম প্রকাশের কথা

নয় বছর হলো।[১] মনে যখন সর্বপ্রথম *সীরাতে আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা* রচনার ভাবনা উদয় হয় আমি তখন *আন নাদওয়াহ*-এর সহকারী সম্পাদক। সেটা ছিল আমার ছাত্রজীবনের শেষ বর্ষ। পত্র-মারফত বিষয়টি উস্তাদ-মরহুমকে জানাই। তিনি উৎসাহ দেন এবং গ্রন্থপঞ্জি বলে দেন।[২] দু'বছর পর রবিউল আওয়াল ১৩২৬ হিজরী *সীরাতে আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা*-এর কিছু অংশ *আন নাদওয়ায়* ছাপাও হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত কিছুকালের জন্য এ চিন্তা চাপা পড়ে।

অবশ্য বন্ধুমহলের তাগাদা অব্যাহত ছিল। মৌলভি আজিজ মির্যার সঙ্গে সাক্ষাৎ হলেই *সীরাতে আয়েশা রাযি.*-এর প্রসঙ্গ তুলতেন আর আমি মুচকি হাসতাম এবং নীরব হয়ে থাকতাম। হযরত উস্তাদও বারবার সমাপ্ত করার তাগাদা দিতেন।[৩] বন্ধু সাইয়্যেদ আবদুল হাকিম অত্যন্ত বুযুর্গ মানুষ, তাঁর প্রত্যেক চিঠিতে *সীরাতে আয়েশা রাযি.*-এর কথা থাকত। কিন্তু আমার নীরবতা শেষমেশ তাঁকেও নীরব করে দেয়। তবে বন্ধুবর—ভুপাল ইতিহাস-বিভাগের প্রধান—মুনশি মুহাম্মাদ আমিন ছিলেন ভিন্ন প্রকৃতির, অসাধারণ ধৈর্যের অধিকারী। দীর্ঘ আট মাস যাবৎ আমার গড়িমসি—এই বাহানা ওই বাহানা সত্ত্বেও তিনি কখনোই

---

১. রচনা আরম্ভের তারিখ—অর্থাৎ ১৯১৪ পর্যন্ত। নয়তো সমাপ্তির তারিখ—অর্থাৎ ১৯১৭ পর্যন্ত বারো বছর হয়।

২. *মাকাতিবে শিবলী*, ২য় খণ্ড, মাকতুব : ৪১।

৩. *মাকাতিবে শিবলী*, ২য় খণ্ড, মাকতুব : ৫৮,৭০,৭১,৭২,৭৩।

হাল ছাড়েননি। অবশেষে ২৭ রজব ১৩৩২ তার পীড়াপীড়িই আমার অস্বীকৃতির বিরুদ্ধে জয়যুক্ত হলো।

কাজটি শেষ হতে অনেক সময় লাগে; এবং শেষ হওয়ার পর ছাপতেও দেরি হয়; আবার বিভিন্ন প্রসঙ্গে *সীরাতে আয়েশা রাযি*-এর কথা বারবার কলমে এসে যায়। ফলে খুব শীঘ্রই এই নামটি পাঠকমহলে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে। এই সুযোগের অপব্যবহার করে একদল কলমবাজ এই নামে একাধিক বই বাজারে ছেড়ে দেন; কিন্তু আমি তাতে বিচলিত হইনি; এবং আশা করি, আমার পাঠকরাও বিচলিত হবেন না। কেননা, এটা *আল-ফারুক* রচয়িতার (আমার উস্তাদের) জীবনে ঘটেছিল, যা *সীরাতে আয়েশা রাযি.* রচয়িতার (আমার) বেলায়ও ঘটল। فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ (মুসা আ.-এর লাঠি মাটিতে পড়তেই সবচেয়ে বড় সাপ হয়ে অন্য সব সাপকে গিলে খেতে শুরু করল, যেগুলো যাদুকররা যাদুর দ্বারা প্রকাশ করেছিল)।

সীরাতে আয়েশা রাযি. : গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

উর্দু ভাষার নতুন বিপ্লব আমাদের যে বিপুল রচনাসম্ভার উপহার দিয়েছে তাতে মুসলিম পুরুষদের কীর্তি ও অবদান অনেকটাই মানুষ জানতে পেরেছে। কিন্তু পর্দানশীন মুসলিম রমণীগণের সুস্পষ্ট অবদান ও কারনামা এখনো রয়ে গেছে পর্দার অন্তরালে। *সীরাতে আয়েশা*-ই মুসলিম নারীদের খেদমতে দীনের ক্ষেত্রে তাঁদের ব্যাপক অবদান ও কীর্তি উর্দুভাষীদের কাছে তুলে ধরার প্রথম প্রয়াস।

এই পতনের যুগে মুসলিম-জাতির অধঃপতনের যতগুলো কারণ আছে তার বেশি অর্ধেক নারী। ঘরে-ঘরে প্রবৃত্তিপূজা, জড়পূজা-মরপূজা, ইসলামবিরোধী রসম-রেওয়াজ, শোক ও আনন্দের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে ব্যাপক অপচয় ইত্যাদি বর্বরযুগীয় ক্রিয়াকলাপ আমাদের সমাজ-সংসারে চালু রয়েছে শুধু এই কারণে যে, মুসলিম মা-বোনদের মন থেকে ইসলামী শিক্ষা-দীক্ষা

ও মূল্যবোধ বিদায় নিয়েছে। এর কারণ সম্ভবত এটাই যে, কোনো মুসলিম মহীয়সীর পূর্ণাঙ্গ জীবনাদর্শ তাদের সামনে নেই। তাই আমাদের এবারের নিবেদন এমন এক মহীয়সীর জীবনাদর্শ, যিনি ছিলেন মহানবীর আদর্শ জীবনের আদর্শসঙ্গিনী; যিনি নবীজীর একান্ত আন্তরিক সাহচর্যে ধন্য হয়েছেন নয় বছর; যাঁর পথনির্দেশের আলোকবর্তিকা স্বর্ণযুগের রমণীকুলকে আলো দিয়েছে প্রায় চল্লিশ বছর।

একজন মুসলিম নারীর জন্য *সীরাতে আয়েশা রাযি.*-তে রয়েছে জীবনের সার্বিক দিক-নির্দেশনা। জীবনের সকল পরিবর্তন, উত্থান-পতন, উন্নতি-অবনতি, শোক-সুখ, বিবাহ-বিরহ, পিত্রালয়-শ্বশুরালয়, স্বামী-সতিন, বৈধব্য, অপত্যহীনতা, ঘরবাস-পরবাস, রান্নাবান্না, সন্তানপালনসহ সংসার-জীবনের হাসিকান্না, আবেগ-অনুভূতি, অভিমান-অভিরোষ—এককথায় জীবন ও জগতের সর্বক্ষেত্রে, সর্বাবস্থায় আদর্শ অনুসরণের উজ্জ্বল দৃষ্টান্তে ভরপুর হযরত আয়েশা রাযি.-এর জীবনচরিত। আর জ্ঞান-গুণ, ধর্ম-কর্ম ও চরিত্রমাধুরীর অনুপমতা তো বলাই বাহুল্য। প্রকৃত প্রস্তাবে, তাঁর পবিত্র জীবনচরিত হলো সেই স্বচ্ছ আয়না, যাতে ফুটে ওঠে একজন মুসলিম নারীর প্রকৃত জীবনের চিত্র।

উল্লেখ্য, উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা রাযি.-এর জীবনচরিত অধ্যয়ন শুধু এজন্য আবশ্যক নয় যে, তা নবীপরিবারের এক মহীয়সী নারীর পবিত্র জীবনধারার সমষ্টি, বরং এজন্যও এটা পড়া জরুরি যে, তা পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মানবের শ্রেষ্ঠতম জীবনের এমন অর্ধাঙ্গিনীর জীবন, যা সত্যিকারের পূর্ণাঙ্গ রমণীর সুসজ্জিত স্বরূপ তুলে ধরে আমাদের সামনে।

উৎস-প্রসঙ্গ

জীবনীগ্রন্থ রচনার জন্য সাধারণত ইতিহাসগ্রন্থের সাহায্য নেওয়া হয়। কিন্তু এ গ্রন্থ যে সময় ও সমাজকে কেন্দ্র করে, তার ইতিহাস শুধু হাদীসগ্রন্থেই সীমাবদ্ধ। কেননা এ সবই নবী

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, উম্মাহাতুল মুমিনীন ও সাহাবা কেরাম রাযি.-এর জীবনাদর্শের বাস্তবসম্মত ইতিহাস। তাই এ গ্রন্থের যাবতীয় তথ্য-উপাত্তের উৎস শুধুই হাদীসগ্রন্থ। জামে, মুসনাদ, সুনান তো আছেই; আরও অসংখ্য আসমাউর-রিজালগ্রন্থ—যেমন : ইবনে সাদের *তাবাকাত*, যাহাবির *তাযকিরাতুল হুফফাজ*, ইবনে হাজারের *তাহযিব* এবং *ফাতহুল বারী*-সহ কাসতালানি, নববী প্রমুখের বিখ্যাত ব্যাখ্যাগ্রন্থ থেকেও সাহায্য নেওয়া হয়েছে; সাধারণ ইতিহাসগ্রন্থ ছুঁয়েও দেখিনি। অবশ্য জঙ্গে জামালের ব্যাপারে সীমাবদ্ধতা থাকায় সর্বোচ্চ *তাবারী*র ওপর নির্ভর করেছি। কেননা এর বিশদ বিবরণ হাদীসসমূহে নেই।

হাদীসগ্রন্থগুলোর মধ্যে অধিকাংশ ক্ষেত্রে *সহীহ বুখারী*, *সহীহ মুসলিম*, *আবু দাউদ* এবং *মুসনাদে ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বল* সামনে ছিল। এ অমূল্য গ্রন্থগুলোর এক-একটি অক্ষর আমি পড়েছি। মুসনাদগ্রন্থগুলোতে হযরত আয়েশা রাযি.-এর বর্ণনায় অনেক তথ্য মেলে। উৎসগ্রন্থগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বিরল গ্রন্থ হলো হাকেমের *মুসতাদরাক* এবং সুয়ূতির *আইনুল ইসাবা*। *আইনুল ইসাবা* একটি ছোট্ট রিসালা। এতে যে হাদীসগুলো সন্নিবেশিত হয়েছে তাতে হযরত আয়েশা রাযি. কর্তৃক তৎকালীন প্রচলিত ভুল ধারণাগুলো খণ্ডিত হয়েছে।

বিদগ্ধমহল অবগত আছেন, হাদীসগ্রন্থগুলোতে—বিশেষত *বুখারীতে*—তথ্য-উপাত্ত এতটাই বিক্ষিপ্ত যে, এগুলোকে খুঁজে খুঁজে একত্র করা পিঁপড়ের মুখে দানা সংগ্রহ করার মতোই। তবু অনবরত অধ্যয়নের কল্যাণে যেটুকু সম্ভব হয়েছে, নিবেদিত হলো। লক্ষণীয়—একই ঘটনা হাদীসের একাধিক গ্রন্থে বা একই গ্রন্থের একাধিক অধ্যায়ে এসেছে। আমার যেখানে যে সূত্রটা সমীচীন মনে হয়েছে, দিয়েছি। সুতরাং ভুল বোঝার অবকাশ নেই যে, ওই ঘটনা ওই সূত্রেই সীমাবদ্ধ। এজন্যই পাঠকমহল অনেক ক্ষেত্রে একই ঘটনার একাধিক সূত্র পেয়ে থাকবেন।

প্রসঙ্গ-কথা

রচনার সূচনাটা রচয়িতার সখের বশে হলেও—আলহামদুলিল্লাহ, সমাপ্তিটা মন্দ হয়নি। আলোচ্য পুস্তিকা যে মহামানবীর (রাযি.) জীবনচরিত অবলম্বনে রচিত, তাঁরই পবিত্র জীবনসঙ্গীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মোবারক জীবনচরিত প্রকাশিত হচ্ছে তাজহিন্দ, মহামতি ভুপাল-গভর্নরের পৃষ্ঠপোষকতায়—উর্দু ভাষায়। প্রসঙ্গত সেদিকে ইঙ্গিত না করলেই নয়।

সীরাতে আয়েশা রাযি. সমাপ্ত করার প্রেরণা পেয়েছিলাম মূলত তাজহিন্দের নির্দেশেই। প্রথমে উস্তাদ-মরহুমের মাধ্যমে,[১] পরে—তাঁর অবর্তমানে, ২৯ নভেম্বর ১৯১৪, যখন কাছে যাওয়ার সৌভাগ্য হয়—সরাসরি তিনি আমাকে আমার রচনা সমাপ্ত করার উৎসাহ দেন। বছরের পর বছর অবিরাম সাধনার পর—আলহামদুলিল্লাহ—একটি গবেষণাকর্ম সমাপ্ত করার পাশাপাশি নির্দেশ পালনেরও আনন্দ অনুভব করছি।

সাইয়্যেদ সুলাইমান
১৯২০ ঈসায়ী.

---

১. *মাকাতিবে শিবলী*, ২য় খণ্ড, মাকতুব : ১২৮-১২৯।

সূচিপত্র

দাম্পত্যজীবন ৭৭-১০৩

সতিনগণের প্রতি আচরণ ১০৪-১২০

সৎ সন্তানদের প্রতি ১২১-১২৬

সংশোধনের আহ্বান ১৮৪-২০২

জঙ্গে জামাল (উটের যুদ্ধ) ২০৩-২১৭

সীরাতে আয়েশা
রাযিয়াল্লাহু আনহা

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْم

اَلْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ وَالصَّلَوةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ وَآلِهِ وَأَزْوَاجِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِيْنَ

প্রাথমিক অবস্থা

(জন্ম থেকে বিবাহ পর্যন্ত)

নাম, নসব ও খানদান

নাম : আয়েশা, উপাধি : সিদ্দীকা, খেতাব : উম্মুল মুমিনীন, কুনিয়ত বা উপনাম : উম্মে আবদুল্লাহ, আরও উপাধি : হুমায়রা।[১] রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিনতুস সিদ্দীক[২] বলেও সম্বোধন করেছেন।

---

১. 'হুমায়রা' উপাধিসংবলিত বর্ণনাগুলো সনদের বিচারে মুহাদ্দিসগণের নিকট গ্রহণযোগ্য নয়। মাওযুআতের মধ্যে এসেছে : خُذُوا شَطْرَ دينكم مِن الحُمَيْراءِ—: তোমরা তোমাদের ধর্মের একটি বড় অংশ গ্রহণ করো হুমায়রার কাছ থেকে। অনেকে লিখেছেন—*নাসাঈ শরীফে* 'হুমায়রা' উপাধি সহীহ সনদেই এসেছে, কিন্তু অনেক খুঁজেও আমি পাইনি; বরং ইবনুল কাইয়্যুম রহ. লিখেছেন—যত হাদীসে 'হুমায়রা' উপাধি এসেছে সবই ভিত্তিহীন**। كشف الخفاء و مزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা : ৩৭৪। তবে রিজালগ্রন্থগুলোতে 'হুমায়রা' উপাধি এসেছে। مجمع البحار-সহ আধুনিক আরবী অভিধানগুলোতে حمر ধাতুমূলের অধীনেও বিষয়টি আলোচিত।

(** শায়খ আবদুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ রহ. *আল মানারুল মুনীফের* টীকায় ইবনুল কাইয়্যিম রহ.-এর এই কথার ওপরে নোট লিখেছেন :
"এই কথা স্বীকৃত নয়। তিনটি সহীহ হাদীস পাওয়া যায়, যেখানে 'হুমায়রা' শব্দটি এসেছে। বদরুদ্দীন যারকাশী রহ. *আল ইজাবাহ লি ই-রাদি মাসতাদরাকাতহু আয়িশাতু আলাস সাহাবাহ* (পৃ. ৬১-৬২)-তে আয়েশা রাযি.-এর বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন..." [উক্ত টীকাতে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। আগ্রহী পাঠক তা দেখে নিতে পারেন। *আল-মানারুল মুনীফ*, পৃ. ৬০, টীকা ২, বর্ণনা নং ৮৯-এর অধীনে, একাদশতম সংস্করণ, বৈরুত, মিশর ২০০৪ ইং] –সম্পাদক)

২. *তিরমিযী*, তাফসীর—সূরা আল মুমিনুন।

আবদুল্লাহ হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার ভাগ্নে। তিনি মূলত হযরত আসমা রাযি.-এর পুত্র। তিনি আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের নামে অধিক পরিচিত। আরবে উপনাম ছিল মর্যাদার প্রতীক। যেহেতু হযরত আয়েশা রাযি.-এর সন্তান ছিল না, সেহেতু উপনামও ছিল না। একবার তিনি আক্ষেপের সঙ্গে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আরজ করলেন, অন্যদের কুনিয়ত তো তাদের সন্তানদের নামে হয়েছে; কিন্তু আমার কুনিয়ত হবে কার নামে? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, তোমার ভাগ্নে আবদুল্লাহর নামে।[১] সেদিন থেকেই হযরত আয়েশা রাযি.-এর কুনিয়ত—উম্মে আবদুল্লাহ।

হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার পিতার নাম আবদুল্লাহ, উপাধি সিদ্দীক ও উপনাম আবু বকর। মাতার নাম উম্মে রুমান। পিতার দিক থেকে বংশধারা—আয়েশা বিনতে আবু বকর সিদ্দীক, ইবনে আবু কুহাফা, ইবনে উসমান, ইবনে আমের, ইবনে উমর, ইবনে কাব, ইবনে সাদ, ইবনে তাইম, ইবনে মুর্‌রা, ইবনে লুওয়াই, ইবনে গালিব, ইবনে ফিহ্‌র, ইবনে মালিক।

মাতার দিক থেকে বংশধারা—আয়েশা বিনতে উম্মে রুমান, বিনতে আমের, ইবনে উআইমের, ইবনে আবদে শামস, ইবনে ইতাব, ইবনে উযাইনা, ইবনে সাবি, ইবনে অহমান, ইবনে হারিস, ইবনে গুনাইম, ইবনে মালিক, ইবনে কিনানা।

সুতরাং পিতার দিক থেকে তিনি কুরাইশিয়া তাইমিয়া এবং মাতার দিক থেকে কিনানিয়া।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও হযরত আয়েশা রাযি.-এর পিতৃকুলের বংশপরম্পরা সপ্তম বা অষ্টম পুরুষে এবং মাতৃকুলের বংশপরম্পরা একাদশ বা দ্বাদশ পুরুষে গিয়ে মিলিত হয়।

হযরত আয়েশা রাযি.-এর পিতা হযরত আবু বকর রাযি. ১৩ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর মাতা উম্মে রুমানের ব্যাপারে অধিকাংশ

---

১. *আবু দাউদ*, শিষ্টাচার অধ্যায়। *মুসনাদে আহমাদ*—মুসনাদে আয়েশা রাযি., ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা : ৯৩, ১০৭।

ঐতিহাসিকের মত—তিনি পঞ্চম অথবা ষষ্ঠ হিজরীতে ইন্তেকাল করেছেন[১]; কিন্তু এ তথ্য ভুল। একাধিক গ্রহণযোগ্য হাদীস দ্বারা প্রমাণিত যে, উম্মে রুমান রাযি. হযরত উসমান রাযি.-এর খেলাফত পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। ষষ্ঠ হিজরীতে ঘটে যাওয়া ইফক-সংক্রান্ত প্রায় সবগুলো হাদীসে তাঁর নাম এসেছে। সপ্তম হিজরীর তাখঈর বা ইচ্ছাধিকার প্রদানের ঘটনায়ও তিনি জীবিত।[২] *সহীহ বুখারীতে* তাবেঈ মাসরুকের বর্ণনা উম্মে রুমান থেকে মুত্তাসিল সনদে বর্ণিত আছে।[৩] ইমাম বুখারী রহ. *তারীখে সগীর* গ্রন্থে উম্মে রুমানকে হযরত আবু বকর রাযি.-এর খেলাফতকালে ইন্তেকালকারীদের তালিকায় উল্লেখ করেছেন; সঙ্গে সঙ্গে প্রথম বর্ণনার ওপর আপত্তি করেছেন।[৪] হাফিয ইবনে হাজার *তাহযিব* গ্রন্থে তুলনামূলক আলোচনায় প্রমাণ করেছেন যে, ইমাম বুখারী রহ.-এর বক্তব্যই যথার্থ।

জন্মগ্রহণ

হযরত উম্মে রুমান প্রথমে আবদুল্লাহ আযদির সঙ্গে এবং তার মৃত্যুর পর আবু বকর রাযি.-এর সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। আবু বকর রাযি.-এর ঔরসে তাঁর গর্ভে হযরত আবদুর রহমান রাযি. ও হযরত আয়েশা রাযি.-এর জন্ম। হযরত আয়েশা রাযি.-এর জন্মতারিখ-নির্ণয়ে ইতিহাস ও জীবনীগ্রন্থগুলো নীরব।

ইবন সাদের অনুসরণে অধিকাংশ ঐতিহাসিক লিখেছেন, হযরত আয়েশা রাযি. নবুওয়াতের চতুর্থ বছরের প্রথম দিকে জন্মগ্রহণ করেন। নবুওয়াতের দশম বর্ষে ছয় বছর বয়সে তাঁর বিবাহ হয়। কিন্তু এ বক্তব্য কোনোভাবেই যথার্থ নয়। কেননা, যদি নবুওয়াতের চতুর্থ বছরের প্রথম দিকে তাঁর জন্ম হয়, তা হলে নবুওয়াতের দশম বর্ষে তাঁর বয়স ছয় বছর হয় না; বরং সাত বছর হয়।

---

২. *উসুদুল গাবাহ*, ইবনে আসির, ৫ম খণ্ড, পৃষ্ঠা : ৫৮৩ (মিশরের ছাপা)।

২. *তাবাকাতুন নিসা*, ইবনে সাদ, পৃষ্ঠা : ৫৪। *সহীহ বুখারী* ও *মুসলিম*, তাখঈর অধ্যায়। *মুসনাদে আহমাদ*, ২য় খণ্ড।

৩. *সহীহ বুখারী*, তাফসীর—সূরা নূর।

৪. *তারীখে সগীর*, ইমাম বুখারী, পৃষ্ঠা : ২১ (এলাহাবাদের ছাপা)।

প্রকৃত প্রস্তাবে, হযরত আয়েশা রাযি.-এর বয়স-সম্পর্কিত কয়েকটি তথ্য সর্বসম্মতিক্রমে সাব্যস্ত। হিজরতের তিন বছর পূর্বে ছয় বছর বয়সে বিবাহ হয়। শাওয়াল ১ম হিজরী রোখসতের সময় বয়স ছিল নয় বছর। রবিউল আওয়াল ১১ হিজরী আঠারো বছর বয়সে বিধবা হন। এ দৃষ্টিকোণ থেকে হযরত আয়েশা রাযি.-এর জন্ম হয় নবুওয়াতের পঞ্চম বর্ষের শেষের দিকে; অর্থাৎ হিজরতপূর্ব নবম বর্ষের শাওয়াল মাস মোতাবেক ৬১৪ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে।

উল্লেখ্য, সামনে যে ঐতিহাসিক ঘটনাগুলোর বিবরণ আসবে সেগুলো বোঝার জন্য মনে রাখতে হবে যে, দীর্ঘ তেইশ বছরব্যাপী নবুওয়াতকালের প্রায় তেরো বছর মক্কায় এবং দশ বছর মদীনায় অতিবাহিত হয়েছে। হযরত আয়েশা রাযি. যখন জন্মগ্রহণ করেন তখন নবুওয়াতের চতুর্থ বর্ষ তো পার হয়েছেই; পঞ্চম বর্ষেরও অনেকখানি কেটে গিয়েছিল।

সিদ্দীকে আকবর রাযি.-এর ছোট্ট কুটিরেই ইসলামের আলো পড়ে সবার আগে—যার কল্যাণে হযরত আয়েশা রাযি.-এর আপাদমস্তক সমগ্র সত্তা পবিত্র ছিল যে-কোনো প্রকারের কুফর ও শিরক থেকে। স্বয়ং হযরত আয়েশা রাযি.-এর বর্ণনা—যখন থেকে আমি আমার মা-বাবাকে চিনতে শুরু করেছি, তাঁদেরকে মুসলমান পেয়েছি।[১]

হযরত আয়েশা রাযি.-কে দুধ পান করিয়েছিলেন ওয়াইলের পত্নী। ওয়াইলের উপনাম ছিল আবুল ফুকাইঈস। হযরত আয়েশা রাযি.-এর দুধচাচা আফলাহ ও দুধভাই মাঝেমধ্যে হযরত আয়েশা রাযি.-এর সঙ্গে দেখা করতে আসতেন।[২] রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুমতিক্রমে হযরত আয়েশা রাযি. তাদের সঙ্গে দেখা করতেন।

শৈশব

যারা অসাধারণ, ছোট থেকেই অসাধারণ। আচরণ-উচ্চারণ, গতি-স্থিতি, বুদ্ধি-বৃদ্ধি—সবকিছুতেই। চোখেমুখে তাদের আলাদা আকর্ষণ।

---

১. *বুখারী শরীফ*, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা : ৫৫২; *তাসহীহ*—মাওলানা আহমদ আলী রহ.।
২. *বুখারী শরীফ*, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা : ৩৬০-৩৬১।

ললাটে তাদের জ্বলজ্বল করে উজ্জ্বল ভবিষ্যতের ঠিকানা। এমনই একজন অসাধারণ মুসলিম নারী-ব্যক্তিত্ব হযরত আয়েশা রাযি.। বাল্যকালেই তাঁর মাঝে ছিল মহত্ত্ব, বড়ত্ব ও সৌভাগ্যের আভাস। তবু শিশু শিশুই। খেলা আর খেলনাই তাঁর বয়সের দাবি। হযরত আয়েশা রাযি.-এরও বাল্যকালে যে খেলার আগ্রহ ছিল না তা নয়। পাড়ার শিশুকন্যারা তাঁর কাছে জড়ো হতো এবং তাঁর সঙ্গে খেলা করত। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, তাঁর শিশুমানস রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মর্যাদার প্রতি কখনোই তাঁকে অমনোযোগী করেনি।

প্রায়ই এমন হতো যে, হযরত আয়েশা রাযি. খেলছেন। চারপাশে তাঁর সই-সখীদের ভিড়। হঠাৎ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমন! হযরত আয়েশা রাযি. জলদি খেলনাগুলো লুকিয়ে ফেলতেন। শিশুরা এদিক-সেদিক লুকিয়ে পড়ত। কিন্তু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিশুদের ভীষণ ভালোবাসতেন। শিশুদের খেলাধুলাকে মন্দজ্ঞান করতেন না। তাই শিশুদের ডেকে ডেকে আবার হযরত আয়েশা রাযি.-এর সঙ্গে খেলতে বলতেন।[১] দুটো খেলা হযরত আয়েশা রাযি.-এর সবচেয়ে প্রিয় ছিল—কাপড়ের পুতুলখেলা ও দোলনায় দোল খাওয়া।[২]

একবার হযরত আয়েশা রাযি. পুতুল খেলছিলেন। এমন সময় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আগমন করলেন। পুতুলগুলোর মধ্যে একটি ঘোড়াও ছিল। ঘোড়াটির ডানে বামে দু'পাশে দুটো পেখম ছিল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, এটা কী? শিশু আয়েশা রাযি. উত্তর দিলেন—ঘোড়া। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন—ঘোড়ার পেখম হয়? হযরত আয়েশা রাযি. সঙ্গে সঙ্গে বললেন—কেন? হযরত সুলাইমান আ.-এর ঘোড়ার তো পেখম ছিল। এমন সহজ-সরল-স্বতঃস্ফূর্ত উত্তরে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মৃদু না হেসে পারলেন না।[৩] এ ঘটনা থেকে

---

১. *ইবনে মাজাহ*, باب مداراة النساء। *সহীহ মুসলিম*, ফাজায়েলে আয়েশা।

২. *আবু দাউদ*, কিতাবুল আদব।

৩. *মেশকাত*, باب عشرة النساء। *আবু দাউদের* আল-আদব অধ্যায়ে আছে, এটা গাযওয়ায়ে খায়বার কিংবা গাযওয়ায়ে তাবুকের সময়কার ঘটনা। এই বিবেচনায় তখন হযরত আয়েশা রাযি.-এর বয়স তেরো কিংবা পনেরো বছর।

শৈশবেই হযরত আয়েশা রাযি.-এর প্রকৃতিগত উপস্থিত বুদ্ধি, ধর্মীয় জ্ঞান, মেধা-প্রতিভা-বুদ্ধিমত্তা ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব অনুমান করা যায়।

এ যুগে সে যুগে, বাচ্চাদের সাধারণ অবস্থা তো এই যে, সাত-আট বছর বয়স পর্যন্ত না তাদের ভালো-মন্দের হুঁশ থাকে, না কিছুর গভীরে পৌঁছার সক্ষমতা থাকে। কিন্তু হযরত আয়েশা রাযি. একেবারে শৈশবের কথাগুলোও মনে রেখেছিলেন ভালোভাবে। তিনি সেগুলোর শুধু বর্ণনাই করতেন না; বরং শিশু ও শৈশবের নানা বিধানও উদ্ঘাটন করতেন নিজের শৈশবে ঘটে-যাওয়া নানা ঘটনা থেকে। শিশুদের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র নানা বিষয়ের কল্যাণ-অকল্যাণ নিয়েও আলোচনা করতেন তিনি। ছোটবেলায় খেলাধুলার মধ্যেও কোনো আয়াত বা হাদীস তাঁর মনোযোগ এড়াত না। যেমন—তিনি বর্ণনা করেন, بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَىٰ وَأَمَرُّ [سورة القمر: 46] আয়াতটি যখন মক্কায় অবতীর্ণ হয় তখন আমি খেলছিলাম।[১] হিজরতের সময় তাঁর বয়স ছিল মাত্র আট বছর। এত অল্প বয়সেও তাঁর মনোযোগিতা ও স্মৃতিশক্তির প্রখরতা দেখুন! হিজরতে নববীর পূর্ণাঙ্গ ঘটনা সকল অনুষঙ্গসহ তিনি মনে রেখেছিলেন! অথচ কোনো সাহাবীই হিজরতের সকল ঘটনা ধারাবাহিকভাবে তাঁর চেয়ে চমৎকাররূপে সংরক্ষণ করতে পারেননি।[২]

বিবাহ

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রথম স্ত্রী হযরত খাদীজা রাযি.। হযরত খাদীজা রাযি.-এর সঙ্গে বিবাহের সময় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বয়স ছিল পঁচিশ বছর; আর হযরত খাদীজা রাযি.-এর বয়স ছিল চল্লিশ বছর। হযরত খাদীজা রাযি. পঁচিশ বছর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহচর্যে ধন্য হন। এরপর হিজরতের তিন বছর পূর্বে নবুওয়াতের দশম বর্ষের রমযান মাসে পরপারে পাড়ি জমান। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের

---

১. *সহীহ বুখারী*, তাফসীর—সূরা কমার।

২. *সহীহ বুখারী*, হিজরত।

বয়স হয়েছিল পঞ্চাশ বছর আর হযরত খাদীজা রাযি.-এর বয়স হয়েছিল পঁয়ষট্টি বছর।

ইসলামে স্ত্রীর অবস্থান কী হওয়া উচিত? তা এ থেকেও প্রতীয়মান হয় যে, সারা পৃথিবীতে নিজ প্রিয় স্বামীর পর হযরত খাদীজা রাযি.-ই ছিলেন দ্বিতীয় মুসলমান, বন্ধুহীন-নিঃসঙ্গ জীবনের কষ্টে, বিপদ-আপদ ও মুসিবতের ভিড়ে এবং জুলুম-নির্যাতনের ভয়াল থাবার মুখে—প্রতিটি ক্ষেত্রে তিনি প্রিয়তম জীবনসঙ্গীর সঙ্গে থেকেছেন; নিপীড়ন ও প্রতিবন্ধকতার এরূপ সকল স্থানে তিনি সান্ত্বনা, সহযোগিতা ও সহমর্মিতায় একাত্ম হয়েছেন। এমন অন্তরঙ্গ অকৃত্রিম স্ত্রী ও বন্ধুর বিরহে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিষণ্ন হবেন, সেটাই স্বাভাবিক। জীবন তাঁর দুর্বিষহ হয়ে উঠবে, সেটাই যৌক্তিক।[১]

অবস্থাদৃষ্টে জীবন-উৎসর্গকারী সাহাবায়ে কেরাম রাযি. বিচলিত হয়ে পড়লেন। বিখ্যাত সাহাবী হযরত উসমান ইবনে মাযউন রাযি.-এর স্ত্রী হযরত খাওলা রাযি. রাসূলের কাছে এলেন এবং মিনতি করলেন—হে আল্লাহর রাসূল, আপনি আবার বিবাহ করুন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, কাকে? হযরত খাওলা রাযি. বললেন, কুমারীও আছে, বিধবাও আছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি কাদের কথা বলছ? হযরত খাওলা রাযি. বললেন, কুমারী আছে আবু বকরের[২] কন্যা আয়েশা, আর বিধবা আছে যামআর

---

১. *তাবাকাত*, ইবনে সাদ, খণ্ড পৃষ্ঠা : ৪১ (লন্ডনের ছাপা)।

২. ইউরোপীয় প্রাচ্যবিদ ও খ্রিস্টান গবেষকদের লজ্জাজনক মূর্খতার একটি উদাহরণ এই যে, তাদের দাবি, যেহেতু আরবী ভাষায় কুমারী মেয়েকে بكر বলে আর কেবলমাত্র হযরত আয়েশা রাযি.-ই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কুমারী স্ত্রী ছিলেন, তাই সেই সম্মানের খাতিরে তাঁর পিতা ইসলামে আবু বকর উপনামে খ্যাত হন। বাইরের লোকেরা প্রকৃত ঘটনা যদি না জানেন, তা হলে দুঃখের কিছু নেই; কিন্তু ঘরের লোকেরা ভুল করলে কীভাবে চলে। আধুনিক শিক্ষার অন্যতম পথিকৃৎ—স্যার সৈয়দ আমীর আলীও *লাইফ অফ মুহাম্মাদ* গ্রন্থের ১৪ নং অধ্যায়ে এ ভ্রান্তির শিকার হয়েছেন। আরবে কুনিয়ত বা উপনাম সম্মান ও আভিজাত্যের প্রতীক। সেকালে সম্মানিত ব্যক্তিবৃন্দ উপনামে সম্বোধিত হতেন। অনেক অভিজাত ব্যক্তিরই প্রকৃত নাম হারিয়ে গেছে উপনামের আড়ালে। কে আছেন যিনি আবু সুফিয়ান, আবু জেহেল, আবু লাহাব ও আবু যর প্রমুখ ব্যক্তিবর্গের প্রকৃত নাম জানেন? আবু বকর নামটিও এমন। হযরত আবু বকর রাযি. শুধু হযরত আয়িশা রাযি.-এর জন্মের পূর্বেই নয়; ইসলামেরও জন্মের পূর্বে 'আবু বকর' উপনামে প্রসিদ্ধি লাভ

কন্যা সাওদা। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন—আচ্ছা, কথা বলো।

হযরত খাওলা রাযি. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মতি পেয়ে আবু বকর রাযি.-এর গৃহে গেলেন এবং তাঁর সঙ্গে কথা বললেন। জাহেলি যুগে 'আপন ভাই'-এর ছেলেমেয়ের মতো 'মুখে বলা ভাই'-এর ছেলেমেয়ের সঙ্গেও বিবাহ না হওয়ার রেওয়াজ ছিল। তাই আবু বকর রাযি. বললেন, আয়েশা তো রাসূলের ভাতিজি। এ বিবাহ হবে কী করে? হযরত খাওলা রাযি. ফিরে এলেন এবং রাসূলের কাছে জানতে চাইলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আবু বকর আমার ধর্মভাই। এমন সম্বন্ধ বিবাহের প্রতিবন্ধক নয়।[১] হযরত আবু বকর রাযি. এ কথা শুনে আর আপত্তি করলেন না।

কিন্তু এরও আগে জুবাইর ইবনে মুতইম রাযি.-এর ছেলের সঙ্গে হযরত আয়েশা রাযি.-এর সম্বন্ধের কথা হয়েছিল। তাই তড়িঘড়ি না করে তাকেও জিজ্ঞেস করা আবশ্যক ছিল। হযরত আবু বকর রাযি. জুবাইর রাযি.-এর কাছে গেলেন এবং বললেন, তুমি তো আয়েশার সম্বন্ধ তোমার ছেলের সঙ্গে করবে বলেছিলে। তো এখনো কি সেই মতের উপরে আছ, না অন্য কিছু ভাবছ? জুবাইর রাযি. স্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ করতে চাইলেন। তখনো জুবাইর-পরিবার ইসলামের আলো থেকে দূরে ছিল। জুবাইর রাযি.-এর স্ত্রী উত্তর দিলেন, এই মেয়ে বদ-দীন, এই মেয়ের মা বাপ বদ-দীন, এ আমাদের ঘরে এলে আমাদের পরিবারও বদ-দীন হয়ে যাবে। আমি এ সম্বন্ধ মানি না।[২]

হযরত আয়েশা রাযি.-এর বয়স ছিল কম। কখনো কখনো মায়ের মর্জির খেলাফ কথা বলে ফেলতেন আর মা তাঁকে শাস্তি দিতেন, ভর্ৎসনা

করেছেন। তা ছাড়া এই পণ্ডিতদের কে জানাবেন যে, আরবী ভাষায় কুমারীকে بَكْر(بفتح الباء) (ফাতহা দিয়ে—বক্‌র) বলা হয় না; বরং بِكْر(بكسرالباء) (কাসরা দিয়ে—বিক্‌র) বলা হয়। যায়েদ, আমর, উমর ইত্যাদির মতো বকরও একটি 'আলাম' বা নামবাচক বিশেষ্য। বনু বকর নামে আরবে একটি বিখ্যাত গোত্র ছিল। 'বিকর' শব্দের সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক নেই।

১. *সহীহ বুখারী*, تزويج الصغر من الكبر, পৃষ্ঠা : ৭৬০।

২. *মুসনাদে আহমদ*, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা : ২১১।

করতেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এটা ভালো লাগত না। তাই উম্মে রুমান রাযি.-কে বলে দিয়েছিলেন, অন্তত আমার খাতিরে ওকে কষ্ট দিয়ো না। একবার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আবু বকর রাযি.-এর গৃহে এসে দেখলেন, হযরত আয়েশা রাযি. কপাটে মুখ লাগিয়ে কাঁদছেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মে রুমান রাযি.-কে বললেন, তুমি আমার কথা রাখলে না। উম্মে রুমান রাযি. আরজ করলেন, হে আল্লাহর রাসূল, আমার বিরুদ্ধে সে বাপের কাছে নালিশ করে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যা-ই হোক, আর ওকে কিছু বোলো না।[১]

বিভিন্ন হাদীসে এসেছে, বিবাহের পূর্বে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বপ্নে দেখেছিলেন, একজন ফেরেশতা রেশমের কাপড়ে করে কী যেন পেশ করলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, কী এটা? ফেরেশতা বললেন, আপনার স্ত্রী। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবরণ সরিয়ে দেখলেন—হযরত আয়েশা রাযি.।[২]

বিবাহের সময় হযরত আয়েশা রাযি.-এর বয়স ছিল মাত্র ছয় বছর।[৩] এত অল্প বয়সে বিবাহ হওয়ার রহস্য ছিল নবুওয়াত ও খেলাফতের মধ্যে দৃঢ় সম্পর্ক গড়া। প্রথমত আরবের শুষ্ক আবহাওয়ায় মেয়েরা অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে উঠত। আবার অভিজ্ঞতা বলে, বিশেষ ব্যক্তিদের মেধা-প্রতিভা-চেতনায় যেমন বিশেষত্ব থাকে, তেমনি থাকে শারীরিক গঠনেও; যাকে ইংরেজিতে বলে প্রিকৌশাস—অকালপক্ব। যাই হোক, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আয়েশা রাযি.-কে এত অল্প বয়সে জীবনসঙ্গিনীরূপে গ্রহণ করা প্রমাণ করে যে, শৈশবেই তাঁর মাঝে অসাধারণ মেধা-প্রতিভা ও অস্বাভাবিক বর্ধনশীলতা লক্ষ করা গিয়েছিল।

---

১. *মুসতাদরাকে হাকেম*।
২. *সহীহ বুখারী*, মানাকিবে আয়েশা রাযি.।
৩. কিছু অপরিণামদর্শী মানুষ এই বাল্যবিবাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শানে অশোভন মনে করেছেন। তাই তারা বিবাহের সময় হযরত আয়েশা রাযি.-এর বয়স বারো বছর প্রমাণ করতে চেয়েছেন; কিন্তু তাদের প্রয়াস অনর্থক, প্রমাণ অগ্রহণযোগ্য। ইসলামের ইতিহাসের কোনো নথিপত্র তাদের পক্ষে নেই। বিশদ জানার জন্য বক্ষ্যমাণ গ্রন্থের শেষে প্রদত্ত 'হযরত আয়েশা রাযি.-এর বয়স' শীর্ষক নিবন্ধটি দ্রষ্টব্য।

হযরত আতিয়া রাযি. হযরত আয়েশা রাযি.-এর বিবাহ সম্পর্কে কেমন সাদামাটা বর্ণনা দিচ্ছেন—হযরত আয়েশা রাযি. বাচ্চাদের সঙ্গে খেলছিলেন। দুধমা এলেন এবং নিয়ে গেলেন। হযরত আবু বকর রাযি. এসে বিবাহ পড়িয়ে দিলেন।

মুসলিম রমণীর বিবাহ এটুকু গুরুত্বই চায়। কিন্তু আজ কোনো মুসলিম মেয়ের বিবাহ আর্থিক অপচয়, নৈতিক অবক্ষয় এবং শিরকী ক্রিয়াকলাপের সমষ্টি ছাড়া কিছু নয়। কিন্তু পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মানবের বিবাহই কি এর কার্যত প্রত্যাখ্যান নয়? হযরত আয়েশা রাযি. বর্ণনা করেন, যখন আমার বিবাহ হয় তখন খবরও ছিল না যে, আমার বিবাহ হয়ে গেছে। যখন আমার মা বাইরে বের হওয়ার ব্যাপারে বকাঝকা করতে শুরু করলেন, তখন বুঝতে পারলাম, আমার বিবাহ হয়ে গেছে। অবশ্য পরবর্তীতে আমার মা আমাকে বুঝিয়েও দিয়েছিলেন।[১]

ইবনে সাদের দুটো বর্ণনা থেকে জানা যায়, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মোহরস্বরূপ হযরত আয়েশা রাযি.-কে একটি জমি দিয়েছিলেন। জমিটির মূল্য ছিল পঞ্চাশ দিরহাম। কিন্তু সূত্রের বিচারে তা তো গ্রহণযোগ্য নয়-ই, যুক্তির বিচারেও এ তথ্য অগ্রহণযোগ্য। মাত্র পঞ্চাশ দিরহাম তো নিকৃষ্ট থেকে নিকৃষ্টতর এবং ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর জমিরও মূল্য হতে পারে না। ইবনে ইসহাকের বর্ণনা অনুযায়ী মোহরস্বরূপ চারশো দিরহাম নির্ধারিত হয়েছিল। কিন্তু ইবন সাদেরই অন্য একটি বর্ণনা, যা স্বয়ং হযরত আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত, প্রমাণ করে যে, হযরত আয়েশা রাযি.-এর মোহর ছিল বারো উকিয়া এক নশ[২]—অর্থাৎ পাঁচশো দিরহাম। সহীহ মুসলিমে হযরত আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত আছে, উম্মাহাতুল মুমিনীনের মোহর সাধারণত পাঁচশো দিরহাম ধার্য হতো।[৩] মুসনাদে আহমদেও হযরত আয়েশা রাযি.-এর বর্ণনা অনুযায়ী, তাঁর মোহর ছিল পাঁচশো দিরহাম।[৪]

---

১. *তাবাকাত*, ইবনে সাদ, পৃষ্ঠা : ৪০।
২. *তাবাকাত*, ইবনে সাদ, পৃষ্ঠা : ৪৩।
৩. *সহীহ মুসলিম*, কিতাবুন নিকাহ।
৪. *মুসনাদে আয়েশা রাযি.*, পৃষ্ঠা : ৯৪।

যাই হোক, উম্মাহাতুল মুমিনীনের মোহর এবং আজকালকার মেয়েদের মোহর—তুলনা করে দেখুন—আকাশ-পাতাল ফারাক। ভেবে দেখুন, মোহর নিয়ে আমাদের বাড়াবাড়ি কোন পর্যায়ে পৌঁছেছে। মোহর কম হলে যেন বংশের অমর্যাদা হয়। অথচ মুসলিমসমাজে এমন কোনো বংশ আছে কি, যা সিদ্দীকে আকবরের বংশের চেয়েও অধিক মর্যাদার? এমন কোনো কন্যা আছেন কি, যিনি সিদ্দীকায়ে কুবরার চেয়েও অধিক মরতবার?

হযরত আয়েশা রাযি.-এর বিবাহের তারিখ নিয়েও মতভেদ আছে। আল্লামা আইনী রহ. বুখারী শরীফের ব্যাখ্যাগ্রন্থে লিখেছেন, হযরত আয়েশা রাযি.-এর বিবাহ হিজরতের দুই বছর পূর্বে, অন্য বর্ণনায় তিন বছর পূর্বে এবং এও কথিত আছে যে, দেড় বছর পূর্বে হয়েছিল।[১] আরও কিছু বর্ণনা থেকে জানা যায়, হযরত খাদীজা রাযি.-এর মৃত্যুর তিন বছর পর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আয়েশা রাযি.-কে বিবাহ করেছিলেন। আবার অনেক জীবনীকার মনে করেন, যে বছর খাদীজা রাযি.-এর মৃত্যু হয় সে বছরই হযরত আয়েশা রাযি.-এর বিবাহ হয়।

হযরত খাদীজা রাযি.-এর মৃত্যু-তারিখ থেকে হযরত আয়েশা রাযি.-এর বিবাহ-তারিখ নির্ণিত হতে পারত; কিন্তু হযরত খাদীজা রাযি.-এর মৃত্যু-তারিখ নিয়েও একাধিক মত। একটি বর্ণনায়—হিজরতের পাঁচ বছর পূর্বে, অন্য একটি বর্ণনায়—চার বছর পূর্বে এবং আরও একটি বর্ণনায়—তিন বছর পূর্বে। এত সব বর্ণনার ভিড়ে স্বয়ং হযরত আয়েশা রাযি.-এর বক্তব্য কোনো সমাধান দিতে পারত। কিন্তু মজার ব্যাপার, খোদ তাঁর থেকেও সহীহ বুখারী ও মুসনাদে দু'রকম বক্তব্য বিদ্যমান। একটি বর্ণনায় আছে, হযরত খাদীজা রাযি.-এর ওফাতের তিন বছর পর বিবাহ হয়েছিল।[২] অন্য একটি বর্ণনায় আছে, এটা সে বছরেরই কথা।[৩]

---

১. *উমদাতুল কারী*, ১ম খণ্ড,পৃষ্ঠা : ৪৫।
২. *সহীহ বুখারী*, ফজিলতে খাদীজা রাযি.। *মুসনাদে আহমদ*, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা : ৫৮।
৩. *সহীহ বুখারী*, হযরত আয়েশা রাযি. এর বিবাহ। *মুসনাদে আয়েশা রাযি.*, পৃষ্ঠা : ১১৮।

বিশ্লেষকদের মতে—এবং বেশির ভাগ গ্রহণযোগ্য বর্ণনা এ মতেরই সমর্থন করে—হযরত খাদীজা রাযি. নবুওয়াতের দশম বর্ষে হিজরতের তিন বছর পূর্বে রমযান মাসে মৃত্যুবরণ করেন। এক মাস পর সে বছরই শাওয়াল মাসে হযরত আয়েশা রাযি.-এর বিবাহ হয়। তখন হযরত আয়েশা রাযি.-এর বয়স ছিল ছয় বছর। এই হিসাব অনুযায়ী হিজরতের তিন বছর আগে শাওয়ালে (মোতাবেক ৬২০ খ্রিস্টাব্দের মে মাসে) বিবাহ হয়েছে। *ইসতিআব* গ্রন্থে আল্লামা ইবনে আবদুল বার এ মতটিকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। হযরত আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত স্ববিরোধী বক্তব্য দুটো—আমার মতে—বর্ণনাকারীর বুঝের ভুল। বিবাহ আসলে সে বছরই হয়েছিল যে বছর হযরত খাদীজা রাযি.-এর মৃত্যু হয়; কিন্তু রোখসত ও স্বামী-স্ত্রীর মিল হয়েছিল তিন বছর পর, যখন হযরত আয়েশা রাযি.-এর বয়স হয়েছিল নয় বছর।

হিজরত

হযরত আয়েশা রাযি. বিবাহের পরও প্রায় তিন বছর পিতৃগৃহে ছিলেন। দু'বছর তিন মাস মক্কায় এবং সাত কি আট মাস মদীনায়। মুসলিমগণ প্রিয় মাতৃভূমি মক্কা থেকে দু'বার হিজরত করেছিলেন। প্রথমবার আবিশিনিয়ায় এবং পরের বার মদীনায়। হযরত আয়েশা রাযি.-এর বর্ণনা অনুযায়ী হযরত আবু বকর রাযি.-ও আবিশিনিয়ায় হিজরত করতে চেয়েছিলেন; এমনকি বারকুল-গিমাদ পর্যন্ত অগ্রসরও হয়েছিলেন। পথিমধ্যে ইবনে দাগিনার সঙ্গে দেখা হয়। শেষ পর্যন্ত আবু বকর রাযি.-ও মক্কা ত্যাগ করছেন দেখে কুরাইশদের প্রতি ইবনে দাগিনার ভীষণ আক্ষেপ হয়। অনেক অনুরোধের পর নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দিয়ে তিনি আবু বকর রাযি.-কে মক্কায় ফিরিয়ে আনেন।[১] খুব সম্ভব, এই সফরে হযরত আয়েশা রাযি.-সহ পরিবারের অনেক সদস্যই হযরত আবু বকর রাযি.-এর সঙ্গে ছিলেন।

মক্কার মুশরিকদের নির্যাতন-নিপীড়নে মুসলমানগণ অতিষ্ঠ হয়ে

---

১. *সহীহ বুখারী*। ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা : ৫২২।

পড়লে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় হিজরত করার সংকল্প করেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকালবেলা ও সন্ধ্যাবেলা প্রতিদিনই আবু বকর রাযি.-এর গৃহে আসতেন। কিন্তু একদিন এ সাধারণ রীতির ব্যতিক্রম ঘটল। ঠিক দ্বিপ্রহরে মুখমণ্ডল চাদরাবৃত করে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু বকর রাযি.-এর গৃহে এলেন। আবু বকর রাযি.-এর পাশে তাঁর দুই মেয়ে : হযরত আয়েশা রাযি. ও হযরত আসমা রাযি. বসা ছিলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আওয়াজ দিলেন—আবূ বকর, লোকজনকে সরিয়ে দিন, কথা আছে। আবু বকর রাযি. আরজ করলেন, হে আল্লাহর রাসূল, অন্য কেউ নেই, আপনারই পরিবার। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভেতরে এলেন এবং হিজরতের ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। হযরত আয়েশা রাযি. ও হযরত আসমা রাযি. দুজনে মিলে সফরের পাথেয় প্রস্তুত করে দিলেন।[১] রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রিয় বন্ধু আবু বকর রাযি.-কে সঙ্গে নিয়ে মদীনা অভিমুখে রওয়ানা হলেন—শত্রুভূমিতে প্রিয় পরিবারকে আল্লাহর কাছে সোপর্দ করে। যেদিন হিজরতে নববীর এই ক্ষুদ্র কাফেলাটি বিপদসঙ্কুল পথ পাড়ি দিয়ে মদীনা মুনাওয়ারায় পৌঁছে, সেদিন ছিল নবুওয়াতের দ্বাদশতম বছরের ১২ই রবিউল আওয়াল।

মদীনায় স্থির হয়েই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপন পরিবারকে কাছে আনার জন্য হযরত যায়েদ রাযি. ও আবু রাফে রাযি.-কে মক্কায় পাঠান। আবু বকর রাযি.-ও লোক পাঠান। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আবু বকর রাযি. মাতা ও ভগ্নিদ্বয়কে সঙ্গে নিয়ে মদীনার পথে পা বাড়ান। হঠাৎ হযরত আয়েশা রাযি.-এর উট পলায়নপর হয়ে দৌড় শুরু করে। উটের ক্ষিপ্রতা দেখে ভয় হচ্ছিল, এই বুঝি হাওদা পড়ে যায়। মহিলাদের মধ্যে রীতিমতো চেঁচামেচি শুরু হয়ে গেল। অবশেষে উট বশে এলে স্বস্তি মেলে। যাই হোক, নবীপরিবার ও সিদ্দীকপরিবারের এই ক্ষুদ্র কাফেলাটি মদীনায় পৌঁছে গেল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন মসজিদে নববীর পাশে ঘর বানাচ্ছিলেন। নবীজীর কন্যা হযরত

---

১. পুরোটাই আয়েশা রাযি.-এর মুখে বিবৃত। *সহীহ বুখারী*, হিজরত অধ্যায়, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা : ৫৫২।

ফাতেমা রাযি. ও হযরত উম্মে কুলসুম রাযি. এবং নবীজীর সম্মানিতা স্ত্রী হযরত সাওদা বিনতে যামআ রাযি. এই নবনির্মিত ঘরেই উঠেছিলেন।[১]

রোখসত

হযরত আয়েশা রাযি.-এর পরিবার বনু হারিস ইবনে খাযরাজের পাড়ায় অবতরণ করেন।[২] প্রায় সাত-আট মাস তিনি মাতার সঙ্গে সেখানেই থাকেন। অধিকাংশ মুহাজিরই নতুন জায়গার নতুন আবহাওয়া সহজে মানিয়ে নিতে পারলেন না। অনেকেই অসুস্থ হয়ে পড়লেন। আবু বকর রাযি.-ও কঠিন রোগে আক্রান্ত হলেন। পিতার শুশ্রূষার দায়িত্ব নিলেন হযরত আয়েশা রাযি.। তিনি বলেন, আমি আমার পিতার কাছে ভালোমন্দ জিজ্ঞেস করলে তিনি এই কবিতা আবৃত্তি করতেন—[৩]

كُلُّ امْرِئٍ مُصَبَّحٌ فِي أَهْلِه - والمَوْتُ أَدْنَىٰ مِن شِرَاكِ نَعْلِه

অর্থ : নিজ বাসভূমেও রোগের আক্রমণ। মৃত্যুর শমন—সে তো ছায়ার মতন।

হযরত আয়েশা রাযি. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে আবু বকর রাযি.-এর অবস্থা ব্যক্ত করলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সুস্থতার জন্য দুআ করলেন। আবু বকর রাযি. তো সুস্থ হলেন; কিন্তু অচিরেই হযরত আয়েশা রাযি.-ও অসুস্থ হলেন। এবার যেন পিতার পালা পুত্রীর দেখাশোনা করার। নয়নমণির করুণ অবস্থা হযরত আবু বকর রাযি.-কে ভীষণ পীড়া দিত। অবস্থার এত অবনতি হয়েছিল যে, হযরত আয়েশা রাযি.-এর সমস্ত চুল পড়ে গিয়েছিল।[৪]

সুস্থ হলে আবু বকর রাযি. রাসূলের কাছে এসে আরজ করলেন, হে আল্লাহর রাসূল, আপনার স্ত্রীকে ঘরে আনছেন না কেন? প্রিয়নবী বললেন,

---

১. *তাবাকাতুন নিসা*, ইবনে সাদ, পৃষ্ঠা : ৪৩।
২. *আবু দাউদ*, শিষ্টাচার অধ্যায়।
৩. *সহীহ বুখারী*, ক্রমিক নং : ৫৬৫৪।
৪. *সহীহ বুখারী*, হিজরত অধ্যায়ে সবগুলো ঘটনা আছে।

এই মুহূর্তে মোহর পরিশোধ করার মতো পয়সা কাছে নেই। আবু বকর রাযি.-এর বিনীত নিবেদন—যদি আমার পয়সা কবুল করতেন! প্রিয়নবী আবু বকর রাযি. থেকে বারো উকিয়া এক নশ কর্জরূপে গ্রহণ করে আয়েশা রাযি.-এর নিকট পাঠিয়ে দিলেন।[১] যারা মোহর পরিশোধ করা অনাবশ্যক জ্ঞান করি, তারা এ ঘটনা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করি। মোহর তো স্ত্রীর অধিকার। সরলতার সুযোগ নিয়ে তাকে বঞ্চিত করা অন্যায়।

মদীনা যেন হযরত আয়েশা রাযি.-এর শ্বশুরালয়। আনসারি মহিলাগণ কনেকে বরণ করার জন্য আবু বকর রাযি.-এর গৃহে এলেন। হযরত আয়েশা রাযি. তখন সখীদের সঙ্গে দোলনায় দোল খাচ্ছিলেন। হযরত উম্মে রুমান রাযি. মেয়েকে ডাক দিলেন। মায়ের ডাক শুনে মেয়ে ছুটে এলেন। মা হাত-মুখ ধুইয়ে দিলেন, মাথা আঁচড়ে দিলেন, তারপর আনসারি অতিথিনীদের অপেক্ষাগারে নিয়ে গেলেন। হযরত আয়েশা রাযি.-কে ঘরে প্রবেশ করতে দেখে তারা অভ্যর্থনা জানালেন; বললেন—

عَلَى الْخَيْرِ وَالْبَرَكَةِ وَعَلَى خَيْرِ طَائِرٍ

তোমার আগমন শুভ হোক, কল্যাণকর হোক, বরকতময় হোক।

তারা হযরত আয়েশা রাযি.-কে সাজিয়ে নিলেন। একটু পরেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমন হলো।[২]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আপ্যায়ন করার মতো এক পেয়ালা দুধ ছাড়া হযরত আবু বকর রাযি.-এর গৃহে কিছুই ছিল না। হযরত আসমা বিনতে ইয়াযিদ হযরত আয়েশা রাযি.-এর ছোটবেলার সখী ছিলেন। তিনি বলেন, আমি সেই বিয়েতে উপস্থিত ছিলাম। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সামান্য দুধ পান করে আয়েশা রাযি.-এর দিকে এগিয়ে দিলেন। তিনি খুব লজ্জা পাচ্ছিলেন। আমি বললাম, রাসূলের উপহার, ফিরিয়ে দিয়ো না। হযরত আয়েশা রাযি. অত্যন্ত লাজুকভাবে পেয়ালা হাতে নিলেন এবং একটু মুখে দিয়েই রেখে দিলেন।

---

১. *তাবাকাত*, ইবনে সাদ, পৃষ্ঠা : ৪৩।

২. *সহীহ বুখারী*, হযরত আয়েশা রাযি. এর বিবাহ, পৃষ্ঠা : ৫৫১। *সহীহ মুসলিম*, বিবাহ অধ্যায়।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমার সখীদেরও দাও। আমরা বললাম, আমাদের ইচ্ছে নেই। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, মিথ্যা বোলো না, মানুষের সব মিথ্যাই লেখা হয়ে থাকে।[১]

সঠিক বর্ণনা অনুযায়ী হযরত আয়েশা রাযি.-এর রোখসত হয় শাওয়াল ১ম হিজরী, দিনের বেলা। আল্লামা সুয়ূতি রহ. *উমদাতুল কারী* গ্রন্থে লিখেছেন, হযরত আয়েশা রাযি.-এর রোখসত হয়েছিল দ্বিতীয় হিজরী, বদর যুদ্ধের পর;[২] কিন্তু এটা ঠিক নয়। কেননা এ হিসাব অনুযায়ী হযরত আয়েশা রাযি.-এর বয়স তখন দশ বছর হয়ে যায়; যেখানে হাদীস ও ইতিহাসের সমস্ত প্রামাণ্যগ্রন্থ একমত যে, রোখসতের সময় হযরত আয়েশা রাযি.-এর বয়স ছিল নয় বছর।

কুসংস্কারের অপনোদন

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে কারও বুঝতে বাকি থাকে না যে, হযরত আয়েশা রাযি.-এর বিবাহ, মোহর, রোখসত কতটা সাদামাটাভাবে হয়েছিল। অপচয়, আড়ম্বরতার লেশ পর্যন্ত ছিল না। وَفِيْ ذَالِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُوْنَ (প্রতিযোগিতা করতেই হয়, তো এতেই করা উচিত)।[৩]

হযরত আয়েশা রাযি.-এর বিবাহের কল্যাণে আরবে বিরাজিত অসংখ্য কুসংস্কারের অপনোদন ঘটে। আরবরা মুখে-বলা ভাইয়ের মেয়েকেও বিয়ে করত না। হযরত খাওলা রাযি. যখন আবু বকর রাযি.-এর কাছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রস্তাব পেশ করেছিলেন তখন আবু বকর রাযি. বলেছিলেন, এ কী করে সম্ভব? আয়েশা তো রাসূলের ভাতিজি! রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তর দিয়েছিলেন, أَنْتَ أَخٌ فِي الْإِسْلَامِ—অর্থ : তুমি আমার ভাই; কিন্তু ধর্মের সূত্রে।

---

১. *মুসনাদে আহমদ*, মুসনাদে আয়েশা রাযি.।

২. *উমদাতুল কারী*, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা : ৪৫।

৩. সূরা মুতাফফিফিন, আয়াত : ২৬।

আরবরা শাওয়াল মাসে বিবাহ করত না। কোনো এককালে এ মাসে আরবে মহামারী দেখা দিয়েছিল। তাই এ মাস তাদের দৃষ্টিতে ছিল অশুভ।[১] হযরত আয়েশা রাযি.-এর বিবাহ, রোখসত উভয়ই শাওয়াল মাসে হয়েছিল। এ জন্য তিনি শাওয়াল মাসেই এসব অনুষ্ঠান পছন্দ করতেন। তিনি বলতেন, আমার বিবাহ রোখসত উভয়ই শাওয়াল মাসে হয়েছে। জীবনসঙ্গীর বিচারে আমার চেয়ে ভাগ্যবতী কে আছে?[২]

আরবে পূর্ব থেকেই রীতি ছিল যে, কন্যার সামনে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত থাকতে হবে। এও রীতি ছিল যে, স্বামী-স্ত্রীর প্রথম সাক্ষাৎ হবে পালকির ভেতর। ইমাম বুখারী রহ. এবং ইমাম কসতলানি রহ. লিখেছেন—এই সব কুসংস্কার হযরত আয়েশা রাযি.-এর বিবাহের মধ্য দিয়ে প্রত্যাখ্যাত হয়।[৩]

---

১. *তাবাকাত*, ইবনে সাদ, পৃষ্ঠা : ৪১।
২. *সহীহ বুখারী* ও *মুসলিম*, বিবাহ অধ্যায়।
৩. *সহীহ বুখারী*, বিবাহ অধ্যায়।

তালীম ও তারবিয়াত

তৎকালীন আরবে শিক্ষার স্বরূপ

নারী তো দূরের কথা, আরবে পুরুষেরই লেখাপড়ার প্রচলন ছিল না। ইসলামের আবির্ভাবের সময় সমগ্র কুরাইশে লেখাপড়া-জানা লোক ছিলেন মাত্র সতেরো জন। তার মধ্যে শিফা আদাবিয়া ছিলেন একমাত্র নারী।[১]

ইসলামের পার্থিব কল্যাণগুলোর মধ্যে এও কিছু কম গুরুত্বপূর্ণ নয় যে, ইসলামের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে লেখাপড়ারও প্রসার ঘটছিল। বদর যুদ্ধে বন্দী কাফেরদের মধ্যে যারা শিক্ষিত ছিল, মহানবী তাদের প্রত্যেককে মুক্তিপণ হিসেবে দশজন মুসলিম শিশুকে লেখাপড়া শেখানোর নির্দেশ দিয়েছিলেন।[২] সুফফায় প্রায় একশো সাহাবী ছিলেন। তাদেরকে প্রয়োজনীয় বিদ্যার পাশাপাশি লেখাপড়াও শেখানো হতো।[৩]

পবিত্র সহধর্মিনীগণের মধ্যে হযরত হাফসা রাযি. ও উম্মে সালামা রাযি. লেখাপড়া শিখেছিলেন। হযরত হাফসা রাযি. বিশেষভাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশে শিফা আদাবিয়ার কাছে এ বিদ্যা রপ্ত করেছিলেন।[৪] পবিত্র স্ত্রীগণসহ আরও অনেক সাহাবিয়া লেখাপড়া শেখার প্রয়াস পেয়েছিলেন।[৫]

---

১. *ফুতুহুল বুলদান*।
২. *মুসনাদে আহমদ*, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা : ২৪৬।
৩. *মুসনাদে আহমদ*, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা : ১৩৭।
৪. *আবু দাউদ*, চিকিৎসা অধ্যায়।
৫. *ফুতুহুল বুলদান*।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনসঙ্গিনীর সংখ্যাধিক্য ও হযরত আয়েশা রাযি.-এর বাল্যবিবাহের একটি কল্যাণকর দিক এই যে, যদিও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সার্বক্ষণিক সাহচর্য সাহাবা কেরামকে সৌভাগ্য ও মর্যাদার উচ্চ শিখরে পৌঁছে দিয়েছিল; কিন্তু স্বাভাবিকভাবে এ সুযোগ সাহাবিয়াগণের হচ্ছিল না। কেননা শুধু পবিত্র স্ত্রীগণই তাঁর সান্নিধ্য-শোভা ও সাহচর্যের আলোক-আভা লাভ করছিলেন। কিন্তু এ উজ্জ্বল তারকারাজির আলোই পুরো পৃথিবীর নারী দিগন্তকে আলোকিত করে।

হযরত আয়েশা রাযি. ছাড়া অন্যান্য স্ত্রীগণ বিধবা হয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সান্নিধ্যে এসেছিলেন। সুতরাং একমাত্র আয়েশা রাযি.-ই একক ও একনিষ্ঠভাবে নববী ফয়যানে ধন্য হয়েছিলেন। আর বাল্যকালই যেহেতু শিক্ষা-দীক্ষার প্রকৃত সময় সেহেতু এ সময়ই ভাগ্য তাঁকে সকল অন্ধকার ও অপূর্ণতা থেকে মুক্ত করে নববী সান্নিধ্যে পৌঁছে দিয়েছিল। তিনি যে পূর্ণতার আলোকবর্তিকা হয়ে থাকবেন যুগ-যুগের মুসলিম রমণীকুলের জন্য!

পিতার কাছে তালীম-তারবিয়াত

হযরত আবু বকর রাযি. সারা কুরাইশে বংশবিদ্যা ও কাব্যজ্ঞানে সবচেয়ে পারদর্শী ছিলেন।[১] কুরাইশ কবিদের প্রতিউত্তরে ইসলামের মুখপাত্র মুসলমানদের শীর্ষ কাব্য দিয়ে যে আক্রমণ চালাত, কাফেরদের বিশ্বাস হতো না যে, তা আবু বকর রাযি.-এর সহযোগিতা ছাড়া রচিত হয়েছে।[২] হযরত আয়েশা রাযি. এমনই একজন কাব্যরত্ন ও বংশবিদ পিতার ঘরে লালিত-পালিত হয়েছিলেন। সুতরাং বংশবিদ্যা ও কাব্যজ্ঞান তাঁর জন্মসূত্রে পাওয়া।[৩]

হযরত আবু বকর রাযি. সন্তানদের শিষ্টাচারের ব্যাপারে ছিলেন অত্যন্ত কঠোর। পুত্র আবদুর রহমান রাযি. অতিথিদের আপ্যায়নে—

১. *সহীহ মুসলিম*, মানাকিবে হাস্‌সান রাযি।
২. *ইসাবা*, ইসতিআব : হযরত হাসান রাযি.-এর আলোচনা।
৩. *মুসতাদরাকে হাকেম* : হযরত আয়েশা রাযি.-এর আলোচনা।

খাবার পরিবেশনে—বিলম্ব করেছিলেন বলে হযরত আবু বকর রাযি. তাঁকে প্রহার করতে গিয়েছিলেন।[১] হযরত আয়েশা রাযি. বিবাহের পরও আপন ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্য পিতৃভয়ে ভীত থাকতেন।[২] হযরত আবু বকর রাযি. কর্তৃক হযরত আয়েশা রাযি.-কে বকাঝকা করার একাধিক ঘটনা পাওয়া যায়।[৩] একবার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে এ ধরনের পরিস্থিতি সৃষ্টি হলে তিনি তাঁকে পিতার হাতে থাপ্পড় খাওয়া থেকে বাঁচিয়েছিলেন।[৪]

পবিত্র জীবনসঙ্গীর সান্নিধ্যে

হযরত আয়েশা রাযি.-এর শিক্ষা-দীক্ষা ও শিষ্টাচার গ্রহণের প্রকৃত ক্ষেত্র আসে রোখসতের পর—পবিত্র জীবনসঙ্গীর সান্নিধ্যে এসে। তিনি জীবনের মর্ম অনুধাবন করেন ও জ্ঞানের স্বরূপ আবিষ্কার করেন এই চিরসুন্দর, চিরমহিমান্বিত সাহচর্য থেকেই। তিনিও যে জ্ঞানের ধর্ম তুলে ধরবেন, জীবনের মর্ম ব্যাখ্যা করবেন—ইসলামের আলোয়-আসা ভাগ্যবতী নারী সমাজের জন্য।

লেখাপড়া

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সান্নিধ্যে এসে হযরত আয়েশা রাযি. পড়তে শিখেছিলেন। তিনি দেখে দেখে কুরআন শরীফ তেলাওয়াত করতেন।[৫]

একটি বর্ণনায় আছে, তিনি লিখতে পারতেন না।[৬] বিভিন্ন হাদীসে এসেছে, গোলাম যাকওয়ান হযরত আয়েশা রাযি.-কে কুরআন লিখে দিতেন।[৭] তাই অনুমান করা হয়, তিনি নিজে লিখতে পারতেন না।

---

১. *সহীহ বুখারী*।

২. *সহীহ মুসলিম* : باب القسم بين الزوجات ।

৩. *সহীহ বুখারী* : باب التيمم । *সহীহ মুসলিম* : باب القسم بين الزوجات ।

৪. *আবু দাউদ* : كتاب الأدب ، باب المزاح ।

৫. *সহীহ বুখারী* : باب تأليف القرآن । *বালাযুরি* : فصل الخط ।

৬. *বালাযুরি* : فصل الخط ।

৭. *সহীহ বুখারী* : الصلوة الوسطى । *মুসনাদে আহমদ* : ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা : ৭৩।

অবশ্য কিছু কিছু বর্ণনায়—অমুক পত্রের জবাবে তিনি লিখেছেন—এমন কথাও পাওয়া যায়।[১] হতে পারে, বর্ণনাকারী রূপকভাবে 'লিখিয়েছেন' পরিবর্তে 'লিখেছেন' শব্দটি প্রয়োগ করেছেন; এবং এর প্রচলনও আছে।

যাই হোক, লেখাপড়া তো মানুষের বাহ্যিক শিক্ষা। প্রকৃত জ্ঞান আরও ওপরের বিষয়। মনুষ্যত্বের বিকাশ, চারিত্রিক গুণাবলি, অনিবার্য ধর্মীয় জ্ঞান, শরীয়তের রহস্য সম্পর্কে অবগতি, কালামে পাকের মারেফাত, আহকামে নববীর ইলম ইত্যাদি জ্ঞানের উন্নততর পর্যায়। আর এ শিক্ষায় হযরত আয়েশা রাযি. ছিলেন স্বয়ংসম্পূর্ণা।

জ্ঞানার্জনের নানা অনুষঙ্গ ও পদ্ধতি

ধর্মীয় জ্ঞানের পাশাপাশি ইতিহাস-সাহিত্য-চিকিৎসায়ও তাঁর পাণ্ডিত্য কম ছিল না।[২] ইতিহাস ও সাহিত্যের শিক্ষা তো স্বয়ং পিতার কাছ থেকেই পেয়েছিলেন।[৩] আর চিকিৎসাবিদ্যা রপ্ত করেছিলেন দিগ্‌দিগন্ত থেকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে আগত আরব গোত্রের প্রতিনিধিদলের কাছ থেকে। তা ছাড়া শেষ বয়সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রায়ই অসুস্থ থাকতেন। এ কারণে আরবের বিজ্ঞ হেকিম ও চিকিৎসকগণের গমনাগমন চলতে থাকত। তারা যখন যে ওষুধ বাতলে দিতেন, হযরত আয়েশা রাযি. সেগুলো শিখে নিতেন।[৪]

দরসে নববী থেকে উপকৃত হওয়া

ধর্মীয় জ্ঞানার্জনের কোনো নির্দিষ্ট সময় ছিল না। স্বয়ং ধর্মগুরুই তো ঘরের মনিব। প্রাণপ্রিয় পরম শ্রদ্ধেয় জীবনসঙ্গীর মোবারক সোহবত সবসময়ই তিনি লাভ করতেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তালীম ও ইরশাদের যাবতীয় মজলিস অনুষ্ঠিত হতো মসজিদে নববীতে,

---

১. *মুসনাদে আহমদ*, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা : ৮৭। *তিরমিযী*, পৃষ্ঠা : ৩৯৭০।
২. *মুসতাদরাকে হাকেম*, সাহাবিয়াদের মধ্যে আয়েশার [রাযি.] আলোচনা।
৩. *মুসনাদে আহমদ*, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা : ৬৭।
৪. *মুসনাদে আহমদ*, মুসনাদে আয়েশা রাযি., পৃষ্ঠা : ৬৭।

যা তাঁর ঘরের সঙ্গে লাগানো। এজন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘরের বাইরেও সাহাবায়ে কেরামকে যা শিক্ষা দিতেন, হযরত আয়েশা রাযি. সেগুলোতেও শরীক থাকতেন। দূরত্বের কারণে কোনো কথা বুঝতে অসুবিধা হলে পরে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছ থেকে ভালোভাবে বুঝে নিতেন।[১] কখনো উঠে মসজিদের কাছে চলে যেতেন।[২] তা ছাড়া সপ্তাহে সাহাবিয়াগণের তালীম তালকীনের জন্য নির্ধারিত দিনটি তো ছিলই।[৩]

আমলী সাওয়ালাত ও বাস্তবভিত্তিক জিজ্ঞাসা

দিন-রাত অসংখ্য ইলমী আলোচনা হযরত আয়েশা রাযি.-এর কর্ণগোচর হতো। তাঁর অভ্যাস ছিল, তিনি যে কোনো মাসআলা নির্দ্বিধায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করতেন। স্পষ্ট না হওয়া পর্যন্ত ক্ষান্ত হতেন না।[৪] একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,

مَنْ حُوْسِبَ فَقَدْ عُذِّبَ

অর্থ : যার হিসাব নেওয়া হবে তার শাস্তি হবেই।

হযরত আয়েশা রাযি. জিজ্ঞেস করলেন, আল্লাহ তো বলেছেন,

فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيْرًا

অর্থ : অচিরেই হিসাব নেওয়া হবে, বড় সহজ হিসাব। (সূরা ইনশিকাক, আয়াত : ৮)

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এ তো হিসাব হবে— সেই কথা; কিন্তু যার হিসাব হবে, সে তো গেল।[৫]

---

১. *মুসনাদে আয়েশা রাযি.*, পৃষ্ঠা : ৭৭।
২. *মুসনাদে আয়েশা রাযি.*, পৃষ্ঠা : ১৫৭।
৩. *সহীহ বুখারী* : কিতাবুল ইলম।
৪. *সহীহ বুখারী* : কিতাবুল ইলম, পৃষ্ঠা : ২১।
৫. *সহীহ বুখারী* : কিতাবুল ইলম।

একবার হযরত আয়েশা রাযি. জিজ্ঞেস করলেন, আল্লাহ বলেছেন,[১]

يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ وَبَرَزُوْا لِلّٰهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ

অর্থ : যেদিন আসমান জমিন বদলে দেওয়া হবে। আর তারা মহাপরাক্রমশালী এক আল্লাহর সামনে দণ্ডায়মান হবে। (সূরা ইবরাহিম, আয়াত : ৪৫)

অন্য একটি বর্ণনা অনুযায়ী তিনি এই আয়াত উল্লেখ করেছিলেন,[২]

وَالْأَرْضُ جَمِيْعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِيْنِهِ

অর্থ : কিয়ামতের দিন গোটা পৃথিবী তাঁর মুঠোয় হবে। আসমান তাঁর হাতের মধ্যে গুটিয়ে যাবে। (সূরা যুমার, আয়াত : ৪৫)

তাঁর প্রশ্ন ছিল, যদি আসমান জমিন কিছুই না থাকে, তা হলে মানুষ থাকবে কোথায়? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, পুলসিরাতে।

একবার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বয়ান করছিলেন। তিনি বললেন, কিয়ামতের দিন বিবস্ত্র অবস্থায় মানুষের উত্থান হবে। পরে হযরত আয়েশা রাযি. জিজ্ঞেস করলেন, নারী পুরুষ একসঙ্গে? তবে কি একে অপরের প্রতি দৃষ্টিপাত করবে না? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সে বড় নাজুক মুহূর্ত হবে। কারও কোনো খবর থাকবে না।[৩]

একবার হযরত আয়েশা রাযি. জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল, কিয়ামতের দিন কেউ কাউকে স্মরণ করবে কি? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তিনটি জায়গায় কেউ কাউকে স্মরণ করবে না, কারও কথা কারও মনেও পড়বে না : এক. যখন আমল ওজন করা হবে;

---

১. *মুসনাদে আহমদ*, পৃষ্ঠা : ৩৫।

২. *মুসনাদে আহমদ*, পৃষ্ঠা : ১১০।

৩. *সহীহ বুখারী*, হাশরের অবস্থা, পৃষ্ঠা : ৯৬৬।

দুই. যখন আমলনামা বণ্টিত হবে; তিন. যখন জাহান্নাম গর্জন শুরু করবে আর বলতে থাকবে—আমি তিন ধরনের মানুষের জন্য তৈরি হয়েছি...[১]

একবার জিজ্ঞেস করার ছিল, কাফের মুশরিক যদি নেক আমল করে তবে তার সওয়াব পাবে কি না? মক্কায় আবদুল্লাহ ইবনে জাদআন নামক একজন মুশরিক ছিলেন। তিনি অত্যন্ত সৎ ও মহৎ মানুষ ছিলেন। ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে কুরাইশের আত্মকলহ-নিরসনে নেতৃবর্গকে একত্র করে তিনি একটি সন্ধি স্থাপন করেছিলেন। স্বয়ং হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও সেই মহৎ উদ্যোগে অংশগ্রহণ করেছিলেন। হযরত আয়েশা রাযি. জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল, আবদুল্লাহ ইবনে জাদআন জাহেলি যুগেও মানুষের প্রতি সহমর্মিতা করতেন, অভাবীকে সহায়তা করতেন। তার আমল কি কোনো উপকারে আসবে না? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন—না, আয়েশা। তিনি তো কোনোদিনই এ কথা বলেননি—হে আমার প্রভু, আমাকে ক্ষমা করুন।[২]

জিহাদ ইসলামের অন্যতম ফরজ। হযরত আয়েশা রাযি.-এর ধারণা ছিল, যেহেতু অন্যান্য ফরজে নারী-পুরুষে ব্যবধান নেই, সেহেতু জিহাদও নারীর ওপর ফরজ হবে। একদিন বিষয়টি সম্পর্কে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তর দিলেন, নারীর জন্য হজই জিহাদ।[৩]

বিবাহে নারীর সম্মতি শর্ত। কিন্তু কুমারী মেয়ে তো মুখ ফুটে বলতে পারে না। তাই হযরত আয়েশা রাযি. জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল, বিবাহে নারীর সম্মতি নিতেই হবে? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, অবশ্যই। হযরত আয়েশা রাযি. আরজ করলেন, কুমারী তো নীরব থাকবে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, নীরবতাই তার সম্মতি নির্দেশ করবে।[৪]

---

১. *মুসনাদে আয়েশা রাযি.* : পৃষ্ঠা : ৯৩।
২. *মুসনাদে আয়েশা রাযি.*, পৃষ্ঠা : ৯৩।
৩. *সহীহ বুখারী* : মহিলাদের হজ।
৪. *সহীহ মুসলিম* : বিবাহ অধ্যায়।

ইসলামে প্রতিবেশীর অধিকার অনেক বেশি। আর এ ধরনের ক্ষেত্রগুলো সবচেয়ে বেশি নারীকেই সামলাতে হয়। কিন্তু সমস্যা এই যে, একাধিক প্রতিবেশী হলে প্রাধান্য দেবে কাকে? হযরত আয়েশা রাযি. বিষয়টি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেন। তিনি বললেন, যার ঘর তোমার ঘরের সবচেয়ে কাছে হবে, তাকেই বেশি মূল্য দেবে।[১]

একবার হযরত আয়েশা রাযি.-এর দুধচাচা দেখা করতে এলেন। হযরত আয়েশা রাযি. প্রথমে দেখা করলেন না। তিনি মনে করলেন, আমি দুধ পান করেছি ঠিকই, কিন্তু একজন স্ত্রীলোকের; তার দেবরের সঙ্গে নিশ্চয় আমার কোনো সম্পর্ক নেই। যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাশরিফ আনলেন, বিষয়টি তাঁর কাছে উত্থাপন করলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তিনি তোমার চাচা বলেই গণ্য হবেন, তাকে ভেতরে নিয়ে এসো।

কুরআন মাজীদে একটি আয়াত আছে,

وَالَّذِيْنَ يُؤْتُوْنَ مَآ اٰتَوْا وَّقُلُوْبُهُمْ وَجِلَةٌ اَنَّهُمْ اِلٰى رَبِّهِمْ رٰجِعُوْنَ

অর্থ : ...আর যারা আমল করে এমতাবস্থায় যে, তাদের অন্তর এই কারণে ভীতসন্ত্রস্ত যে, তাদেরকে তাদের প্রতিপালকের কাছে প্রত্যাবর্তন করতে হবে।... (সূরা মুমিনুন, আয়াত : ৬০)

হযরত আয়েশা রাযি.-এর সন্দেহ ছিল—যারা চোর, বদমাশ, মদখোর—আবার অন্তরে আল্লাহর ভয়ও আছে, তারাও কি এ আয়াতের অন্তর্ভুক্ত হবে? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্পষ্ট করে দিলেন—না, বরং যারা নামাযী, রোযাদার এবং খোদাভীরু আয়াতে তাদের কথা বলা হয়েছে।[২]

একবার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যে আল্লাহর সাক্ষাৎ চায়, আল্লাহও তার সাক্ষাৎ চান। আর যে আল্লাহর সাক্ষাৎ চায়

১. *মুসনাদে আহমদ*, পৃষ্ঠা : ১৭৫।
২. *সহীহ বুখারী*, পৃষ্ঠা : ৯০৯।

না, আল্লাহও তার সাক্ষাৎ চান না। হযরত আয়েশা রাযি. আরজ করলেন, হে আল্লাহর রাসূল, আমরা তো কেউই মৃত্যু চাই না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এর অর্থ এটা নয়; এর অর্থ হলো—যখন মুমিন বান্দা আল্লাহর রহমত, রেজামন্দি ও জান্নাতের কথা শোনে, তখন তার অন্তর আল্লাহর সাক্ষাৎ ও দীদার পাওয়ার জন্য উদগ্রীব হয়ে ওঠে। সে অবস্থায় আল্লাহ তাআলাও সেই বান্দার সাক্ষাৎ চাইতে থাকেন। পক্ষান্তরে যখন কোনো কাফের আল্লাহর আজাব-গজবের কথা শোনে, তখন সে আল্লাহর সাক্ষাতকে ঘৃণা করে, আল্লাহও তাকে ঘৃণা করেন।[১]

হাদীসগ্রন্থগুলো হযরত আয়েশা রাযি. কর্তৃক এরকম অসংখ্য জিজ্ঞাসা, অসংখ্য ভাবনা, অসংখ্য আলোচনাকে ধারণ করে আছে। প্রকৃত প্রস্তাবে, এগুলো তাঁর জীবনমুখী শিক্ষার প্রতিদিনের বিচিত্র পাঠ।

বাহ্যিকভাবে যেসব ক্ষেত্রে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কষ্ট পাওয়ার বা অসন্তুষ্ট হওয়ার কথা, হযরত আয়েশা রাযি. সেসব ক্ষেত্রেও প্রশ্ন করা থেকে বিরত থাকতেন না। স্বয়ং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও এতে মনঃক্ষুণ্ন হতেন না। একবার কোনো বিষয়ে কষ্ট পেয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈলা করেছিলেন (অর্থাৎ শপথ করেছিলেন, এক মাস পবিত্র স্ত্রীগণের কাছে যাবেন না)। তাই ঊনত্রিশ দিন ওপরতলায় অবস্থান করেছিলেন। সহধর্মিনীগণ বিচলিত ছিলেন। ঘটনাক্রমে মাসটি ছিল ঊনত্রিশ দিনের। যাই হোক, ত্রিশতম দিনে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওপরতলা থেকে নেমে হযরত আয়েশা রাযি.-এর ঘরে গেলেন। হযরত আয়েশা রাযি. আনন্দে সবকিছু ভুলে যাওয়ার কথা ছিল। উপরন্তু একে কেন্দ্র করে কোনো প্রশ্ন তোলা বাহ্যিকভাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আরেকবার কষ্ট দেওয়ার মতোই ছিল। কিন্তু হযরত আয়েশা রাযি. যেহেতু নববী-চরিত্রের মাধুরী সম্পর্কে অবগত ছিলেন, সেহেতু সবকিছুর ওপর শরীয়তের বিধি-নিষেধকেই প্রাধান্য দিলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল, আপনি বলেছিলেন, একমাস আমাদের কাছে আসবেন না। তা হলে এক দিন আগে—ঊনত্রিশ দিন পূর্ণ করে—কী করে এলেন? রাসূল

---

১. *জামে তিরমিযী* : জানাযার অধ্যায়।

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আয়েশা, চন্দ্রমাস কখনো ঊনত্রিশ দিনেও হয়।[১]

একবার জনৈক ব্যক্তি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে আসার অনুমতি চাইলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তাকে আসতে দাও, আপনজনদের সঙ্গে সে ভালো ব্যবহার করে না। লোকটা যখন ভেতরে এসে বসল, তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার প্রতি মনোযোগী হলেন এবং খুবই কোমল ও প্রীতভাবে কথা বললেন। হযরত আয়েশা রাযি. অবাক হলেন। লোকটা চলে গেলে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল, আপনি তো লোকটাকে ভালো মনে করেন না; অথচ তার সঙ্গে এত কোমল ও প্রীতভাবে কথা বললেন! রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন—আয়েশা, নিকৃষ্ট তো সে-ই, যার ব্যবহারে মানুষ দূরে সরে যায়।[২]

পল্লী আরবের বর্বর বেদুইনরা ছিল বেপরোয়া মনোভাবের। ইসলামের বিধিনিষেধ সম্পর্কে এদের পূর্ণ ধারণা ছিল না। তাই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এদের খাদ্যসামগ্রীগ্রহণে সাবধানতা অবলম্বন করতেন। একবার উম্মে সুম্বুলা নাম্নী জনৈকা মহিলা এলেন হাদিয়াস্বরূপ দুধ নিয়ে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পান করলেন। হযরত আবু বকর রাযি. সঙ্গে ছিলেন, তিনিও পান করলেন। হযরত আয়েশা রাযি. আরজ করলেন, হে আল্লাহর রাসূল, আপনি এদের খাবার খাওয়া পছন্দ করতেন না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আয়েশা, এরা ওরকম নয়। এদের ডাকা হলে এরা আসে।[৩] তাই শরীয়তের বিধি-নিষেধ সম্পর্কে এদের ধারণা আছে।

একবার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, কাজে কর্মে মধ্যমতা অবলম্বন করো, মানুষকে ডেকে সুসংবাদ দাও যে, মানুষের আমল মানুষকে জান্নাতে নেবে না; বরং আল্লাহর রহমত তাদেরকে জান্নাতে নেবে। শেষ উক্তিটি হযরত আয়েশা রাযি.-এর কাছে অস্বাভাবিক

---

১. *সহীহ বুখারী* : باب الفرقة।

২. *সহীহ বুখারী* : باب الغيبة।

৩. *মুসনাদে আয়েশা রাযি.*, পৃষ্ঠা : ১৩৩।

মনে হলো। তিনি ভাবলেন, যারা নিষ্পাপ তাদের কথা নিশ্চয় আলাদা। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল, আপনাকেও কি আপনার আমল জান্নাতে নেবে না? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, না, বরং আমার আল্লাহ আমাকে আপন ক্ষমা ও করুণা দ্বারা ঢেকে নেবেন।[১]

একবার তাহাজ্জুদের পর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিতর না পড়ে শুতে চাইলেন। হযরত আয়েশা রাযি. আরজ করলেন, হে আল্লাহর রাসূল, বিতর না পড়েই শুয়ে পড়ছেন? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আয়েশা, আমার চোখদুটো ঘুমায়; কিন্তু আমার হৃদয় ঘুমায় না।[২]

বাহ্যিকভাবে এ ধরনের বেশ কিছু প্রশ্ন হযরত আয়েশা রাযি.-এর শানে অশোভন মনে হয়। কিন্তু তিনি যদি স্ত্রীসুলভ সৎসাহসটুকু না দেখাতেন, তা হলে মুসলিম উম্মাহ অবশ্যই নবুওয়াতের প্রকৃতি ও স্বরূপ সম্পর্কে অনবগত থেকে যেত।

সংশোধন, শিষ্টাচার ও মহত্ত্বের দীক্ষা

এ তো গেল হযরত আয়েশা রাযি.-কর্তৃক স্বতঃপ্রণোদিত কিছু জিজ্ঞাসা ও প্রয়োজনীয় আলোচনার কথা। এগুলো ছাড়াও স্বয়ং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও হযরত আয়েশা রাযি.-এর আচার-ব্যবহার, কথাবার্তা, চলা-বলা লক্ষ রাখতেন; কোনো ত্রুটি পেলে শুধরে দিতেন, কিছু শেখানোর থাকলে শিখিয়ে দিতেন—এমন অনেক উদাহরণ আছে হাদীসগ্রন্থের পাতায় পাতায়।

একবার কিছু ইহুদি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এল। তারা السَّلَامُ عَلَيْكَ (আপনার ওপর শান্তি বর্ষিত হোক) না বলে বলল, السَّامُ عَلَيْكَ (আপনার ওপর মৃত্যু আপতিত হোক); রাসূল সাল্লাল্লাহু

---

১. *সহীহ বুখারী* : باب القصد و المداومة على العمل।

২. *সহীহ বুখারী* : فضل من قام رمضان।

আলাইহি ওয়াসাল্লাম শান্তকণ্ঠে উত্তর দিলেন, وَعَلَيْكُمْ (এবং আপনাদের ওপর)। কিন্তু হযরত আয়েশা রাযি. ধৈর্য ধরতে পারলেন না; তিনি বলে উঠলেন, عَلَيْكُمُ السَّامُ وَاللَّعْنَةُ (আর তোমাদের ওপর মৃত্যু ও অভিশাপ নেমে আসুক)। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আয়েশা, নম্র হও, আল্লাহ সর্ব বাক্যে নম্রতা পছন্দ করেন।[১]

একবার হযরত আয়েশা রাযি.-এর কোনো জিনিস চুরি হলো। তখনকার রীতি অনুসারে হযরত আয়েশা রাযি. চোরকে অভিশাপ করলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আয়েশা, لَاتُسَبِّخِيْ عَنْهُ—অর্থাৎ অভিশাপ করে নিজের নেকি আর পরের বদি কমিয়ো না।[২] একবার সফরে হযরত আয়েশা রাযি. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে উটে সওয়ার ছিলেন। হঠাৎ উট কিছুটা তেজ দেখাতে লাগল। সাধারণ নারীর মতো হযরত আয়েশা রাযি.-এর মুখেও অভিশাপের বাক্য এসে পড়ে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নির্দেশ দিলেন, এই উটকে ফিরিয়ে নেওয়া হোক; কোনো অভিশপ্ত বস্তু আমার সঙ্গে থাকতে পারে না।[৩] রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উদ্দেশ্য ছিল এটা শিক্ষা দেওয়া যে, কোনো প্রাণীকেও মন্দ বলা অনুচিত।

সাধারণ মানুষ, বিশেষ করে নারীরা, ছোটখাটো গুনাহর পরোয়া করে না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আয়েশা রাযি.-কে সম্বোধন করে বলেন, ছোটখাটো ভুল-ত্রুটি থেকেও বেঁচে থেকো, এগুলোরও হিসাব হবে।[৪] একবার হযরত আয়েশা রাযি. রাসূলের কাছে জনৈকা মহিলার অবস্থা ব্যক্ত করছিলেন; কথা প্রসঙ্গে বললেন, সে

---

১. *সহীহ বুখারী* : باب الرفق في الأمر كله।

২. *মুসনাদে আহমদ*, পৃষ্ঠা : ৪৫।

৩. *মুসনাদে আহমদ*, পৃষ্ঠা : ৭২।

৪. *মুসনাদে আহমদ*, পৃষ্ঠা : ৭০।

বেঁটে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সঙ্গে সঙ্গে বললেন, আয়েশা, এও গীবত।[১]

হযরত সাফিয়্যা রাযি. কিছুটা খর্বাকৃতির ছিলেন। একদিন হযরত আয়েশা রাযি. বললেন, হে আল্লাহর রাসূল, আর কী বলবেন, সাফিয়্যা তো এট্টুক। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি এমন কথা বললে, যদি সমুদ্রের পানিতে মেশানো হয়, মিশে যাবে (অর্থাৎ তোমার এ কথা এতই লোনা যে যদি সমুদ্রে মেশানো হয় তা হলে সমুদয় পানি লোনা হয়ে যাবে)। হযরত আয়েশা রাযি. বললেন, আমি তো কারও সম্পর্কে বাস্তবতাই তুলে ধরেছি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যদি এত-এত-এতও আমাকে দেওয়া হয়, তবু এ ধরনের কথা বলব না (অর্থাৎ যত লোভই আমাকে দেখানো হোক, কারও সম্পর্কে এহেন মন্তব্য করব না)।[২]

একবার এক ভিক্ষুক ভিক্ষা চাইল। হযরত আয়েশা রাযি.-এর ইশারায় দাসী কিছু দান নিয়ে এগিয়ে এল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আয়েশা, গুনে গুনে দান কোরো না, তা হলে আল্লাহও তোমাকে গুনে গুনে দান করবেন।[৩] আরেক জায়গায় বলেন, আয়েশা, এক টুকরো শুকনো খেজুরও যদি থাকে, তাও ভিক্ষুককে দিয়ে জাহান্নামের আগুন থেকে আত্মরক্ষা করো। এক টুকরো শুকনো খেজুর যদি ক্ষুধার্ত আহার করে তাও কাজে লাগবে। অপ্রয়োজনে নিজের পেটে দিয়ে কী এমন লাভ হবে ?[৪]

একবার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুআ করলেন, আয় আল্লাহ, আমাকে মিসকিনভাবে জীবিত রাখুন, মিসকিনভাবে মৃত্যু দান করুন, মিসকিনদের সঙ্গেই হাশর করান। হযরত আয়েশা রাযি. জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল, এমন দুআ কেন করছেন? রাসূল সাল্লাল্লাহু

---

১. *মুসনাদে আহমদ*, পৃষ্ঠা : ২০৬।
২. *মুসনাদে আহমদ*, পৃষ্ঠা : ৭০।
৩. *আবু দাউদ*, কিতাবুল আদব।
৪. *মুসনাদে আয়েশা রাযি.*, পৃষ্ঠা : ৭৯।

আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আয়েশা, মিসকিনরা ধনীদের চল্লিশ বছর আগে জান্নাতে যাবে। আয়েশা, কখনো কোনো মিসকিনকে খালি হাতে ফিরিয়ে দিয়ো না। এক টুকরো শুকনো খেজুর হলেও দিয়ো। আয়েশা, মিসকিনদের ভালোবেসো, তাদেরকে কাছে আসার সুযোগ দিয়ো।[১]

এরকম অনেক নৈতিক উপদেশ ছাড়াও ইবাদত-বন্দেগী, দুআ-জিকির ও ধর্ম-কর্মের অধিকাংশ বিষয়ই স্বয়ং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আয়েশা রাযি.-কে শিক্ষা দিতেন। হযরত আয়েশা রাযি. খুবই আগ্রহের সঙ্গে সেগুলো শিখতেন এবং অত্যন্ত কঠোরভাবে একেকটা নির্দেশ পালন করতেন।[২]

---

১. *জামে তিরমিযী* : আবওয়াবুয যুহ্দ।

২. *মুসনাদে আয়েশা রাযি.* : পৃষ্ঠা : ১৮৩, ১৪৭, ১৫১।

সংসার-জীবন

নবীপরিবারের বাসগৃহের চিত্র

হযরত আয়েশা রাযি. পিতৃগৃহ ত্যাগ করে যে ঘরে এসেছিলেন তা কোনো সুউচ্চ শানদার অট্টালিকা ছিল না; বরং বনু নিযারের মহল্লায় মসজিদে নববীর পাশে ছোট-ছোট অনেক হুজরা ছিল, এগুলোরই একটি ছিল হযরত আয়েশা রাযি.-এর বাসস্থান। হযরত আয়েশা রাযি.-এর হুজরার অবস্থান ছিল মসজিদে নববীর পূর্ব দিকে।[১] হুজরার একটি দরজা মসজিদের ভেতরে পশ্চিম দিকে এমনভাবে ছিল যে, মনে হতো—মসজিদে নববীই হুজরার আঙিনা। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই দরজা দিয়েই মসজিদে নববীতে প্রবেশ করতেন। ইতিকাফরত অবস্থায় হুজরার দিকে মাথা এগিয়ে দিতেন আর হযরত আয়েশা রাযি. তাঁর কেশ মোবারক আঁচড়ে দিতেন।[২] কখনো কখনো মসজিদে বসেই হুজরার দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে কোনো কিছু চেয়ে নিতেন।[৩]

হুজরার প্রশস্ততা ছিল ছয়-সাত হাতের মতো। দেয়াল ছিল মাটির। ছাউনি ছিল খেজুরপাতা ও খেজুরডালের। বৃষ্টির পানি এড়ানোর জন্য ওপর থেকে কম্বলজাতীয় মোটা কাপড় বিছানো থাকত। উচ্চতা এটুকু ছিল যে, কেউ দাঁড়িয়ে হাত বাড়ালে ছাউনিতে হাত ঠেকে যেত। দরজার কপাট ছিল এক পাটের।[৪] তাও সারা জীবনে কখনো বন্ধ হয়নি।[১]

---

১. *খুলাসাতুল অফা বি আখবারি দারিল মুসতফা*, চতুর্থ অধ্যায়, চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

২. *সহীহ বুখারী* : ইতিকাফ অধ্যায়। *মুসনাদে আহমাদ*, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা : ২৩১।

৩. *সহীহ বুখারী* : হায়েয অধ্যায়।

৪. *মুসনাদে আহমদ*, *ইবনে সাদ*। *আল আদাবুল মুফরাদ*, *বুখারী* : কিতাবুন নিসা। *খুলাসাতুল অফা*।

পর্দাস্বরূপ কাপড় ঝোলানো থাকত। হুজরার সঙ্গে লাগানো একটি ওপরতলা ছিল। ঈলার দিনগুলোতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একমাস এখানেই অবস্থান করেছিলেন।[২]

ঘরের আসবাবপত্র

ঘরে সব মিলিয়ে যা ছিল : একটা চকি, একটা চাটাই, একটা বিছানা, একটা ছালের বালিশ, খেজুর ও জব রাখার দু-একটা পাত্র, একটা জগ, একটা মগ। এর বেশি কিছু ছিল না।[৩] সত্যিকার অর্থে যেই ঘরটা ছিল পৃথিবী ও পৃথিবীবাসীর আলোর উৎস—সেই ঘরেই আলো জ্বালানোর সামর্থ্য ঘরওয়ালার ছিল না।[৪] রাতের পর রাত পার হয়ে যেত, কিন্তু ঘরে আলো জ্বলত না।[৫]

সদস্যসংখ্যা মাত্র দুজন : হযরত আয়েশা রাযি. ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। কয়দিন পর হযরত বারীরাহ রাযি. নাম্নী দাসীও যোগ হলো।[৬] যতদিন পর্যন্ত হযরত আয়েশা রাযি. ও হযরত সাওদা রাযি. কেবল দুজনই পবিত্র স্ত্রীর মর্যাদায় ভূষিত ছিলেন, ততদিন পর্যন্ত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন পরপর হযরত আয়েশা রাযি.-এর ঘরে অবস্থান করতেন। পরবর্তীতে যখন আরও অনেক মহীয়সী এই বৈশিষ্ট্যে বিশিষ্টতা লাভ করেন, তখন বার্ধক্যজনিত কারণে হযরত সাওদা রাযি. তাঁর অধিকার হযরত আয়েশা রাযি. এর অনুকূলে ছেড়ে দেন। সুতরাং নয় দিনে দুই দিন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আয়েশা রাযি.-এর ঘরে অবস্থান করতেন।

---

১. *খুলাসাতুল অফা*, চতুর্থ অধ্যায়।

২. *আবু দাউদ* : উপবিষ্ট অবস্থায় ইমামের নামায অধ্যায়।

৩. হাদীসগ্রন্থসমূহে বিভিন্ন প্রসঙ্গে এগুলোর নাম এসেছে। দেখুন—الطهارة، الحيض، صلوة الليل ইত্যাদি অধ্যায়গুলো।

৪. *সহীহ বুখারী*, باب التطوع خلف المرأة।

৫. *মুসনাদে তয়ালিসি*, পৃষ্ঠা : ২০৭।

৬. *সহীহ বুখারী*, পৃষ্ঠা : ৩৪৮। باب الصدقة، الإفك، باب استعانة المكاتب।

অভাব-অনটন

ঘরের কাজ বেশি ছিল না। খানা পাকানোর সুযোগও কম হতো। স্বয়ং হযরত আয়েশা রাযি. বলেন, একটানা তিন দিন ঠিকমতো আহার জুটেছে—নবীপরিবারে কখনো এমন হয়নি।[১] তিনি আরও বলেন, মাসের পর মাস চুলোয় আগুন জ্বলত না।[২] শুকনো খেজুর ও পানিতেই দিন কাটত।[৩] অবশ্য খায়বার বিজয়ের পর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পবিত্র স্ত্রীগণের খোরপোশস্বরূপ বার্ষিক ভাতা নির্ধারণ করেছিলেন—আশি অসক শুকনো খেজুর, বিশ অসক জব।[৪] কিন্তু সেসব তাঁরা দান-খয়রাত করে শেষ করে ফেলতেন। অভাব-অনটন সবসময় লেগেই থাকত।

সাহাবা কেরাম রাযি. মহব্বত করে মাঝেমধ্যে হাদিয়া-তোহফা পাঠাতেন—বিশেষ করে, যেদিন হযরত আয়েশা রাযি.-এর হুজরায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের থাকার কথা থাকত, সেদিন তাঁরা হাদিয়া পাঠানোর চেষ্টা করতেন বেশি।[৫] প্রায়ই এমন হতো, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাইরে থেকে এসে জিজ্ঞেস করতেন, আয়েশা, ঘরে খাবার কিছু আছে? হযরত আয়েশা রাযি. উত্তর দিতেন, হে আল্লাহর রাসূল, ঘরে কিছু নেই। আর কী! দুজনেই উপোস।[৬] কখনো-কখনো কোনো আনসারি সাহাবী দুধ পাঠিয়ে দিতেন। নবীপরিবার তুষ্ট।[৭]

নিজ হাতে খানা পাকানো

আল্লাহপ্রদত্ত এমন বিবেক, বুদ্ধি ও চেতনা সত্ত্বেও—বিশেষ করে বয়স যেহেতু খুবই কম ছিল—ভুল-ত্রুটি করে ফেলতেন। আটা পিষে

---

১. *সহীহ বুখারী* : معيشة النبي صلى الله عليه وسلم। *মুসনাদে আহমদ*, পৃষ্ঠা : ২৫৫।

২. *মুসনাদে আহমদ*, পৃষ্ঠা : ২১৭, ২৩৭। *মুসনাদে তয়ালিসি*, পৃষ্ঠা : ২০৭। *সহীহ বুখারী*, পানাহার অধ্যায়ে আছে—একমাস।

৩. *সহীহ বুখারী*, كيف كان عيش النبي صلى الله عليه وسلم।

৪. *আবু দাউদ*, حكم أرض الخيبر।

৫. *সহীহ বুখারী*, فضل عائشة رض।

৬. *মুসনাদে আহমদ*, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা : ৪৯।

৭. *মুসনাদে আহমদ*, ২৪৪ পৃষ্ঠা।

রেখে ঘুমিয়ে পড়তেন, আর বকরি এসে খেয়ে ফেলত।[১] একদিনের ঘটনা—হযরত আয়েশা রাযি. নিজ হাতে আটা পিষে রুটি বানিয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অপেক্ষায় আছেন। রাতের বেলা। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এলেন এবং নামাযে দাঁড়ালেন। হযরত আয়েশা রাযি. একসময় ঘুমিয়ে পড়লেন। পাশের বাড়ির বকরি এসে সব খেয়ে চলে গেল।[২] অন্য স্ত্রীগণের তুলনায় হযরত আয়েশা রাযি. ভালো রান্না করতে পারতেন না।[৩]

বাজারসদাই ও খরচপাতি

নবীপরিবারের বাজারসদাই ও খরচপাতির দায়িত্ব ছিল হযরত বেলাল রাযি.-এর ওপর। তিনিই নবীপরিবারের সারা বছরের খোরপোশ বণ্টন করতেন। প্রয়োজনে ধারকর্জও করতেন।[৪] রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকালের সময় পুরো আরব ছিল বশীভূত। সকল প্রদেশ থেকে একের পর এক ধনভাণ্ডার বাইতুল মালে এসে জড়ো হতো। অথচ যেদিন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকাল হলো, সেদিন হযরত আয়েশা রাযি.-এর ঘরে একদিন পার হওয়ার মতো খাবারও ছিল না।[৫]

হযরত আবু বকর রাযি.-এর খেলাফতের সময় খায়বারের নীতি অনুসারে নির্ধারিত পরিমাণ ফসল আসত। পরে হযরত উমর রাযি. সবার জন্য নগদ অর্থ নির্ধারণ করেন। অন্য স্ত্রীগণ পেতেন দশ হাজার দিরহাম, আর হযরত আয়েশা রাযি. পেতেন বারো হাজার।[৬] একটি বর্ণনায় আছে : হযরত উমর রাযি. ইচ্ছাধিকার দিয়েছিলেন—চাইলে ফসল নিতে

---

১. *সহীহ বুখারী*, الإفك।

২. *আল আদাবুল মুফরাদ*, ইমাম বুখারী, باب لا يؤذى جاره...।

৩. *আবু দাউদ*, باب من أفسد شيئا...।

৪. *আবু দাউদ*, باب قبول هدايا المشركين।

৫. *তিরমিযী*, পৃষ্ঠা : ৪০৭ (মাতবাউল উলুম, দিল্লি)।

৬. *মুসতাদরাকে হাকেম*, ذكر عائشة في الصحابيات।

পারেন, কিংবা জমিও নিতে পারেন।[১] হযরত আয়েশা রাযি. জমি নিয়েছিলেন। কিন্তু সেই অর্থের অধিকাংশই ছিল ফকির-মিসকিনের জন্য ওয়াকফকৃত। হযরত উসমান রাযি., হযরত আলী রাযি. ও আমীর মুয়াবিয়া রাযি.-এর সময়ও সাধারণভাবে এ নীতিই চালু ছিল। আমীর মুআবিয়া রাযি.-এর অব্যবহিত পরই হেজাজের খলীফা হয়েছিলেন হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের রাযি.। তিনি হযরত আয়েশা রাযি.-এর আপন ভাগ্নে ছিলেন। সম্মানিতা খালার যাবতীয় ব্যয়ভার-দায়ভার বহন করতেন তিনি নিজে। কিন্তু যেদিনই বাইতুল মাল থেকে হাদিয়া আসত, সেদিনই সব দান-খয়রাত করে শেষ করে ফেলতেন। সন্ধ্যায় ঘরে আর কিছু থাকত না।[২]

---

১. *সহীহ বুখারী*, باب المزارعة بالشرط।

২. *সহীহ বুখারী*, মানাকিবে কুরাইশ।

দাম্পত্যজীবন

ইসলাম ও নারী

নারীর প্রতি প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মনোভাব সম্পূর্ণ বিপরীত। প্রাচ্যে নারীর ভালোবাসা মর্যাদা ও আভিজাত্যের জন্য হানিকর। তাদের জীবনব্যবস্থায় নারী একটা কমদামি কুপির মতো, যা ঘরকে আলো দেয় ঠিকই; কিন্তু গৃহকোণকে কালো করে ফেলে। অন্যদিকে প্রতীচ্যে নারীই সব—যেন পূজ্য দেবী। রীতিমতো তাদের শ্লোগান—দেবী খুশি, তো সবই খুশি। সেখানে কোনো মত বা মতাদর্শের গ্রহণযোগ্যতাও নির্ভর করে—তাতে নারীকে কেমন মূল্য দেওয়া হয়েছে তার ওপর।

ইসলামের সরল পথ বিপরীতমুখী দুই প্রান্তিকতাকেই প্রত্যাখ্যান করে। ইসলামে নারী না জীবনের সব, না জীবনের গজব। ইসলামে নারীর সুন্দরতম ব্যাখ্যা : নারী—জীবন ও জগতের টানাপোড়েনে, সুখে-দুখে পুরুষের সঙ্গিনী, সান্ত্বনা ও প্রশান্তি। মহান আল্লাহ ইরশাদ করেছেন :

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً

অর্থ : তাঁর একটি নিদর্শন এই যে, তিনি তোমাদের থেকেই সৃষ্টি করেছেন তোমাদের স্ত্রীগণকে, যেন তোমরা তাদের কাছে প্রশান্তি লাভ করো। আর তিনি তোমাদের মাঝে স্থাপন করেছেন ভালোবাসা ও মায়া। (সূরা রুম, আয়াত : ২১)

পরিবারের প্রতি কেমন ছিলেন প্রিয় রাসূল

যাই হোক, ইসলামে নারীর মর্যাদা ও অধিকার আমাদের আলোচ্য বিষয় নয়। আমরা শুধু দেখানোর চেষ্টা করব—রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও হযরত আয়েশা রাযি.-এর দাম্পত্যজীবন কেমন ছিল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِه وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِيْ

অর্থ : তোমাদের মধ্যে সেই সবচেয়ে ভালো মানুষ, যে তার স্ত্রীর কাছেও সবচেয়ে ভালো মানুষ। আমি আমার স্ত্রীর কাছেও সবচেয়ে ভালো মানুষ।[১]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বক্তব্যের যথার্থতা পাওয়া যায় হযরত আয়েশা রাযি.-এর সঙ্গে তাঁর দীর্ঘ নয় বছরের দাম্পত্যজীবন থেকে। এতদিনের দীর্ঘ দাম্পত্যজীবনে (ঈলার ঘটনা ছাড়া) পারস্পরিক মনোমালিন্যের একটি ঘটনাও ঘটেনি। সবসময় স্নেহ, মায়া, ভালোবাসা ও আন্তরিকতার সম্পর্ক ছিল। বিশেষ করে নবীপরিবারের পার্থিব-জীবন কত অভাব-অনটন ও কঠিনতার মধ্য দিয়ে কেটেছে তা কল্পনা করলেই সেই প্রেম ও ভালোবাসার গভীরতা অনুভব করা যায়।

জীবনসঙ্গিনীর প্রতি ভালোবাসা

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আয়েশা রাযি.-কে খুবই ভালোবাসতেন। সাহাবা কেরাম রাযি. সকলেই তা জানতেন। সেজন্য তাঁরা সেদিনই হাদিয়া পাঠাতেন, যেদিন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আয়েশা রাযি.-এর ঘরে থাকতেন।[২] তাঁরা এটা ইচ্ছাকৃতভাবেই করতেন। পবিত্র স্ত্রীগণ কষ্ট পেতেন; কিন্তু কিছু বলার ছিল না। অবশ্য একবার সকলে মিলে হযরত ফাতেমা রাযি.-এর সাহায্য নিলেন। হযরত ফাতেমা রাযি. বিষয়টি উত্থাপন করলে রাসূল সাল্লাল্লাহু

---

১. *সহীহ বুখারী*, ২য় খণ্ড, باب حسن المعاشرة।

২. *সহীহ বুখারী*, ২য় খণ্ড, باب فضل عائشة رض, পৃষ্ঠা : ৫৩২।

আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন—আমার কলিজার টুকরা, যাকে আমি চাই তাকে তুমি চাইবে না! জগৎ-জননীকে বেশি কিছু বলতে হলো না। তিনি ফিরে এলেন। পবিত্র স্ত্রীগণ আবারও পাঠাতে চাইলেন, কিন্তু তিনি অসম্মত হলেন।[১] অবশেষে তাঁরা হযরত উম্মে সালামা রাযি.-কে পাঠালেন। তিনি অত্যন্ত বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমতী ছিলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রিয়ও ছিলেন। তিনি সুযোগ বুঝে খুবই বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে বিষয়টি তুললেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন—উম্মে সালামা, আয়েশার ব্যাপারে কিছু বোলো না; কেননা সে ছাড়া আর কোনো স্ত্রীর বিছানায় আমার ওপর ওহী নাজিল হয়নি।[২]

একবার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপহার হিসেবে একটি হার পেলেন। তিনি বললেন—আমি এটা তাকেই দেব, যাকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসি। সবাই বলাবলি করলেন, ইবনে কুহাফার মেয়েই (হযরত আয়েশা রাযি.) এটা পাবে। কিন্তু রাসূলের ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ কখনোই রঙ-বেরঙের কাপড়চোপড় ও চকচকে গহনায় ছিল না। তিনি এটা তাঁর ছোট্ট নাতনী, হযরত যায়নাব রাযি.-এর নয়নমণি হযরত উমামা রাযি.-কে দান করলেন।[৩]

হযরত আমর ইবনুল আস রাযি. যখন গাযওয়ায়ে সুলাসিল থেকে ফিরে এলেন, তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেন—হে আল্লাহর রাসূল, আপনি সবচেয়ে কাকে বেশি ভালোবাসেন? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আয়েশাকে। হযরত আমর রাযি. আরজ করলেন—হে আল্লাহর রাসূল, প্রশ্ন পুরুষদের ব্যাপারে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন—আয়েশার পিতাকে।[৪]

---

১. *সহীহ বুখারী*, باب الهدايا।
২. *নাসাঈ*, باب حب الرجل بعض نسائه।
৩. *মুসনাদে আহমদ* : ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা : ১০১।
৪. *সহীহ বুখারী* : باب مناقب أبي بكر رضي الله عنه।

একদিন হযরত উমর রাযি. হযরত হাফসা রাযি.-কে বোঝাচ্ছিলেন—মা, আয়েশাকে হিংসা কোরো না; তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রিয় পাত্রী।[১]

কোনো এক সফরে হযরত আয়েশা রাযি.-এর সওয়ারি অনিয়ন্ত্রিত হয়ে এক দিকে ছুট দেয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এতটাই পেরেশান হয়ে গিয়েছিলেন যে, তার পবিত্র জবান থেকে বের হয়ে গেল—

وَاعَرُوْسَاه!

অর্থ : হায় হায়, আমার স্ত্রীর কী হবে![২]

একবার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘরে এলেন। দেখলেন, হযরত আয়েশা রাযি. মাথাব্যথায় কাতরাচ্ছেন। তিনি বলে ফেললেন, وَا رَأْسَاه!—ওহ, মাথাটা গেল! এ সময়ই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অসুস্থ হয়েছিলেন এবং এটাই ছিল তাঁর মৃত্যুরোগ।[৩] রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মৃত্যুশয্যায় শায়িত থেকে বারবার জিজ্ঞেস করতেন, আজ কী বার? সাহাবা কেরামের বুঝতে অসুবিধা হয়নি।[৪] তারা তাঁকে হযরত আয়েশা রাযি.-এর ঘরে নিয়ে গিয়েছিলেন। মৃত্যু পর্যন্ত তিনি সেখানেই ছিলেন। সেখানেই হযরত আয়েশা রাযি.-এর কোলে মাথা রেখে আপন প্রভুর সমীপে আত্মনিবেদন করেন।[৫]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুআ করতেন—হে আল্লাহ, যা আমার নিয়ন্ত্রণে (অর্থাৎ স্ত্রীগণের প্রতি আচার-ব্যবহার ও লেনদেন), তাতে অবশ্যই সমতাবিধান করি; কিন্তু যা আমার নিয়ন্ত্রণে নয় (অর্থাৎ হযরত আয়েশার প্রতি ভক্তি ও ভালোবাসা), তাতে আমাকে ক্ষমা কোরো।[৬]

---

১. *সহীহ বুখারী*, পৃষ্ঠা : ৭৮৫ ।
২. *মুসনাদে আহমদ* : ৬ষ্ঠ খণ্ড, ২৫৮ পৃষ্ঠা।
৩. *সহীহ বুখারী*, পৃষ্ঠা : ৮৪৬। *মুসনাদে আহমদ*, পৃষ্ঠা : ২২৮।
৪. *সহীহ বুখারী*, পৃষ্ঠা : ১৮৬।
৫. *সহীহ বুখারী*, পৃষ্ঠা : ৬৪০।
৬. *আবু দাউদ* : باب القسم بين الزوجات।

সাধারণ মানুষ ভাবতে পারেন, হযরত আয়েশা রাযি.-এর প্রতি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভালোবাসার কারণ হয়তো তাঁর সৌন্দর্য হবে। কিন্তু এ ধারণা একেবারেই ভুল। পবিত্র স্ত্রীগণের মধ্যে হযরত যায়নাব রাযি., হযরত জুওয়াইরিয়া রাযি., হযরত সাফিয়্যাহ রাযি. প্রমুখের সৌন্দর্যও কম ছিল না। তাদের সৌন্দর্যের কথা হাদীস, তারীখ ও সিয়ারগ্রন্থগুলোতে এসেছে। তা ছাড়া অল্পবয়স্কা ও প্রায়কুমারী স্ত্রীও ছিলেন।[১] কিন্তু আয়েশা রাযি.-এর সৌন্দর্যের কথা হাদীস, তারীখ ও সিয়ারে আসেনি বললেই চলে। অবশ্য হযরত উমর রাযি. তাঁর কন্যা হযরত হাফসা রাযি.-কে বলেছিলেন—হযরত আয়েশা রাযি.-কে হিংসা কোরো না; কারণ তিনি তোমার চেয়ে বেশি সুন্দরী এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রিয় পাত্রী। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত উমর রাযি.-এর মন্তব্য শুনে ঈষৎ হেসেছিলেন।[২] কিন্তু এই হাদীস থেকে এর চেয়ে বেশি কিছু প্রমাণিত হয় না যে, তিনি হযরত হাফসা রাযি.-এর চেয়ে সুন্দর ছিলেন।

প্রকৃত প্রস্তাবে, হযরত আয়েশা রাযি.-এরই বর্ণনা, সহীহ মুসলিম ও আবু দাউদের বিবাহ অধ্যায়ে হযরত আবু হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত আছে, বিবাহে পাত্রী-নির্বাচনে চারটি গুণ দেখা হয় : সম্পদ, সৌন্দর্য, বংশ, ধার্মিকতা; কিন্তু তোমরা ধার্মিক মেয়ে খুঁজো।[৩] সুতরাং পবিত্র স্ত্রীগণের মধ্যে তাঁরই সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব পাবার কথা, যার দ্বারা ধর্মের সেবা হবে সবচেয়ে বেশি। হযরত আয়েশা রাযি.-এর মাসায়েল-দক্ষতা, ইজতিহাদ-ক্ষমতা, ধর্মীয় বিধি-বিধানের জ্ঞান শুধু নারী নয়, পুরুষদেরকেও ছাড়িয়ে গিয়েছিল। পবিত্র স্ত্রীগণের তুলনায় তাঁর বিশিষ্টতা এখানেই। এজন্যই তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বেশি প্রিয় ছিলেন। আল্লামা ইবনে হাযাম (الملل والنحل) *আল মালিল ওয়ান নাহাল* গ্রন্থে এ ব্যাপারে বিশদ ও প্রামাণ্য আলোচনা করেছেন।[৪]

---

১. *যুরকানি* ও এ জাতীয় সিয়ারগ্রন্থগুলো দ্রষ্টব্য।

২. *সহীহ বুখারী* : باب موعظة الرجل لابنته بحال زوجها ।

৩. *মুসনাদে আহমদ* : মুসনাদে আয়েশা রাযি., পৃষ্ঠা : ১৫২।

৪. الملل والنحل : أفضلية الصحابة ।

সিহাহ্গ্রন্থে আছে,[১] রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

كَمُلَ مِنَ الرِّجَالِ كَثِيْرٌ وَلَمْ يَكْمُلْ مِنَ النِّسَاءِ غَيْرُ مَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ وَآسِيَةُ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ وَ إِنَّ فَضْلَ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضْلِ الثَّرِيْدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ

অর্থ : পুরুষদের মধ্যে অনেকেই কামেল হয়েছিলেন; কিন্তু নারীদের মধ্যে কামেল হয়েছিলেন শুধু ইমরানপুত্রী মারইয়াম ও ফেরাউনপত্নী আসিয়া। নিঃসন্দেহে সকল খাদ্যের ভেতর সারিদ যেমন শ্রেষ্ঠ, তেমনি সকল নারীর ওপর আয়েশা শ্রেষ্ঠ।[২]

এই হাদীস থেকেই বোঝা যায়, এই ভক্তি-ভালোবাসার প্রকৃত কারণ কী? বাহ্যিক সৌন্দর্য-শোভা, নাকি সুপ্ত জ্ঞানের আভা। সুপ্ত প্রতিভা ও জ্ঞানে-গুণে হযরত আয়েশা রাযি.-এর পর হযরত উম্মে সালামা রাযি.-এর অবস্থান। তিনিও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন; অথচ তিনি ছিলেন বয়োবৃদ্ধা। হযরত খাদীজা রাযি.-এর ইন্তেকাল হয়েছিল পঁয়ষট্টি বছর বয়সে; কিন্তু তাঁর প্রতি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভালোবাসা[৩] এমন ছিল যে, হযরত আয়েশা রাযি.-ও ঈর্ষা করতেন। একবার তিনি মন্দভাবে হযরত হযরত খাদীজা রাযি.-এর নাম নেওয়ার কারণে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভীষণ কষ্ট পেয়েছিলেন।[৪]

জীবনসঙ্গীর প্রতি ভালোবাসা

হযরত আয়েশা রাযি.-ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অনেক ভালোবাসতেন। শুধু তাই নয়, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি তাঁর ভীষণ অনুরাগ ও আসক্তি ছিল। অন্য কেউ রাসূলকে ভালোবাসার কথা বললে তাঁর খুব কষ্ট হতো। পবিত্র স্ত্রীগণের

---

১. *সহীহ মুসলিম* : فضائل الصحابة رض : -باب فضل عائشة رض., ক্রমিক : ৬২৯৯।

২. *সহীহ বুখারী* : كتاب أحاديث الأنبياء، باب قول الله تعالى : وضرب الله مثلا للذين آمنوا ক্রমিক : ৩৪১১।

৩. *সহীহ মুসলিম* : باب فضل خديجه رض- ।

৪. *সহীহ বুখারী* ও *সহীহ মুসলিম* : باب فضل خديجة رض- ।

প্রতি তাঁর খুব নজর থাকত। কখনো এমন হতো যে, রাতে ঘুম ভেঙে গেছে, দেখেন—রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাশে নেই; তিনি অস্থির হয়ে যেতেন। একবার রাতে ঘুম ভেঙে গেলে রাসূলকে পেলেন না। ঘর অন্ধকার।[১] এদিক-সেদিক হাতড়াতে লাগলেন। অবশেষে রাসূলের কদম মোবারকে হাত পড়ল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেজদারত অবস্থায় আল্লাহর দরবারে রোনাজারি করছেন।[২] আরও একবার একই ঘটনা ঘটলে তিনি ভেবেছিলেন—রাসূল হয়তো অন্য কোনো স্ত্রীর ঘরে গেছেন। উঠে এদিক-সেদিক দেখতে লাগলেন। পরে বুঝতে পারলেন, তিনি তাসবিহ-তাহলিলে রত আছেন। হযরত আয়েশা রাযি. মনে-মনে লজ্জিত হলেন। অবচেতন মনে বলে ফেললেন—আমার মা-বাবা আপনার প্রতি কোরবান হোন; আমি কোন ধ্যানে ছিলাম, আর আপনি কোন ধ্যানে ছিলেন।[৩]

আরেক রাতের ঘটনা। ঘুম ভাঙলে দেখলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নেই। প্রায় অর্ধেক রাত অতিবাহিত হয়েছে। এদিক-সেদিক খুঁজলেন, কিন্তু প্রিয়তমের কোনো সাড়াশব্দ নেই; খুঁজতে-খুঁজতে গোরস্তানে পৌঁছে গেলেন, দেখলেন—রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুআ ও ইস্তিগফারে মশগুল। সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে এলেন। সকালে রাসূলের কাছে ঘটনাটি ব্যক্ত করলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, রাতে কারও ছায়া লক্ষ করেছিলাম; তা হলে তুমিই ছিলে?[৪]

কোনো এক সফরে হযরত আয়েশা রাযি. ও হযরত হাফসা রাযি. রাসূলের সঙ্গে ছিলেন। প্রতি রাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আয়েশা রাযি.-এর হাওদায় তাশরিফ আনতেন। যখন কাফেলা চলত, তখন কথাবার্তাও চলত। একদিন হযরত হাফসা রাযি. বললেন—

---

১. *সহীহ বুখারী* : باب التطوع خلف المرأة *মুয়াত্তা মালিক* : باب صلاة الليل ।

২. *মুআত্তা মালিক* : باب ما جاء في الدعاء ।

৩. *নাসাঈ* : باب الغيرة و باب الدعاء في السجود ।

৪. সামান্য ভিন্নতাসহ ঘটনাটি বিভিন্ন হাদীসগ্রন্থে এসেছে। বিশুদ্ধ গ্রন্থগুলোই দ্রষ্টব্য। বিশেষত *নাসাঈ* : باب الاستغفار للمؤمنين এবং باب الغيرة ।

আয়েশা, চলো, আমরা হাওদা বদলাবদলি করি। হযরত আয়েশা রাযি. উদারতা ও সরলতার পরিচয় দিলেন। রাতে আগের মতোই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আয়েশা রাযি.-এর হাওদায় এলেন; কিন্তু সেখানে হযরত হাফসা রাযি.-কে দেখতে পেলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাম দিয়ে বসে পড়লেন। এদিকে হযরত আয়েশা রাযি. অধীর আগ্রহে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতীক্ষা করছেন। যখন কাফেলা থামল, তখন আর ধৈর্য ধরতে পারলেন না। হাওদা থেকে নেমে পড়লেন, দুই পা ঘাসের ওপর ছড়িয়ে দিয়ে বললেন—আল্লাহ, আমি তো ওনাকে কিছু বলতে পারব না; কিন্তু তুমি তো একটা সাপ বা বিচ্ছু পাঠাতে পারো! একটা সাপ বা বিচ্ছু পাঠাও, এসে আমার পায়ে কামড় দিক।[১] দেখুন, এই কথাটায় নারীমনের কেমন তীব্র ভালোবাসা ও বিরহ জ্বলে উঠেছে!

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈলা করেছিলেন। অর্থাৎ একমাস পবিত্র স্ত্রীগণের কাছে যাবেন না, শপথ করেছিলেন। বাইরে হযরত আয়েশা রাযি.-এর গৃহের সঙ্গে লাগানো একটি ওপরতলা ছিল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একমাস এখানেই অবস্থান করেছিলেন। পবিত্র স্ত্রীগণ শোকাচ্ছন্ন ছিলেন।[২] আবার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে যাবেন তাও সম্ভব ছিল না। হযরত আয়েশা রাযি.-এর অবস্থা ছিল—তিনি শুধু দিন গোনেন, কবে মাস পুরবে।[৩] মাস পূর্ণ হবার পর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বপ্রথম হযরত আয়েশা রাযি.-এর ঘরেই এসেছিলেন।

পবিত্র স্ত্রীগণের মধ্যে বিভিন্ন স্তরের নারী ছিলেন। আমীর-ওমরা ও নেতৃবর্গের কন্যাও ছিলেন। তাঁরা এমন অভাবের জীবন মেনে নিতে চাইতেন না। এ কারণে ইচ্ছাধিকার প্রদান করে আয়াত নাজিল হয় : যে চায় সে নবীস্ত্রীর মর্যাদা নিয়ে তুষ্ট থাকুক, আর যে না চায় সে নবীপরিবার থেকে পৃথক হয়ে যাক। নবীপরিবারে এমন হতভাগী কেউই ছিলেন না,

---

১. *সহীহ বুখারী*, পৃষ্ঠা : ৭৮৫, باب القرعة بين النساء ।

২. *সহীহ বুখারী* : باب هجرة النبي صلى الله عليه وسلم نساءه ক্রমিক : ৭৮৫।

৩. *সহীহ বুখারী* : كتاب المظالم ' باب الغرفة ক্রমিক : ২৪৬৮।

যিনি এই ভূষণ ত্যাগ করবেন। সবাই নবীস্ত্রী হয়ে থাকাকেই প্রাধান্য দিলেন। তবে এই সিদ্ধান্তগ্রহণে সর্বাগ্রে থাকলেন হযরত আয়েশা রাযি.। তিনিই সর্বপ্রথম নিজের সিদ্ধান্ত জানিয়ে রাসূলকে মিনতি করেছিলেন—রাসূল, আমার নির্ণয় দয়া করে কাউকে জানাবেন না।[১] এই কথায়ও তাঁর নারী-স্বভাবের আলোকিত বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠে।

টানাপোড়েনের শেষ পরিণতিতে ইরজার আয়াত নাজিল হয়—যেই স্ত্রীকে ইচ্ছা রাখবেন, যাকে ইচ্ছা ত্যাগ করবেন। দয়ার নবী কাউকে ত্যাগ করেননি। কিন্তু ইচ্ছাধিকার তাঁর বলবৎ ছিল। হযরত আয়েশা রাযি. বলতেন—হে আল্লাহর রাসূল, যদি ক্ষমতাটা আমাকে দেওয়া হতো, তা হলে এ মর্যাদায় অন্য কাউকে প্রাধান্য দিতাম না।[২]

গাযওয়ায়ে মুতায় হযরত জাফর তাইয়্যার রাযি.-এর শাহাদাতের খবর এলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মনঃকষ্টে আচ্ছন্ন ছিলেন। ইসলামে বিলাপ করা নিষিদ্ধ। কেউ এসে সংবাদ দিল, হযরত জাফরের গৃহে নারীগণ বিলাপ করছেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন—নিষেধ করো। লোকটা ঘুরে এসে বলল—আমার কথা শুনছে না। রাসূল বললেন—ওদের মুখে মাটি পড়ুক। লোকটা ঘুরে এসে আবার কিছু বলতে লাগল। হযরত আয়েশা রাযি. দরজার ওপাশ থেকে অস্থির হয়ে যাচ্ছিলেন; লোকটা না রাসূলের কথা মানছে, না রাসূলকে ছাড়ছে।[৩] রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রায়শই হযরত আয়েশা রাযি.-এর কোলে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়তেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার ঠিক এভাবেই বিশ্রাম করছিলেন। হঠাৎ হযরত আবু বকর রাযি. কোনো কারণে রাগান্বিত অবস্থায় ভেতরে এলেন, এবং মেয়েকে সজোরে খোঁচা মারলেন। হযরত আয়েশা রাযি. বলেন—আমি শুধু এজন্য নড়ে উঠিনি যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘুমের ব্যাঘাত ঘটবে।[৪]

---

১. *সহীহ বুখারী* : বাবুল ঈলা (আয়েশা রাযি.-এর রেওয়ায়েত)।

২. *সহীহ বুখারী* : তাফসীর—সূরা আহযাব। *মুসনাদে আহমদ* : ষষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা : ৭৬।

৩. *সহীহ বুখারী* : জানাযা অধ্যায়।

৪. *সহীহ বুখারী* : তায়াম্মুম অধ্যায়।

স্ত্রীর মন রক্ষা করা

নবীজীবন মানবজীবনের সর্বোত্তম আদর্শ। তাই স্ত্রীর মন রক্ষা করারও শিক্ষা দিয়ে গেছেন প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। মাঝেমধ্যে স্ত্রীর মন-রক্ষার্থে তিনি এমন এমন কথা বলতেন, এমন এমন কাজ করতেন, যা একটু অস্বাভাবিকই লাগে। যেমন দেখা যায়, তিনি হযরত আয়েশা রাযি.-এর খেলাধুলায় থেকে-থেকে আনন্দ প্রকাশ করতেন। হযরত আয়েশা রাযি. এক আনসারি কন্যার প্রতিপালন করেছিলেন। তিনি যখন অত্যন্ত সাদামাটা ও অনাড়ম্বরভাবে পুষ্যিকন্যার বিবাহ দিচ্ছিলেন, তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর মন যোগাতে বলেছিলেন—একি আয়েশা, গানবাজনা তো হলোই না![১]

একবার ঈদের দিন। হাবশিরা উৎসবের জন্য হেলেদুলে বর্শা উঁচিয়ে পালোয়ানি প্রদর্শন করছিল। হযরত আয়েশা রাযি. দেখার আগ্রহ করলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সামনে এবং হযরত আয়েশা রাযি. পেছনে দাঁড়িয়ে গেলেন। যতক্ষণ হযরত আয়েশা রাযি. নিজে সরে না গেলেন, ততক্ষণই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সোজা দাঁড়িয়ে থাকলেন।[২]

একবার হযরত আয়েশা রাযি. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে আগে বেড়ে-বেড়ে কথা বলছিলেন। ঘটনাক্রমে হঠাৎ আবু বকর রাযি. এসে পড়লেন। এই অবস্থা দেখে তিনি এতটাই ক্রোধান্বিত হলেন যে, হযরত আয়েশা রাযি.-কে থাপ্পড় মারতে গেলেন; সঙ্গে-সঙ্গে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাত ধরে নিলেন। হযরত আবু বকর রাযি. চলে গেলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন—দেখলে, তোমাকে কীভাবে বাঁচালাম?[৩]

একবার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি শিশুকন্যাকে সঙ্গে নিয়ে এলেন। জিজ্ঞেস করলেন—আয়েশা, একে চেন? আরজ

---

১. *মুসনাদে আহমদ* : ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা : ২৬৯। *সহীহ বুখারী* : كتاب النكاح, *ফাতহুল বারী*।

২. *সহীহ বুখারী* : باب حسن المعاشرة ।

৩. *আবু দাউদ* : كتاب الأدب، باب ما جاء في المزاح ।

করলেন, জি না, হে আল্লাহর রাসূল। বললেন—এ অমুকের দাসী; তুমি এর গান শুনবে? হযরত আয়েশা রাযি. ইচ্ছা প্রকাশ করলে মেয়েটি কয়েক মুহূর্ত গান গাইল। গান শোনার পর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, গায়িকাদের নখের মধ্যে শয়তান বাঁশি বাজায়। বোঝা গেল, এ ধরনের গানকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদম অপছন্দ করেছেন।[১]

স্ত্রীকে আনন্দ দেওয়া

স্ত্রীর মনোরঞ্জনের জন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাঝেমধ্যে গল্পও বলতেন। একবার কথা প্রসঙ্গে খুরাফার নাম উঠল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন—জানো, খুরাফা কে? খুরাফা উযরা গোত্রের এক নামকরা লোক ছিল। খুরাফাকে ভুতেরা তুলে নিয়ে গিয়েছিল। ভুতের দেশে গিয়ে যেসব আশ্চর্য জিনিস দেখেছিল, ফিরে এসে লোকজনকে সেগুলো বলত। এজন্যই লোকেরা আশ্চর্য কিছু শুনলে বলে—এ তো খুরাফার গল্প[২] (উর্দু ভাষায় 'খুরাফা'-র বহুবচন 'খুরাফাত'। শব্দটি 'অলীক' অর্থে ব্যবহৃত)।

একবার হযরত আয়েশা রাযি. গল্প বলা শুরু করলেন।[৩] গল্পের ভাষাসৌন্দর্য ও মর্ম আমাদের আলোচ্য বিষয় নয়। এখানে শুধু গল্পের অনুবাদটা দেওয়া হচ্ছে :

'একদিন এগারো জন সখী মিলে এক জায়গায় বসে গল্প করছিল। তারা ঠিক করল—প্রত্যেকে যার যার স্বামী সম্পর্কে বলবে, কিন্তু একদম ঠিকঠাক; এদিক-সেদিক করবে না। প্রথমজন বলল, আমার বর পাহাড়ের চূড়ায় রাখা উটের গোশতের মতো; না সেখানে কারও উঠে যাওয়ার সাধ্য হবে, আর না কারও তা উঠিয়ে নেওয়ার সাধ হবে। দ্বিতীয়জন বলল, আমি আমার বরের কথা বলব না, বাবা। যদি বলি, তা হলে এত কথা

---

১. *মুসনাদে আহমদ* : মুসনাদে আয়েশা রাযি.।

২. *শামাইলে তিরমিযী* : باب حديث خرافة। *মুসনাদে আহমদ* : ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা : ১৫৭।

৩. ইমাম নাসাঈ গল্পটিকে স্বয়ং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে সম্পৃক্ত করেছেন।

আছে যে, ভয় হয়, কিছু ছেড়ে দেব; কিংবা গোপন-অগোপন সব ঝেড়ে দেব। তৃতীয়জন বলল, আমার বরের কথা বলব না; খুব রোখা—কিছু বললে বিয়ের গিঁঠই খুলে যাবে; আর না বললে জীবনটাই ঝুলে যাবে। চতুর্থজন বলল, আমার বর হেজাজের রাতের মতো—নাতিশীতোষ্ণ; কাঁপায়ও না, খ্যাপায়ও না। পঞ্চমজন : আমার বর ঘরে এলে চিতা, বাইরে গেলে বাঘ; কথা দিলে রাখবেই, দ্বিতীয়বার আর বলতে হবে না। ষষ্ঠজন : আমার বর—খেলে, একাই সব গিলে ফেলে; পিলে, একাই সব শুকিয়ে ফেলে; আর শুলে বিছানা-বালিশ সব তার; ভেতরে হাত দিয়ে দেখার বালাই নেই। সপ্তমজন বলল, আমারটা তো মাথামোটা; রোগাটেও, বখাটেও—কখন ধরে যে ঘাড় মটকায় বা হাড় মচকায়, ঠিক-ঠিকানা নেই। অষ্টমজন বলল, আমার বর—ছোঁবে, তো খরগোশকোমল; শুঁকবে, তো কুসুমসঙ্কাশ! নবমজন বলল, আমার বর—যেমন বড় শরীর, তেমন বড় মন। বিশাল বাড়ির চালা।[১] ব্যস্ত বাড়ির চুলা।[২] ব্যাপ্ত হাতের হাতিয়ার।[৩] দশমজন বলল, আমার বর—মালিক! মালিক কী বোঝ? আরে না, এর চেয়েও বেশি কিছু। বিশাল তার উটের পাল; বাড়িতেই থাকে পড়ে, মাঠে চড়ে কী করে? অতিথি আসে যদি, আপ্যায়নে দেরি হবে না? সানাই বাজলে আর মানায় কে? উট জবাই হবেই হবে।[৪] শেষ জন বড় লম্বা কাহিনী জুড়ে দিল : আমার বর—আমার বরের নাম আবু যারা। আবু যারা কে, ভেবেছ কী? আমার কত গহনা জানো? শরীরে আমার চর্বি ধরিয়ে দিয়েছে। আদরে আদরে মনও ভরিয়ে দিয়েছে। আরে, বকরিওয়ালার বাড়ি থেকে তুলে এনে উট-ঘোড়া আর সেবক-ভরা বাড়িতে আমার সে কী যত্ন! যাই বলি—মন্দ নয়। খাবে, তো যত পারো, খাও। ঘুমাবে, তো যত খুশি ঘুমাও। আবু যারার মা—আবু যারার মায়ের কথা বলছ? তার সিন্দুকের কাপড়চোপড় দেখেছ! জিনিসপত্তরের জাঁকজমক দেখেছ! আবু যারার ছেলে—আবু যারার ছেলে কেমন? যেন

---

১. ধনাঢ্যতা বোঝাতে।

২. দানশীলতা বোঝাতে।

৩. পরোপকার বোঝাতে।

৪. *সহীহ বুখারী*, ৭৮০ পৃষ্ঠা। বাবু হুসনিল মুআশারা।

খোলা তলোয়ার! কচি ছাগের ভুনা না খেলে তার তৃপ্তিই হয় না। আবু যারার মেয়ে—আবু যারার মেয়ে কেমন? মা-বাপের নয়নমণি, ময়মুরব্বির অনুগতা, সতিনের ঈর্ষা, সখীদের খুশি। আবু যারার দাসী—আবু যারার দাসী কেমন? ঘরের কথা পরের কাছে কয় না, একটুও খাবার নষ্ট করে না, ঘরদোর অগোছালো রাখে না।"...

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ধৈর্য ধরে দীর্ঘক্ষণ কাহিনী শুনলেন। এরপর বললেন—আয়েশা, আবু যারা উম্মে যারার জন্য যেমন ছিল, আমি তোমার জন্য তেমনই। তাই না?

কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এরকম অন্তরঙ্গ মুহূর্তেও আজান হলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আর দেরি করতেন না। সঙ্গে সঙ্গে উঠে চলে যেতেন। হযরত আয়েশা রাযি. বলেন—তখন মনে হতো, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের চেনেনই না।[১]

স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে পানাহার

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রায়ই হযরত আয়েশা রাযি.-কে সঙ্গে নিয়ে এক দস্তরখানে বরং এক বাসনে খাবার খেতেন। এভাবেই একবার একসঙ্গে খাবার খাচ্ছিলেন। এমন সময় হযরত উমর রাযি. এলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকেও ডেকে নিলেন এবং তিনজন একসঙ্গে খাবার খেলেন[২] (তখনও পর্দার বিধান আসেনি)। খেতে খেতেও ভালোবাসার প্রকাশার্থে হযরত আয়েশা রাযি. যেই হাড্ডি মুখে নিতেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও সেই হাড্ডিই মুখে নিতেন। পেয়ালায় যেই অংশে হযরত আয়েশা রাযি. মুখ লাগাতেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও সেই অংশেই মুখ লাগাতেন।[৩] একবার তাঁরা একসঙ্গে খাবার খাচ্ছিলেন। এমন সময় হযরত সাওদা

---

১. ইমাম গাযালি রহ. *ইহইয়াউল উলূম* গ্রন্থে ইশতিরাতুল খুযু অধ্যায়ে ঘটনাটি এনেছেন। *সহীহ বুখারী* كيف يكون الرجل في أهله অধ্যায়েও এর কাছাকাছি একটি হাদীস আছে।

২. *মুজাম তাবরানি*, ৪৫ পৃষ্ঠা। *আদাবুল মুফরাদ*, ইমাম বুখারী রহ. : باب أكل الرجل مع امرأته।

৩. *মুসনাদে আহমদ* : ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা : ৬৪। *সুনানে আবি দাউদ*, অধ্যায় : مواكلة الحائض।

রাযি. অভিযোগ নিয়ে এলেন—হযরত উমর রাযি. প্রয়োজনেও তাঁকে বের হতে দেন না।[১] আরও বর্ণিত আছে, রাতের অন্ধকারে ঘরে বাতি থাকত না। তাই অনেক সময় দুজনের হাত একই খাবারের ওপর পড়ে যেত।[২]

একবার এক পারসিক প্রতিবেশী রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দাওয়াত দিলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন—আয়েশাও যাবে। তিনি বললেন—না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন—তাহলে আমিও যাব না। লোকটি পরপর দুবার এলেন এবং একই প্রশ্নোত্তরের পর ফিরে গেলেন। তৃতীয়বার আবার এলেন, এবারও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন—আয়েশাকেও দাওয়াত দিচ্ছ তো? শেষমেষ লোকটি বললেন—জি হাঁ। এরপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং হযরত আয়েশা রাযি. দুজনেই তার ঘরে গেলেন।[৩]

সঙ্গে নিয়ে সফর করা

সফরে পবিত্র স্ত্রীগণের সকলকে সঙ্গে নেওয়া সম্ভব ছিল না। আবার যে কোনো একজনকে বিশেষভাবে প্রাধান্য দেওয়াও ঠিক নয়। তাই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সফরের পূর্বে লটারি করতেন। যার নাম উঠত, তিনিই এই সম্মানের অধিকারী হতেন।[৪] হযরত আয়েশা

---

১. *সহীহ বুখারী* : কিতাবুন নিকাহ, বাবু খুরুজিন নিসা।

২. *মুসনাদে আহমদ* : ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা : ২১৭।

৩. ঘটনাটি খুব সম্ভব হিজরী সনের শুরুর দিকের। হাদীসবিশারদগণ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক একাকী নিমন্ত্রণগ্রহণে অসম্মত হওয়ার কারণ ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে : তখন নবীপরিবারে ভীষণ অভাব ছিল। বিশেষ করে সেদিন ঘরে আহার্য কিছু ছিল না। ঘরে স্ত্রী অনাহারে থাকবেন, আর বাইরে তিনি তৃপ্তিসহকারে আহার করবেন—এটা তাঁর পছন্দ হয়নি। অপরপক্ষে প্রতিবেশী যে মুখের ওপর দুই দুইবার অনিচ্ছা ব্যক্ত করেছেন—তার কারণ, তার ঘরেও অভাব ছিল। ব্যবস্থা ছিল একজন মেহমানেরই। কিন্তু বিষয়টির গুরুতরতা বুঝতে পেরে তৃতীয়বার তিনি আরও কিছু খাবার যোগাড় করেন এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে আসেন। ...ফিকহবিদগণ এই হাদীসকে সামনে রেখে বলেন—কোনোরকম ভনিতা, কৃত্রিমতা বা অজুহাত ছাড়াই বন্ধু-বান্ধবের নিমন্ত্রণ গ্রহণ না করা বা নিমন্ত্রণে আরও কাউকে সঙ্গে নেওয়ার জন্য তাগাদা দেওয়া জায়েয। হাদীসটি *সহীহ মুসলিম*, الأطعمة অধ্যায়ে এসেছে। নববীও দ্রষ্টব্য।

৪. *সহীহ বুখারী*, অধ্যায় : القرعة بين النساء।

রাযি.-ও বিভিন্ন সফরে সঙ্গে যাওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন। গাযওয়ায়ে বনী মুসতালিকে সঙ্গে থাকার বিষয়টি সুস্পষ্ট। যেই সফরে হযরত আয়েশা রাযি. ও হযরত হাফসা রাযি.-এর উট পরিবর্তনের ঘটনা ঘটেছিল তার কথা বলার অপেক্ষা রাখে না। এরকম আরও একটি সফরের কথা হাদীসে এসেছে, যাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও হযরত আয়েশা রাযি. দৌড় প্রতিযোগিতা করেছিলেন।

গাযওয়ায়ে বনী মুসতালিকে দুটো অস্বাভাবিক ঘটনা ঘটেছিল। দুটোতেই আল্লাহ তাআলা হযরত আয়েশা রাযি.-কে অশেষ সম্মান ও অফুরন্ত মর্যাদা দান করেছিলেন। প্রথম ঘটনার ফলে তায়াম্মুমের বিধান নাজিল হয় আর দ্বিতীয় ঘটনার ফলে নিষ্পাপ, নিষ্কলঙ্ক, পূত-পবিত্র নারীদের সম্মান রক্ষার আইন (বিবরণ সামনে আসছে)। *মুসনাদে আহমাদ*-এর একটি বর্ণনা থেকে বোঝা যায়, হুদায়বিয়ার সফরেও হযরত আয়েশা রাযি. সঙ্গে ছিলেন।[১] আর বিদায় হজের সফরে তো অধিকাংশ স্ত্রীই ছিলেন; সুতরাং হযরত আয়েশা রাযি. থাকাই স্বাভাবিক।

দৌড়-প্রতিযোগিতা

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোরসওয়ারি ও তিরন্দাজি খুব পছন্দ করতেন। সাহাবা কেরামকে উৎসাহ দিতেন এবং নিজে সামনে দাঁড়িয়ে থেকে প্রশিক্ষণ দেওয়াতেন। কোনো এক গাযওয়ায় হযরত আয়েশা রাযি. সফরসঙ্গিনী ছিলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকল সাহাবীকে সামনে এগিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন। সাহাবা কেরাম দৌড় প্রতিযোগিতায় এগিয়ে গেলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আয়েশা রাযি.-কে বললেন—চলো, দৌড়-প্রতিযোগিতা করি। দেখি, কে আগে যেতে পারে। হযরত আয়েশা রাযি. হালকা-পাতলা ছিলেন। তিনি আগে চলে গেলেন। কয়েক বছর পর দৌড়-প্রতিযোগিতার আরও একটা সুযোগ এল। হযরত আয়েশা রাযি. বলেন—তখন আমি ভারী হয়ে গিয়েছিলাম। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি

---

১. *মুসনাদে আহমদ* : মুসনাদে আয়েশা রাযি.।

ওয়াসাল্লাম এবার আগে চলে গেলেন। তিনি বললেন—আয়েশা, এটা সেটার জবাব।[১]

প্রেমাবেগ ও অভিমান

প্রেমাবেগ ও অভিমান নারীর স্বভাববৈশিষ্ট্য। ভালোবাসার অথৈ সাগরের অসংখ্য প্রেমলহরি মিশে আছে নারীমনে। কিন্তু এ ধরনের যে ঘটনাগুলোর উল্লেখ হাদীসগ্রন্থগুলোতে রয়েছে, অনেকেই সেগুলোর সমালোচনা করতে চান। তারা বলতে চান, একজন নবীর প্রতি উম্মতের এমন প্রেমাবেগ ও অভিমান কিংবা এমন আচরণ ও উচ্চারণ অশোভন। তারা ভুলে যান যে, এই আবেগ ও অনুভূতি, এই আচরণ ও উচ্চারণ একজন নবীর প্রতি উম্মতের নয়, বরং একজন প্রেমময় স্বামীর প্রতি প্রেমময়ী স্ত্রীর। সুতরাং এ ধরনের যে ঘটনাগুলো বিশুদ্ধগ্রন্থসমূহে এসেছে, এই বিবেচনাতেই এসেছে। এগুলোকে এই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েই পড়া ও বোঝা উচিত।

হযরত আয়েশা রাযি. বলেন, যখন এই নির্দেশ এল—যদি কোনো নারী নিজেকে রাসূলের প্রতি সমর্পণ করতে চায় (অর্থাৎ মোহর ছাড়াই স্ত্রীত্ব গ্রহণ করতে চায়), করতে পারবে—তখন আমার খুব রাগ হলো। মনে মনে বললাম, কোনো মেয়ে কি এমনও করতে পারে। কিন্তু যখন ইরজার আয়াত নাজিল হলো (যাতে রাসূলকে এই ইচ্ছাধিকার দেওয়া হয়েছিল যে, তিনি যে কোনো স্ত্রীকে ইচ্ছামতো কাছে ডাকবেন কিংবা ইচ্ছামতো কাছে থাকবেন, অথবা ডাকবেন না বা থাকবেন না), তখন আমি বললাম—আপনার আল্লাহ দেখি আপনার সব ইচ্ছাই শীঘ্র পূরণ করে দেন।[২] আল্লাহ মাফ করুন, হযরত আয়েশা রাযি.-এর এই কথার অর্থ আপত্তি করা নয়; বরং একজন প্রেমময়ী স্ত্রীর অভিমান। বিশিষ্টজনেরা হযরত আয়েশা রাযি.-এর বক্তব্যের আরও একটি ব্যাখ্যা করেছেন—আল্লাহ তাঁর প্রিয় বান্দাদের মনোবাঞ্ছা পুরা করে দেন, যাতে তাঁর আদেশ-পালন ও নির্দেশ-বাস্তবায়নে মনোযোগী থাকতে পারেন।

---

১. *সুনানে আবু দাউদ* : باب السبق।

২. *সহীহ বুখারী* : তাফসীর—সূরা আহযাব।

কিন্তু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের ইচ্ছাকে প্রাধান্য দেননি; বরং অনুমতির পরও পূর্বের ন্যায়ই পালাক্রমিক গমনাগমন অব্যাহত রেখেছিলেন।[১]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রায়ই হযরত খাদীজা রাযি.-এর কথা বলতেন। এতে অন্য স্ত্রীগণ কষ্ট পেতেন। একবার তিনি এভাবেই হযরত খাদীজা রাযি.-এর কথা বলছিলেন। হযরত আয়েশা রাযি. সহ্য করতে না পেরে বলে উঠলেন, আপনি কি ওই বুড়ির কথা ছাড়বেন? আল্লাহ তো আপনাকে আরও ভালো ভালো স্ত্রী দান করেছেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আল্লাহ তো ওই বুড়ির মাধ্যমেই আমাকে সন্তান দান করেছিলেন।[২] একই বর্ণনা মুসনাদে আহমাদে আছে এভাবে : একবার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত খাদীজা রাযি.-এর প্রশংসা করা শুরু করলেন। অনেকক্ষণ ধরে তিনি তাঁর প্রশংসা করে চললেন। হযরত আয়েশা রাযি. বলেন, আমার খুব রাগ হলো। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল, আপনি কুরাইশের কোনো এক বুড়ির, যার ঠোঁট লাল হয়ে গিয়েছিল, যার মরার অনেক দিন পারও হয়ে গেছে, এতক্ষণ ধরে প্রশংসা করে চলেছেন; অথচ আল্লাহ আপনাকে তারচে অনেক ভালো স্ত্রী দান করেছেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেহারা বিবর্ণ হয়ে গেল। তিনি নিজেকে সংযত রেখে বললেন, সে তো আমার এমনই একজন ছিল, যখন সকলে আমাকে প্রত্যাখ্যান করেছিল, তখন সেই আমাকে বিশ্বাস করেছিল; যখন সকলে আমাকে মিথ্যাবাদী বলেছিল, তখন সেই আমাকে সত্যবাদী বলেছিল; যখন সকলে আমাকে অসহায় অবস্থায় পরিত্যাগ করেছিল, তখন সেই আমার পাশে দাঁড়িয়েছিল; এবং আল্লাহ তাঁর মাধ্যমেই আমাকে সন্তান-সন্ততি দান করেছিলেন, যেখানে অন্য স্ত্রীদের বেলায় আমাকে বঞ্চিত রেখেছেন।[৩]

একবার হযরত আয়েশা রাযি.-এর মাথাব্যথা ছিল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মৃত্যুরোগের সূচনা হয়েছিল সেখানেই। তিনি

---

১. *সহীহ বুখারী* : তাফসীর—সূরা আহযাব।

২. *সহীহ বুখারী* : অধ্যায় : فضل خديجة رض-।

৩. *মুসনাদে আহমদ* : মুসনাদে আয়েশা রাযি. : ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা : ১১৮, ১৫০।

হযরত আয়েশা রাযি.-কে বললেন, যদি তুমি আমার জীবদ্দশায় মারা যাও, তা হলে নিজ হাতে তোমার দাফন-কাফন দেব; এই হাতদুটো তুলে আল্লাহর কাছে তোমার জন্য দুআ করব। হযরত আয়েশা রাযি. বুঝলেন না, বললেন—হে আল্লাহর রাসূল, আপনি আমার মৃত্যু কামনা করছেন? যদি আমি মারা যাই, তা হলে এই ঘরে বুঝি নতুন স্ত্রী আনবেন? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মৃদু হাসলেন।[১]

কোথাও থেকে কোনো এক কয়েদিকে গ্রেফতার করা হয়েছিল। হযরত আয়েশা রাযি.-এর হুজরায় তাকে আটকে রাখা হয়। হযরত আয়েশা রাযি. নারীদের সঙ্গে আলোচনায় রত হলে সুযোগ বুঝে কয়েদি পালিয়ে যায়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসে জানতে পারলে গলা ভারী করে বললেন, তোমার হাত কেটে দেওয়া হবে। তারপর বাইরে গিয়ে সাহাবা কেরামকে খবর দিলেন। কয়েদিকে ধরে আনা হলো। পরে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘরে এলে হযরত আয়েশা রাযি. নিজের হাত দুটো সম্মুখে ধরে নাড়িয়ে নাড়িয়ে দেখছেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন—কী করছ? হযরত আয়েশা রাযি. বললেন, দেখছি কোন হাত কেটে দেবেন। কথাটি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মনে দাগ কাটল। তিনি হযরত আয়েশা রাযি.-এর জন্য হাত তুলে দুআ করলেন।[২]

একটি বর্ণনায় আছে, হযরত আয়েশা রাযি. হঠাৎ করেই জিজ্ঞেস করলেন—হে আল্লাহর রাসূল, যদি এমন হয় যে, আপনাকে দুটো চারণভূমি দেওয়া হলো, একটিতে আগে উট চড়ানো হয়েছে, অপরটিতে চড়ানো হয়নি, তা হলে আপনি উট চড়ানোর জন্য কোন চারণভূমিটি বেছে নেবেন? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যেটিতে চড়ানো হয়নি।[৩] কথাটির তাৎপর্য হলো : পবিত্র স্ত্রীগণের মধ্যে একমাত্র আয়েশা রাযি.-ই ছিলেন কুমারী।

---

১. *সহীহ বুখারী* : অধ্যায় : আল মারয, পৃষ্ঠা : ৮৪৬। *মুসনাদে আহমদ* : ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা :২২৮।
২. *মুসনাদে আহমদ* : ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা : ৫৩।
৩. *সহীহ বুখারী* : অধ্যায় : নিকাহুল আবকার, পৃষ্ঠা : ৭৭৬।

ইফকের ঘটনায় (আলোচনা সামনে আসবে), যখন ওহীর মাধ্যমে হযরত আয়েশা রাযি.-এর পবিত্রতা ঘোষিত হলো, তখন সম্মানিতা মাতা বললেন—যাও মা, পবিত্র জীবনসঙ্গীকে কৃতজ্ঞতা জানাও। হযরত আয়েশা রাযি. অভিমান করে বললেন, যেই আল্লাহ আমার পবিত্রতার প্রমাণ দিয়েছেন, সেই আল্লাহ ছাড়া আর কারও প্রতি আমি কৃতজ্ঞ নই।

একবার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন—আয়েশা, তুমি যখন আমার প্রতি নারাজ থাক, তখন আমি বুঝতে পারি। তুমি যখন নারাজ থাক, তখন বল—ইবরাহিম আলাইহিস সালামের রবের কসম। আর যখন খুশি থাক, তখন বল—মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রবের কসম। হযরত আয়েশা রাযি. বললেন—হে আল্লাহর রাসূল, মুখে ত্যাগ করলেও বুকে আপনারই নাম ধারণ করি।[১]

মার্গলিউস *লাইফ অফ মুহাম্মাদ* গ্রন্থে এ ঘটনাটিই লিখেছেন এভাবে : 'যখন মুহাম্মাদ তাকে (হযরত আয়েশা রাযি.-কে) কষ্ট দিতেন, তখন তিনি তাকে আল্লাহর নবী বলে অস্বীকার করতেন এবং তার ওহীর ওপর নানা রকম প্রশ্ন তুলতেন।'[২] (নাউজুবিল্লাহ)

ইংরেজপণ্ডিতদের বর্ণনাবিকৃতি ও সাম্প্রদায়িক মানসিকতার এটা একটা জ্বলন্ত প্রমাণ।

ঘরের কাজ ও সেবাযত্ন

ঘরে তো খাদেমা ছিলই, তারপরও হযরত আয়েশা রাযি. নিজের কাজ নিজেই করতেন।[৩] আটা কুটতেন নিজে।[৪] খামির করতেন নিজে। রুটি বানাতেন নিজে। খানা পাকাতেন নিজে।[৫] বিছানা বিছাতেন নিজে।[৬] ওযুর পানি আনতেন নিজে।[৭] রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

---

১. *সহীহ বুখারী* : অধ্যায় : ما يجوز من الهجران, পৃষ্ঠা : ৮৯৭।
২. *লাইফ অফ মুহাম্মাদ*, পৃষ্ঠা : ৪৫১।
৩. *আল আদাবুল মুফরাদ* : ইমাম বুখারী রহ.। অধ্যায় : لا يؤذى جاره।
৪. *সহীহ বুখারী* : ইফক।
৫. *সহীহ বুখারী*। *আবু দাউদ*।
৬. *শামায়েলে তিরমিযী*।
৭. *মুসনাদে আহমদ* : ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা : ৬৮।

কোরবানির জন্য যে উট পাঠাতেন, সেটার দেখাশোনাও করতেন নিজে।[১] এমনকি, তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাথা আঁচড়ে দিতেন।[২] শরীরে সুগন্ধি লাগিয়ে দিতেন।[৩] রাসূলের কাপড় ধুতেন।[৪] শোয়ার সময় রাসূলের মেসওয়াক ও পানি ঠিক করে রাখতেন।[৫] রাসূলের মেসওয়াক পরিষ্কার করে দিতেন।[৬] ঘরে কোনো মেহমান এলে মেহমানের আপ্যায়ন করতেন। সুফফাবাসী কায়স গিফারি রাযি. বলেন, একদিন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের বললেন, চলো, আয়েশার ঘরে যাই। হুজরায় পৌঁছে বললেন—আয়েশা, আমাদের জন্য খাবারের ব্যবস্থা করো। তিনি আটার তৈরি এক ধরনের খাবার দিয়ে গেলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও কিছু চাইলে তিনি খেজুরের হারিরা দিয়ে গেলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পানীয় জাতীয় কিছু চাইলে তিনি একটি বড় পাত্রে করে দুধ, তারপর একটি ছোট পাত্রে করে পানি দিয়ে গেলেন।[৭]

আনুগত্য ও নির্দেশ-পালন

স্ত্রীর সবচেয়ে বড় গুণ স্বামীর আনুগত্য ও নির্দেশ-পালন। হযরত আয়েশা রাযি. দীর্ঘ নয় বছর সাহচর্যের কি দিনে, কি রাতে—রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি নির্দেশও অমান্য করেননি। এমনকি, আকারে ইঙ্গিতেও যেটাকে অপ্রীতিকর মনে হয়েছে, সেটাকেও ত্যাগ করতে বিলম্ব করেননি। একবার তিনি খুব শখ করে দরজায় একটি ছবিওয়ালা পর্দা ঝুলিয়েছিলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভেতরে ঢুকতেই পর্দাটা চোখে পড়ে। রাসূলের চোখে-মুখে অসন্তোষের ছাপ ফুটে ওঠে। হযরত আয়েশা রাযি. হতভম্ব হয়ে যান। আরজ

---

১. *সহীহ বুখারী* : হজ অধ্যায়।
২. *সহীহ বুখারী* : ইতিতকাফ অধ্যায়।
৩. *সহীহ বুখারী* : হজ অধ্যায়।
৪. *সহীহ বুখারী* : ধোয়া অধ্যায়। *আবু দাউদ* : অধ্যায় : আল ইয়াদাতু মিনান নাজাসাতি ইয়াকুনু ফিস সাওবি।
৫. *মুসনাদে আহমদ* : ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা : ৫৪।
৬. *আবু দাউদ* : তাহারাত : গোসল।
৭. *আবু দাউদ* : শিষ্টাচার অধ্যায়। সম্ভবত এটা পর্দার বিধান আসার আগের ঘটনা।

করলেন, হে আল্লাহর রাসূল, ক্ষমা করবেন। আমি কী ভুল করলাম? রাসূল বললেন, যেই ঘরে ছবি থাকে সেই ঘরে ফেরেশতা প্রবেশ করে না। হযরত আয়েশা রাযি. সঙ্গে সঙ্গে পর্দা নামিয়ে ফেললেন এবং অন্য কোনো কাজে লাগালেন।[১] জনৈক সাহাবীর ওলিমা ছিল; কিন্তু ঘরে কিছু ছিল না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন—যাও, আয়েশাকে বলো, ঘরে খাবার যা আছে, যেন পাঠিয়ে দেয়। সাহাবী এসে হযরত আয়েশা রাযি.-কে সংবাদ শুনিয়ে দিলেন। হযরত আয়েশা রাযি. খাবারের পুরো গাট্টিটাই পাঠিয়ে দিলেন।[২] সন্ধ্যায় ঘরে আর কিছু ছিল না।

জীবদ্দশায় স্বামীর অনুগতা অনেকেই। কিন্তু প্রকৃত আনুগত্য হলো শৃঙ্খল খুলে যাবার পরও শৃঙ্খলাবদ্ধ থাকা, অর্থাৎ স্বামীর মৃত্যুর পরও স্বামীর কথা মেনে চলা।

পূর্বে আলোচনা এসেছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আয়েশা রাযি.-কে দানশীলতার কথা বলেছিলেন। এর প্রভাব কেমন ছিল দেখুন, আমৃত্যু তিনি এই দায়িত্বপালনে অবহেলা করেননি। পাঠক জেনেছেন, হযরত আয়েশা রাযি. জিহাদের অনুমতি চাইলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বলেছিলেন—হজই নারীর জিহাদ। এই নির্দেশনা পাওয়ার পর থেকে তিনি এত কঠিনভাবে এর পাবন্দি করেছিলেন যে, এমন একটা বছরও নেই, যে বছর তিনি হজ করেননি।[৩] জনৈক ব্যক্তি একবার হযরত আয়েশা রাযি.-এর খেদমতে কিছু কাপড় ও নগদ অর্থ পাঠান। তিনি প্রথমে ফিরিয়ে দেন, পরে আবার গ্রহণ করেন; তিনি বলেন, রাসূলের একটা কথা মনে পড়ে গেল, (তাই গ্রহণ করলাম)।[৪] একবার তিনি আরাফার দিন রোযা রেখেছিলেন; এত বেশি গরম পড়েছিল যে, বারবার মাথায় পানি ঢালতে হচ্ছিল। কেউ বলল—আজকে না হয় রোযা ভেঙে ফেলুন। তিনি বললেন—রাসূলের মুখে

---

১. *সহীহ বুখারী* : কিতাবুল লিবাস, বাবুত তাসাবীর।
২. *মুসনাদে আহমদ* : ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা : ৭৫৭।
৩. *সহীহ বুখারী* : হাজ্জুন নিসা।
৪. *মুসনাদে আহমদ* : ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা : ২৫৯।

শুনেছি, আরাফার দিন রোযা রাখলে সারা বছরের গোনাহ মাফ হয়, তা হলে কেমন করে রোযা ভাঙি।[১]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে চাশতের নামায পড়তে দেখে তিনিও নিয়মিত চাশতের নামায পড়া আরম্ভ করেছিলেন। তিনি বলতেন—যদি আমার পিতাও কবর থেকে উঠে আসেন আর এই নামায পড়তে নিষেধ করেন, তবু আমি মানব না।[২] একবার জনৈকা মহিলা এসে আরজ করলেন—উম্মুল মুমিনীন, মেহেদি ব্যবহার করা কেমন হবে? তিনি উত্তর দিলেন—আমার প্রিয়তম (নারীদের জন্য) রঙ পছন্দ করতেন, কিন্তু ঘ্রাণ পছন্দ করতেন না; হারাম নয়, ব্যবহার করতে পারো।

অভ্যন্তরীণ ধর্ম ও জীবন

হযরত আয়েশা রাযি.-এর ঘর ছিল একজন পয়গম্বরের ঘর। এখানে না অর্থপ্রাচুর্য ছিল, না অর্থপ্রাচুর্যের বাসনা ছিল। ইসলাম দীন ও দুনিয়ার মধ্যে সমন্বয় সাধন করে। আগের অধ্যায়গুলোতে আমরা যে জীবন্ত আদর্শ দেখে এসেছি তা ছিল মানবীয় গুণ ও বৈশিষ্ট্যের সমাহার; এখন নবীপরিবারের ঘর ও ঘরের মানুষকে বাস্তব জীবনের প্রেক্ষিতে দেখা যাক। হযরত আয়েশা রাযি. বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র অভ্যাস ছিল—যখনই ঘরে আসতেন, উচ্চস্বরে এই কথাগুলো বলতেন :

لَوْ كَانَ لِابْنِ آدَمَ وَادِيَانِ مِنْ مَالٍ لَابْتَغَى وَادِيًا ثَالِثًا وَ لَا يَمْلَأُ فَاهُ إِلَّا التُّرَابُ

وَمَا جَعَلْنَا الْمَالَ إِلَّا لِإِقَامِ الصَّلٰوةِ وإِيْتَاءِ الزَّكٰوةِ وَيَتُوْبُ اللهُ عَلَى مَن تَابَ

অর্থ : আদমসন্তান যদি দুটো সম্পদপূর্ণ ময়দানের মালিক হয়ে যায়, তবে সে তৃতীয় আরও একটির কামনা করবে; মাটি ছাড়া কিছুই তার মুখ ভরাবে না। (আল্লাহ বলেছেন) আমি তো সম্পদ দিয়েছি শুধুমাত্র আমার

---

১. *মুসনাদে আহমদ* : ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা : ১২৮।

২. *মুসনাদে আহমদ* : ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা : ১৩৮।

স্মরণের জন্য এবং অভাবীকে সাহায্য করার জন্য। যে তওবা করবে, আল্লাহ তার তওবা কবুল করবেন।[১]

এই কথাগুলো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতিদিন বলতেন, বারবার বলতেন—যাতে নবীপরিবারের কারও মনে দুনিয়ার মায়া ও সম্পদের মোহ না জাগে।

এশার নামায পড়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘরে প্রবেশ করতেন। মেসওয়াক করে তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়তেন। পরবর্তী প্রহরেই উঠে যেতেন এবং তাহাজ্জুদে রত হতেন।[২] রাতের শেষ প্রহরে হযরত আয়েশা রাযি.-কেও উঠিয়ে দিতেন। তিনিও উঠে নামাযে শরীক হতেন এবং বিতর আদায় করতেন।[৩]

ভোরের শুভ্রতা প্রকাশ পেলে তিনি ফজরের সুন্নত পড়ে নিতেন, তারপর কনুইয়ের ওপর ভর দিয়ে সামান্য কাত হতেন এবং হযরত আয়েশা রাযি.-এর সঙ্গে গল্প করতেন।[৪] কিছুক্ষণ পর ফজরের ফরজ আদায়ের জন্য মসজিদে বের হতেন। কখনো সারারাত দুজনে মিলে আল্লাহর ইবাদতে কাটিয়ে দিতেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইমাম হতেন আর আয়েশা রাযি. মুক্তাদি হতেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূরা বাকারা, সূরা আল-ইমরান, সূরা নিসা এবং এ জাতীয় লম্বা-লম্বা সূরা পড়তেন। যখন ভয় ও ভীতির কোনো আয়াত আসত, তখন আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইতেন; যখন দয়া ও করুণার কোনো আয়াত আসত, তখন আল্লাহর কাছে তা কামনা করতেন। নবীপরিবারে এমনই ক্রিয়াশীল, প্রাণবন্ত, অনিন্দ্যসুন্দর দৃশ্য বিরাজ করত সারারাত ধরে।[৫] অনিয়মিতভাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে নামাযগুলো পড়তেন, যেমন সূর্যগ্রহণের নামায, তাতেও হযরত আয়েশা রাযি. শরীক হতেন। এমনকি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি

---

১. *মুসনাদে আহমদ* : ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা : ৫৫।

২. *মুসনাদে আহমদ* : ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা : ৫৫।

৩. *মুসনাদে আহমদ* : ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা : ১৫২।

৪. *সহীহ মুসলিম* : সালাতুল লাইল। *সহীহ বুখারী* : من تحدث بعد الركعتين।

৫. *মুসনাদে আহমদ* : ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা : ১৫১।

ওয়াসাল্লাম মসজিদে নববীতে নামায পড়ানোর জন্য যখন দাঁড়াতেন, তখন তিনিও ঘরের ভেতর নামাযের নিয়ত করতেন।[১]

হযরত আয়েশা রাযি. পাঁচ ওয়াক্ত নামায ও তাহাজ্জুদ তো পড়তেনই, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখে চাশতের নামাযও ছাড়তেন না।[২] প্রায়শই রোযা রাখতেন। কখনো দুজনে মিলে একসঙ্গে। রমযানের শেষ দশকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইতিকাফ করতেন। কখনো হযরত আয়েশা রাযি.-ও ইতিকাফে শরীক হতেন। তিনি মসজিদের আঙিনায় একপাশে তাঁবু টানিয়ে নিতেন। ফজরের নামাযের পরে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিছুক্ষণের জন্য হলেও সেখানে আসতেন।[৩] একাদশ হিজরীতে হজের জন্যও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে বের হয়েছিলেন তিনি। এবং হজ ও উমরা উভয়েরই নিয়ত করেছিলেন। কিন্তু মজবুরির কারণে তাওয়াফে অপারগ হয়ে পড়েছিলেন। এজন্য তাঁর অনেক দুঃখ হয়েছিল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানতে পেরে সান্ত্বনা দিয়েছিলেন এবং মাসআলা শিখিয়ে দিয়েছিলেন। পরবর্তীতে ভাই আবদুর রহমান ইবনে আবু বকর রাযি.-এর সঙ্গে হজের অবশিষ্ট আমল সম্পন্ন করেছিলেন।[৪]

ঘরেও নবুওয়াতের দায়িত্ব-পালন

দাম্পত্যজীবনের সর্বশেষ অনুষঙ্গ এটি। পারস্পরিক ভালোবাসার যে বর্ণনাগুলো আগে গিয়েছে তাতে কারও মনে ধারণা জন্মাতে পারে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘরে এসে বুঝি নবুওয়াতের গুরুদায়িত্বের কথা ভুলে যেতেন। কিন্তু না, স্বয়ং হযরত আয়েশা রাযি.-এর বর্ণনা নিশ্চয় শুনে থাকবেন, তিনি কী বলেছেন? তিনি বলেছেন—প্রায়ই এমন হতো যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার সঙ্গে গল্প করছেন,

---

১. *সহীহ বুখারী* : কুসূফের নামায।
২. *মুসনাদে আহমদ* : ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা : ১৫১।
৩. *সহীহ বুখারী* : নারীর ইতিকাফ।
৪. *সহীহ বুখারী* : হজ অধ্যায়।

হঠাৎ আজান হলো, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আর একটুও বিলম্ব করলেন না, উঠে চলে গেলেন। অবস্থা দেখে মনে হতো, যেন রাসূল আমাকে চেনেনই না।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন গাযওয়ায়ে তাবুক থেকে বিজয়ীবেশে ফিরে এলেন, তখন হযরত আয়েশা রাযি. তাঁকে বরণ করার জন্য একটি চিত্রিত নকশাবিশিষ্ট পর্দার ব্যবস্থা করলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দরজায় কদম মোবারক রাখতে না রাখতেই তাঁর চেহারা মোবারক বিবর্ণ হয়ে গেল। হযরত আয়েশা রাযি. আরজ করলেন- ক্ষমা করবেন, হে আল্লাহর রাসূল! কী ভুল হলো? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন—আয়েশা, আল্লাহ আমাদের ইট-পাথরের সাজসজ্জার জন্য ধনসম্পদ দেননি।

কোনো এক রাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আয়েশা রাযি.-এর কাছে এলেন। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যে উঠে চুপচাপ একদিকে চলে গেলেন। হযরত আয়েশা রাযি.-ও পেছন-পেছন চললেন, কিন্তু গোপনে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জান্নাতুল বাকির গোরস্তানে পৌঁছে হাত তুলে দুআয় মশগুল হলেন। হযরত আয়েশা রাযি. গোপনে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলেন। কিন্তু ফিরে আসার সময় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দেখে ফেললেন হযরত আয়েশা রাযি. চুপিসারে ঘরে ঢুকছেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন—আয়েশা, এ কী? যেহেতু বিষয়টা গুপ্তচরির শামিল—যা নিষিদ্ধ, তাই হযরত আয়েশা রাযি. বললেন—আমার মা বাবা আপনার প্রতি কোরবান হোক, ঘটনাটা এই ছিল... তিনি সব খুলে বললেন।[১]

একবার হযরত আয়েশা রাযি. একজন ইহুদিকে—যে রাসূল সাল্লাল্লাম আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অভিশাপ করেছিল—দাঁতভাঙা জবাব দিয়েছিলেন। কিন্তু দয়ার নবী বলেছিলেন—আল্লাহ কোমল, কোমলতা

---

১. ঘটনাটি সামান্য ভিন্নতাসহ সবগুলো হাদীসগ্রন্থেই এসেছে। এখানে *নাসাঈ* : আল ইস্তিগফার লিল মুমিনীন অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

পছন্দ করেন। কোমলতায় তিনি এমনভাবে দান করেন, যা কঠোরতায় করেন না।[১]

যদিও রেশম ও স্বর্ণের ব্যবহার ইসলামে নারীর জন্য বৈধ, কিন্তু পার্থিব সুখ-শোভার প্রতি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্বভাবগত ঘৃণা ও অনীহা ছিল। তাই নিজ ঘরে পরিবারের বেশি সাজসজ্জা ও আড়ম্বরতা পছন্দ করতেন না। একবার হযরত আয়েশা রাযি. একটি স্বর্ণালঙ্কার পরলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি তোমাকে এরচে বেশি কিছু বলব না; তুমি স্বর্ণালঙ্কার ছাড়ো এবং চাঁদির দুটো দুল বানিয়ে তাতে জাফরানের রঙ লাগাও।[২]

হযরত আয়েশা রাযি. বর্ণনা করেন—রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের পাঁচটি জিনিস থেকে দূরে থাকতে বলেছেন : রেশমি কাপড়, স্বর্ণালঙ্কার, সোনা-চাঁদির বরতন, লাল মোলায়েম গদি, কারুকার্য খচিত রেশমি কাপড়। আমি আরজ করলাম, যদি মশক বাঁধার মতো সামান্য পরিমাণ স্বর্ণ হয়, তা হলে কি সমস্যা আছে? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন—না, চাঁদিতে সামান্য জাফরান রঙ মিশ্রিত করো।[৩]

ঘরে-পরিবারে সবসময়ই নৈতিক ও চারিত্রিক উপদেশাবলির তালীম দিতে থাকতেন এমন অনেক উদাহরণ আগে গিয়েছে। একবার হযরত আয়েশা রাযি. নিজ হাতে আটা কুটলেন এবং টিকিয়া বানালেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাইরে থেকে এসে নামাযে রত হলেন। হযরত আয়েশা রাযি.-এর ঘুম ধরে গেল। এমন সময় প্রতিবেশীর বকরি এসে সব খেয়ে ফেলল। হযরত আয়েশা রাযি. দৌড় দিয়ে বকরিকে মারতে গেলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাধা দিলেন,

---

১. *সহীহ মুসলিম* : নম্রতার ফজিলত।

২. *নাসাঈ* : সজ্জা অধ্যায়।

৩. *মুসনাদে আহমদ* : ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা : ২২৮। নারীদের জন্য রেশমি কাপড়, স্বর্ণালঙ্কার অন্যান্য হাদীসের আলোকে বৈধ। কিন্তু পবিত্র স্ত্রীগণের জন্য এগুলোকে অশোভন গণ্য করা হয়েছে—অধিক প্রত্যাশায় যেন দুনিয়ার প্রতি সামান্যও মোহ না জন্মে।

বললেন—আয়েশা, প্রতিবেশীকে কষ্ট দিয়ো না।[1]

আরবে শুশুক খাওয়ার প্রথা ছিল। কিন্তু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা পছন্দ করতেন না। একবার কেউ শুশুকের গোশত পাঠাল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খেলেন না। হযরত আয়েশা রাযি. বললেন—হে আল্লাহর রাসূল, গরীবদের খাইয়ে দিই। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন—যা তুমি নিজে খাওয়া পছন্দ করো না, তা অন্যকে খাওয়াবে কেন?[2]

---

১. *আল আদাবুল মুফরাদ* : ইমাম বুখারী রহ.।
২. *মুসনাদে আহমদ* : ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা : ১৬৩।

সতিনগণের প্রতি আচরণ

হযরত আয়েশা রাযি.-এর সতিনগণ

পৃথিবীতে একজন নারীর জন্য সবচেয়ে কষ্টকর ও তিক্ত বিষয় হলো কোনো সতিন থাকা। হযরত আয়েশা রাযি.-কে একজন দুইজন নয়, একই সঙ্গে আট-আটজন সতিনের ঘর করতে হয়েছে। তারপরও পবিত্র সম্মানিত সাহচর্যের প্রতিফলনে এই উজ্জ্বল প্রতিবিম্ব স্বচ্ছ, সুন্দর ও পবিত্র ছিল যে কোনো প্রকার ধুলোময়লা থেকে।

হযরত খাদীজা রাযি.-এর মৃত্যুর পর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিভিন্ন সময় বিভিন্ন কারণে দশজন মহীয়সীকে পবিত্র স্ত্রীর সম্মান দান করেছিলেন। তার মধ্যে উম্মুল মাসাকিন হযরত যায়নাব রাযি.-কে বিবাহ করেছিলেন হিজরী তৃতীয় বর্ষে। তিনি দুই থেকে তিন মাসের মধ্যেই ইন্তেকাল করেছিলেন। বাকি নয়জনই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মৃত্যু পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। তাঁদের নাম ও বিবাহবর্ষের একটি তালিকা দেওয়া হচ্ছে। এ থেকে বোঝা যাবে, হযরত আয়েশা রাযি. কত বছর পর্যন্ত কত জন সতিনের ঘর করেছিলেন।

ক্রম	নাম	বিবাহ
১	হযরত সাওদা বিনতে যামআ রাযি.	নবুওয়াতের দশম বর্ষে
২	হযরত হাফসা বিনতে উমর রাযি.	হিজরী তৃতীয় বর্ষে
৩	হযরত উম্মে সালামা রাযি.	হিজরী পঞ্চম বর্ষে
৪	হযরত জুওয়াইরিয়া রাযি. (বনু	হিজরী পঞ্চম বর্ষে

	মুসতালিকের গোত্রপতির কন্যা)	
৫	হযরত যায়নাব বিনতে জাহশ কুরাইশিয়া রাযি.	হিজরী পঞ্চম বর্ষে
৬	হযরত উম্মে হাবিবা বিনতে আবু সুফিয়ান রাযি.	হিজরী ষষ্ঠ বর্ষে
৭	হযরত মাইমুনা রাযি.	হিজরী সপ্তম বর্ষে
৮	হযরত সাফিয়্যা রাযি. (খায়বার গোত্রপতির কন্যা)	হিজরী সপ্তম বর্ষে

হযরত খাদীজা রাযি.-এর প্রতি

হযরত খাদীজা রাযি. হযরত আয়েশা রাযি.-এর সময় জীবিত ছিলেন না। কিন্তু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র হৃদয়ে তাঁর স্মৃতি সবসময়ই ছিল জীবন্ত, জাগরূক। তিনি প্রায়ই হযরত আয়েশা রাযি.-এর কাছে হযরত খাদীজা রাযি.-এর কথা বলতেন, তাঁর প্রশংসা করতেন। হযরত আয়েশা রাযি. নিজেই বর্ণনা করেন—হযরত খাদীজা রাযি.-এর প্রতি আমার যেই পরিমাণ ঈর্ষা হতো, অন্য কারও প্রতি হতো না। কারণ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর স্মৃতিচারণ করতেন খুব বেশি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতি বছর তাঁর পক্ষ থেকে কোরবানি করতেন। তাঁর সকল সঙ্গিনীকে হাদিয়া পাঠাতেন। তাই বলে হযরত আয়েশা রাযি. তাঁর মর্যাদা ও সম্মানকে অস্বীকার করতেন না। তিনি বলতেন, মহান আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে তাঁকে বিনা হিসাবে জান্নাতের সুসংবাদ দান করেছিলেন।[১] হযরত খাদীজা রাযি.-এর যত কীর্তি ও কারনামা এবং ভূমিকা ও অবদান ইসলামের আবির্ভাবের সঙ্গে সম্পর্কিত—যেমন : রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সান্ত্বনা দেওয়া, বিপদে-আপদে পাশে থাকা, দুশ্চিন্তায় অভয় দান করা—সবই হযরত আয়েশা রাযি.-এর সূত্রে বর্ণিত।

---

১. *সহীহ বুখারী* : ফাজায়েলে খাদীজা রাযি.।

হযরত সাওদা রাযি.-এর প্রতি

হযরত আয়েশা রাযি. ও হযরত সাওদা রাযি.-এর বিবাহ যদিও একই সময়ে হয়েছিল, কিন্তু হযরত আয়েশা রাযি. বিবাহের পরও প্রায় সাড়ে তিন বছর পিতৃগৃহে থাকায় এ সময়টা হযরত সাওদা রাযি. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একাকী ও একচ্ছত্র সাহচর্য লাভ করেছিলেন। হিজরী প্রথম বর্ষে যখন হযরত আয়েশা রাযি. পিতৃগৃহ ত্যাগ করে স্বামীগৃহে চলে এলেন, তখন সতিন তাঁর একজনই : হযরত সাওদা রাযি.। এমতাবস্থায় তাঁরা একে অপরকে আপন অধিকারের প্রতিবন্ধকতার ক্ষেত্র ভাবতে পারতেন। কিন্তু ফলাফল এই সাধারণ বিবেচনার বিপরীত ছিল। সবকিছুই পারস্পরিক একতা ও ঐক্য এবং আন্তরিকতা ও অন্তরঙ্গতার দ্বারা সমর্থিত ছিল। পারিবারিক প্রায় সব বিষয়েই তাদের মধ্যে ছিল অন্তরঙ্গ বন্ধু ও সহযোগীর মানসিকতা।[১] এমনকি বার্ধক্যজনিত কারণে কয়েক বছর পর হযরত সাওদা রাযি. আপন অধিকারের দিনগুলোও হযরত আয়েশা রাযি.-কে ছেড়ে দেন। তিনি আশঙ্কা করেছিলেন, বার্ধক্যের কারণে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে ত্যাগ করতে পারেন। তিনি পবিত্র স্ত্রীর মর্যাদা ও সম্মানিতা মাতার মাহাত্ম্য থেকে বঞ্চিত হতে চাননি। তাই আগে বেড়ে এমনটা করেছিলেন। হযরত আয়েশা রাযি. তাঁর দান সানন্দে গ্রহণ করেছিলেন এবং আমৃত্যু তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ থেকেছিলেন।[২] তিনি বলতেন—পবিত্র স্ত্রীগণের মধ্যে হযরত সাওদা রাযি.-কে ছাড়া আর কাউকে এত আপন মনে হতো না। অবশ্য তিনি কঠোর প্রকৃতির ছিলেন।[৩]

হযরত হাফসা রাযি.-এর প্রতি

হযরত হাফসা রাযি. হিজরী তৃতীয় বর্ষে পবিত্র স্ত্রীগণের অন্তর্ভুক্ত হন। এই হিসেবে প্রায় আট বছর তিনি হযরত আয়েশা রাযি.-এর সঙ্গে

---

১. *সহীহ বুখারী* : باب الهدايا و التحريم ।

২. *সহীহ বুখারী* ও *মুসলিম* : বিবাহ অধ্যায়, جوازالهبة نوبتها لضرتها ।

৩. *সহীহ মুসলিম*, অধ্যায় : جواز نوبتها لضرتها ।

থেকেছেন। একজন সিদ্দীকে আকবার রাযি.-এর কলিজার টুকরা, তো অন্যজন ফারুকে আযম রাযি.-এর চোখের মণি। পারস্পরিক বন্ধন ছিল জোরদার। মতের মিল ছিল অসাধারণ। সুখে-দুখে একে অপরের সমভাগিনী। অন্য স্ত্রীগণের তুলনায় পারস্পরিক পক্ষসমর্থন ও স্বার্থরক্ষার বিষয়টি ছিল চোখে পড়ার মতো।[১] তারপরও প্রেমের ধর্ম ভিন্ন। কবি বলেন—

با سایہ ترا نمی پسندم

প্রীতির প্রদীপ জ্বলে; তবু ঈর্ষাকাতর হৃদয় বলে–
কি যে ভালো হতো, কত ভালো হতো, সে না হলে!

কোনো এক সফরে দুজনই ছিলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সফরসঙ্গিনী। রাতে যাত্রাবিরতিকালে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাধারণত হযরত আয়েশা রাযি.-এর হাওদায় আসতেন। একদিন হযরত হাফসা রাযি. বললেন—চলো, আমরা হাওদা বদলাবদলি করি। হযরত আয়েশা রাযি. সরলতা এবং উদারতার পরিচয় দিয়ে তাঁর প্রস্তাব মেনে নেন। কিন্তু রাতে যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে পেলেন না, তখন একটি ঈর্ষাকাতর নারীর মনে যা হওয়ার কথা, তা-ই হলো। তিনি ভীষণ কষ্ট পেলেন।[২]

হযরত উম্মে সালামা রাযি.-এর প্রতি

জ্ঞানে-গুণে ও অনুধাবনে হযরত আয়েশা রাযি.-এর পর পবিত্র স্ত্রীগণের মধ্যে হযরত উম্মে সালামা রাযি. ছিলেন সবার শীর্ষে। হুদায়বিয়ার সন্ধিকালে কোরবানির বিষয় নিয়ে তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যে পরামর্শ দিয়েছিলেন মুসলিম রমনীকুলের ইতিহাসে তা স্মরণীয় হয়ে থাকবে চিরকাল।[৩] ফিকহী মাসায়েল ও

---

১. *সহীহ বুখারী*, অধ্যায় : الإيلاء، التحريم، الهدايا। *জামে তিরমিযী* : مناقب صفية رض। *সুনানে নাসাঈ* : باب الغيرة।

২. *সহীহ বুখারী* : القرعة بين النساء في السفر।

৩. *সহীহ বুখারী* : ذكر الحديبية।

ফতোয়ার ক্ষেত্রেও হযরত আয়েশা রাযি.-এর পরই তাঁর অবস্থান।[১] এজন্যই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে খুব গুরুত্ব দিতেন, যদিও তিনি ছিলেন বয়োবৃদ্ধা। এসব বিবেচনায় পবিত্র স্ত্রীগণের মধ্যে তিনিই ছিলেন হযরত আয়েশা রাযি.-এর সমকক্ষা। কিন্তু তারপরও শুধু একটি মামুলি বিষয় ছাড়া তাদের মধ্যে পারস্পরিক মনোমালিন্যের একটি ঘটনাও পাওয়া যায়নি। তা এই যে, পবিত্র স্ত্রীগণ হযরত উম্মে সালামা রাযি.-কে প্রতিনিধি করে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে পাঠালেন; আবেদন—সাহাবা কেরাম শুধু হযরত আয়েশা রাযি.-এর ঘরে হাদিয়া পাঠান; এ ব্যাপারে অন্যদের কথাও বিবেচনায় আনলে ভালো হতো। তিনি এ আবেদন নিয়ে হযরত আয়েশা রাযি.-এর ঘরে আসেন এবং অত্যন্ত বিচক্ষণতার সঙ্গে পবিত্র স্ত্রীগণের অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা উত্তর দেওয়ার দিলেন, এবং হযরত উম্মে সালামা রাযি. আর কিছু বললেন না। হযরত আয়েশা রাযি. সবই শুনেছিলেন; কিন্তু কোনোরকম প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেননি।[২]

হযরত জুওয়াইরিয়া রাযি.-এর প্রতি

হযরত জুওয়াইরিয়া রাযি. ও হযরত আয়েশা রাযি.-এর মধ্যেও কোনো মনোমালিন্যের ঘটনা পাওয়া যায় না। অবশ্য তাঁর সৌন্দর্য দেখে হযরত আয়েশা রাযি. প্রথমে খুব ঘাবড়ে গিয়েছিলেন—[৩]এই ভেবে যে, না জানি তাঁর মূল্যায়ন কমে যায়; কিন্তু পরে তাঁর ভুল ভেঙে গিয়েছিল; কেননা তাঁর মর্যাদা ও মূল্যায়নের কারণ ছিল অন্য কিছু, যা রূপ-লাবণ্যের অনেক উর্ধ্বে।

হযরত যায়নাব রাযি.-এর প্রতি

হযরত যায়নাব রাযি. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ফুফাতো বোন ছিলেন। তিনি খুব অভিমানী ও কঠোরপ্রকৃতির ছিলেন।

---

১. *তাবাকাত* : ইবনে সাদ। ২য় খণ্ড, ২য় পরিচ্ছেদ, পৃষ্ঠা : ১৬২।

২. *সহীহ মুসলিম* ও *বুখারী* : فضل عائشة رض।

৩. *তাবাকাত* : ইবনে সাদ, ترجمة جويرية رض।

এজন্যই প্রথম স্বামী থেকে বিচ্ছেদ আবশ্যক হয়ে পড়ে। তা ছাড়া সম্পর্কের বিচারে অন্য সকল স্ত্রীর চেয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটাত্মীয়াও ছিলেন। তাই অন্যদের তুলনায় নিজেকে অগ্রগণ্য মনে করতেন। হযরত আয়েশা রাযি. বলতেন, সকল স্ত্রীর মধ্যে ইনিই শুধু আমার প্রতিপক্ষতা করতে চাইতেন। পবিত্র স্ত্রীগণ হযরত উম্মে সালামা রাযি.-এর পর হযরত যায়নাব রাযি.-কেই প্রতিনিধি করে পাঠিয়েছিলেন। তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে অত্যন্ত জোরালোভাবে কথা বলেন। হযরত আয়েশা রাযি. চুপচাপ শুনছিলেন এবং বারবার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিকে তাকাচ্ছিলেন। হযরত যায়নাব রাযি. যখন কথা শেষ করলেন, তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আয়েশা রাযি.-কে কিছু বলার থাকলে বলতে বললেন। রাসূলের অনুমতি পেয়ে হযরত আয়েশা রাযি. মুখ খুললেন। তিনি এত বলিষ্ঠ ও যুক্তিপূর্ণ কথা বলেছিলেন যে, হযরত যায়নাব রাযি. লা-জওয়াব হয়ে গেলেন। আর কোনো আপত্তি করার সুযোগ পেলেন না। প্রতিক্রিয়ায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুধু বললেন, বাব্বাহ, আবু বকরের বেটি বলে কথা।[১]

রমযানের শেষ দশকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইতিকাফ করতেন। হযরত আয়েশা রাযি.-ও এ সময় মসজিদের আঙিনায় তাঁবু টানিয়ে ইতিকাফ করতেন। প্রতিদিন সকালবেলা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেখানে আসতেন। কোনো এক বছর ইতিকাফের সময় হযরত আয়েশা রাযি. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুমতি নিয়ে তাঁবু টানালে হযরত হাফসা রাযি.-ও অনুমতি চেয়ে নিলেন। জানতে পেরে হযরত যায়নাব রাযি.-ও তাঁবু টানালেন। সকালবেলা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দেখলেন, মসজিদের আঙিনায় একাধিক তাঁবু টানানো হয়েছে। জিজ্ঞাসাবাদের পর বিষয়টি অবগত হলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সবারই কি ইখলাস ও নেক নিয়ত ছিল? এ কথা বলে তিনি সবগুলো তাঁবু উঠিয়ে

---

১. সহীহ মুসলিম : فضل عائشة رض।

ফেললেন এবং সে বছর ইতিকাফের মাস বদলে ফেললেন।[১]

একবার রাত্রিবেলা হযরত যায়নাব রাযি. হযরত আয়েশা রাযি.-এর ঘরে এলেন। ঘরে বাতির ব্যবস্থা ছিল না। এমন সময় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এলেন এবং সোজা এক দিকে এগিয়ে যেতে লাগলেন। হযরত আয়েশা রাযি. বলে উঠলেন, উনি তো যায়নাব (রাযি.)। হযরত যায়নাব রাযি. রেগে গেলেন এবং কড়া কথা বলে ফেললেন। হযরত আয়েশা রাযি.-ও যথাযথ উত্তর দিতে পিছপা হলেন না। বাইরে মসজিদে নববীতে হযরত আবু বকর রাযি. ছিলেন। তিনি আওয়াজ পেয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বাইরে আসার অনুরোধ জানালেন। হযরত আয়েশা রাযি. পিতার অসন্তুষ্টি বুঝতে পেরে আত্মসংবরণ করলেন। নামাযের পর হযরত আবু বকর রাযি. ঘরে গেলেন এবং আপন আত্মজাকে ধমক দিলেন ও সাবধান করলেন; যদিও বাস্তবে দোষ তাঁর ছিল না।[২]

এরকম দু-একটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা থেকে এটা ভাববার কারণ নেই যে, পবিত্র স্ত্রীগণের অন্তর পবিত্র ছিল না। কারণ এক জায়গায় দু-চারজন মানুষ থাকলে—যত মিলমিশ আর মতৈক্যই থাকুক—থেকে-থেকে সত্যি-সত্যিই অথবা ভুল বোঝাবুঝির কারণে একটু আধটু মনোমালিন্য হবে, সেটাই স্বাভাবিক; বিশেষ করে যদি নারী হয়। আর সতিন হলে তো কথাই নেই। এরকম জায়গায় বিভিন্ন কারণে মনোমালিন্য হওয়া নারীর সহজাত প্রবৃত্তি। নববীসাহচর্য মানুষকে শ্রেষ্ঠ মানুষে পরিণত করে; কিন্তু তার প্রকৃতিকে বদলায় না। স্বামীর ভালোবাসায় কোনো অংশীদার থাকবে, এটা কোনো নারীমনই মেনে নিতে পারে না। নবীপরিবারে যদি কোনো কিছুর ঘাটতি থেকে থাকে, তা হলে এটুকুই যে, একই প্রেমাগ্নির পতঙ্গ ছিলেন সবাই; কিন্তু ভালোবাসার একটি শিখাই অনির্বাণ ছিল প্রতিটি অন্তরে। তারপরও স্বাভাবিক ও সহজাত সব প্রবণতাকে ছাপিয়ে উঠে তাদের মাঝে বিরাজিত ছিল এক অনিন্দ্যসুন্দর মিল-বন্ধন।

---

১. *সহীহ বুখারী* : باب الاعتكاف।

২. *সহীহ মুসলিম* : باب القسم بين الزوجات।

এই হযরত যায়নাব রাযি.-কেই দেখুন, যখন পবিত্র স্ত্রীগণের মধ্যে শামিল হলেন, তখন হযরত আয়েশা রাযি.-ই তাঁকে স্বাগত জানিয়েছিলেন সবার আগে।[১] অপরপক্ষে যখন লোকজন হযরত আয়েশা রাযি.-এর নামে অপবাদ আরোপে জড়িয়ে পড়েছিল, তখন বোনের মায়ায় হযরত হামনা রাযি.-ও (হযরত যায়নাব রাযি.-এর বোন) নিজেকে রক্ষা করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন। কিন্তু উম্মুল মুমিনীন হযরত যায়নাব রাযি. সততা ও সত্য থেকে বিচ্যুত হননি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে হযরত আয়েশা রাযি.-এর ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে তিনি দ্ব্যর্থহীন ও প্রতিবাদী ভাষায় বলেছিলেন—

مَا عَلِمْتُ فِيْهَا إِلَّا خَيْرًا

অর্থ : আমি তো হযরত আয়েশা রাযি. সম্পর্কে ভালো ছাড়া মন্দ কিছু জানি না।

তিনি চাইলে প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করতে উদ্যত হতে পারতেন। কিন্তু মহৎ সাহচর্যের গুণে তিনি সেই ক্ষুদ্রতার উর্ধ্বে উঠে গিয়েছিলেন। হযরত আয়েশা রাযি. তাঁর এ মহত্ত্বের কথা স্মরণ করতেন বড় কৃতজ্ঞতার সঙ্গে।[২]

একবার হযরত যায়নাব রাযি. হযরত সাফিয়্যা রাযি.-কে ইহুদি বলে সম্বোধন করলেন। বিষয়টি জানতে পেরে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুবই মনঃক্ষুণ্ন হন এবং একমাস তাঁর সঙ্গে কথা বলা বন্ধ রাখেন। অবশেষে তিনি হযরত আয়েশা রাযি.-এর শরণাপন্ন হন এবং অনুরোধ করেন—আপনি আমার মার্জনার ব্যবস্থা করুন। এবার একই সুযোগ হযরত আয়েশা রাযি.-এর হাতেও আসে। তিনি বিষয়টিকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিলেন এবং একপর্যায়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে এমন বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে কথা বললেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত যায়নাব রাযি.-কে ক্ষমা না করে পারলেন না।[৩]

---

১. *সহীহ বুখারী* : তাফসীর : ...لاتدخلوا بيوت النبي ।
২. *সহীহ বুখারী* : ইফকের ঘটনা।
৩. *মুসনাদে আহমদ* : ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা : ৯৫।

মৃত্যুর পর কারও উত্তম গুণাবলির প্রকাশ মৃতের নৈতিক জীবনকে অমর করে রাখে। হযরত আয়েশা রাযি. প্রতিপক্ষ সতিনদের এমন আবে হায়াত ও সঞ্জীবনী-প্রদানেও কার্পণ্য করেননি। তিনি বর্ণনা করেন— রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার পবিত্র স্ত্রীগণকে সম্বোধন করে বললেন, তোমাদের মধ্যে সর্বপ্রথম আমার সঙ্গে সে-ই মিলিত হবে, যার হাত সবচেয়ে লম্বা হবে। হযরত আয়েশা রাযি. বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা শুনে আমরা যার যার হাত মাপতে লাগলাম। কিন্তু সবার আগে যখন হযরত যায়নাব রাযি.-এর ইন্তেকাল হয়ে গেল, তখন বুঝতে পারলাম, হাত লম্বা হওয়ার অর্থ ছিল দানশীলতা ও বদান্যতা। হযরত যায়নাব রাযি. নিজ হাতে কাজ করতেন এবং যা-ই উপার্জন হতো, দান-খায়রাত করে ফুরিয়ে ফেলতেন।

ওপরে আলোচনা এসেছে, একটি বিষয়ে হযরত আয়েশা রাযি. ও হযরত যায়নাব রাযি.-এর কথোপকথন কথা কাটাকাটির পর্যায়ে চলে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল। কিন্তু হযরত আয়েশা রাযি.-এর মনের স্বচ্ছতা ও একনিষ্ঠতা দেখুন, সেই ঘটনাটার বিবৃতি দিতে গিয়েও তিনি হযরত যায়নাব রাযি.-এর প্রশংসায় পঞ্চমুখ। তিনি বলেন, পরবর্তীতে হযরত যায়নাব রাযি. এলেন। পবিত্র স্ত্রীগণের মধ্যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে ব্যক্তিত্ব ও মর্যাদায় তিনিই ছিলেন আমার সমকক্ষতার দাবিদার। আমি কোনো নারীকে হযরত যায়নাব রাযি.-এর চেয়ে ধার্মিকতা, খোদাভীরুতা, সত্যভাষিতা, বদান্যতা, দানশীলতা এবং আল্লাহর নৈকট্য অর্জনে অগ্রবর্তিনী দেখিনি। স্বভাবে কিছুটা কঠোরতা ছিল; কিন্তু অনুতাপবোধে বিলম্ব হতো না।[১]

হযরত উম্মে হাবিবা রাযি.-এর প্রতি

হযরত উম্মে হাবিবা রাযি.-এর সঙ্গে হযরত আয়েশা রাযি.-এর কোনো মিল-অমিলের বর্ণনা পাওয়া যায় না। শুধু আসমাউর রিজাল গ্রন্থগুলোতে আছে, মৃত্যুশয্যায় শায়িতা হযরত উম্মে হাবিবা রাযি. হযরত

---

১. *সহীহ বুখারী* : باب فضل عائشة رض । *নাসাঈ* : باب حب النساء ।

আয়েশা রাযি.-কে ডেকে পাঠালেন। তিনি এলে বললেন, সতিনদের মধ্যে কিছু না কিছু থেকেই থাকে। যদি আপনার আর আমার মধ্যে কিছু থেকে থাকে, তা হলে আল্লাহ যেন দুজনকেই মাফ করে দেন। হযরত আয়েশা রাযি. বললেন, আল্লাহ যেন সব মাফ করেন এবং আপনাকে সুউচ্চ মর্যাদা দান করেন। হযরত উম্মে হাবিবা রাযি. বললেন, আপনি আমাকে আনন্দিত করলেন, আল্লাহও আপনাকে আনন্দে রাখুন।[১]

হযরত মাইমুনা রাযি.-এর প্রতি

হযরত মাইমুনা রাযি. সম্পর্কেও হাদীসে তেমন কিছু পাওয়া যায় না। শুধু রিজালশাস্ত্রীয় গ্রন্থগুলোতে আছে, তাঁর মৃত্যুর পর হযরত আয়েশা রাযি. বলেন, হযরত মাইমুনা রাযি. আমাদের মধ্যে সবচেয়ে পরহেজগার ছিলেন।[২]

হযরত সাফিয়্যা রাযি.-এর প্রতি

হযরত সাফিয়্যা রাযি. মাত্র তিন বছর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র সাহচর্য লাভ করেছিলেন। তা ছাড়া অন্য সকল স্ত্রীর তুলনায় তাঁর অবস্থা ছিল একটু আলাদা। কেননা তিনি খায়বার এলাকার কন্যা ছিলেন; আবার বংশগতভাবে ছিলেন ইহুদি। খায়বারেই পবিত্র স্ত্রীর মর্যাদা লাভ করেন। খায়বার থেকে প্রত্যাবর্তনকালে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে একই হাওদায় সওয়ার ছিলেন। মদীনার কাছে এসে হাওদার রশি ছিঁড়ে গেলে হাওদা পড়ে যায়। মদীনায় সংবাদ পৌঁছলে দাসীরাও দেখতে আসে। দাসীরা ঘটনাটাকে হযরত সাফিয়্যা রাযি.-এর কুলক্ষণ গণ্য করে যা-তা বলতে লাগে।[৩] মদীনায় পৌঁছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত সাফিয়্যা রাযি.-এর থাকার ব্যবস্থা করেন একজন আনসারি সাহাবীয়ার গৃহে। বিভিন্নভাবে তাঁর ওলিমা ও সংবর্ধনা হয়ে গিয়েছিল। অধিকাংশ নারীই তাঁকে দেখতে গেলেন। হযরত

---

১. *তাবাকাত*, ইবনে সাদ, পৃষ্ঠা : ৭১।

২. *তাহযিবুত তাহযিব*, ইবনে হাজার : ১৬/৪৫৩।

৩. সহীহ মুসলিম : باب فضيلة إعتاق الأمة ثم تزوجها।

আয়েশা রাযি.-ও নেকাব পরে নারীদের ভিড়ে ঢুকে পড়লেন। কিন্তু আত্মগোপন করা সম্ভব হলো না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চিনে ফেললেন। হযরত আয়েশা রাযি. লজ্জা পেয়ে সরে আসতে লাগলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-ও উঠে এলেন। কাছে এসে বললেন, আয়েশা, বলো, তোমার কী মনে হচ্ছে? হযরত আয়েশা রাযি. বললেন, শুনলাম, ইহুদি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এমন করে বোলো না, সে ইসলাম গ্রহণ করেছে।[১]

হযরত সাফিয়্যা রাযি.-এর রান্নার হাত খুবই ভালো ছিল। স্বয়ং হযরত আয়েশা রাযি. বলেন, হযরত সাফিয়্যা রাযি.-এর চেয়ে ভালো রান্না করতে পারেন এমন নারী আমি দেখিনি। একদিন দুজনেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য খাবার রান্না করলেন। হযরত সাফিয়্যা রাযি.-এর রান্না খুব তাড়াতাড়ি হয়ে গেল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আয়েশা রাযি.-এর ঘরে ছিলেন। হযরত সাফিয়্যা রাযি. একজন দাসীর হাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য খাবার পাঠিয়ে দিলেন। হযরত আয়েশা রাযি. সহ্য করতে পারলেন না। তিনি এত জোরে হাত ঝাড়া দিলেন যে, দাসীর হাত থেকে পাত্র পড়ে গিয়ে টুকরো টুকরো হয়ে গেল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নীরবতার সঙ্গে টুকরোগুলো জড়ো করলেন। তিনি দাসীকে বললেন, তোমার মাতার রাগ দ্যাখো! কিছুক্ষণ পর হযরত আয়েশা রাযি. আপন কৃতকর্মের ওপর অনুতপ্ত হলেন এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল, এই অপরাধের মোচন কী হতে পারে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হুবহু এরকম পাত্র এবং হুবহু এরকম খাবার। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিক-নির্দেশনা অনুযায়ী একটি নতুন পাত্র হযরত সাফিয়্যা রাযি.-কে ফেরত দেওয়া হয়।[২]

---

১. *তাবাকাত*, ইবনে সাদ : তরজমাতু সাফিয়্যাহ রাযি.।

২. ঘটনাটি সামান্য শব্দভেদসহ প্রায় সবগুলো হাদীসগ্রন্থেই এসেছে। ফিকহ-শাস্ত্রে ক্ষতিপূরণ সংক্রান্ত মূলনীতিটি এ হাদীস থেকেই গৃহীত (*বুখারী*—কিতাবুল মাযালিম এবং বাবুল গাইরাহ)। *মুসলিম*, *আবু দাউদ*-এ হযরত আনাস রাযি.-এর বর্ণনায় উম্মাহাতুল মুমিনীনের নাম নেই। কিন্তু *মুসনাদে আহমাদ*, *আবু দাউদ* ও *নাসাঈ*-তে স্বয়ং হযরত আয়েশা রাযি.-এর বর্ণনায় নামের উল্লেখ আছে

হযরত সাফিয়্যা রাযি. কিঞ্চিৎ খর্বাকৃতির ছিলেন। একদিন কথা প্রসঙ্গে হযরত আয়েশা রাযি. বলে ফেললেন—হে আল্লাহর রাসূল, আর কী বলবেন, সাফিয়্যা [রাযি.] তো এট্টুক। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আয়েশা, তুমি এমন একটা কথা বললে, যদি সমুদ্রেও মেশানো হয় মিশে যাবে। আরজ করলেন—হে আল্লাহর রাসূল, আমি তো কারও বাস্তবতাই তুলে ধরেছি। ইরশাদ করলেন, যদি আমাকে এত-এত-এতও দেওয়া হয়, তবু কারও সম্পর্কে এহেন মন্তব্য করব না।

হযরত আয়েশা রাযি. এবং হযরত সাফিয়্যা রাযি. একই পাড়ায় থাকতেন। পারস্পরিক হিতাকাঙ্ক্ষা ও পক্ষসমর্থন ছিল।[১] মনোমালিন্যের তেমন কোনো ঘটনা নেই। আর সাময়িক দু-একটা যা পাওয়া যায়—একে অপরের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ ও ভালোবাসাবোধকে কখনো ব্যাহত করেনি।

পাঠক নিশ্চয় বুঝতে পেরেছেন, হযরত আয়েশা রাযি. সতিনদের সঙ্গে কতটা ভালোবাসাপূর্ণ, শ্রদ্ধাপূর্ণ ও ন্যায়সঙ্গত আচরণ করতেন। কতটা খোলা মনে তাদের গুণ ও বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতেন। কখনো কখনো মনুষ্যবৃত্তি তাঁকে প্রভাবিত করলেও শীঘ্রই অনুতপ্ত হয়েছেন। আগে বেড়েও সতিনদের আক্রমণাত্মক কিছু বলেননি। হাঁ, কেউ বললে চুপ করেও থাকেননি। আবার সতিনদের যথাযোগ্য প্রশংসা করতেও কখনো কার্পণ্য করেননি।

কয়েকটি বর্ণনা এবং সমালোচনা

সাধারণভাবে সারা পৃথিবীতে সতিনদের মধ্যে আন্তরিক ভালোবাসা থাকে না বললেই চলে। কিন্তু নবীপরিবারের অন্তঃপুরিকাগণের কাছে যে নৈতিক গুণাবলি ও চারিত্রিক সৌন্দর্যমাধুরী আশা করা যায়, আল্লাহর

(*আবু দাউদ*—কিতাবুল বুয়ু, *নাসাঈ*—কিতাবু ইশরাতিন নিসা—বাবুল গায়রাহ, *মুসনাদে আহমদ*—৬ষ্ঠ খণ্ড)। পূর্ণ চিত্রায়ন ঘটে সবগুলো বর্ণনাকে একত্র করলে। *নাসাঈ*-র একটি বর্ণনায়, এবং *মুজামে তাবরানি* (হাদীসু আলী ইবনে ইসহাক, পৃষ্ঠা : ১১৮)-তে অপর স্ত্রীর নাম : উম্মে সালামা রাযি.।

১. *সহীহ বুখারী* : كتاب الهدايا।

প্রশংসা, তাঁরা তাতে অসফল নন। বিভিন্ন ঘটনায় কোথাও কোথাও যে অপ্রিয়তা ও অসুন্দরতা দেখা যায়, তা মূলত কপটাচারীদের বানোয়াটি অথবা অপরিণামদর্শীদের মুর্খসুলভ প্রচেষ্টা। যেমন : নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে একজন মহিলা ছিল। সিয়ার ও রিজালগ্রন্থগুলোতে তার বৈশিষ্ট্য লেখা হয়েছে : كَانَتْ تُحَرِّشُ بَيْنَ أَزْوَاجِ النِّسَاءِ—সে পবিত্র স্ত্রীগণের মধ্যে বিবাদের উস্কানি দিয়ে বেড়াত। কিন্তু নিজের পাপের স্বীকারোক্তিও করত নিজেই। লোকে জিজ্ঞেস করত, তখনকার মানুষ তোমার কথা বিশ্বাস করত কীভাবে? সে বলত, যদি বিশ্বাসই না করত, তা হলে বলতাম কী করে?[১]

এ কথা ঠিক যে, ওপরে যে বর্ণনাগুলো প্রদত্ত হয়েছে অধিকাংশই সিহাহ্গ্রন্থগুলো থেকেই গৃহীত; তারপরও যেখানে যেখানে সামান্যতম মন্দেরও অবকাশ আছে, যদি সনদ-মতনের গোড়ায় হাত দেওয়া হয়, তা হলে সেগুলোও নড়বড়ে প্রমাণিত হবে। পাত্র ভাঙার ঘটনাটা প্রায় সবগুলো হাদীসগ্রন্থেই আছে। কিন্তু *বুখারী* ও *মুসলিমে*র কোথাও হযরত আয়েশা রাযি.-এর নাম নেই। *আবু দাউদ, নাসাঈ, মুসনাদে আহমাদ* এবং আরও বেশ কিছু সাধারণ কিতাবে বর্ণনাকারী হযরত আয়েশা রাযি.-এর নাম উল্লেখ করেছেন। মজার ব্যাপার হলো, সেগুলো স্বয়ং হযরত আয়েশা রাযি.-এরই মৌখিক বর্ণনা হিসেবে গৃহীত। আলোচ্য সূত্রের প্রথম রাবী : জাসরা বিনতে দুজানা। প্রখ্যাত হাদীসবিশারদ আজালি এবং ইবনে হিব্বান তাকে বিশ্বস্ত বললেও ইমাম বুখারীর মন্তব্য : عِنْدَ جَسْرَةَ عَجَائِبُ—অর্থ : জাসরার বর্ণনায় অদ্ভুত সব কথা পাওয়া যায় (তাহযিব)। ইবনে হাযম জাসরার বর্ণনাকে বলেছেন : بَاطِلٌ—অর্থ : অনর্থক বা অগ্রহণযোগ্য (তাহযিব)।

আলোচ্য সূত্রের দ্বিতীয় রাবী : أفلت عامري বা فليت عامري। দু-একজন হাদীসবিশারদ তাকে বিশ্বস্ত জ্ঞান করলেও অধিকাংশের মন্তব্য দেখুন—

---

১. *আল ইসাবাহ*, ইবনে হাজার রহ. : ذكر أم حبيبة رض।

ইমাম আহমাদ : لَا بَأسَ بِهٖ—অর্থ : তেমন সমস্যা নেই, চলতে পারে (অর্থাৎ দুর্বল)।

ইমাম আহমাদ : (খাত্তাবি ও বাগাবির বর্ণনানুসারে) مجهول / مجهول الحال। (হাদীসের জগতে অজ্ঞাত)/(হাদীসের জগতে তার অবস্থা পরিজ্ঞাত নয়)।

ইবনে হাযম : অপ্রসিদ্ধ। তার বিশ্বস্ততার ব্যাপারে তেমন কিছু জানা যায় না। তার একটি বিশেষ হাদীস باطل (অনর্থক বা অগ্রহণযোগ্য) বলে গণ্য।

রাত্রিবেলা হযরত আয়েশা রাযি. ও হযরত যায়নাব রাযি.-এর মধ্যে সংঘটিত কথা কাটাকাটির হাদীসটি এসেছে *সহীহ মুসলিমে*। কিন্তু বাস্তবতা বিচার করুন স্বয়ং নিজেই। হাদীসটির প্রথম রাবী হযরত আনাস রাযি.। পঞ্চম হিজরীর পর থেকে উম্মাহাতুল মুমিনীনের ঘরে যাওয়ার অবকাশ তাঁর ছিল না; অথচ ঘটনাটা পঞ্চম হিজরীর পরের। আবার ঘটেছিল ঘরের ভেতর। নিঃসন্দেহে ঘরের ভেতর হযরত আনাস রাযি. ছিলেন না। এজন্য বর্ণনার ইত্তিসাল বা সংলগ্নতা ও ধারাবাহিকতা শেষ রাবী পর্যন্ত পৌঁছে না। যদি ধরেও নেওয়া হয় যে তিনি মসজিদে নববীতে ছিলেন আর ঘরের আওয়াজ বাইরে চলে আসছিল বলে তিনি শুনতে পেয়েছিলেন, তা হলে রাতের অন্ধকারে—যেখানে তিনি নিজে অনুপস্থিত, আবার ঘরে আলোরও ব্যবস্থা নেই—তিনি কীভাবে দেখতে পেলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন দিকে হাত বাড়িয়েছেন? আর বাস্তবিকই কী ঘটেছে? সবচেয়ে বড় কথা, হযরত আয়েশা রাযি.-এর মনের কথাই বা তিনি কী করে বুঝলেন যে, পিতা এসে আমাকে নিশ্চয় ধমক দেবেন? সব মিলিয়ে আলোচ্য বর্ণনায় হাদীস বর্ণনার জন্য যে সাবধানতার অপরিহার্যতা ছিল, তা নেই।

তিরমিযী শরীফে আছে, একবার হযরত সাফিয়্যা রাযি. কাঁদছিলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কারণ জানতে চাইলে তিনি বললেন : আমি জানতে পেরেছি, হযরত আয়েশা রাযি. ও হযরত হাফসা রাযি.

বলেছেন, তারাই নাকি আপনার কাছে অধিক মর্যাদার; তারা আপনার নিকটাত্মীয়াও বটে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সান্ত্বনা জানালেন এবং বললেন, তুমি বললে না যে, আপনারা আমার চেয়ে অধিক মর্যাদার হন কী করে? আমার স্বামী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আমার পিতা হযরত হারুন আলাইহিস সালাম। আমার চাচা হযরত মুসা আলাইহিস সালাম। হাদীসটিকে প্রায় সকল সিয়ারগ্রন্থে আনা হয়েছে। কিন্তু শেষে স্বয়ং ইমাম তিরমিযীর মন্তব্যটি আনা হয়নি :

هَذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيْثِ هَاشِمٍ الْكُوْفِيِّ وَلَيْسَ إِسْنَادُه بِذَاكَ

অর্থ : হাদীসটি গরিব (একেবারেই অপরিচিত)। হাশেম কুফির সনদ ছাড়া এর কোনো গোড়া পাওয়া যায় না। আর তার সনদ গ্রহণযোগ্যও নয়।

হাশেম কুফি সম্পর্কে প্রখ্যাত হাদীসবিশারদগণের মন্তব্য—

ইমাম আহমাদ : لا نَعْرِفه—অর্থ : আমি তাকে চিনি না।

ইবনে মাঈন : لَيْسَ بِشَيْئٍ —অর্থ : ইনি তো গোনায় আসেন না।

আবু হাতিম : ضَعِيْفُ الْحَدِيْثِ—অর্থ : তার হাদীস যঈফ।

ইবনে আদঈ : مِقْدَارُ مَا يَرْوِيْهِ لا يُتَابَعُ عَلَيْه—অর্থ : তার সাথীরাও তাকে সমর্থন করেননি।

মুসনাদে আহমাদে আছে, একবার রাত্রিবেলা হযরত উম্মে সালামা রাযি. হযরত আয়েশা রাযি.-এর ঘরে বসা ছিলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাশরিফ আনলেন। তিনি হযরত উম্মে সালামা রাযি.-কে চিনতে পারলেন না। হযরত আয়েশা রাযি. চুপিচুপি ইশারা করছিলেন। কিন্তু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বুঝতে পারছিলেন না। অবশেষে যখন বুঝতে পারলেন, তখন হযরত উম্মে সালামা রাযি. রেগে গেলেন এবং হযরত আয়েশা রাযি.-কে যা-তা বলে দিলেন। তারপর উঠে হযরত ফাতেমা রাযি.-এর কাছে গেলেন এবং বললেন,

আয়েশা [রাযি.] তোমাকে এই-সেই বলে। এই হাদীসের দ্বিতীয় রাবী আলী ইবনে যায়েদ তামিমী। তার ব্যাপারে হাদীসশাস্ত্রবিদগণের মন্তব্য লক্ষ করুন—

ইবনে সাদ : فِيْهِ ضُعْفٌ وَلَا يُحْتَجُّ بِهٖ—অর্থ : তার মধ্যে যু'ফ (দুর্বলতা) আছে, তার হাদীস প্রামাণ্য নয়।

ইমাম আহমাদ : لَيْسَ بِالْقَوِيِّ—অর্থ : তিনি মজবুত নন। لَيْسَ بِشَيْئٍ—অর্থ : তিনি কিছুই নন। ضَعِيْفُ الْحَدِيْثِ—অর্থ : তার হাদীস দুর্বল।

ইমাম ইয়াহইয়া : ضَعِيْفٌ، ضَعِيْفٌ فِيْ كُلِّ شَيْئٍ—অর্থ : তিনি যঈফ, সর্বক্ষেত্রে যঈফ।

ইমাম জাওযানী : وَاهِي الْحَدِيْثِ—অর্থ : দুর্বল।

ইমাম হাকেম : لَيْسَ بِالْمَتِيْنِ عِنْدَهُمْ—অর্থ : হাদীসবিশারদগণের কাছে তিনি শক্তিশালী নন।

ইমাম আবু যুরআ : لَيْسَ بِالْقَوِيِّ—অর্থ : তিনি মজবুত নন।

ইমাম বুখারী : لَا يُحْتَجُّ بِهٖ— অর্থ : তার হাদীস কোনো প্রমাণ হতে পারে না।

এ ধরনের দ্ব্যর্থহীন মন্তব্য অন্যান্য ইমামও করেছেন। তার এক শাগরেদ বলেছেন : তিনি আমাদের একেকদিন একেকরকম বলতেন।[১]

সাধারণ সিয়ারগ্রন্থগুলোতে এ ধরনের আরও অনেক ঘটনা আছে। অধিকাংশই ওয়াকিদী ও কালবির বানোয়াট গল্প থেকে নেওয়া। উদাহরণস্বরূপ এখানে একটি ঘটনা দেওয়া হচ্ছে :

বিভিন্ন হাদীসে এসেছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক গোত্রপতির কন্যাকে বিবাহ করেছিলেন। তিনি মদীনায় এসে যখন বাসরঘরে যান, তখন ওই স্ত্রীলোক বলেন, একজন গোত্রপতির কন্যা

---

১. *তাহযিবুত তাহযিব* এবং *মিযানুল ইতিদাল* দ্রষ্টব্য।

কীভাবে নিজেকে একজন সাধারণ প্রজার কাছে অর্পণ করতে পারে? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য তার মাথায় হাত রাখতে চাইলে তিনি বলে ওঠেন, আমি আপনার কাছ থেকে পানাহ চাইছি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি যথাযথ মানুষের কাছেই পানাহ চেয়েছ। তিনি এ কথা বলে চলে গেলেন এবং তাকে তালাক দিয়ে মুক্ত করে দিলেন।[১]

এটা সহীহ বুখারীরই বর্ণনা। কিন্তু ইবনে সাদ হিশাম ইবনে মুহাম্মাদ থেকে বর্ণিত আছে, হযরত আয়েশা রাযি. এবং হযরত হাফসা রাযি. ওই মহিলাকে শিখিয়ে দিয়েছিলেন যে, তুমি এভাবে বলবে... তা হলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুশি হবেন। এই হিশাম ইবনে মুহাম্মাদ কে? এ তো সে—পৃথিবীবাসী যাকে কালবি বলে জানে। যার বিশেষ পরিচয় : মাতরুক (বর্জনীয়), গায়রে সিকাহ, রাফেযি ইত্যাদি।

ইমাম আহমাদ বলেন : إِنَّهُ كَانَ صاحبَ سَمَرٍ وَنَسَبٍ مَّا، مَا ظَنَنتُ أَنَّ أحدًا يُحَدِّثُ عَنْه [ميزان]—অর্থ : ইনি তো একজন বংশবিদ ও গল্পকার ছিলেন। কেউ তার থেকেও হাদীস বর্ণনা করবে—এটা কাম্য নয়।

*সহীহ বুখারী*তে স্পষ্টত উল্লেখ আছে, ওই স্ত্রীলোক রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে চিনতেন না। সেজন্যই এমনটা করেছিলেন। কিন্তু পরে যখন জানতে পেরেছিলেন যে, ইনিই ছিলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, তখন তার আফসোসের কোনো শেষ ছিল না।[২] স্বয়ং হযরত আয়েশা রাযি.-ও এই হতভাগ্য নারীর ঘটনা বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তিনি কোথাও একথা বলেননি, এটা আমার শেখানো ছিল।[৩] অথচ তিনি যে স্বাধীনভাবে কথা বলতেন এবং অপরাধ করে ফেললে নির্দ্বিধায় স্বীকার করে নিতেন—হাদীসের জগতে তা কে না জানেন?[৪]

---

১. *সহীহ বুখারী* : কিতাবুত তালাক।

২. *সহীহ বুখারী* : آخر كتاب الأشربة।

৩. *সহীহ বুখারী* : কিতাবুত তালাক।

৪. হযরত আয়েশা রাযি.-এর মনন ও স্বভাববৈশিষ্ট্য আলোচ্য বর্ণনার অধ্যায়েও ফুটে ওঠে।

সৎ সন্তানদের প্রতি

সৎ সন্তানগণ

হযরত খাদীজা রাযি.-এর গর্ভে হযরত আয়েশা রাযি.-এর চারজন সৎ সন্তানের জন্ম হয়েছিল। তাঁরা হলেন—হযরত যায়নাব রাযি., হযরত রুকাইয়া রাযি., হযরত উম্মে কুলসুম রাযি. ও হযরত ফাতেমা রাযি.। কিন্তু হযরত আয়েশা রাযি.-এর রোখসতের পূর্বেই হযরত ফাতেমা রাযি. ছাড়া বাকি সবার বিবাহ ও রোখসত হয়ে যায়। তা ছাড়া দ্বিতীয় হিজরীতে হযরত আয়েশা রাযি.-এর রোখসতের এক বছর পরই হযরত রুকাইয়া রাযি.-এর ইন্তেকাল হয়ে গিয়েছিল। আর হযরত যায়নাব রাযি. ও হযরত উম্মে কুলসুম রাযি. যথাক্রমে অষ্টম ও নবম হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেছিলেন। তাঁরা মোটামুটি সাত আট বছর নবীপরিবারে হযরত আয়েশা রাযি.-এর উপস্থিতিতে জীবিত ছিলেন। কিন্তু এ দীর্ঘ সময়কালে তাদের মধ্যে পারস্পরিক মনোমালিন্যের কোনো ঘটনা ঘটেনি।

হযরত যায়নাব রাযি.-এর প্রতি

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জ্যেষ্ঠ কন্যা ছিলেন হযরত যায়নাব রাযি.। তিনি আল্লাহর রাস্তায় শাহাদাত বরণ করেছিলেন। তাঁর সম্পর্কে হযরত আয়েশা রাযি. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিবৃতি দিয়ে বলেন : সে আমার সবচেয়ে সুপুত্রী ছিল। আমার কারণে সে অনেক নির্যাতনের শিকার হয়েছে।[১] হযরত যায়নাব রাযি.-এর কলিজার টুকরা ছিলেন হযরত উমামা রাযি.। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

---

১. *যুরকানি* (*তহাবি* ও *হাকেমের* উদ্ধৃতি অবলম্বনে)।

তাঁকে খুবই ভালোবাসতেন। তাঁকে কোলে নিতেন। কাঁধে নিতেন। কোলে নিয়ে মসজিদে যেতেন এবং নামায পড়াতেন।[১] হযরত আয়েশা রাযি. বর্ণনা করেন : রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে খুবই ভালোবাসতেন। একবার একটি হার উপহার এলে সবাই বলাবলি করল, এটা হযরত আয়েশা রাযি.-ই পাবেন; কিন্তু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হারটি হযরত উমামা রাযি.-কে দিয়েছিলেন।[২]

হযরত ফাতেমা রাযি.-এর প্রতি

হযরত আয়েশা রাযি. যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র সান্নিধ্যে এলেন, তখন হযরত ফাতেমা রাযি. কুমারী ছিলেন। তাঁদের বয়সের ব্যবধান ছিল মাত্র পাঁচ ছয় বছরের। আনুমানিক এক বছর বা তারচে কম সময়কাল মা-মেয়ে একসঙ্গে থেকে থাকবেন। দ্বিতীয় হিজরীর ভেতরেই হযরত আলী রাযি.-এর সঙ্গে হযরত ফাতেমা রাযি.-এর বিবাহ হয়। মাতৃসম যে নারীগণ বিবাহের বন্দোবস্ত করেছিলেন, হযরত আয়েশা রাযি. ছিলেন তাঁদের অন্যতম। তা ছাড়া রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশের কারণে তাঁর দায়ভার ও গুরুত্বারোপ ছিল বেশি। নিজ হাতে ঘর লেপন করেছিলেন, বিছানা সাজিয়েছিলেন, খেজুরছাল ধুনে বালিশ বানিয়েছিলেন, ওলিমায় শুকনো খেজুর ও আঙ্গুরের ব্যবস্থা করেছিলেন, পানির মশক ও কাপড় লটকানোর জন্য লাকড়ির আলনা বানিয়েছিলেন। তিনি স্বয়ং বলেন : হযরত ফাতেমা [রাযি.]-এর বিবাহের চেয়ে সুন্দর বিবাহ আর দেখিনি।[৩] বিবাহের পর হযরত ফাতেমা রাযি. যেই ঘরে গিয়েছিলেন, সেই ঘর আর হযরত আয়েশা রাযি.-এর ঘরের মধ্যে ব্যবধান ছিল শুধু একটি দেয়ালের। মাঝখানে একটি ছোট দরজাও ছিল। ওই দরজা দিয়ে মাঝেমধ্যে কথাবার্তাও হতো।[৪]

---

১. *সহীহ বুখারী* : কিতাবুস সালাহ।
২. *মুসনাদে আহমদ* : ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা : ১০১।
৩. *ইবনে মাজাহ* : বাবুল ওয়ালিমা।
৪. *খুলাসাতুল অফা* : চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

হাদীসের গ্রন্থসম্ভারে বিশুদ্ধ সনদে একটি ঘটনাও এমন নেই, যা প্রমাণ করে যে, মা-মেয়ের মধ্যে কোনো মনোমালিন্য ছিল। বরং সকল হাদীস এ কথারই সাক্ষ্য বহন করে যে, তাদের মধ্যে সবসময়ই মিল-মহব্বতের সম্পর্ক ছিল। হযরত ফাতেমা রাযি. স্বামীসংসারে নিজ হাতে কাজ করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। তাই কোনো দাসীর আবদার নিয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আসেন। কিন্তু সম্মানিত পিতার দেখা না পেয়ে সম্মানিতা মাতাকেই প্রয়োজনের কথা জানিয়ে চলে গেলেন।[১]

পবিত্র স্ত্রীগণ হযরত ফাতেমা রাযি.-কে হযরত আয়েশা রাযি.-এর বিরুদ্ধে বলার জন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে প্রতিনিধি করে পাঠিয়েছিলেন। তিনি পবিত্র স্ত্রীগণের পক্ষ থেকে আবেদন করলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুধু বলেছিলেন—প্রিয় পুত্রী, আমি যাকে ভালোবাসি, তুমি তাকে ভালোবাসবে না! রাসূলের কথায় হযরত ফাতেমা রাযি. খুবই লজ্জিত হয়েছিলেন। কালক্ষেপণ না করে সঙ্গে সঙ্গে ফিরে আসেন। পবিত্র স্ত্রীগণের বারংবার অনুরোধ সত্ত্বেও পুনরায় তাঁদের আবেদন নিয়ে রাসূলের দরবারে যেতে কিছুতেই সম্মত হননি।[২]

মেয়ের প্রশংসা করে মা বলছেন—আমি ফাতেমার চেয়ে ভালো মানুষ আর দেখিনি; অবশ্য তাঁর পিতার কথা আলাদা।[৩] জনৈক তাবেঈ হযরত আয়েশা রাযি.-কে জিজ্ঞেস করলেন—রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সবচেয়ে বেশি কাকে ভালোবাসতেন? হযরত আয়েশা রাযি. উত্তর দিলেন—হযরত ফাতেমা রাযি.-কে। তিনি আরও বলেন—আমি ওঠা-বসা ও চাল-চলনে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে ফাতেমা রাযি.-এর চেয়ে অধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ আর কাউকে দেখিনি। যখন তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে আসতেন, তখন

---

১. *সহীহ বুখারী* : كتاب الجهاد وباب عمل المرأة في بيت زوجها। *মুসনাদ*। *আবু দাউদ*। *তয়ালিসি* : মুসনাদে আলি রাযি.।

২. *সহীহ বুখারী*।

৩. *যুরকানি*। معجم الأوسط، الطبراني، على شرط الشيخين।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পূর্ণ দাঁড়িয়ে যেতেন, কপালে চুমু খেতেন এবং নিজের জায়গায় বসতে দিতেন। একইভাবে যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর ঘরে তাশরিফ আনতেন, তখন তিনিও পিতার সৌজন্যে দাঁড়িয়ে যেতেন, পিতাকে চুমু দিতেন এবং নিজের জায়গায় বসতে দিতেন।[১] যেই বিশেষ বিশেষ হাদীসগুলোতে হযরত ফাতেমা রাযি.-এর আহলে বাইতের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার কথা এসেছে, সেগুলো হযরত আয়েশা রাযি.-এর সূত্রেই বর্ণিত।[২]

হযরত আয়েশা রাযি. বর্ণনা করেন, একদিন আমরা পবিত্র স্ত্রীগণ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পাশে বসা ছিলাম। এমন সময় হযরত ফাতেমা রাযি. এলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুবই মহব্বতের সঙ্গে তাঁকে ডেকে নিলেন এবং কাছে বসালেন। তারপর কানে কানে কী যেন বললেন। তিনি কাঁদতে লাগলেন। তাঁর কান্নাকাতরতা দেখে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবার কানে কানে কী যেন বললেন। এবার তিনি হাসতে লাগলেন। আমি বললাম, ফাতেমা, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকল স্ত্রীকে ছেড়ে আপনাকে তাঁর গোপন কথা বলছেন আর আপনি কাঁদছেন?—রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন উঠে গেলেন তখন বিষয়টি জানতে চাইলাম। তিনি বললেন—আমি আমার পিতার গোপন কথা রাষ্ট্র করতে পারি না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তিকালের পর আমি আবার কথাটি তুললাম—ফাতেমা, আপনার ওপর আমার যে অধিকার আছে, তার দোহাই দিয়ে বলছি, সেদিনের বিষয়টি আমাকে বলুন। তিনি বললেন—হ্যাঁ, এখন বলতে বাধা নেই। আমার কান্নার কারণ এই ছিল যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে তাঁর আসন্ন মৃত্যুর কথা বলেছিলেন। আর হাসার কারণ এই ছিল যে, তিনি বলেছিলেন—ফাতেমা, তুমি কি এটা চাও না যে, সারা পৃথিবীর সকল নারীর নেত্রী হবে তুমি ?[৩]

---

১. *জামে তিরমিযী* : বাবুল মানাকিব।

২. *সহীহ মুসলিম* : কিতাবুল ফাজায়েল।

৩. *সহীহ বুখারী* ও *সহীহ মুসলিম* : باب من ناجى بين أيدي الناس।

এই হাদীস থেকে বোঝা যায়, মা মেয়ের সম্পর্কটা কত গভীর ও মধুর ছিল। এটা হযরত ফাতেমা রাযি.-এর শেষ জীবনের ঘটনা। সুতরাং এও প্রমাণিত হয় যে, না উত্তরাধিকার ও বিষয়সম্পর্কিত কিছু তাঁদের পবিত্র হৃদয়কে একটুও প্রভাবিত করেছে, না পরিবারজীবনের অন্য কোনো কষ্ট তাঁদের অন্তরকে মলিন করেছে।

কয়েকটি বর্ণনা পর্যালোচনা

যারা বর্ণনা করেছেন, কোনো এক রাত্রিতে হযরত উম্মে সালামা রাযি. হযরত আয়েশা রাযি.-এর ঘরে গিয়েছিলেন এবং তাঁদের মধ্যে কিঞ্চিৎ কথা কাটাকাটি হয়েছিল, তাঁদের থেকেই *মুসনাদে আহমাদে* বর্ণিত আছে, এরপর হযরত উম্মে সালামা রাযি. উঠে হযরত ফাতেমা রাযি.-এর ঘরে যান এবং বলেন—হযরত আয়েশা [রাযি.] তোমার সম্পর্কে এই-সেই বলে। তখন হযরত আলী রাযি.-এর পরামর্শে হযরত ফাতেমা রাযি. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে যান এবং জানান। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন—আল্লাহর কসম, সে তোমার পিতার প্রিয় পাত্রী। হযরত আলী রাযি. বললেন, হযরত আয়েশা [রাযি.] পূর্বে যা বলেছেন, তা যথেষ্ট হয়নি; যখন তিনি এ কথাও বলে দিলেন যে, আল্লাহর কসম, সে তোমার পিতার প্রিয়পাত্রী।[১]

হাদীসটি বাহ্যত হযরত আয়েশা রাযি.-এর শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করার জন্য আনা হয়েছে। কিন্তু চিন্তা করে দেখুন, অবিবেচক রাবী পবিত্র স্ত্রীগণের চরিত্রমাধুরীতে কী কালিমা লেপন করে ফেলেছেন। আসলে এই লোনা পানির মূল উৎস আলী ইবনে যায়েদ তামিমী—যিনি হাদীসশাস্ত্রের পরিভাষায় যঈফ (দুর্বল), ওয়াহি (অথর্ব), অগ্রহণযোগ্য। শুধু তাই নয়, চিন্তা-চেতনায় তিনি রাফেযিও।[২]

ইয়াহইয়া মুসনাদে ঈসা ইবনে আবদুল্লাহ থেকে বর্ণনা করেন যে, হযরত আয়েশা রাযি. ও হযরত ফাতেমা রাযি.-এর ঘরের মধ্যে একটি ছোট্ট দরজা ছিল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওই দরজা থেকে

---

১. *মুসনাদে আহমদ* : ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা : ১৩০।
২. *তাহযিবুত তাহযিব*। *মিযানুল ইতিদাল*।

হযরত ফাতেমা রাযি.-এর খোঁজখবর নিতেন। কোনো এক রাত্রিতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আয়েশা রাযি.-এর গৃহে ছিলেন না। হযরত আয়েশা রাযি. ও হযরত ফাতেমা রাযি.-এর মধ্যে একটু কথা কাটাকাটি হয়ে যায়। পরে হযরত ফাতেমা রাযি.-এর আবেদনে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দরজাটি বন্ধ করে দেন।[১]

ইবনে আবদুল হামিদ ও ঈসা ইবনে আবদুল্লাহ দুজনই এই ঘটনার বর্ণনাকারী। সার্বিক বিবেচনায় তারা যে 'পতিত-রহিত' তা তো আছেই; উপরন্তু শিয়াও বটে। যদিও শাস্ত্রজ্ঞদের নিকট শিয়া হওয়া হাদীস যঈফ হওয়ার কারণ নয়, তবুও এ কথা স্বীকার করতেই হবে যে, অন্তত হযরত আয়েশা রাযি.-এর বিরুদ্ধে তাদের সাক্ষ্য কিছুতেই গ্রহণযোগ্য নয়।

১. *খুলাসাতুল অফা* : চতুর্থ পরিচ্ছেদ, পৃষ্ঠা : ১২৭।

ইফকের ঘটনা

মুনাফিকদের চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্র

মদীনায় এসে মুসলমানদের যেসব বিপদাপদের সম্মুখীন হতে হয়েছিল, সেগুলো মক্কার বিপদাপদের তুলনায় সম্পূর্ণ আলাদা। মদীনায় একদল মুনাফিক ও কপটশ্রেণির উদ্ভব ঘটেছিল। এদের মন-মগজের ধ্যান-ধারণা প্রতিমুহূর্ত লিপ্ত ছিল ইসলামবিরোধী ষড়যন্ত্রে। মানুষের সবচেয়ে বড় সম্পদ তার সম্মান ও সম্ভ্রম। আর সেই সম্মান ও সম্ভ্রমে আঘাত হানা ঘোরতর শত্রুরই কাজ। ইসলাম যেমন একনিষ্ঠ, বিশ্বস্ত ও প্রেমময় বন্ধু লাভ করেছিল তেমনই লাভ করেছিল কপটচারী, ঘোর বিদ্বেষী ও চরম বিশ্বাসঘাতক শত্রুও। বানোয়াট অশোভন ঘটনার প্রচারণা চালানো, পারিবারিক বা পারস্পরিক দ্বন্দ্ব ও মনোমালিন্যের ক্ষেত্র প্রস্তুত করা—এগুলোই তাদের বড় হাতিয়ার। আল্লাহ না করুন, যদি সময়মতো আল্লাহর সাহায্য না হতো, তা হলে তাদের বিধ্বংসী প্রচেষ্টাগুলো আরও আগেই সাহাবা কেরামের মাঝে বিভেদ বরং রক্তপাতও ঘটাত।

কপটশ্রেণির সেই অপচেষ্টাগুলোর মধ্যে নিকৃষ্ট ও জঘন্যতম হলো, ইফক তথা হযরত আয়েশা রাযি.-এর নামে অপবাদ-আরোপ। এটা সকলেরই জানা আছে যে, কপটশ্রেণি মুনাফিকদলের সবচেয়ে বড় শত্রু ছিলেন হযরত আবু বকর রাযি. ও হযরত উমর রাযি.। আর এজন্যই তাদের অপচেষ্টার সিংহভাগই ব্যয়িত হতো হযরত আয়েশা রাযি. ও হযরত হাফসা রাযি.-এর নামে কুৎসা রটনার মধ্যে। এ ধরনের অসংখ্য উদাহরণ পূর্বে গিয়েছে এবং সামনে আসবে।

গাযওয়ায়ে বনু মুসতালিকে মুনাফিকদের অংশগ্রহণ

নজদের নিকটেই মুরাইসি (مريسيع) নামক বনী মুসতালিকের একটি কূপ ছিল। পঞ্চম হিজরী—শাবান মাসে এই কূপের পাশেই মুসলমানগণ বনু মুসতালিকের সঙ্গে যুদ্ধের জন্য তাঁবু ফেলেছিলেন। যেহেতু পূর্বেই বোঝা গিয়েছিল যে, এ যুদ্ধে কোনোরকম রক্তপাত ঘটবে না বা ক্ষয়ক্ষতি হবে না, সেহেতু মুনাফিকরাও নির্ভয়ে অভিযানে অংশগ্রহণ করেছিল। ইবনে সাদ বর্ণনা করেন :

وَ خَرَجَ مَعَهُ بَشَرٌ كَثِيْرٌ مِّنَ الْمُنَافِقِيْنَ لَمْ يَخْرُجُوْا فِيْ غَزْوَةٍ قَطُّ مِثْلُهَا

অর্থ : এই অভিযানে অসংখ্য মুনাফিক শরীক হয়েছিল, যা অন্য কোনো অভিযানে দেখা যায়নি।[১]

সফরসঙ্গিনী হলেন হযরত আয়েশা রাযি.

পূর্বে আলোচিত হয়েছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোনো সফরে বের হতেন, তখন পবিত্র স্ত্রীগণের মধ্যে লটারিতে যার নাম উঠত তিনিই সফরসঙ্গিনী হওয়ার মর্যাদা লাভ করতেন। নিয়মানুসারে বনু মুসতালিকের সফরে হযরত আয়েশা রাযি.-ই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে ছিলেন। যাত্রাকালে প্রিয় ভগ্নি হযরত আসমা রাযি.-এর একটি হার কর্জ হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। হারটি হযরত আয়েশা রাযি.-এর গলায় ছিল। হারের আংটা এত দুর্বল ছিল যে বারবার খুলে যাচ্ছিল। এ সময় হযরত আয়েশা রাযি.-এর বয়স ছিল মাত্র চৌদ্দ বছর। বয়সটাই এমন, যাতে নারীমনে সাধারণ থেকে সাধারণ সাজের জিনিসও অনেক দামি। সাজগোজের ব্যাপারে কোনো ঝামেলাই ঝামেলা নয়। সফরে হযরত আয়েশা রাযি. নিজ হাওদায় আরোহণ করতেন; এরপর হাওদার দায়িত্বে নিয়োজিত সাহাবীগণ হাওদা উটের পিঠে অধিষ্ঠিত করতেন এবং কাফেলা চলতে থাকত। অল্প বয়স এবং পর্যাপ্ত আহারের অভাবে তখন হযরত আয়েশা রাযি. এত হালকা-

---

১. *ইবনে সাদ* : মাগাযি, পৃষ্ঠা : ৪৫।

পাতলা ছিলেন যে, হাওদা-বাহক সাহাবীগণ সাধারণত বুঝতে পারতেন না, ভেতরে কেউ আছে কি নেই।

মুনাফিকদের ষড়যন্ত্রের মানসিকতা

অভিযান থেকে প্রত্যাবর্তনকালে মুনাফিকরা ইতোমধ্যে একাধিকবার কূটচক্রে লিপ্ত হয়। এমনকি, তাদের চক্রান্তে আনসার ও মুহাজির সাহাবীগণ একপর্যায়ে একে অপরের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণেরও উপক্রম হয়। শেষমেশ অনেক কষ্টে সমাধান আসে। এই দুষ্টচক্রই আনসার সাহাবীগণকে ইসলামের পক্ষে আর্থিক সমর্থন প্রত্যাহার করতে প্ররোচিত করেছিল। দুষ্টচক্রের হোতা আবদুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের—কুরআনে বর্ণিত—ধৃষ্টতাপূর্ণ মন্তব্য দেখুন :

لَإِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِيْنَةِ لَيُخْرِجَنَّ الأَعَزُّ مِنْهَا الأَذَلَّ

অর্থ : এবার যদি আমরা মদীনায় ফিরে যেতে পারি তা হলে মদীনার শ্রেষ্ঠজন নিকৃষ্টজনকে বিতাড়িত করবেই করবে। (সূরা মুনাফিকুন, আয়াত : ৮)

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আনসার সাহাবীগণকে একত্র করে বিষয়টি অবহিত করেন। যদিও তারা অপরাধে অংশ নেননি, তবু অনুতপ্ত হলেন। আবদুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের প্রতি তাদের অন্তরে ঘৃণার উদ্রেক হলো। স্বয়ং তার পুত্রই ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে ছুটে গেলেন এবং পিতার ঘোড়ার লাগাম ধরে পিতাকে উদ্দেশ্য করে বললেন—যতক্ষণ আপনি এ কথা স্বীকার না করছেন যে, আপনিই নিকৃষ্টজন এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামই শ্রেষ্ঠজন, ততক্ষণ আপনার নিস্তার নেই।[১]

---

১. *ইবনে সাদ* : মাগাযি, পৃষ্ঠা : ৪৫। *সহীহ বুখারী* ও *ফাতহুল বারী* : তাফসীর —সূরা মুনাফিকুন। *নাসাঈ*-র বক্তব্য অনুযায়ী এটা গাযওয়ায়ে তাবুকের ঘটনা। কিন্তু *সহীহ বুখারী*-তে হযরত জাবের রাযি. থেকে বর্ণিত হাদীস—ওই সময় আনসারের চেয়ে মুহাজির কম ছিলেন—থেকে মতটির খণ্ডন হয়। ইবনে আবি হাতেম-সহ সকল মাগাযি গবেষক একমত যে, এটা গাযওয়ায়ে মুরাইসির ঘটনা। *ফাতহুল বারী* : ৮ম খণ্ড, পৃষ্ঠা : ৭৪০৪।

গলার হারটি হারিয়ে গেল

রাত্রিবেলা একটি অজ্ঞাত জায়গায় যাত্রাবিরতি হয়। রাতের শেষভাগে আবার কাফেলা চলতে আরম্ভ করবে করবে—এমন সময় হযরত আয়েশা রাযি. প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে দূরে চলে গেলেন। প্রয়োজন সারার পর যখন উঠলেন, তখন হঠাৎ গলায় হাত পড়ল। দেখলেন প্রিয় ভগ্নির কাছ থেকে কর্জ নেওয়া হারটি নেই। তিনি চমকে গেলেন। প্রথমত বয়স কম, দ্বিতীয়ত কর্জ করা জিনিস। হযরত আয়েশা রাযি. হতভম্ব হয়ে হারটি খুঁজতে লাগলেন। ভ্রমণের অভিজ্ঞতা ছিল না বললেই চলে। উপরন্তু তিনি ভেবেছিলেন, যাত্রা আরম্ভের পূর্বেই হারটি খুঁজে পাবেন এবং সময়মতো হাওদায় পৌঁছে যাবেন। তাই কাউকে কিছু বলার প্রয়োজনও মনে করলেন না। তিনি না কাউকে ঘটনাটা জানালেন, না তাঁর জন্য অপেক্ষা করার নির্দেশ দিয়ে গেলেন।

কাফেলা চলে গেল

এদিকে হাওদাবাহকগণ নিয়মমাফিক হাওদা উটের পিঠে চড়ালেন এবং কাফেলার সঙ্গে চলতে লাগলেন। হযরত আয়েশা রাযি. অবশ্য অল্পক্ষণের মধ্যেই হারটি পেয়ে গেলেন। কিন্তু ফিরে এসে দেখলেন কেউ নেই, আছে শুধু নির্জনতা-নিস্তব্ধতা। হযরত আয়েশা রাযি. বাধ্য হয়ে সেখানেই চাদর মুড়ি দিয়ে পড়ে রইলেন। ভাবলেন, যখন কাফেলা বুঝতে পারবে, তখন নিশ্চয়ই এখানে ফিরে আসবে।

হযরত সাফওয়ান রাযি. এলেন

সাফওয়ান ইবনে মুআত্তল রাযি. অত্যন্ত বড় মাপের সাহাবী ছিলেন। এই সফরে তিনি সাকাহ হিসেবে নিযুক্ত ছিলেন অর্থাৎ কাফেলা চলাকালে বা যাত্রাবিরতির স্থানে যদি কাফেলার ছোটখাটো কোনো জিনিস পড়ে যায় বা ভুল করে ফেলে যায়, তা হলে সেগুলো দেখেশুনে নেওয়া এবং সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করার দায়িত্ব তাঁর। এজন্য তিনি অনেক পেছনে ছিলেন। কাফেলার পেছনে থেকে যাত্রাপথের সর্বত্র সজাগ দৃষ্টি দিয়ে খোঁজ করছিলেন আর আসছিলেন। তিনি ভোরের দিকে আলোচ্য স্থানে পৌঁছে

গেলেন। দূর থেকে কালো কিছু দেখা যাচ্ছিল। উল্লেখ্য, পর্দার বিধান নাজিল হয়েছে সে বছরই। ইতিপূর্বে তিনি হযরত আয়েশা রাযি.-কে দেখেছেন। তাই একটু কাছে আসতেই বুঝতে পারলেন, ইনি আর কেউ নন, উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা রাযি.। হযরত আয়েশা রাযি. কিছুটা তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়েছিলেন। তাঁকে সজাগ করার জন্য হযরত সাফওয়ান রাযি. উচ্চস্বরে আওয়াজ দিলেন—ইন্না লিল্লাহ! হযরত আয়েশা রাযি. সজাগ ও সতর্ক হলে হযরত সাফওয়ান রাযি. তাঁর উটকে বসালেন এবং অন্যমুখ হয়ে দূরে সরে গেলেন। হযরত আয়েশা রাযি. উটে সওয়ার হলেন। হযরত সাফওয়ান রাযি. এসে উটের রশি ধরে মদীনার পথে চলতে লাগলেন। দুপুরবেলা যাত্রাবিরতি হওয়ায় হযরত সাফওয়ান রাযি. হযরত আয়েশা রাযি.-কে নিয়ে কাফেলায় পৌঁছে গেলেন। তখন হযরত সাফওয়ান রাযি. উটের রশি ধরে ছিলেন আর হযরত আয়েশা রাযি. উটের হাওদায় বসা ছিলেন। ঘটনা খুবই স্বাভাবিক। প্রায় সফরেই এমনটা ঘটে। আজকের রেলগাড়ি-তেলগাড়ির যুগেও এমন ঘটনার সংখ্যা কম নয়।

মুনাফিকদের চক্রান্ত ও অপবাদ

হিন্দুদের সীতার ওপর এবং বনী ইসরাইলের মারইয়াম আ.-এর ওপর যে অগ্নিপরীক্ষা নেমে এসেছিল, ইতিহাসে তারই পুনরাবৃত্তি ঘটল মাত্র। আবদুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের ষড়যন্ত্রের জের তখনো কাটেনি। আল্লাহর পানাহ, সে উম্মুল মুমিনীনের পবিত্রতা নিয়ে প্রশ্ন তুলল। যেখানে-সেখানে যার-তার কাছে অবান্তর সব কথা বলতে লাগল। পবিত্রহৃদয় মুসলিমগণ শোনামাত্রই হতভম্ভ হয়ে কানে আঙ্গুল দিয়ে বলতে লাগলেন—

سُبْحَانَ اللهِ! هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيْمٌ!

আল্লাহ চিরপবিত্র! এ সুস্পষ্ট অপবাদ ছাড়া কিছু নয়।

হযরত আবু আইয়ুব রাযি. তাঁর স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলেন, উম্মে আইয়ুব, যদি তোমার ব্যাপারে কেউ এমন মন্তব্য করত, তবে কি তুমি

মেনে নিতে? তিনি বললেন, আল্লাহ মাফ করুন, কোনো অভিজাত নারীই তা মেনে নিতে পারেন না। হযরত আবু আইয়ুব রাযি. বললেন, হযরত আয়েশা রাযি. তোমার চেয়ে অনেক অনেক বেশি অভিজাত। তা হলে তাঁর পক্ষে এটা মেনে নেওয়া কী করে সম্ভব?

সাফওয়ান রাযি. বনাম হাস্‌সান রাযি. এবং অন্যান্য

মদীনায় আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ছাড়াও আরও তিনজন এই কুচক্রে জড়িয়ে পড়ে : হাস্‌সান ইবনে সাবিত রাযি., হামনা বিনতে জাহশ রাযি. এবং মিসতাহ ইবনে আসাসাহ রাযি.। অথচ প্রথম দুজন সফরে ছিলেনই না।

হযরত হাসসান রাযি.-কে আল্লাহ মাফ করুন, ঘটনার শুদ্ধ্যশুদ্ধি নিয়ে তাঁর মাথাব্যথা ছিল না; বরং হযরত সাফওয়ান রাযি.-এর বদনামই ছিল তার উপভোগ্য বস্তু। কেননা তিনি ঈর্ষান্বিত ছিলেন—উড়ে এসে জুড়ে বসে কেউ তার চেয়ে অধিক সম্মানী হয় কী করে! তাঁর একটি কবিতায়ও সেই মাতমই মেলে :

أَمْسَى الْجَلَابِيْبُ قَدْ عَزُّوْا وَقَدْ كَثُرُوْا * ابْنُ الْفُرَيْعَةِ أَمْسَى بَيْضَةَ الْبَلَدِ

অর্থ : উড়ে এসে জুড়ে বসে নামধামের শেষ নেই
ফারিয়া-তনয় ঘরের ছেলে ভ্রুক্ষেপেরও লেশ নেই।[১]

হযরত হামনা রাযি. উম্মুল মুমিনীন হযরত যায়নাব রাযি.-এর ভগ্নি ছিলেন। তিনি ভেবেছিলেন, এভাবে জল আরও ঘোলা হলে হযরত আয়েশা রাযি.-এর জায়গাটা তার বোনই দখল করবেন।[২] অবশ্য হযরত মিসতাহ রাযি.-এর বিষয়টি আশ্চর্যজনক। কেননা প্রথমত তিনি হযরত আবু বকর রাযি.-এর ঘনিষ্টজন ছিলেন, দ্বিতীয়ত হযরত আবু বকর রাযি.-এর দান-দক্ষিণায়ই ছিল তার জীবিকা-নির্বাহের বাহ্যিক উপায়।

পৃথিবীতে সবচেয়ে স্পর্শকাতর বস্তু হলো সম্ভ্রম। এ তো সেই অমূল্য

---

১. *ইবনে হিশাম* : ইফকের আলোচনা ও দিওয়ানে হাস্‌সান রাযি.।
২. *সহীহ বুখারী* ও *মুসলিম* : ইফকের আলোচনা।

হিরে, যাতে পাথর ছুঁড়তে হয় না; পাথর ছুঁলেও টুকরো টুকরো হয়ে যায়। যদি কোনো দুষ্টচরিত্র লোক কোনো সম্মানী ব্যক্তির ওপর চরম মিথ্যাও আরোপ করে, তবু তিনি লজ্জায় মুখ লুকানোর জায়গা পান না। তিনি হয়তো লজ্জায় পানি হয়ে যান, নয়ত ক্রোধে আগুন হয়ে জ্বলে ওঠেন। ইসলাম ও মুসলমানদের মারইয়াম (হযরত আয়েশা) তখনো ঘটনা সম্পর্কে সম্পূর্ণভাবে অনবহিত ছিলেন। ঘটনাক্রমে কোনো এক রাত্রিতে প্রাকৃতিক প্রয়োজনে হযরত মিসতাহ রাযি.-এর সম্মানিতা মাতাকে সঙ্গে নিয়ে লোকালয়ের বাইরে চলে যান। পথিমধ্যে মিসতাহ রাযি.-এর মা কিছুতে হোঁচট খান। অবচেতন মনে মুখ ফসকে নিজ পুত্রের জন্য বদদুআ বের হয়। হযরত আয়েশা রাযি. বলে ওঠেন—আশ্চর্য, আপনি একজন সম্মানিত সাহাবীকে গালি দিচ্ছেন! মিসতাহ রাযি.-এর মা সব খুলে বললেন। শোনামাত্রই হযরত আয়েশা রাযি.-এর মাথা ঘুরে উঠল। মুহূর্তেই তাঁর পবিত্র হৃদয় যেন ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেল। তিনি অনুভূতিশূন্য হয়ে পড়লেন। ইস্তিঞ্জার প্রয়োজনও ভুলে গেলেন। একেবারে স্তব্ধ হয়ে ঘরে ফিরে এলেন। এত বড় ভয়ঙ্কর কথা বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। মনে হচ্ছিল, এ কোনো দুঃস্বপ্ন হবে। ...অবশেষে মায়ের কাছে গেলেন। মা সান্ত্বনা দিচ্ছিলেন। এমন সময় এক আনসারি সাহাবিয়া এসে পুরো ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ দিয়ে ফেলল। আর সন্দেহের অবকাশ কোথায়? হযরত আয়েশা রাযি. কান্নায় ভেঙে পড়লেন। মাতা-পিতা বুঝিয়েসুঝিয়ে কোনোভাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘরে রেখে গেলেন। এখানে এসে কষ্টের অনুভূতি তীব্র থেকে তীব্রতর হতে লাগল। মানুষের মনে এরকম সময়ে অনেক কল্পনা-জল্পনার উদয় হয়। একটুতেই অনেক কিছু ভেবে ফেলে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাইরে থেকে এসে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাঁর অবস্থা জিজ্ঞেস করেই চলে যেতেন। হযরত আয়েশা রাযি.-এর মনে হলো, তাঁর প্রতি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগের সেই স্নেহানুভূতি, প্রেমাবেগ, গুরুত্ববোধ আর নেই। তিনি অনুমতি নিয়ে পিতৃগৃহে চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন এবং চলেও গেলেন। দিন-রাত চব্বিশ ঘণ্টা শুধু কাঁদতেন আর কাঁদতেন। তিনি বলেন—না চোখের পানি বাঁধ মানত, না চোখে এক ফোঁটাও ঘুম আসত। সম্মানিত পিতা

অত্যন্ত স্নেহ ও মমতার সঙ্গে বোঝাতেন—এত কাঁদলে তোমার কলজে ফেটে যাবে যে! মা সান্ত্বনা দিতেন আর বলতেন—বেটি, যে নারী স্বামীসোহাগা হয়, তাকে এরকম অনেক কষ্টই স্বীকার করতে হয়।

একবার তো অভিমানে তিনি কসম করে বসলেন যে, কুয়ায় ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করবেন।

হযরত সাফওয়ান রাযি. যখন হযরত হাস্‌সান রাযি.-এর নিন্দাকবিতা সম্পর্কে অবগত হলেন, তখন ক্ষোভে আক্ষেপে কসম করে বললেন, আল্লাহর কসম, আমি জীবনে কখনো কোনো নারীকে স্পর্শও করিনি। তিনি ধৈর্য ধারণ করতে পারলেন না। উন্মুক্ত তরবারি হাতে বের হলেন হযরত হাস্‌সান রাযি.-এর খোঁজে। তাকে পেলেই হয়। তিনি ছুটছিলেন আর আবৃত্তি করছিলেন—

تَلَقَّ ذُبَابَ السَّيْفِ مِنِّيْ فَإِنَّنِيْ * غُلَامٌ إِذَا هُجِيْتُ لَسْتُ بِشَاعِرٍ

অর্থ : কথার ছল নয়, বাহুর বল দিয়ে আমার মোকাবেলা করো। আমি বীরযোদ্ধা, কোনো মিথ্যুক-নিন্দুক কপট-কবি নই।

হযরত সাফওয়ান রাযি.-এর উন্মত্ততা দেখে সাহাবা কেরাম তাঁকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে ধরে নিয়ে যান। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর মার্জনার ব্যবস্থা করেন এবং বিনিময়ে হযরত হাস্‌সান রাযি.-কে একটি জায়গির প্রদান করেন।

হযরত আলী রাযি. এবং উসামা রাযি.-এর সঙ্গে পরামর্শ

যদিও উম্মুল মুমিনীনের পবিত্রতা সন্দেহাতীত, তবু দুষ্টচক্রের মুখ বন্ধ করার জন্য তদন্তের আবশ্যকতা ছিল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আলী রাযি. ও হযরত উসামা রাযি.-এর কাছে পরামর্শ চাইলেন। হযরত উসামা রাযি. সান্ত্বনা দিলেন, হযরত আয়েশা রাযি.-এর 'নিষ্কলুষতা' সম্পর্কে নিজের মত প্রকাশ করলেন। হযরত আলী রাযি. বললেন—পৃথিবীতে নারীর অভাব নেই (যদি লোকে কী বলল তার পরোয়া করেন তা হলে তালাক দিয়ে দিন); তা ছাড়া সেবিকাদের জিজ্ঞেস করলে তারা ঠিক ঠিক বলে দেবে।

দাসীর সাক্ষ্যপ্রদান

বিষয়টি যেহেতু একেবারেই কল্পনাতীত ছিল, সেহেতু সেবিকাকে ইঙ্গিতে জিজ্ঞেস করা হলে উত্তর দেওয়া তো দূরের কথা প্রশ্নই বুঝল না। ভাবল, হয়তো সাধারণ ও সাংসারিক বিষয়ে হযরত আয়েশা রাযি. সম্পর্কে জানতে চাওয়া হয়েছে। দাসী উত্তর দিল, তেমন কোনো দোষত্রুটি তো দেখি না, শুধু যখন-তখন ঘুমিয়ে পড়েন আর বকরি এসে খাবার সব সাবাড় করে চলে যায়। অবশেষে স্পষ্ট ভাষায়ই জিজ্ঞেস করা হলো। প্রশ্ন শুনে সেবিকার মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ল। সে হতভম্ব হয়ে বলল—সুবহানাল্লাহ! আল্লাহর কসম, স্বর্ণকার যেমন খাঁটি সোনা চিনে নেয়, আমিও তাঁকে তেমনই চিনে নিয়েছি।

আলী রাযি.-এর প্রতি বনু উমাইয়ার আপত্তি ও নিরসন

কোনো কোনো বর্ণনায় আছে, হযরত আলী রাযি. দাসীকে মেরেছিলেন পর্যন্ত। হযরত আলী রাযি.-এর রুক্ষতায় অনেকে ভেবেছিলেন হযরত আয়েশা রাযি. কষ্ট পেয়ে থাকবেন। উমাইয়া শাসনামলে হযরত আলী রাযি.-এর বিরুদ্ধে যে আপত্তিগুলো উত্থাপিত হয়েছিল তার মধ্যে এটিও একটি। কিন্তু ইমাম যুহরী রহ. যথাসময়ে যথেষ্ট যৌক্তিকতা ও সাহসিকতার সঙ্গেই তার অপনোদন করেছিলেন।

হযরত যায়নাব রাযি.-এর সাক্ষ্যপ্রদান

পবিত্র স্ত্রীগণের মধ্যে একমাত্র হযরত যায়নাব রাযি.-ই হযরত আয়েশা রাযি.-এর সমকক্ষতার দাবি করতেন। আবার কুৎসা-রটকদের মধ্যে তাঁর ছোটবোন হযরত হামনা রাযি.-ও ছিলেন। তাই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকেও বিষয়টি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। তিনিও প্রশ্ন শোনামাত্রই কানে আঙুল দিলেন; যেন এমন কথা শোনাও পাপ। তিনি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলে দিলেন—আল্লাহর কসম, আয়েশা [রাযি.]-এর ব্যাপারে ভালো ছাড়া মন্দ কিছু আমি জানি না।

রাসূলের ভাষণ এবং আওস-খাযরাজ দ্বন্দ্ব

এরপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকল সাহাবীকে মসজিদে নববীতে একত্র করে সংক্ষেপে নবীপরিবারের পবিত্রতা তুলে ধরলেন। আবদুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের নীচতা ও নিকৃষ্টতার কথাও স্মরণ করালেন। এরপর বললেন—হে আমার মুসলমান ভাইয়েরা, এহেন ইতরকে আমার পক্ষ থেকে কে শায়েস্তা করতে পারে, যার ব্যাপারে আমার কাছে সংবাদ পৌঁছেছে যে, সে আমার পরিবারের বিরুদ্ধে মিথ্যা দোষারোপ করে? আওসের গোত্রপতি হযরত সাদ ইবনে মুআয রাযি. দাঁড়িয়ে গেলেন এবং বজ্রকণ্ঠে হুঙ্কার ছেড়ে বললেন—আমি, হে আল্লাহর রাসূল। যদি সে ইতর আমাদের আওস গোত্রের হয়, তা হলে এখনই তার গর্দান উড়িয়ে দেব। আর যদি আমাদের মিত্র খাযরাজ গোত্রেরও হয়, তবু আপনি শুধু আদেশ দিন, আপনার আদেশ শিরোধার্য।

আওস ও খাযরাজের পারস্পরিক বিদ্বেষ ও কথায় কথায় যুদ্ধপ্রবণতা ছিল বংশপরম্পরাগত। ইসলাম সেই অনভিপ্রেত অগ্নিকে নির্বাপিত করেছিল ঠিকই; কিন্তু ছাইয়ের নিচে চাপাপড়া জ্বলন্ত অঙ্গার তখনো ছিল। সামান্য ফুঁৎকারেও সে অঙ্গার দাউদাউ করে জ্বলে উঠত। খাযরাজের গোত্রপতি সাদ ইবনে উবাদা রাযি. আওসের গোত্রপতির উৎসাহকে ধৃষ্টতা জ্ঞান করলেন। তিনি ভাবলেন, আওস গোত্রপতি নিজ গোত্রের ব্যাপারে যা-তা করতে পারেন, বলতে পারেন; কিন্তু অন্য গোত্রের ব্যাপারে নাক গলানোর অধিকার তার নেই। খাযরাজের ব্যাপারে যা বলার খাযরাজ গোত্রপতিই বলবেন, তিনি এ ব্যাপারে কথা বলার কে? তা ছাড়া ঘটনাচক্রে সেই ইতর খাযরাজ গোত্রের সঙ্গেই সম্পর্কিত ছিল। আর হযরত হাস্‌সান ইবনে সাবিত রাযি.-এর মামলা তো মিটেই গেছে। তাই তিনি হযরত সাদ ইবনে মুআয রাযি.-কে সম্বোধন করে বললেন—কিন্তু আপনি তো হত্যা করতে পারবেন না, কারণ সে অধিকার আপনার নেই। সঙ্গে সঙ্গে ইবনে মুআয রাযি.-এর চাচাতো ভাই উসায়েদ ইবনে হুযায়ের রাযি. কথা ধরলেন। তিনি বলে উঠলেন—হে সাদ, এ তো মুনাফিকি! আপনি মুনাফিকদের পক্ষ নিচ্ছেন কী করে? ...ব্যস, গোলমাল পাকিয়ে গেল! তুমুল বাগ্‌বিতণ্ডা থেকে অস্ত্র ধারণের উপক্রম হলো। রাসূল

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সবাইকে চুপ করালেন। আলোচনা এভাবেই সমাপ্তি পেল।

জীবনের সঙ্কটময় মুহূর্তে

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আয়েশা রাযি.-এর ঘরে গেলেন। তিনি উপুড় হয়ে বিছানায় পড়ে থেকে কাঁদছিলেন। নিষ্কলঙ্ক মাতৃমুখ অশ্রুজলে একাকার হয়ে আছে। ডানে-বামে পিতা-মাতা সান্ত্বনার ভাব ও ভাষাপ্রয়োগে ব্যর্থ হয়ে কাঠ হয়ে গেছেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আয়েশা রাযি.-এর পাশে বসলেন। সান্ত্বনার শীতল প্রলেপ বুলিয়ে অত্যন্ত কোমল কণ্ঠে বললেন—আয়েশা, যদি ভুল করে থাক তা হলে তওবা করো, আল্লাহ ক্ষমা করে দেবেন। আর যদি নির্দোষ হও তা হলে আল্লাহই তোমার পবিত্রতা প্রমাণ করবেন।

হযরত আয়েশা রাযি. আশা করলেন, হয়তো মা-বাবা তাঁর হয়ে কিছু বলবেন। কিন্তু তারা কিছুই বললেন না। তিনি বলেন—এমন সঙ্কটময় মুহূর্তে হঠাৎ আমার অশ্রু থেমে গেল। চোখে এক ফোঁটা জলও নেই। নিজের পবিত্রতার প্রতি পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাসে হৃদয় ও আত্মা শান্ত হয়ে গেল। তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথায় অভিমান করে জবাব দিলেন এভাবে—যদি অপরাধ স্বীকার করে নিই, অথচ আল্লাহ ভালো করেই জানেন যে, আমি সম্পূর্ণ নির্দোষ; তা হলে এই মিথ্যা অপবাদের সত্যতা নিয়ে কে সন্দেহ করবে? আর যদি অস্বীকার করি তবে কে-ইবা বিশ্বাস করবে? আমার অবস্থা তো এখন ইউসুফের বাপের মতো (তিনি বলেন—ওই সময় চেষ্টা করেও হযরত ইয়াকুব আ.-এর নাম মনে করতে পারিনি), যিনি বলেছিলেন—

فَصَبْرٌ جَمِيلٌ

এখন ধৈর্যই আমার শ্রেষ্ঠ অবলম্বন।

মুনাফিকরা মূলত কী চেয়েছিল

মৌলিকভাবে যে স্বার্থগুলো চরিতার্থ করার জন্য কপটশ্রেণি আলোচ্য ফেতনার পাঁয়তারা করেছিল সেগুলো হলো :

১. নবী ও সিদ্দীক—এই মহিমান্বিত নামগুলোর অপমান করা।
২. নবীপরিবারে বিভেদ সৃষ্টি করা।
৩. ইসলামের ঐক্য, ভ্রাতৃত্ব ও সামাজিক শক্তিকে খর্ব করা।

এত দিনে মুনাফিরা তাদের উদ্দেশ্যে অনেকটা সফলও হয়েছে। তাদের বিধ্বংসী প্রচেষ্টাগুলো পরিস্থিতিকে যৎপরনাস্তি ঘোলাটে করে দিয়েছে।

পবিত্রতা ঘোষিত হলো পবিত্র কুরআনে

সত্যিই, অদৃশ্য জগতের নিয়ন্তা যিনি, তাঁর প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ আরোপ ছাড়া সঙ্কট থেকে উত্তরণের আর কোনো উপায় ছিল না। এবার সময় হয়েছে—তিনিই কিছু বলার, সাত আসমানের ওপার থেকে উম্মুল মুমিনীনের পবিত্রতা ঘোষণা করার। হযরত আয়েশা রাযি. বলেন—রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর ওহী অবতরণের পরিস্থিতি সৃষ্টি হলো। তিনি মৃদু হাসলেন। তারপর মাথা তুললেন। ললাটে মুক্তো দানার মতো ঘাম চকচক করছিল। তিনি এই আয়াতে কারীমাগুলো তেলাওয়াত করলেন :

إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنْفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُبِينٌ لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا

لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ يَعِظُكُمُ اللَّهُ أَنْ تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَدًا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

অর্থ : নিঃসন্দেহে যারা অপবাদ আরোপ করেছে, তারা তোমাদেরই একটি ক্ষুদ্র দল। বিষয়টিকে তোমরা অনিষ্ট জ্ঞান কোরো না; বরং এ তোমাদের জন্য কল্যাণ। প্রত্যেকের পাপ তার নিজেরই ওপর বর্তাবে। কিন্তু যে হোতা ছিল, তার জন্য রয়েছে মহা শাস্তি। মুমিন-মুমিনারা অপবাদ শুনে নিজেদের ব্যাপারে যদি ভালো ধারণা করত, তবে কত ভালো হতো! কত ভালো হতো, যদি তারা বলত, এ তো সুস্পষ্ট অপবাদ। যারা অপবাদ আরোপ করেছে, তারা অন্তত চারজন সাক্ষী আনুক! তারা তো কোনো সাক্ষী আনতে পারেনি। পারবেও না। কেননা, আল্লাহ জানেন, তারা মিথ্যাবাদী। যদি দুনিয়া ও আখেরাতে তোমাদের প্রতি আল্লাহর করুণা ও অনুগ্রহ না হতো, তা হলে তোমরা যে দোষচর্চা করেছ তাতে বিরাট আজাবে পাকড়াও হতে। যে ব্যাপারে তোমাদের বাস্তবতা জানা নেই, শুধু কানে শুনেই বলে বেড়াতে লাগলে! তোমরা একে তুচ্ছ ভাবলেও আল্লাহর কাছে এটা বিরাট অপরাধ। তোমরা যখন অপবাদটা শুনলে অন্তত এটুকু বলতে পারতে, এ ব্যাপারে আমাদের কিছু বলা যাবে না। আল্লাহ চিরপবিত্র। এটা একটা মহা অপবাদ। আল্লাহ তোমাদের উপদেশ দিচ্ছেন, যদি মুমিন হয়ে থাক, তা হলে আর কখনো এমন কোরো না। যারা মুমিনদের মধ্যে পাপাচার ছড়াতে চায়, তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। দুনিয়াতে এবং আখেরাতে। আল্লাহ জানেন। তোমরা জানো না। (সূরা নূর, আয়াত : ১১-১৯)

إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

অর্থ : নিঃসন্দেহে যারা সতীসাধ্বী ভোলাভালা মুমিনাদের ওপর অপবাদ আরোপ করে, তারা দুনিয়াতেও অভিশপ্ত, আখেরাতেও অভিশপ্ত। তাদের জন্য রয়েছে বিরাট আজাব। যেদিন তাদের হস্তপদ, তাদের জিহ্বা তাদের বিরুদ্ধে তাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে সাক্ষ্য দেবে। (সূরা নূর, আয়াত : ২৩-২৪)

জনমদুখিনী মায়ের বুক ভরে গেল, আনন্দে অশ্রুসজল হলেন, বললেন—যাও মা, পবিত্র জীবনসঙ্গীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো। হযরত আয়েশা রাযি. নারীসুলভ অভিমানের সঙ্গে বললেন—আমি কেবল আমার আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ হতে পারি, অন্য কারও অনুগ্রহের পাত্রী আমি নই।

এরপর অপবাদআরোপকারী ওই তিন অপরাধীকে ঐশী বিধান মোতাবেক আশিটা করে চাবুকাঘাত করা হলো।[১] পরবর্তীতে হযরত হাস্‌সান রাযি. হযরত আয়েশা রাযি.-এর সম্মানে বেশ কিছু কবিতা রচনা করেছিলেন—বলা যায়, কাফফারাস্বরূপ। ইবনে ইসহাক সীরাতে সেই কবিতা-পঙ্‌ক্তিগুলোর উল্লেখ করেছেন। *বুখারী শরীফে* এসেছে—হযরত হাস্‌সান রাযি. স্বরচিত কয়েকটি পঙ্‌ক্তি হযরত আয়েশা রাযি.-কে শুনিয়েছিলেন। তিনি যখন নিম্নোক্ত পঙক্তিটি বলেছিলেন-

حَصَانٌ رَزَانٌ مَا تُزَنُّ بِرِيْبَةٍ * وَتُصْبِحُ غَرْثَى مِنْ لُحُوْمِ الْغَوَافِلِ

১. সবগুলো ঘটনা *সহীহ বুখারী* ও *সহীহ মুসলিম*—তাওবা অধ্যায়ে সবিস্তারে আলোচিত হয়েছে। ইমাম বুখারী রহ. বিশদ ও সংক্ষিপ্তাকারে বিভিন্ন জায়গায় বর্ণনাগুলোকে তুলে ধরেছেন। কিতাবুশ শাহাদাহ, কিতাবুল জিহাদ, তাফসীর—সূরা নুর, গাযওয়ায়ে বনু মুসতালিক ইত্যাদি অংশে বিশদ বিবরণ আছে। অতিরিক্ত তথ্য—যেগুলো অন্যান্য হাদীসগ্রন্থে এসেছে, *ফাতহুল বারী*—সূরা নুরের তাফসীর থেকে নেওয়া হয়েছে। বাহ্যত স্ববিরোধী তথ্যোপাত্তের সমন্বয়, ঘটনাপ্রবাহের ধারাবিন্যাস, অর্থ ও মর্মের শুদ্ধ্যশুদ্ধি—ইত্যাদি বিষয়ে হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী রহ.-এর অনুসরণ করা হয়েছে।

অর্থ : তিনি পবিত্র, ধৈর্যশীলা, নিষ্কলঙ্ক-নির্দোষ। সরলা নারীকে দোষারোপ করা থেকে অনেক উর্ধ্বে।[১]

তখন হযরত আয়েশা রাযি. বলেছিলেন—সত্য বলেছ, কিন্তু তুমি এমন মানুষ ছিলে না। অপবাদ আরোপের ক্ষেত্রে তার জড়িত থাকার বিষয়ে ইঙ্গিত করতেই হযরত আয়েশা রাযি. কথাটি বলেছিলেন।

উইলিয়াম মেইবারের বক্তব্য এবং কিছু কথা

স্যার উইলিয়াম মেইবার *লাইফ অব মুহাম্মাদ* গ্রন্থে ইফকের ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে আশ্চর্য ও অদ্ভুত সব ঐতিহাসিক ও সাহিত্যগত ভুলের শিকার হয়েছেন। আমার এ গ্রন্থের সঙ্গে যেসব ভুলের কোনো সম্পর্ক নেই, সেগুলোর সমালোচনা করারও প্রয়োজন নেই। তবে দু-একটি ভুলের উদাহরণ উল্লেখ না করলেই নয়। তিনি বর্ণনা করেছেন :

'বনু মুসতালিকের বিরুদ্ধে প্রেরিত অভিযান মদীনায় ফিরে এলে হযরত আয়েশার হাওদা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে মসজিদে নববীর দরজা বরাবর অধিষ্ঠিত করা হয়। কিন্তু কোনো সাড়াশব্দ না পেয়ে হাওদা উন্মুক্ত করে দেখা গেল ভেতরে কেউ নেই। একটু পরেই সাফওয়ান নামক জনৈক মুহাজির লোকসম্মুখে এলেন। উটের ওপর ছিলেন আয়েশা আর আগে আগে আসছিলেন সাফওয়ান।'

স্যার উইলিয়াম মেইবার আরও আগে বেড়ে লিখেছেন :

'সাফওয়ান অনেক তড়িঘড়ি করেও কাফেলাকে ধরতে অসমর্থ হয়েছিলেন। তাই কাফেলা অবতরণের পর তাঁবু গেড়ে ফেললে আয়েশা সাফওয়ানের পথ-নির্দেশে জনসমক্ষে মদীনায় প্রবেশ করেন।'

উপর্যুক্ত দুটো বর্ণনাই হাদীস ও সিয়ারের সমস্ত গ্রন্থের সঙ্গে সাংঘর্ষিক। তিনি যে চিত্রটি তুলে ধরতে চেয়েছেন তাতে তার অসৎ উদ্দেশ্যই প্রতীয়মান হয়। কেননা সকল প্রামাণ্যগ্রন্থ প্রমাণ করে যে, হযরত সাফওয়ান রাযি. কয়েক ঘণ্টা পর দুপুরের দিকে কাফেলাকে ধরতে সক্ষম হয়েছিলেন। বস্তুত এ মদীনার কথাই নয়।

---

১. *সহীহ বুখারী* : কিতাবুত তাফসীর, ক্রম : ৪৭৫৫।

অপবাদ আরোপের বিষয়ে হযরত হাস্‌সান রাযি.-এর অতি উৎসাহ সাহাবা কেরামকে মর্মাহত করেছিল। তাঁরা হযরত হাস্‌সান রাযি.-কে সর্বদা ঘৃণা ও নিন্দার সঙ্গে স্মরণ করতে শুরু করেছিলেন। কিন্তু হযরত আয়েশা রাযি. তাকে কখনোই কিছু বলতে যাননি। অগোচরেও কিছু বলে ফেলেননি; বরং কেউ মন্দ কিছু বললে তিনি বাধা দিতেন।[১]

এর কারণও *সহীহ বুখারী* ও *সহীহ মুসলিমে* বিবৃত হয়েছে। হযরত হাস্‌সান রাযি. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ থেকে কাফেরদের নিন্দাকবিতার সক্ষম জবাব দিতে পারতেন। এটাই ছিল তাঁর প্রতি হযরত আয়েশা রাযি.-এর ধৈর্য ও ঔদার্যপ্রদর্শনের একমাত্র কারণ। কিন্তু তেরোশো বছর পর নতুন যুগে নতুন ঐতিহাসিক ও নতুন গবেষক বের হয়েছেন নতুন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে! স্যার উইলিয়াম মেইবার লিখেছেন :

'হাস্‌সান অবস্থা প্রতিকূল বুঝে কাব্যের গতি পাল্টালেন। তিনি অতি চমৎকার কবিতা রচনা করলেন। তাতে আয়েশার পবিত্রতা, সৌন্দর্য, বুদ্ধিমত্তা, নিখুঁত কমনীয় দেহের প্রশংসা ছিল। তোষামোদে ভরা স্তুতিকাব্য আয়েশা ও হাস্‌সানের মনোমালিন্য দূরীকরণে কার্যকর ভূমিকা পালন করল।'

যদি বৃটেনের 'মহামতি' প্রাচ্যবিদ দয়া করে আমাদেরকে বলতেন যে, স্তুতিকাব্যের কোন পঙক্তিতে হযরত আয়েশা রাযি.-এর সৌন্দর্য, বুদ্ধিমত্তা ও নিখুঁত কমনীয় দেহের কথা আছে! হয়তো নতুন যুগের নতুন গবেষকের এও জানা নেই যে, হযরত আয়েশা রাযি.-কে যখন হযরত হাস্‌সান রাযি.-এর স্তুতিকাব্য শোনানো হয়েছিল, তখন তাঁর বয়স প্রায় চল্লিশ বছর হয়ে গিয়েছিল। তখন তাঁর শরীর নিখুঁত কমনীয় কেমন করে হয়? পনেরো-ষোলো বছর বয়সেই তো তাঁর শরীর ভারী হয়ে গিয়েছিল![২]

স্যার উইলিয়াম মেইবারের প্রাচ্য-পণ্ডিতি ও আরবী ভাষাজ্ঞানের আরও অদ্ভুত ও হাস্যকর উদাহরণ আছে। তিনি লিখেছেন : 'আলোচ্য পঙক্তিতে হযরত আয়েশার দেহসৌষ্ঠব স্তাবকতা লাভ করেছে। নিখুঁত

---

১. *সহীহ বুখারী* : তাফসীর—সূরা নুর। মানাকিবে হাস্‌সান রাযি.।

২. *সুনানে আবু দাউদ* : باب السبق على الرجل।

কমনীয় দেহের প্রতি যেহেতু তার ভীষণ গর্ব ছিল, সেহেতু পঙ্‌ক্তিটি শুনে তিনি অতিমাত্রায় উৎসাহিত হয়ে পড়েন। এমনকি উৎসাহের আতিশয্যে কবিকে থামিয়ে গর্ব করে বলেন—কিন্তু তুমি তো এমন নও।'

আমরা ইসলামের ইতিহাসের নথিপত্র, দলিল-দস্তাবেজ একটিও ঘাঁটা বাকি রাখিনি। কিন্তু কোথাও হযরত আয়েশা রাযি.-এর এমন মানসিকতার পরিচয় পাইনি। তাঁর দেহসৌষ্ঠব স্তাবকতা লাভ করেছে এমন উদাহরণও খুঁজে বের করা আমাদের জন্য অসম্ভব প্রমাণিত হয়েছে। অগত্যা স্বয়ং স্যার উইলিয়ামের লিখিত বক্তব্য নিয়েই ঘাঁটাঘাঁটি শুরু করি। শেষমেশ দেখা গেল, ভুত সর্ষের ভেতরই। আসলে এ কোনো আরব্য বিবরকের বর্ণনাগত ত্রুটি নয়; বরং ইউরোপের শ্রেষ্ঠ আরবী-ভাষাবিজ্ঞানী স্যার উইলিয়ামের জ্ঞানগত ত্রুটি। গোলমাল পাকিয়েছে হযরত হাস্‌সান রাযি.-এর স্তুতিকাব্যের একটি পঙক্তি :

وَتُصْبِحُ غَرْثَى مِنْ لُحُوْمِ الْغَوَافِلِ

অর্থ : তিনি সরলা নারীর 'গোশত খান না'।[১]

আরবী বাগধারায় 'কারও গোশত ভক্ষণ করা' কথাটি পশ্চাতে তার গীবত করা, সমালোচনা করা, দোষচর্চা করা, অপবাদ আরোপ করা ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত। হযরত হাস্‌সান রাযি.-এর উদ্দেশ্য ছিল এ কথা বলা যে, হযরত আয়েশা রাযি. কখনো কোনো নারীর গীবত ও দোষচর্চা করতেন না। এ কথা শুনে হযরত আয়েশা রাযি. দুঃখ করে বলেছিলেন—কিন্তু হে হাস্‌সান, তুমি তো এমন নও। অর্থাৎ তুমি ভোলাভালা সহজ সরল নারীর গীবত ও দোষচর্চায় লিপ্ত হয়েছিলে। তিনি ইফকের ঘটনায় হযরত হাস্‌সান-এর জড়িত থাকার প্রতি ইঙ্গিত করার জন্য এ কথা বলেছিলেন। এতে উম্মুল মুমিনীনের মনের কোণে লুকিয়ে থাকা সুপ্ত ব্যথা ও বেদনাই ফুটে উঠেছে। তাঁর কথার অর্থ আদৌ এটা ছিল না, আমি চিকন-চাকন সুন্দর; কিন্তু তুমি মোটাসোটা অসুন্দর—নাউজুবিল্লাহ। এমন মুর্খসুলভ অদ্ভুত পণ্ডিতি ইউরোপের আজব দেশের আজব লোকেরা দেখাতেই পারেন!

---

১. *সহীহ বুখারী* : কিতাবুত তাফসীর।

কিন্তু তারপরও স্যার উইলিয়াম মেইবারের প্রতি আমাদের এজন্য কৃতজ্ঞ থাকা উচিত যে, উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা রাযি.-এর প্রতি যে অপবাদ আরোপিত হয়েছিল তার অসারতা তিনি নিজেও অস্বীকার করতে পারেননি। আলোচনার যবনিকায় তিনিও লিখেছেন—

'হযরত আয়েশার পূর্বাপরের জীবনচরিত আমাদের আশ্বস্ত করে যে, তিনি সম্পূর্ণই নির্দোষ ছিলেন।'

তায়াম্মুমের বিধান

অন্য আরও একটি সফরে হযরত আয়েশা রাযি. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গলাভে ধন্য হয়েছিলেন। এই সফরেও ওই হারটিই গলায় ছিল। কাফেলা ফেরার পথে যখন যাতুল জায়শ নামক স্থানে পৌঁছল, তখন হারটি গলা থেকে কোথাও পড়ে গেল। পূর্বের তিক্ত অভিজ্ঞতা উম্মুল মুমিনীন রাযি.-কে যথেষ্ট সচেতন করেছে। তিনি বিষয়টি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে অবহিত করলেন।[১] ভোর হতে সামান্য সময় বাকি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাত্রাবিরতির নির্দেশ দিলেন এবং একজন সাহাবীকে উম্মুল মুমিনীনের হারানো হারটি খুঁজতে পাঠালেন। ঘটনাচক্রে যেখানে যাত্রাবিরতি দেওয়া হলো, সেখানে পানি বলতে কিছু ছিল না। ফজরের সময় হয়ে গেল। সাহাবা কেরাম ঘাবড়ে গিয়ে হযরত আবু বকর রাযি.-এর কাছে আরজ করলেন, হযরত আয়েশা রাযি. আমাদের এ কোন বিপদে ফেলে দিলেন। হযরত আবু বকর রাযি. সোজা হযরত আয়েশা রাযি.-এর কাছে চলে গেলেন। দেখলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আয়েশা রাযি.-এর কোলে মাথা রেখে বিশ্রাম করছেন। মেয়েকে লক্ষ্য করে বললেন—কী হলো তোমার, প্রতিদিন কোনো না কোনো ঝামেলা বাধিয়েই থাক! তিনি ক্রোধবশত হযরত আয়েশা রাযি.-এর বাহুতে সজোরে খোঁচা মারলেন। কিন্তু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিশ্রামে ব্যাঘাত ঘটবে দেখে তিনি (আয়েশা রাযি.) একটুও নড়লেন না।

---

১. *মুসনাদে আহমদ* : ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা : ৩৭২।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘুম থেকে জাগ্রত হলেন এবং সমস্যাটি অবগত হলেন। ইসলামের যাবতীয় বিধানের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য এই যে, তা সবসময়ই কোনো না কোনো ঘটনাকে কেন্দ্র করে অবতীর্ণ হয়। ইসলামে নামাযের জন্য ওযু করা ফরজ। কিন্তু এমন হওয়া অস্বাভাবিক নয় যে, কোনো একস্থানে ওযুর জন্য পানির কোনো ব্যবস্থা নেই। এমতাবস্থায় কী করা উচিত, সে দিক-নির্দেশনা দেবার জন্যই মহান আল্লাহর ঐশী ইশারায় এই প্রেক্ষাপটের অবতারণা। ওহী এল :

وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا

অর্থ : আর যদি তোমরা অসুস্থ হও, কিংবা সফরে থাক, কিংবা ইস্তিঞ্জা থেকে আস, কিংবা স্ত্রীসহবাস কর, কিন্তু পানি না পাও, তবে পবিত্র মাটিতে তায়াম্মুম করো—তা দিয়ে তোমরা তোমাদের মুখমণ্ডল ও হস্তযুগল মাসেহ করো। নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল ও মার্জনাকারী। (সূরা নিসা : ৪৩)

হযরত আবু বকর রাযি. আনন্দিত হলেন

সাহাবা কেরামের অবসাদগ্রস্ত মুজাহিদবাহিনী, যারা ওযুর পানির অভাবে হতভম্ব হয়েছিলেন, মহান আল্লাহর করুণাধারায় সিক্ত হয়ে তাজা হয়ে উঠলেন। তাঁদের সব ক্লান্তি-অবসাদ নিমিষেই দূর হয়ে গেল। হর্ষে আনন্দে কৃতজ্ঞতাস্বরূপ সম্মানিতা মাতার জন্য কল্যাণ ও বরকতের দুআ করতে লাগলেন। হযরত উসায়েদ ইবনে হুযায়ের রাযি. অত্যন্ত বড় মাপের সাহাবী ছিলেন। আনন্দের আতিশায্যে তিনি চিৎকার করে বলে উঠলেন—সিদ্দীক পরিবার ওহে, ইসলামে এ তোমাদের প্রথম দান নহে।[১] সিদ্দীকে আকবর রাযি.—যিনি একটু আগেও নয়নমণিকে

১. সবগুলো ঘটনা *সহীহ বুখারী* : বাবুত তায়াম্মুম-এ এসেছে।

শিষ্টাচার শেখানোর জন্য অস্থির হয়ে উঠেছিলেন—ছুটে গেলেন প্রিয়তমা কন্যার কাছে। বুকভরা গর্ব নিয়ে আবেগাপ্লুত কণ্ঠে ডাক দিয়ে বললেন—আমার কলিজার টুকরা, তুমি যে এত কল্যাণী, এত বরকতময়ী, তা আমার জানা ছিল না। আল্লাহ তোমার ওসিলায় মুসলমানদের কত আসানি ও সহজতা দান করেছেন![১]

অবশেষে যাত্রাবিরতির সমাপ্তি টেনে উটকে উঠানো হলো। দেখা গেল, উম্মুল মুমিনীনের মহিমান্বিত হারটি ওখানেই পড়ে আছে।[২]

---

১. *মুসনাদে আহমদ* : ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা : ৩৭৩।
২. *সহীহ বুখারী* : বাবুত তায়াম্মুম।

তাহ্‌রীম, ঈলা ও তাখঈর

তাহ্‌রীমের ঘটনা

পূর্বে আলোচিত হয়েছে, পবিত্র স্ত্রীগণ দুটো পাড়ায় বাস করতেন। একটাতে হযরত আয়েশা রাযি., হযরত হাফসা রাযি., হযরত সাওদা রাযি. এবং হযরত সাফিয়্যা রাযি.। আর অন্যটাতে হযরত যায়নাব রাযি. ও অন্যান্য স্ত্রীগণ।

সাধারণত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসরের নামাযের পর পবিত্র স্ত্রীগণের কাছে যেতেন এবং সবাইকেই একটু একটু করে সময় দিতেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পবিত্র স্ত্রীগণের মধ্যে সমতা রক্ষার ব্যাপারে ছিলেন অত্যন্ত তৎপর। কখনো কোনো বিষয়ে কারও প্রতি যেন বিন্দুমাত্র কমবেশি না হয়, সেজন্য খুবই সতর্ক থাকতেন। তা সত্ত্বেও একবার এমন ঘটল যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লাগাতার কয়েকদিন হযরত যায়নাব রাযি.-এর পাড়ায় বিকেলবেলা একটু বেশি সময় দিচ্ছিলেন; অথচ নির্ধারিত সময়ে অন্যান্য স্ত্রীগণ অপেক্ষায় থাকেন। হযরত আয়েশা রাযি. খোঁজ নিয়ে জানতে পারলেন, হযরত যায়নাব রাযি.-কে তাঁর কোনো কাছের মানুষ কিছু মধু হাদিয়া দিয়েছেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেহেতু মধু খুব পছন্দ করেন, তাই তিনি মধু দিয়ে তাঁর আপ্যায়নের ব্যবস্থা করেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই মধু ফিরিয়ে দিতে পারেন না বলেই গমনাগমনের সময়সূচি এভাবে ব্যাহত হচ্ছে।

হযরত আয়েশা রাযি. বিষয়টি হযরত হাফসা রাযি. ও হযরত সাওদা রাযি.-এর কাছে উত্থাপন করলেন—এ ব্যাপারে কী করা যায়? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন অত্যন্ত পরিচ্ছন্নতাপ্রিয়। সামান্য দুর্গন্ধও পছন্দ করতেন না।[১] মৌমাছি যেই ফুল থেকে মধু সংগ্রহ করে, মধুতে সেই ফুলের স্বাদ ও গন্ধ থাকে। আরবে মাগাফির নামক এক প্রকার ফুল ছিল। সেই ফুলের গন্ধে নাবিযের মতো সামান্য ঝাঁঝ হতো। হযরত আয়েশা রাযি. দুজনকেই বোঝালেন, যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসবেন তখন তাঁরা প্রত্যেকেই যেন জিজ্ঞেস করেন—হে আল্লাহর রাসূল, আপনার মুখে গন্ধ কীসের? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলবেন, মধু পান করেছি। তারা বলবেন, সম্ভবত তা মাগাফিরের। ...এবং এমনটাই ঘটল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অন্তরে মধুর প্রতি ঘৃণা জন্মাল। তিনি আর মধু পান করবেন না শপথ করলেন।

যদি এ কোনো সাধারণ মানুষের বিষয় হতো, তা হলে কোনো কথা ছিল না। কিন্তু এ তো এক শাশ্বত ধর্মের মহান প্রবর্তকের বিষয়, যাঁর প্রতিটি আচরণ ও উচ্চারণকে কেন্দ্র করে নির্ধারিত হবে অসংখ্য বিধান। তাই মহান আল্লাহ তাঁকে ভর্ৎসনা করলেন। অবতীর্ণ হলো সূরা তাহরীমের প্রথম কয়েকটি আয়াত :

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ

অর্থ : হে নবী, স্বয়ং আল্লাহ আপনার জন্য যা হালাল করে দিয়েছেন তা শুধু পত্নীদের মনোরঞ্জনের জন্য হারাম করে নিচ্ছেন? আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ার্দ্র। আল্লাহ তোমাদের শপথের কাফফারা নির্ধারণ করে দিয়েছেন। তিনি তোমাদের মনিব। তিনিই সর্বজ্ঞ, মহাপ্রজ্ঞাময়। (সূরা তাহরীম, আয়াত : ১-২)

আবার ওই দিনগুলোতেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত

১. *মুসনাদে আহমদ* : ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা : ২৪৯।

হাফসা রাযি.-কে কোনো কথা গোপন করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু হযরত হাফসা রাযি. বিষয়টি হযরত আয়েশা রাযি.-এর সঙ্গে আলোচনা করেন। এ প্রসঙ্গেই কুরআনে কারীমে পরবর্তী আয়াতে এসেছে :

وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَٰذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ

অর্থ : যখন নবী তাঁর কোনো পত্নীকে একটি কথা গোপন করতে বললেন, কিন্তু পত্নী তা আরেকজনকে জানিয়ে দিল, আর আল্লাহও নবীকে এ বিষয়ে সতর্ক করে দিলেন, তখন নবী তাঁর সেই পত্নীর কাছে তার ক্রটির কথা ব্যক্ত করলেন আর কিছু কথা এড়িয়ে গেলেন। পত্নী অবাক হয়ে জানতে চাইল, কে আপনাকে এসব অবহিত করল? নবী বললেন, আমাকে অবহিত করেছেন সেই সত্তা, যিনি সর্ব বিষয়ে জ্ঞাত, যিনি সর্ব বিষয়ে অবহিত। (সূরা তাহরীম, আয়াত : ৩)

এরপরের আয়াতে আল্লাহ সেই পত্নীদ্বয়কে সম্বোধন করে বলছেন—

إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا وَإِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَٰلِكَ ظَهِيرٌ

অর্থ : যদি তোমরা দুজনে আল্লাহর কাছে তওবা করো (তা হলে ক্ষতি নেই); কেননা (তওবা করার দ্বারা) তোমাদের হৃদয় তো আল্লাহমুখী হয়েই গেল। আর যদি তোমরা জোটবদ্ধ থেকেই যাও, তা হলেও (হে মুনাফিকের দল, এতে উৎফুল্ল হবার কিছু নেই; কেননা) স্বয়ং আল্লাহ তাঁর মনিব। আর জিবরীল, বিশ্বাসীগণ, সৎ বান্দাগণ আর আমার ফেরেশতাকুল তাঁর সহায়ক হিসেবে তো আছেনই। (সূরা তাহরীম, আয়াত : ৪)

এখন প্রশ্ন হলো, কী এমন রহস্য ছিল যা গোপন করার জন্য এত কঠোরতার প্রয়োজন! *সহীহ বুখারী*তে আছে, গোপনীয় বিষয়টি ছিল

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক মধুর মতো উৎকৃষ্ট বস্তুকে নিজের ওপর হারাম করে নেওয়া। সনদের বিচারে বিশুদ্ধ নয় এমন কিছু বর্ণনায় আছে—[১]রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মারিয়া নাম্নী এক দাসী ছিল। তিনি হযরত আয়েশা রাযি. ও হযরত হাফসা রাযি.-কে খুশি করার জন্য সেই দাসীকে নিজের জন্য হারাম করে নিয়েছিলেন এবং হযরত হাফসা রাযি.-কে বলেছিলেন, কথাটা যেন নিজের কাছেই সীমাবদ্ধ রাখেন, হযরত আয়েশা রাযি.-কে না জানান। কিন্তু হযরত হাফসা রাযি. রাসূলের কথা রাখতে ব্যর্থ হন এবং হযরত আয়েশা রাযি.-কে জানিয়ে দেন। এ প্রসঙ্গেই আয়াতে কারীমাটি নাজিল হয়।

কিন্তু ভাববার বিষয় হলো, গোপনকৃত বিষয়টি দ্বারা হযরত আয়েশা রাযি.-সহ আরও কোনো স্ত্রীকে খুশি করার অভিপ্রায় ছিল। কেননা কুরআনে এসেছে : হে নবী, স্বয়ং আল্লাহ আপনার জন্য যা হালাল করে দিয়েছেন তা শুধু পত্নীদের মনোরঞ্জনের জন্য হারাম করে নিচ্ছেন? সুতরাং যদি স্ত্রীদের খুশি করার জন্যই তিনি কিছু হারাম করে নিয়ে থাকেন, তা হলে সেটা তাদের থেকে গোপন করার অর্থ কী? বিষয়টি জানলেই না তারা খুশি হবেন! একটি বিষয় আরও ভাবিয়ে তোলে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের ওপর যেটা হারাম করেছিলেন, সেটা আদৌ মধু জাতীয় কোনো সাধারণ পদার্থ কি না। কেননা সনদের বিচারে বর্ণনাটি বিশুদ্ধ হলেও সেটা শুধু হযরত হাফসা রাযি.-এর চাহিদা ছিল। অথচ আয়াতের দাবি অনুসারে কমপক্ষে তিনজনের চাহিদা অনুযায়ী রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমনটা করে থাকবেন। কেননা কুরআনে বহুবচন ব্যবহৃত হয়েছে। আরবী ভাষায় বহুবচন সর্বনিম্ন তিনটি সংখ্যার ধারণা দেয়। আরও ভাবা দরকার, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো পানীয় বর্জনের শপথ করলেন, বা কোনো দাসীকে নিজের ওপর হারাম করে নিলেন, এতে কী এমন ঘটে যে ভূলোক-দ্যুলোকের মানব-দানবের সহায়তা নেওয়ার আবশ্যকতা হবে! রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদি মধু পান না করেন, বা কোনো দাসীর কাছে না যান, তা হলে লোকজন আপনা-আপনিই জেনে যাবে যে

---

১. পূর্ববর্তী মুহাদ্দিসগণ স্পষ্টতই ব্যক্ত করেছেন যে, রেখাযুক্ত এই বর্ণনাটি সহীহ সনদে সাব্যস্ত নয়।

তিনি এমনটা করেছেন। যেমন আরবরা শুশুক খেত, কিন্তু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়সাল্লাম তা অপছন্দ করতেন। অসংখ্য বর্ণনা থেকে জানা যায়, তিনি দু-একজন স্ত্রীকে তালাকও দিয়েছিলেন, অথবা তালাকের কথা বলেছিলেন; কিন্তু এগুলো কোনোটাই এভাবে গোপন করার মতো ছিল না।

যারা কুরআনে কারীমের ভাব ও ভাষা সম্পর্কে সম্যক ধারণা রাখেন, যাদের আরবী ভাষার বাগ্‌বৈচিত্রে ব্যুৎপত্তি আছে, তারা অবশ্যই জানেন যে, إذ শব্দটির পর সবসময় নতুন সুরে নতুন বিষয়ের অবতারণা হয়। আগের আয়াত পর্যন্ত অবশ্যই নবী কর্তৃক কোনো হালাল বস্তুকে নিজের ওপর হারাম করার কথা এসেছে। কিন্তু إذ থেকে যে গোপনীয় বিষয়ের কথা বলা হয়েছে, তা অন্য কিছু। খোদ কুরআনেই যা বিবৃত হয়েছে অপর আয়াতে। সেটি হলো পবিত্র স্ত্রীগণের মধ্যে দু-একজন সদস্যের একাত্মতা ও জোটবদ্ধতা। *সহীহ মুসলিম*কে সামনে রাখলে বিষয়টি বিশদভাবে জানা যায়।

মদীনার মুনাফিকদের শঠতা, কপটতা ও নিকৃষ্টতার কথা কে না জানেন। যে কোনো ইস্যুতে নতুন ষড়যন্ত্রে মেতে ওঠা তাদের পক্ষে অস্বাভাবিক নয়। সুতরাং পবিত্র স্ত্রীগণের মধ্যে দু-একজনের জোটবদ্ধতার কথা যদি তারা জানতে পারে, তা হলে এই বিষয়টাকে কাজে লাগিয়ে তারা যে কোনো বড় ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হবে না, তার কী নিশ্চয়তা আছে? বরং সেটাই স্বাভাবিক। এটা শুধু যুক্তি-ই নয়, কুরআন থেকেও প্রমাণিত। উল্লিখিত আয়াতের তাৎপর্যও এটাই।

পরবর্তী আয়াতগুলোতে ঘটনার প্রেক্ষিতে মুসলমানদের উপদেশ দেওয়া হয়, তারা যেন স্ত্রী-সন্তানের মায়া-মোহে সত্য ও ন্যায় থেকে বিচ্যুত না হয়। এরপর বলা হয় :

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ

অর্থ : হে নবী, কাফের ও মুনাফেকদের সঙ্গে মোজাহাদা ও কঠোরতা করুন। তাদের ঠিকানা জাহান্নাম। কত নিকৃষ্ট তাদের পরিণতি। (সূরা তাহরীম, আয়াত : ৯)

শুধু এ-ই নয়, পুনরায় নবীকে সম্বোধন করে হযরত নূহ আ. এবং হযরত লূত আ.-এর স্ত্রীদের দৃষ্টান্ত তুলে ধরা হয়। তারা সত্যের অনুকূলে আসেনি বলে কি নবীদের দাওয়াতি কার্যক্রম থেমে থেকেছিল? বা কোনো ত্রুটি হয়েছিল? তা হলে নবীপরিবারের দু-একজন সদস্যের সাময়িক আনুকূল্য-লাভে—অর্থাৎ তাদের জোটবদ্ধতার বিষয়টিকে কাজে লাগিয়ে—মুনাফিকরা আর কীবা করতে পারবে? এই অনুমানের শুদ্ধতা পবিত্র কুরআনের আরও একটি আয়াত থেকে প্রতিভাত হয়, যা অনেকটা এই ঘটনার প্রেক্ষিতেই নাজিল হয়েছিল।[১] ইরশাদ হচ্ছে :

وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ

অর্থ : আর যখন স্বস্তি বা ভীতির কোনো সংবাদ মুনাফিকরা পায়, তখন (যেখানে সেখানে অসৎ উদ্দেশ্যে) ছড়িয়ে বেড়ায়। অথচ যদি তারা রাসূলের কাছে, বিচক্ষণ ব্যক্তিদের কাছে তা উত্থাপন করত, তা হলে অবশ্যই যারা বোঝার, বুঝে যেত। (সূরা নিসা, আয়াত : ৮৩)

কিছু ভ্রান্তি ও নিরসন

দ্বিতীয় আয়াতের তাফসীরে কতিপয় তাফসীরকার ভুলের মধ্যে আছেন। তাদের তাফসীর অনুযায়ী আয়াতটির তরজমা দাঁড়ায়—আর যদি তোমরা আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন কর (তাহলে এটা খুবই জরুরি); কেননা তোমাদের হৃদয় বক্র হয়ে গিয়েছে। কিন্তু যদি তোমরা জোটবদ্ধ থেকেই যাও, তা হলে আল্লাহই তাঁর নবীর মনিব।...

রেখাযুক্ত তরজমাটি সম্পূর্ণ ভুল। এটা স্পষ্ট যে, বাক্যটি শর্তসাপেক্ষ। আরবী ভাষায় এ ধরনের বাক্যের পরবর্তী অংশ উহ্য

১. *সহীহ মুসলিম* : বাবুল ঈলা।

থাকে। উহ্য বাক্যটি নির্ণিত হয় পূর্বাপরের আবহ থেকে। আমরা সেই উহ্য বাক্যটি নির্ধারণ করেছি—لَا بَأْسَ (কোনো ক্ষতি নেই)। কিন্তু অনেকে উহ্য বাক্য ধরেছেন—فَهُوَ وَاجِبٌ (এটা জরুরি)। আরবী ভাষার ব্যাকরণ সম্পর্কে যাদের ভালো ধারণা আছে, তারা নিশ্চয় জেনে থাকবেন, যদি إِنْ দ্বারা সূচিত শর্তবাক্যের শেষে فَقَدْ দ্বারা পরবর্তী উহ্য বাক্যের হেতু নির্দেশিত হয়, তা হলে উহ্য বাক্যটি হয়—لَا بَأْسَ (কোনো সমস্যা নেই), لَا حَرَجَ (কোনো ক্ষতি নেই), لَا ضَيْرَ (কোনো সমস্যা নেই), فَهُوَ هَيِّنٌ (এ তো মামুলি ব্যাপার) ইত্যাদি। প্রাচীন আরবের কাব্যসম্ভার এমনকি স্বয়ং কুরআনে কারীমে এর অসংখ্য উদাহরণ আছে।[১]

صَغَتْ শব্দটির زَاغَتْ (বক্র/ বিচ্যুত হয়েছে/সরে গিয়েছে) অর্থটিও ঠিক নয়। কেননা হযরত আয়েশা রাযি. এবং উম্মাহাতুল মুমিনীনের সদস্যবৃন্দ, আল্লাহ মাফ করুন, নিঃসন্দেহে এ ধরনের ক্ষুদ্রতার অনেক উর্ধ্বে। তাদের হৃদয় বক্র হয়ে যাবে, তারা বিপথে চলে যাবেন এটা কল্পনাও করা যায় না। আসলে কোনো কিছু থেকে সরে যাওয়া আর কোনো কিছুর দিকে ঝুঁকে যাওয়া এক কথা নয়। যে কোনো ভাষাতেই এ দুটো অর্থকে ধারণ করে এমন প্রচুর শব্দ পাওয়া যায়। আরবী ভাষায়ও এ

---

১. যারা আরবী জানেন নিম্নোক্ত আয়াতগুলো ভেবে দেখুন-

- فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِكَ

অর্থ : যদি তারা আপনাকে মিথ্যুক বলে তা হলে ক্ষতি কী! আপনার পূর্ববর্তী রাসূলগণকেও তো মিথ্যা প্রতিপন্ন করা হয়েছে। (সূরা আলে ইমরান, আয়াত : ১৮৪)

- إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ

অর্থ : যদি তোমরা তার সাহায্যে এগিয়ে না আস, তবে এ আর এমন কী ! আল্লাহ তো অবশ্যই তাকে সাহায্য করবেন। (সূরা তাওবা, আয়াত : ৪০)

- وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ

অর্থ : আর যদি তারা আবার এমনটা করে তা হলে ভাববার কিছু নেই। পূর্ববর্তীদের দৃষ্টান্ত তো গিয়েছেই। (সূরা আনফাল, আয়াত : ৩৮)

- فَإِنْ يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ

অর্থ : আর যদি এরা এটা অস্বীকার করে তা হলে কিছু আসে যায় না। কেননা আমি এমন একটি সম্প্রদায়কে নিযুক্ত করেছি যারা এটা অস্বীকার করবে না। (সূরা আনআম, আয়াত : ৮৯)

ধরনের বেশ কিছু শব্দ আছে। আমরা শব্দগুলোকে তিন ভাগে ভাগ করতে পারি :

এক. যেগুলো শুধু প্রথম অর্থকে ধারণ করে। যেমন :

انْحَرَفَ ادعوى، زَاغَ، حَاد

দুই. যেগুলো শুধু দ্বিতীয় অর্থটিকে ধারণ করে। যেমন :

فَاءَ، تَابَ، الْتَفَتَ، تَوَجَّهَ

তিন. যেগুলো উভয় অর্থকে ধারণ করে। যেমন :

مَالَ، شَغَلَ، عَدَلَ، رَجَعَ صَغَتْ

শব্দটি দ্বিতীয় অর্থে ব্যবহৃত হয়। অনেকে শব্দটিকে তৃতীয় অর্থে গ্রহণ করেছেন। আবার অনেকে ব্যবহার করেছেন প্রথম অর্থে। আর এটাই সবচেয়ে বড় ভাষাগত ত্রুটি। আরবী ভাষার কোনো শব্দভাণ্ডার একে সমর্থন করে না।[১] কুরআনে কারীমের আরও একটি জায়গায় শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে :

وَلِتَصْغَىٰٓ إِلَيْهِ أَفْـِٔدَةُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْءَاخِرَةِ

অর্থ : ...এবং যারা ঈমান আনবে না, তাদের হৃদয় যেন ঝুঁকে যায় তার দিকে...। (সূরা আল-আনআম, আয়াত : ১১৩)

দেখুন, কোনো কিছু থেকে সরে যাওয়া বা বিচ্যুত হওয়ার অর্থে শব্দটিকে কি গ্রহণ করা সম্ভব?

আয়াতে কারীমায় হযরত আয়েশা রাযি. এবং হযরত হাফসা রাযি.-এর অন্তর কীসের দিকে ঝুঁকে গিয়েছে তার উল্লেখ নেই। অনেকে, আল্লাহ মাফ করুন, লিখেছেন—রাসূলকে কষ্ট দেওয়া এবং তাঁকে বিপদে ফেলার দিকে। অথচ ব্যাকরণের রীতি অনুসারে যে শব্দ উহ্য থাকে, তা আগে-

---

১. *লিসানুল আরব* এবং *বায়যাবী* গ্রন্থে যা আছে—তাও قِيل শব্দযোগে। মাওলানা হামীদ আদ-দীন সূরা তাহরীমের তাফসীরে এ বিষয়ে চুলচেরা বিশ্লেষণ করেছেন। বিশদ জানার জন্য যা দেখা যেতে পারে।

পিছে কোথাও না কোথাও থেকেই থাকে। অন্তত তার স্পষ্ট ইঙ্গিত থাকে। লক্ষ করুন, পূর্বে তওবার কথা আছে, যার মর্মার্থ—আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন। সুতরাং উহ্য কথাগুলো উক্ত করলে বাক্যটির রূপ দাঁড়াবে :

إِنْ تَتُوْبَا إِلَى اللّٰهِ (فَهُوَ هَيِّنٌ) فَقَدْ صَغَتْ قُلُوْبُكُمَا (إِلَى التَّوْبَةِ إِلَى اللّٰهِ)

অর্থ : যদি তোমরা দুজনে আল্লাহর কাছে তওবা কর (তাহলে বিষয়টি তোমাদের জন্য ক্ষতিকর হবে না); কেননা (তওবা করার দ্বারা) তোমাদের হৃদয় তো আল্লাহমুখী হয়েই গেল।

ঈলার ঘটনা

তাহরীমের ধারাবাহিকতায়ই ঘটে ঈলার ঘটনা। এগুলো নবম হিজরীর কথা। আরবের দূরদূরান্তের গোত্রগুলো ইসলামের ছায়াতলে এসে চলেছে। গনিমতের মাল, বিজিত অর্থসম্পদ এবং বার্ষিক আয়ে সমৃদ্ধ ধনভাণ্ডার একের পর এক মদীনাকে ভরপুর করে তুলছে।

আশা করি, নবীপরিবার যে অভাব-অনটনের মধ্য দিয়ে কালাতিক্রম করছিলেন তারও একটা সাধারণ ধারণা ইতোমধ্যে 'সংসার-জীবন' শিরোনামে পাঠক পেয়ে থাকবেন।

খায়বার বিজয়ের পর পবিত্র স্ত্রীগণের জন্য যে খোরপোশ নির্ধারিত হয়েছিল, তা একে তো খুবই কম, তার ওপর তাদের বদান্যতা, দানশীলতা—সব মিলিয়ে টানাটানি করেও বছর পার হওয়া ছিল কঠিন। ঘরে অভাব-অনটন লেগেই থাকত। অথচ পবিত্র স্ত্রীগণের অনেকেই ছিলেন ধনী পরিবারের মেয়ে বরং শাহযাদি। তারা ইতিপূর্বে কি নিজের ঘরে, কি স্বামীসংসারে, অঢেল সম্পদ ও ভোগবিলাসের মধ্য দিয়ে জীবন-যাপন করেছেন। তাই মদীনা যখন ধনসম্পদে পরিপূর্ণ, আর অজস্র ঐশ্বর্য যখন রাসূলের পদতলে, তখন নবীপরিবারের বার্ষিক খরচ কি একটু বাড়ানো যায় না? পবিত্র স্ত্রীগণ এই মর্মে তাঁদের মনোবাঞ্ছার কথা ব্যক্ত করলেন রাসূলের কাছে।

হযরত উমর রাযি. বিষয়টি জেনে হতভম্ব হয়ে গেলেন। প্রথমেই আপন আত্মজাকে বোঝালেন রাসূলের কাছে কোনো আবদার কোরো না,

তোমার যা লাগে আমাকে বলো। রাসূল তোমাকে স্ত্রীর মর্যাদা দিয়ে রেখেছেন শুধু আমার খাতিরে, নয়তো অনেক আগেই ছেড়ে দিতেন। এরপর তিনি এক এক করে উম্মাহাতুল মুমিনীনের প্রত্যেকের দ্বারেই গেলেন এবং বোঝালেন। কিন্তু হযরত উম্মে সালামা রাযি. বলে বসলেন—উমর, আপনি সবকিছুতেই নাক গলান; এবার এসেছেন রাসূলের পরিবারের বিষয়েও নাক গলাতে? উম্মুল মুমিনীনের জবাবে হযরত উমর রাযি. স্তব্ধ হয়ে গেলেন।

একদিন হযরত আবু বকর রাযি. এবং হযরত উমর রাযি. দুজনই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হলেন। দেখলেন রাসূল বিষণ্ন, মধ্যখানে বসা, এদিক-ওদিক পবিত্র স্ত্রীগণ—তাঁরা খোরপোশ বাড়ানোর কথা বলছেন। দুজনই যাঁর যাঁর আত্মজাকে শাসন করলেন। হযরত আয়েশা রাযি. এবং হযরত হাফসা রাযি. কথা দিলেন, ভবিষ্যতে আর এ ধরনের আবদার করে রাসূলকে কষ্ট দেবেন না।

অন্যান্য স্ত্রীগণ তাঁদের দাবির ওপর অটল। ঘটনাক্রমে এরই মধ্যে একদিন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে গিয়ে আহত হলেন।[১] হযরত আয়েশা রাযি.-এর হুজরাসংলগ্ন একটি ওপরতলা ছিল,[২] বলা যায় হুজরার গুদামঘর।[৩] আহত অবস্থায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এখানেই অবস্থান গ্রহণ করলেন এবং শপথ করলেন—এক মাস পবিত্র স্ত্রীগণের কাছে যাবেন না। মুনাফিকরা রটাতে লাগল, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্ত্রীদেরকে তালাক দিয়ে দিয়েছেন। ঘরে ঘরে শোরগোল পড়ে গেল। সাহাবা কেরাম মসজিদে নববীতে সমবেত হলেন। পবিত্র স্ত্রীগণ মর্মাহত। শোকের ছায়া নেমেছে নবীপরিবারে। কী হতে কী হয়ে গেল। সাহাবা কেরাম কেউ সাহস করছেন না যে, স্বয়ং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে সত্য জানতে চাইবেন।

---

১. *আবু দাউদ* : باب إمامة من صلى قاعدا ।

২. *আবু দাউদ* : باب إمامة من صلى قاعدا ।

৩. *সহীহ মুসলিম* : باب الإيلاء ।

হযরত উমর রাযি. সংবাদ পেয়ে মসজিদে নববীতে এলেন। সাহাবা কেরাম সবাই স্তব্ধ। হযরত উমর রাযি. রাসূলের সাক্ষাৎ লাভের অনুমতি চাইলেন। কিন্তু কোনো উত্তর এল না। দ্বিতীয়বার অনুমতি চাইলেন। এবারও সাড়া মিলল না। অবশেষে তৃতীয়বারে অনুমতি পেয়ে কাছে গেলেন। দেখলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চকিতে শুয়ে আছেন। শরীরে চাটাইয়ের দাগ পড়ে গিয়েছে। এদিক-সেদিক তাকিয়ে দেখলেন দয়ার নবীর কাছে কিছুই নেই। শুধু মাটির বরতন ও দু-একটি শুকনো মশক। দোজাহানের বাদশাহর রিক্ততা দেখে হযরত উমর রাযি. অশ্রুসিক্ত হলেন। তিনি আরজ করলেন, হে আল্লাহর রাসূল, আপনি কি সত্যি সত্যিই পবিত্র স্ত্রীগণকে ত্যাগ করেছেন? ইরশাদ হলো, না। আরজ করলেন, এই সুসংবাদ কি মুসলমানগণ পেতে পারেন? ইরশাদ হলো, হ্যাঁ। হযরত উমর রাযি. সানন্দে উচ্চস্বরে—আল্লাহু আকবার—তাকবীর দিলেন।

মাসটি ছিল ঊনত্রিশ দিনের। হযরত আয়েশা রাযি. বলেন—আমি শুধু দিন গুনতাম। ঊনত্রিশতম দিনে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নেমে এলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বপ্রথম হযরত আয়েশা রাযি.-এর কাছে যান। তিনি আরজ করলেন, হে আল্লাহর রাসূল, আপনি তো একমাসের শপথ করেছিলেন। অথচ সবে মাত্র ঊনত্রিশ দিন হয়েছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আয়েশা, এক মাস ঊনত্রিশ দিনেও হয়।

তাখঈরের প্রেক্ষাপট

কোনো নবীই শুধুমাত্র স্ত্রীদের তাগিদে পার্থিব বিলাস গ্রহণ করতে পারেন না। তাই পবিত্র কুরআনে তাখঈরের আয়াত নাজিল হয়। তাখঈর অর্থ ইচ্ছাধিকার প্রদান। অর্থাৎ পবিত্র স্ত্রীগণ প্রত্যেকে স্বাধীন। যার যার নির্ণয় নিজেই নেবেন। চাইলে অভাব-অনটনকে সাদরে বরণ করে পবিত্র স্ত্রীর মর্যাদায় ভূষিত থাকতে পারেন, চাইলে এই সম্মান ত্যাগ করে দুনিয়ার বিলাস গ্রহণ করতে পারেন। যারা দুনিয়ার সাময়িক বিলাসকে বিসর্জন দিতে পারবে, আল্লাহ তাদেরকে দান করবেন আখেরাতের

চিরস্থায়ী সুখ, সম্মান ও সৌভাগ্য। মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন :

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا وَإِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْاٰخِرَةَ فَإِنَّ اللّٰهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا

অর্থ : হে নবী, আপনি আপনার স্ত্রীদেরকে বলে দিন, তোমরা যদি পার্থিব জীবন ও পার্থিব বিলাস কামনা কর, তবে এসো, আমি তোমাদের ন্যায়সঙ্গত ও উত্তম পন্থায় মুক্ত করে দিই। আর যদি আল্লাহ, রাসূল ও পরকাল কামনা কর, তা হলে জেনে রেখো, আল্লাহ মুহসিন নারীদের জন্য রেখেছেন বিরাট প্রতিদান। (সূরা আহযাব, আয়াত : ২৮-২৯)

আয়াতটি নাজিল হওয়ার পর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বপ্রথম হযরত আয়েশা রাযি.-এর কাছে যান এবং বলেন—আয়েশা, আমি তোমাকে একটি প্রস্তাব দেব, তুমি তোমার আব্বা-আম্মার সঙ্গে পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত নেবে। হযরত আয়েশা রাযি. আরজ করলেন—হে আল্লাহর রাসূল, ইরশাদ করুন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপর্যুক্ত আয়াতটি পড়ে শোনালেন। তিনি আরজ করলেন—হে আল্লাহর রাসূল, আমি কোন বিষয়ে আব্বা-আম্মার পরামর্শ নেব? আমি তো আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকেই বেছে নিয়েছি। হযরত আয়েশা রাযি.-এর স্বতঃস্ফূর্ত উত্তরে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেহারা মোবারকে খুশির ছাপ দেখা দিল। হযরত আয়েশা রাযি. আরজ করলেন—হে আল্লাহর রাসূল, আমার নির্ণয় অন্যরা না জানলে ভালো হতো।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মৃদু হাসলেন। বললেন, আয়েশা, পৃথিবীতে এসেছি শিখিয়ে দিতে; চাপিয়ে দিতে নয়।[১]

---

১. *সহীহ বুখারী* ও *সহীহ মুসলিম* : ঈলা অংশে সবগুলো ঘটনা আছে।

বৈধব্য : হিজরী ১১ সন

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অসুস্থ হলেন

একজন নারীর জীবনের সবচেয়ে সঙ্কটময় পরিস্থিতি হলো বৈধব্য। হযরত আয়েশা রাযি.-এর বয়স মাত্র আঠারো বছর। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন পরপারের যাত্রী। এই দুই মানব-মানবীর মধ্যে যে প্রেম আর ভালোবাসা ছিল তা সূর্যের আলোর মতোই স্বচ্ছ। সর্বত্র প্রকট। সফর ১১ হিজরী। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আয়েশা রাযি.-এর ঘরে এলেন। তিনি তখন মাথার ব্যথায় কাতরাচ্ছিলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যদি তুমি আমার উপস্থিতিতে মৃত্যুবরণ করতে, তা হলে নিজ হাতে তোমার কাফন দাফনের ব্যবস্থা করতাম। এই হাত দুটো তুলে তোমার জন্য দুআ করতাম। হযরত আয়েশা রাযি. তৎক্ষণাত বলে উঠলেন, এমন দরদ বুঝি এজন্য যে, এই ঘরে কোনো নতুন বিবি আসবে। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের মাথার যন্ত্রণার কথা জানালেন, নিজের মাথায় হাত রাখলেন এবং বললেন, না আয়েশা, বরং আমার মাথায়ই প্রচণ্ড যন্ত্রণা হচ্ছে। ওহ, আমার মাথাটা গেল! ...রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অসুস্থ হলেন। এবং এটাই ছিল তাঁর মৃত্যুরোগ।

হযরত আয়েশা রাযি.-এর গৃহে

হযরত মাইমুনা রাযি.-এর ঘরে গিয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিছানাগত হয়ে পড়লেন। এহেন পরিস্থিতিতেও তিনি স্ত্রীদের মনযোগানো ভুললেন না। নিয়মমাফিক একদিন একদিন করে সকলের ঘরে থাকা অব্যাহত রাখলেন। কিন্তু সবসময় জিজ্ঞেস করতেন,

আগামীকাল কোথায় থাকব? পবিত্র স্ত্রীগণ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মনোবাঞ্ছা বুঝতে পারলেন। সবার সম্মতিতে তাঁকে হযরত আয়েশা রাযি.-এর গৃহে আনা হলো। মৃত্যু পর্যন্ত তিনি সেখানেই ছিলেন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মনোবাঞ্ছার কারণ অনেকেই ভাববেন, হযরত আয়েশা রাযি.-এর প্রতি ভালোবাসা। কিন্তু না, বিষয়টি এমন নয়। পূর্বে আলোচিত হয়েছে, আল্লাহ তাআলা হযরত আয়েশা রাযি. -কে স্বভাবগতভাবেই একরকম পূর্ণতা ও পূর্ণাঙ্গতা দান করেছিলেন। তাঁর বুদ্ধিমত্তা, স্মৃতিশক্তির প্রখরতা ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ছিল সবার থেকে আলাদা। ফিকীহ ইজতিহাদ, ইসতিদাদ ও ইসতিমবাত-ই তা প্রমাণ করে। যদি বলা হয়—রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উদ্দেশ্য ছিল, তাঁর জীবনের শেষ মুহূর্তের কথা, কাজ ও দিক-নির্দেশনাগুলো, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অনুষঙ্গগুলো তাঁর উম্মতের জন্য হুবহু সংরক্ষিত হোক, তা হলে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। বাস্তবতাও তা-ই। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মৃত্যু-সম্পর্কিত অধিকাংশ বিশুদ্ধ বর্ণনাই উম্মত পর্যন্ত পৌঁছেছে এই মহীয়সী মানবীর কল্যাণেই।

হযরত আবু বকর রাযি.-এর ইমামতি

দিন দিন অসুস্থতা তীব্র থেকে তীব্রতর হতে থাকল। এমনকি ইমামতির জন্য মসজিদে আসাও সম্ভব হলো না। পবিত্র স্ত্রীগণ প্রিয়তম জীবনসঙ্গীর সেবাযত্নকে পরম সৌভাগ্য জ্ঞান করলেন। কিছু দুআ ছিল, যেগুলো পড়ে পড়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মৃত্যুশয্যায় শায়িত ব্যক্তির গায়ে ফুঁক দিতেন। হযরত আয়েশা রাযি.-ও দুআগুলো পড়ে পড়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ফুঁক দিচ্ছিলেন।

ফজরের জামাতের জন্য সাহাবা কেরাম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অপেক্ষায় ছিলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কয়েকবার উঠে আসার চেষ্টা করলেন; কিন্তু পারলেন না। অবশেষে হযরত আবু বকর রাযি.-কে ইমামতি করার নির্দেশ দিলেন। হযরত আয়েশা রাযি. বলেন, আমার মনে হলো, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জায়গায় যে ব্যক্তি দাঁড়াবে লোকে তাকে অপয়া বলবে।

তাই আরজ করলাম—হে আল্লাহর রাসূল, আবু বকর [রাযি.] খুবই নরম প্রকৃতির।[১] তাঁকে দিয়ে হবে না। তিনি কাঁদবেন। কিন্তু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুনরায় একই নির্দেশ দিলেন। হযরত আয়েশা রাযি. উপায় না পেয়ে হযরত হাফসা রাযি.-এর দিকে তাকালেন, তিনি যদি রাসূলকে বোঝাতে পারেন—এ আশায়। হযরত হাফসা রাযি.-ও যখন অনুরোধ করলেন, তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমরা নারীরাই ভ্রাতা ইউসুফকে ফাঁসাতে চেয়েছিলে না! বলে দাও, যেন আবু বকরই ইমামতি করেন। শেষমেশ হযরত আবু বকর রাযি.-ই ইমামতি করলেন।[২]

অসুস্থ হবার পূর্বে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিছু আশরাফি হযরত আয়েশা রাযি.-এর কাছে রেখে ভুলে গিয়েছিলেন। মনে পড়ামাত্রই বললেন, আয়েশা, আশরাফিগুলো কোথায়? ওগুলো আল্লাহর রাস্তায় সদকা করে দাও। মুহাম্মাদ কি গাফেল অবস্থায় আল্লাহর সঙ্গে মিলিত হবে? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশে আশরাফিগুলো ওই মুহূর্তেই সদকা করে দেওয়া হলো।

হযরত আয়েশা রাযি.-এর কোলে মাথা রেখে

একেবারে শেষ মুহূর্তের কথা। হযরত আয়েশা রাযি. বসা ছিলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাঁর সিনায় হেলান দিয়ে বসানো হয়েছে। এরই মধ্যে হযরত আয়েশা রাযি.-এর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হযরত আবদুর রহমান রাযি. মেসওয়াক নিয়ে ভেতরে এলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মেসওয়াকের দিকে তাকালেন। হযরত আয়েশা রাযি. বুঝতে পারলেন যে, রাসূল মেসওয়াক করতে চাইছেন। তিনি ভ্রাতার হাত থেকে মেসওয়াকটি নিলেন এবং নিজের দাঁত দিয়ে চিবিয়ে নরম করে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দিলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পূর্ণ সুস্থ মানুষের মতো মেসওয়াক

---

১. হযরত আবু বকর রাযি. এমনিতেই নামাযে খুব কাঁদতেন। আর এরকম কঠিন মুহূর্তে কান্না আসা আরও স্বাভাবিক। সুতরাং এমন মন্তব্য অনর্থক নয়। *সহীহ বুখারী* : হিজরত অংশটি দ্রষ্টব্য।

২. *মুসনাদে আহমদ* : ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা : ১৬২।

করলেন। হযরত আয়েশা রাযি. গর্ব করে বলতেন—পবিত্র স্ত্রীগণের মধ্যে শুধু আমারই এই সৌভাগ্য হয়েছে যে, জীবনের শেষ মুহূর্তটিতেও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার মুখের ঝুটা নিজের মুখে লাগিয়েছিলেন।

হযরত আয়েশা রাযি. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুস্থতার জন্য দুআ করছিলেন। রাসূলের হাত তাঁর হাতের মধ্যে ছিল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হঠাৎ হাত সরিয়ে নিলেন এবং বললেন— اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ وَاجْعَلْنِيْ مَعَ الرَّفِيْقِ الْأَعْلٰى —অর্থ : হে আল্লাহ, আমাকে ক্ষমা করুন, আমাকে সর্বশ্রেষ্ঠ বন্ধুর সঙ্গে মিলিত করুন।[১] হযরত আয়েশা রাযি. বলেন, সুস্থ থাকতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন, মৃত্যুর সময় নবীদের দুনিয়া ও আখেরাতের কোনো একটিকে বেছে নেওয়ার সুযোগ দেওয়া হয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুখের উচ্চারিত শব্দগুলো শুনে আমি ভেঙে পড়লাম। কেননা আমি নিশ্চিত হলাম যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের থেকে বিদায় নিতে চলেছেন।

হযরত আয়েশা রাযি. অল্পবয়স্কা ছিলেন। তখন পর্যন্ত কাউকে নিজের চোখে মারা যেতে দেখেননি। তিনি আরজ করলেন—হে আল্লাহর রাসূল, আপনার খুব কষ্ট হচ্ছে? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন—কষ্ট যত সওয়াবও তত। তখন পর্যন্ত হযরত আয়েশা রাযি. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ধরে থাকতে পেরেছেন। তেমন ভারী লাগেনি। কিন্তু হঠাৎ খুব ভার মনে হলো। চোখের দিকে তাকিয়ে দেখলেন, চোখ দুটো বন্ধ হয়ে গেছে। তিনি খুব ধীরস্থিরভাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মস্তক মোবারক কোলে রাখলেন। তিনি বাকরুদ্ধ হলেন। বুকের ভেতর অসহ্য যন্ত্রণা মোচড় মেরে উঠল। ব্যর্থ হলেন অশ্রুঢলকে বাঁধ মানাতে।[২]

---

১. *সহীহ মুসলিম* : كتاب اسلام، باب استحباب رقية المريض ক্রম : ৫৭০৭। *মুসনাদে আহমদ* : খণ্ড, পৃষ্ঠা : ১৬২।

২. *মুসনাদে আহমদ* : ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা : ২৭৪। যে অংশগুলোর সূত্র দেওয়া হয়নি সেগুলো *সহীহ বুখারী*—باب وفاة النبي صلى الله عليه وسلم থেকে নেওয়া।

বিশ্বনবীর সমাধি : সেই স্মৃতিময় ঘর

হযরত আয়েশা রাযি.-এর ফাজায়েল ও মানাকেবের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দিক এই যে, তাঁর স্মৃতিময় ঘরটিই বিশ্বনবীর সমাধি হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেছিল এবং প্রিয় নবীর মোবারক দেহ এই মাটির কোলেই গচ্ছিত রাখা হয়েছিল।

إِنَّا لِلّٰهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ

হযরত আয়েশা রাযি. স্বপ্নে দেখেছিলেন—তাঁর হুজরা মোবারকে আকাশ থেকে তিনটি চাঁদ খসে পড়ল। তিনি স্বপ্নের কথা হযরত আবু বকর রাযি.-কে বলেছিলেন। যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সেখানে সমাহিত করা হলো, তখন তিনি হযরত আয়েশা রাযি.-কে বললেন—পুত্রী, তোমার দেখা তিনটি চাঁদের একটি চাঁদ ইনি। এবং ইনিই শ্রেষ্ঠ।[১] পরবর্তী ইতিহাস প্রমাণ করেছে, অন্য দুটো চাঁদ ছিলেন সিদ্দীকে আকবর রাযি. এবং ফারুকে আযম রাযি.।

হযরত আয়েশা রাযি. বিধবা হলেন। এবং এভাবেই বাকি জীবন কাটিয়ে দিলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রওযা মোবারকের বাসিন্দা হয়ে। তিনি ঘুমাতেনও রাসূলের কবরের পাশেই। কিন্তু যেদিন তাঁকে স্বপ্নে দেখলেন, সেদিন থেকে সেখানে ঘুমানো ছেড়ে দিলেন।[২]

এরপর তেরো বছর, হযরত উমর রাযি. সমাহিত হওয়ার আগ পর্যন্ত, তিনি হিজাব ছাড়া রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রওযায় আসা-যাওয়া করেছেন। কেননা, একজন স্বামী, অন্যজন পিতা। কিন্তু হযরত উমর রাযি. সমাহিত হওয়ার পর হযরত আয়েশা রাযি. বলতেন—এখন সেখানে যেতে হলে হিজাবসহই যেতে হবে।

---

১. *মুআত্তা মালেক* রহ. : ما جاء في دفن الميت।

২. *তাবাকাত*, ইবনে সাদ, ২/২/৮৫।

পবিত্র স্ত্রীগণের দ্বিতীয় বিবাহ নিষিদ্ধ কেন?

পবিত্র স্ত্রীগণের জন্য আল্লাহ তাআলা অন্য স্বামী গ্রহণ হারাম করে দিয়েছেন। জনৈক আরব-নেতা মন্তব্য করেছিলেন—রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মৃত্যুর পর হযরত আয়েশা রাযি.-কে বিবাহের প্রস্তাব দেবেন।

যেহেতু এটা ধর্মীয় ও রাজনৈতিকভাবে নেতিবাচক, আবার শানে নবুওয়াতেরও খেলাফ, তাই আল্লাহ তাআলা আগেই ইরশাদ করে দিলেন–

النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ

অর্থ : নবী মুমিনদের কাছে তাদের জীবনের চেয়েও দামি। আর নবীর স্ত্রীবর্গ তাদের মাতৃতুল্য। (সূরা আহযাব, আয়াত : ৬)

مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا

অর্থ : কখনোই তোমাদের এই অধিকার থাকবে না যে, তোমরা আল্লাহর রাসূলকে কোনোভাবে কষ্ট দেবে। কখনোই তোমাদের এই অধিকার থাকবে না যে, তার মৃত্যুর পর তাঁর স্ত্রীগণকে বিবাহ করবে। এটা অবশ্যই মহান আল্লাহর কাছে বিরাট অপরাধ। (সূরা আহযাব, আয়াত : ৫৩)

প্রকৃতপক্ষে, পবিত্র স্ত্রীগণ কিছুকাল এমন একজন মানবের একান্ত সান্নিধ্য লাভ করেছেন, যিনি ছিলেন নবুওয়াতের ধারক। ইলমে নববীর অসংখ্য বিষয়ের প্রকৃত প্রতিনিধি তাঁরাই। সুতরাং তাঁদের বাকি জীবনের একমাত্র কাজ হবে—যতদিন বাঁচবেন, পবিত্র জীবনসঙ্গীর জীবন্ত শিক্ষা ও কার্যত দীক্ষা উম্মতের মাঝে বাস্তবায়ন করে যাবেন, উম্মতকে দিক-নির্দেশনা দিয়ে যাবেন। তাঁদের জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত নিয়োজিত থাকবে এই সুমহান দায়িত্ব-পালনে। তাঁরা যে মুসলিম সম্প্রদায়ের মা! মায়ের ভূমিকা সন্তানের লালনপালন। তাই মহান আল্লাহ স্বয়ং তাদের করণীয় নির্ধারণ করে দিলেন আগেই :

يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ مَنْ يَأْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ وَكَانَ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا

অর্থ : হে নবীপত্নীগণ, তোমাদের মধ্যে যদি কেউ অন্যায় করে, তবে তার শাস্তি হবে দ্বিগুণ। আল্লাহর পক্ষে এটা খুবই সহজ। কিন্তু যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অনুগত থাকবে, নেক আমল করবে আমি তাকে পুরস্কৃতও করব দ্বিগুণভাবে। আমি তার জন্য প্রস্তুত করে রেখেছি সম্মানজনক জীবিকা। (সূরা আহযাব, আয়াত : ৩০-৩১)

يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا

অর্থ : হে নবীপত্নীগণ, তোমরা আর দশটা সাধারণ নারীর মতো নও। তোমরা যদি আল্লাহকে ভয় করো, তা হলে কথায় নমনীয়তা বর্জন করো। কেননা, এতে যাদের অন্তরে ব্যাধি আছে, তারা (অর্থাৎ মুনাফিকরা) লালায়িত হয়। তবে তোমরা অবশ্যই ন্যায়সঙ্গত কথা বলো। তোমরা তোমাদের ঘরেই স্থিরচিত্তে অবস্থান করো। জাহেলি যুগের মতো সৌন্দর্য প্রদর্শনে বের হয়ো না। সালাত কায়েম করো। যাকাত আদায় করো। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অনুগত থেকো। হে নবীপরিবার, আল্লাহ তো এটাই চান যে, তিনি তোমাদের থেকে অকল্যাণ রোধ করবেন এবং তোমাদের রাখবেন পবিত্র। তোমাদের ঘরে ঘরে আল্লাহর যে বাণীগুলো এবং জ্ঞানের যে কথাগুলো আলোচনা করা হয়, সেগুলো স্মরণ রেখো। নিশ্চয় আল্লাহ সূক্ষ্মদর্শী ও মহাপ্রজ্ঞাবান। (সূরা আহযাব, আয়াত : ৩২-৩৪)

নিঃসন্দেহে, হযরত আয়েশা রাযি.-এর পুরো জীবন ছিল কুরআনের এই আয়াতগুলোর জীবন্ত তাফসীর।

সার্বিক অবস্থা
হযরত আবু বকর রাযি.-এর শাসনামল

উত্তরাধিকার প্রসঙ্গে ভূমিকা

হযরত আয়েশা রাযি.-এর সম্মানিত পিতা হযরত আবু বকর রাযি.-এর কাঁধে খেলাফতের গুরুদায়িত্ব অর্পিত হলো। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তাজহিয, তাকফিন ও খেলাফতে সিদ্দীকির বাইয়াত সম্পন্ন হওয়ার পর পবিত্র স্ত্রীগণ চাইলেন, তাঁরা হযরত উসমান রাযি.-কে হযরত আবু বকর রাযি.-এর খেদমতে পাঠাবেন এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উত্তরাধিকার দাবি করবেন। কিন্তু হযরত আয়েশা রাযি. সকলকে স্মরণ করিয়ে দিলেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জীবদ্দশায় বলেছিলেন—আমার কোনো উত্তরাধিকার থাকবে না। আমার পরিত্যক্ত সবকিছুই সদকা। পবিত্র স্ত্রীগণ নিশ্চুপ হয়ে গেলেন।[১]

আসলে জীবদ্দশায়ই দয়ার নবীর কাছে পার্থিব কিছু ছিল না—যা তাঁর মৃত্যুর পর বণ্টিত হতে পারে। *সহীহ বুখারী*তে এসেছে, তিনি দিনার-দিরহাম, পশু-পাখি, গোলাম-বাঁদি কিছুই রেখে যাননি।[২] অবশ্য সাধারণ ক্ষমতাবলে—কিছু মহৎ উদ্দেশ্যে—দু-একটি বাগান তাঁর অধীনে ছিল। তিনি জীবদ্দশায় সেগুলোকে যে খাতে, যেভাবে ব্যয় করেছিলেন,

---

১. *সহীহ বুখারী*, কিতাবুল ফারায়েয।
২. *সহীহ বুখারী*, কিতাবুল ওসায়া।

খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগে তার একটুও হেরফের হয়নি। পবিত্র স্ত্রীগণের বার্ষিক খরচও নির্বাহ হতো এখান থেকে। হযরত আবু বকর রাযি. এই ব্যবস্থাটিই হুবহু বহাল রাখলেন।[১]

হযরত আয়েশা রাযি. যেদিন বিধবা হন, সেদিনও সন্ধ্যায় ঘরে কোনো খাবার ছিল না। এমন সঙ্কটময় পরিস্থিতিতেও উত্তরাধিকার প্রসঙ্গে তিনি যে ভূমিকা পালন করেছিলেন তাতে মরহুম জীবনসঙ্গীর প্রতি তাঁর অগাধ আনুগত্য, সহজাত উদারতা ও প্রকৃতিগত মহানুভবতা আরও মহিমাময় হয়ে ওঠে।[২]

মৃত্যুশয্যায় পিতার শিয়রে

হযরত আবু বকর রাযি.-এর শাসনামল স্থায়ী ছিল মাত্র দু-বছর। ত্রয়োদশ হিজরীতে তিনি আপন প্রভুর ডাকে সাড়া দিয়ে পৃথিবী ও পৃথিবীবাসীকে বিদায় জানান। মৃত্যুর সময় বিদুষী আত্মজা পিতার শিয়রে বসা ছিলেন। ইতিপূর্বে হযরত আবু বকর রাযি. তাঁকে কিছু জায়গির প্রদান করেছিলেন। কিন্তু অন্য সন্তানদের কল্যাণেও কিছু করা উচিত। তাই মিনতির স্বরে বললেন—মা, জমিগুলো কি ভ্রাতাদের দিয়ে দেবে? মহীয়সী মেয়ের অকুণ্ঠ উত্তর—কেন নয়, পিতা? সানন্দে-সাগ্রহে।[৩] পিতা জিজ্ঞেস করলেন—রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাফনের কাপড় কয়টি ছিল? হযরত আয়েশা রাযি. আরজ করলেন—তিনটি সাদা কাপড়। পিতা জিজ্ঞেস করলেন—দিনটি কী ছিল? পুত্রী আরজ করলেন—সোমবার। তিনি জিজ্ঞেস করলেন—আজ কী বার? উত্তর দিলেন—সোমবার। তিনি বললেন—তবে হয়তো আমারও জীবনপ্রদীপ আজ সন্ধ্যা পর্যন্তই জ্বলবে। এরপর নিজের চাদরের দিকে তাকালেন। চাদরে জাফরানের মিশ্রণ ছিল। তিনি বললেন—এই কাপড়টা ধুয়ে আরও দুটো কাপড় দিয়ে আমার কাফনের ব্যবস্থা করবে। হযরত আয়েশা রাযি.

---

১. *সহীহ বুখারী*, কিতাবুল ফারায়েয, মুকালামায়ে আব্বাস ও উমর রাযি.।

২. *তিরমিযী*, কিতাবুল আদব।

৩. *তাবাকাতে ইবনে সাদ*। তরজমায়ে আবু বকর রাযি.।

আরজ করলেন—পিতা, এ তো পুরাতন কাপড়। তিনি বললেন—মৃতের চেয়ে জীবিতদের নতুন কাপড়ের প্রয়োজন বেশি।[১] হযরত আবু বকর রাযি. এ দিনই মঙ্গলবার দিবাগত রাতে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পাশে (আদব রক্ষার্থে) একটু পেছনে সমাহিত করা হয়। তাঁর মৃত্যুতে নববী নীড়ের একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র এবং নববী খেলাফতের একটি উজ্জ্বল তারকা পৃথিবীর আকাশ থেকে খসে পড়ে। হযরত আয়েশা রাযি.-কে বৈধব্যের ক্ষত না শুকোতেই—মাত্র দু-বছরের মাথায় পিতৃবিয়োগের ক্ষতও স্বীকার করতে হয়।

---

১. *সহীহ বুখারী* : আবওয়াবুল জানাইয।

হযরত উমর রাযি.-এর শাসনামল

উম্মুল মুমিনীনের প্রতি হযরত উমর রাযি.-এর সদাচার

হযরত উমর রাযি.-এর শাসনামলে ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা ও প্রশাসনিক অবকাঠামো ছিল আলাদা বৈশিষ্ট্যে ভাস্বর। অন্যান্য বিষয়গুলোর মতো অর্থনৈতিক সংস্কারও এসেছিল ব্যাপকভাবে। তিনি মুসলমানদের জন্য রাষ্ট্রীয় ভাতা হিসেবে নগদ অর্থ নির্ধারণ করেছিলেন। কাজি আবু ইউসুফ রহ. *কিতাবুল খারাজে* দুটো রেওয়ায়েত উল্লেখ করেছেন : এক. হযরত উমর রাযি.-এর শাসনামলে পবিত্র স্ত্রীগণের প্রত্যেকের বার্ষিক ভাতা ছিল বারো হাজার দিরহাম।[১] দুই. প্রত্যেকের দশ হাজার দিরহাম; কিন্তু হযরত আয়েশা রাযি.-এর বারো হাজার দিরহাম। ইমাম হাকেম রহ. দ্বিতীয় বর্ণনাটিকে শুদ্ধতার ক্ষেত্রে *বুখারী* ও *মুসলিমের* সমপর্যায়ের বলে মূল্যায়ন করেছেন।[২] অগ্রাধিকার প্রদানের কারণ উল্লেখ করে হযরত উমর রাযি. বলেন—তাঁর জন্য অধিক নির্ধারণ করেছি এজন্য যে, তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অধিক প্রিয় ছিলেন।

পবিত্র স্ত্রীগণের সংখ্যা অনুযায়ী হযরত উমর রাযি. নয়টি পাত্র বানিয়ে নিয়েছিলেন। কোনো উপঢৌকন এলে এক-একটা পাত্রে করে এক-একজনের খেদমতে সেসব পাঠিয়ে দিতেন।[৩] বণ্টনের ক্ষেত্রেও হযরত আয়েশা রাযি.-কে অধিক গুরুত্ব দিতেন। এমনকি, কোনো জন্তু জবেহ

---

১. *কিতাবুল খারাজ*, কাজি আবু ইউসুফ রহ., পৃষ্ঠা : ২৫।

২. *মুসতাদরাকে হাকেম*, সাহাবিয়া অংশ, জিকরু আয়েশা রাযি.।

৩. *ইমাম মালেক*, বাবু জিযয়াতি আহলিল কিতাব।

করা হলে হযরত আয়েশা রাযি.-এর ইচ্ছানুযায়ী মাথা পা ইত্যাদি পর্যন্ত তাঁর খেদমতে পাঠিয়ে দিতেন।[১] ইরাক-অভিযানে বিজয়-লাভের ফলে মুসলমানদের যে অর্থসম্পদ হস্তগত হয়, তাতে মূল্যবান একটি মোতির ডিব্বা ছিল। এটা সকলকে বণ্টন করে দেওয়া ছিল কঠিন। তাই হযরত উমর রাযি. বললেন—যদি আপনাদের আপত্তি না থাকে, তা হলে এটা উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা রাযি.-এর খেদমতে পাঠাতে চাই। কেননা তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রিয় ছিলেন। সাহাবা কেরাম রাযি. সানন্দে অনুমতি দিলেন। ডিব্বাটি হযরত আয়েশা রাযি.-এর খেদমতে পাঠানো হলো। হযরত আয়েশা রাযি. ডিব্বাটি খুলে দেখলেন, এরপর বললেন—ইবনে খাত্তাব [রাযি.], রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অবর্তমানে আমাকে অনেক অনুগ্রহ করেছেন। হে আল্লাহ, তাঁর অনুগ্রহ গ্রহণের জন্য আমাকে আর বেশিদিন বাঁচিয়ে রেখো না।[২]

হযরত উমর রাযি.-এর অন্তিম ইচ্ছা এবং হযরত আয়েশা রাযি.-এর ত্যাগ

হযরত উমর রাযি.-এর তামান্না ছিল, তিনিও মৃত্যুর পর হযরত আয়েশা রাযি.-এর গৃহে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কদম মোবারকের নিচে শায়িত হবেন। কিন্তু মুখ খুলে কোনোদিন এ কথা বলতে পারেননি। কেননা, যদিও শরঈ দৃষ্টিকোণ থেকে কবরে শায়িত মৃত ব্যক্তি থেকে পর্দা করা জরুরি নয়; তথাপি শিষ্টাচারের কথা ভেবে—মৃত্যুর পরও উম্মুল মুমিনীনের সম্মানে নিজেকে তিনি গায়রে মাহরাম ভেবেছেন। কিন্তু মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে এই ব্যাকুলতা তাঁকে ঘিরে ধরে। অবশেষে আপন পুত্রকে পাঠান—উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা [রাযি.]-কে আমার সালাম বোলো, এবং আবেদন কোরো, উমর [রাযি.]-এর অন্তিম ইচ্ছা—আপনার অনুমতি হলে তিনি তাঁর বন্ধুদের পাশে

---

১. *মুয়াত্তা*, ইমাম মুহাম্মাদ রহ. : বাবুয যুহদ।
২. *মুসতাদরাকে হাকেম* রহ.।

সমাহিত হবেন। হযরত আয়েশা রাযি. বললেন—এতদিন মনে-মনে ওই জায়গাটি নিজের জন্যই সংরক্ষণ করেছিলাম; কিন্তু আজ হযরত উমর [রাযি.]-কে আপন ইচ্ছেতেই অগ্রাধিকার প্রদান করছি।

অনুমতি পাওয়ার পরও হযরত উমর রাযি.-এর দ্বিধা কাটল না। তিনি পুত্রকে ওসিয়ত করলেন—আমার মৃত্যুর পর আমার শবাধার উম্মুল মুমিনীন রাযি.-এর দুয়ারে নিয়ে যাবে এবং পুনরায় অনুমতি প্রার্থনা করবে। এবারও যদি তিনি সন্তুষ্টচিত্তে অনুমতি ব্যক্ত করেন, তবেই আমাকে ভেতরে নিয়ে যাবে। অন্যথায় মুসলমানদের গণকবরেই আমাকে দাফন করবে। তা-ই করা হলো। হযরত আয়েশা রাযি. এবারও সন্তুষ্টচিত্তে অনুমতি দিলেন। অন্তিম ইচ্ছা অনুযায়ী হযরত উমর রাযি.-কে তাঁর প্রিয় বন্ধুদের সঙ্গে দাফন করা হলো।[১] হযরত আয়েশা রাযি.-এর ঘরে নববী খেলাফতের আরও একটি চন্দ্র চিরতরে চোখের আড়াল হয়ে গেল।

---

১. *সহীহ বুখারী* : কিতাবুল জানাইয-এ বিস্তারিত আছে।

হযরত উসমান রাযি.-এর শাসনামল

ইসলামে ফেতনার উদ্ভব হলো যেভাবে

হযরত উসমান রাযি.-এর শাসনকাল বারো বছর স্থায়ী ছিল। তাঁর শাসনকালের প্রথমার্ধ জুড়ে পূর্ণ শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় থাকে। কিন্তু এরপর তাঁর প্রতি কিছু মানুষের মনে নানা আপত্তির সৃষ্টি হয়। হযরত আয়েশা রাযি. বলেন—নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত উসমান রাযি.-কে ওসিয়ত করেছিলেন, যদি আল্লাহ তোমাকে খেলাফতের পোশাক পরিধান করান, তবে কখনো নিজে থেকে তা খুলে ফেলবে না।[১]

সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে হযরত আয়েশা রাযি.-এর গ্রহণযোগ্যতা ছিল অন্যরকম।[২] তা ছাড়া মহান আল্লাহর দৃষ্টিতে তিনি ছিলেন পুরো মুসলিমসম্প্রদায়ের মা। এজন্য সিরিয়া, হেজাজ, ইরাক ও মিশরে সর্বত্র মায়ের মতোই মান্য করা হতো তাঁকে। সামনে যে বিবরণগুলো আসছে, তাতেই বিষয়টি প্রতিপন্ন হবে। সাধারণ লোকজন উম্মুল মুমিনীন রাযি.-এর কাছে আসতেন এবং তাদের অভিযোগ ও অনুযোগ ব্যক্ত করতেন। সম্মানিতা মাতা আপন সন্তানদের সান্ত্বনা ও উপদেশ দিয়ে বিদায় জানাতেন।

হযরত আবু বকর রাযি. এবং উমর রাযি.-এর শাসনামল পর্যন্ত, এবং হযরত উসমান রাযি.-এর শাসনামলের বিশেষ করে প্রথমার্ধ পর্যন্ত অনেক বড় বড় সাহাবা কেরাম জীবিত ছিলেন। নিঃসন্দেহে ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থায় তাঁদের ভূমিকা ছিল অপরিসীম। তাঁরা ছিলেন খোলাফায়ে রাশেদার সৎ,

---

১. *মুসনাদে আহমদ* : ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা : ২৬৩।

২. *মুসতাদরাকে হাকেম* ও অন্যান্য গ্রন্থে আছে : وكان أحسن رأيا في العامة—অর্থ : সাধারণ মুসলমানদের কাছে তাঁর মতটিই হতো সুন্দরতম মত।

দূরদর্শী ও হিতাকাঙ্ক্ষী পরামর্শক ও মন্ত্রণাদাতা। যে কোনো সঙ্কটে তাঁদের পরামর্শ কার্যকর ফল দিত। উঁচু উঁচু পদে নিজ নিজ যোগ্যতা ও অধিকার অনুযায়ী তারা ছিলেন অগ্রগণ্য। হযরত আবু বকর রাযি. এবং হযরত উমর রাযি. ন্যায়নিষ্ঠ ও ইনসাফভিত্তিক সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করে গিয়েছিলেন। পক্ষপাত, দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, অনিয়ম ইত্যাদি ছিল অসম্ভব। রাষ্ট্রে নিরাপত্তা ও শান্তি বজায় ছিল। বড় বড় সাহাবা কেরাম যাঁরা ছিলেন, তাঁদেরও কোনো দাবি বা আপত্তি ছিল না। তরুণদের মধ্যে যারা উচ্চাভিলাষী ছিলেন (যেমন : হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের, মুহাম্মাদ ইবনে আবু বকর, মারওয়ান ইবনে হাকাম, মুহাম্মাদ ইবনে আবু হুযায়ফা, সাঈদ ইবনুল আস রাযি.), আকাবিরে সাহাবা কেরামের মতো মহান ও মহৎ ব্যক্তিত্বের সামনে তারা কিছুই ছিলেন না। তখন তাদের পক্ষে খলীফাতুল মুসলিমীন বা আমীরুল মুমিনীন হওয়া ছিল কল্পনারও অতীত।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের রাযি. ছিলেন সিদ্দীকে আকবর রাযি.-এর দোহিত্র এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ফুফাতো ভাই হাওয়ারিয়ে রাসূল হযরত যুবায়ের রাযি.-এর পুত্র। তিনি নিজেকে খেলাফতের সবচেয়ে বেশি যোগ্য ভাবতেন এবং উত্তরাধিকারী হিসেবে খেলাফতকে নিজের অধিকার মনে করতেন।

মুহাম্মাদ ইবনে আবু বকর রাযি. হযরত আবু বকর রাযি.-এর সর্বকনিষ্ঠ পুত্র এবং উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা রাযি.-এর বৈমাত্রেয় ভ্রাতা ছিলেন। তার সম্মানিতা মাতা হযরত আবু বকর রাযি.-এর ইন্তেকালের পর হযরত আলী রাযি.-এর সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। এজন্য তার লালনপালন হয় হযরত আলী রাযি.-এর ঘরে।[১] হযরত আলী রাযি.-ও তাকে আপন সন্তানের মতোই দেখতেন।

মুহাম্মাদ ইবনে আবু হুযাইফা হযরত উসমান রাযি.-এর তত্ত্বাবধানে লালিত-পালিত হয়েছিলেন। প্রাপ্তবয়স্ক হতে না হতেই কোনো উচ্চাসনের মোহ পেয়ে বসে তাকে। হযরত উসমান রাযি. তাকে যোগ্য মনে করেননি বলে তিনি অসন্তুষ্ট হয়ে মিশর চলে যান।

---

১. *ইসাবাহ* : তরজমায়ে মুহাম্মাদ ইবনে আবি বকর রাযি.।

মারওয়ান এবং সাঈদ ইবনে আস দুজনই ছিলেন উমাইয়া বংশের উঠতি বয়সী তরুণ। আকাবিরে মুহাজিরিনের ওফাতের পর তাঁদের অনেক উত্তরসূরিই পূর্বপুরুষদের ভূমিকা ও অবদান অনুসারে নিজেদের পদ ও অধিকারের দাবি তোলেন। হযরত উসমান রাযি. ছিলেন উমাইয়া বংশের। নিজ গোত্র ও পরিবারের লোকদের প্রতি তাঁর আস্থা ও ভরসা একটু বেশিই থেকে থাকবে। তাই বনু উমাইয়ার যুবকরাই মনোনয়ন-লাভের ক্ষেত্রে ছিলেন এগিয়ে। এই সুযোগে মারওয়ান এবং সাঈদও মনমতো পদাধিকার পেয়ে যান। এতে বনু কুরাইশের যুবকদের মনে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। হতে পারে এজন্যই, মুহাম্মাদ ইবনে আবু বকর এবং মুহাম্মাদ ইবনে আবু হুযাইফা হযরত উসমান রাযি.-এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহে সবচেয়ে বেশি তৎপর ছিলেন। তা ছাড়া নতুন দায়িত্বপ্রাপ্ত উমাইয়া তরুণদের মাঝে আকাবিরে সাহাবার সেই ন্যায়-নিষ্ঠা, সেই সততা ও স্বচ্ছতা, সেই তাকওয়া ও পরহেজগারি ছিল না। এজন্য সাধারণ জনগণ ও যোদ্ধারা, অন্তত যারা পূর্ববর্তী ব্যক্তিবর্গের গুণমুগ্ধ ছিলেন, এইসব তরুণদের কর্তৃত্ব ও নেতৃত্বের প্রতি সন্তুষ্ট থাকতে পারছিলেন না।

সবচেয়ে বড় কথা, আরবরা আজন্ম স্বাধীন, অনত, অনির্বাক। অপ্রিয় অকল্যাণের কাছে বশ্যতা স্বীকার করা তাদের পক্ষে ছিল অসম্ভব। তারা মুক্ত-স্বাধীন পরিবেশে বড় হওয়া—দুর্জয়, দুর্লঙ্ঘ। ইসলাম শুধু তাদের স্বভাববৈশিষ্টের মোড় পরিবর্তন করেছিল। তাদের তেজ ও উদ্দীপনাকে সত্য ও সুন্দরের দিকে পরিচালিত করেছিল। তাই তো শতধাবিভক্ত আরব হয়েছিল একতাবদ্ধ। একই বৃন্তের মৃণাল ধরে সুবাস ছড়িয়েছিল দিগ্‌বিদিক—সত্যের, সুন্দরের।

আকাবিরে সাহাবা কেরাম যাঁরা ছিলেন—যাঁরা ছিলেন ইসলামের শিক্ষা-দীক্ষা, আত্মশুদ্ধি ও সংস্কারের মূল উপাদান—এক মুহূর্তের জন্যও এই চরম সত্যটিকে ভুলে যাননি। তাঁরা সবসময়ই সতর্ক থেকেছেন যে, আরবদের ধমনীতে আছে আত্মসম্মান ও জাত্যাভিমান। যা শক্তিতে, সূক্ষ্মতায় পরমাণুকেও হার মানায়। কিন্তু বড় বড় পদাসনে নবনিযুক্ত তরুণসমাজ এই চরম ও পরম উপলব্ধি থেকে একটু দূরে সরে গিয়েছিলেন। তারা—কি ঘরোয়া মজলিসে, কি প্রকাশ্য দরবারে—নিজ

নিজ ব্যক্তিত্ব নিয়ে, বংশকৌলীন্য নিয়ে গর্ব করা শুরু করলেন। বিশেষ করে আরব গোত্রগুলোর পক্ষে এটা বরদাশত করা ছিল কঠিন। তাঁদের দাবি ছিল—নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর সিরিয়া, পারস্য, আফ্রিকা, মিশর ইত্যাদি বিজয়াভিযান সম্ভব হয়েছিল আমাদেরই অস্ত্রধারণের বদৌলতে। সুতরাং আমাদেরও প্রাপ্য আছে। অনারব নওমুসলিমগণ শুধু কুরাইশ ও উমাইয়া গোত্রের প্রতিই নয়, পুরো আরব-সমাজের প্রতিই ছিল মনস্তাপে ক্লিষ্ট। এজন্য এ ধরনের যে কোনো ফেতনায় তারা পালন করত অগ্রণী ভূমিকা। এদিকে আরব ও অনারবের সংযোগস্থলে ছিল কুফা নগরী। ফেতনার উদ্ভব হয়েছিল এই নগরী থেকেই। প্রকৃতপক্ষে, কুফা ছিল আরব গোত্রগুলোর সবচেয়ে বড় ছাউনি। সাঈদ ইবনে আস ছিলেন কুফার গভর্নর। রাতে তার দরবারে অধিকাংশ গোত্রেরই গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত হতেন। সাধারণত এই দরবারের আলোচনার বিষয়বস্তু হতো আরবের বিভিন্ন গৃহযুদ্ধ, জয়-পরাজয়ের ঘটনা, গোত্রে-গোত্রে কলহ, বংশকৌলীন্য, আত্মসম্মান, জাত্যাভিমান ইত্যাদি। নিঃসন্দেহে বিষয়টি—অন্তত আরবদের জন্য ছিল অত্যন্ত স্পর্শকাতর। প্রত্যেকেরই নিজ নিজ গোত্রের প্রতি গর্ব ছিল। কেউ কারও থেকে নিজেকে কম মনে করত না। তাই প্রায়ই আলোচনার সমাপ্তি হতো কথা কাটাকাটি, রাগারাগি ও তর্কবিতর্কের মধ্য দিয়ে। এরকম নাজুক মুহূর্তে সাঈদ ইবনে আসের কুরাইশ বংশ নিয়ে গর্ব করা ছিল তেলে জল ঢালার মতোই ভয়ঙ্কর। একপর্যায়ে গভর্নরের আত্ম-অহঙ্কার অপরাপর গোত্রপতিদের মনে ভীষণ ক্ষোভের সৃষ্টি করে। ক্ষেত্র প্রস্তুত হয় এক ভয়ঙ্কর ফেতনার।

ইবনে সাবা, প্রোপাগান্ডা, সাবাঈ গোষ্ঠী

এরই মধ্যে ইবনে সাবা নামক জনৈক ইহুদি ইসলাম গ্রহণ করে। ইহুদিদের চিরাচরিত চাল হলো—যখন শত্রুতা করে পারবে না, তখন অস্ত্র ফেলে দেবে; মুহূর্তেই পরিণত হবে পরম মিত্রে। ধীরে ধীরে মেতে উঠবে গোপন ষড়যন্ত্রে। 'বল না হলে ছল' এই তাদের কৌশল।

এই ইহুদিরাই যখন ঈসা মাসীহ-এর সঙ্গে শত্রুতা করে সুবিধা করতে পারেনি, তখন পালবস নামক ইহুদিকে দিয়ে খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করায় এবং ঈসা মাসীহ-এর শিক্ষা-দীক্ষায় গোলমাল পাকিয়ে দেয়।

মুনাফিক ইবনে সাবা লোকমুখে ছড়াতে লাগল, মূলত হযরত আলী রাযি.-ই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যোগ্য উত্তরসূরি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর পক্ষে ওসিয়তও করে গিয়েছেন। সে আরও বলতে লাগল, হযরত হারুন আ.-এর ব্যাপারেও ইহুদিদের এমনই বিশ্বাস ছিল। ইবনে সাবা এই নতুন প্রোপাগান্ডার প্রসারে আদাজল খেয়ে লাগল। রাজনৈতিক তৎপরতার বাহানায় ষড়যন্ত্রের জাল ছড়িয়ে দিল সর্বত্র। সে গোটা ইসলামী জাহানে দাপিয়ে বেড়াল। তার অপতৎপরতায় কুফা, বসরা, মিশর-সহ যেখানে-যেখানে মুসলিম সেনাছাউনি ছিল, রীতিমতো সবই পরিণত হলো পরিবর্তনকামীদের এক-একটা ঘাঁটিতে। ইবনে সাবা এদেরকে ঐক্যবদ্ধ করার চেষ্টা করল। ফাঁদে আটকা পড়া শিকারগুলোকে নিয়ে গড়ে তুলল একটি বিদ্রোহী গোষ্ঠী। মুসলিম ঐতিহাসিকগণ এদের আখ্যায়িত করেছেন 'সাবাঈ' নামে।

মিশরে বিদ্রোহ

হযরত উসমান রাযি.-এর শাসনামলে রোম ও আফ্রিকার উপদ্বীপগুলোতে তুমুল যুদ্ধ চলছিল। এজন্য সিংহভাগ সেনাসদস্যই ছিলেন সেদিকে ব্যস্ত। যুদ্ধে অংশগ্রহণের বাহানায় মুহাম্মাদ ইবনে আবু বকর এবং মুহাম্মাদ ইবনে হুযাইফা অনায়াসেই সেনাবাহিনীর মধ্যে আসা-যাওয়া ও ওঠা-বসা করতে পারতেন। তারা এই সুযোগের সৎ ব্যবহার করতে ছাড়েননি। ধীরে ধীরে সেনাবাহিনীর মধ্যে বিদ্রোহের আগুন জ্বলে ওঠে। একপর্যায়ে মিশর পরিণত হয় বিদ্রোহের মূল কেন্দ্রে। এ সময় মিশরের গভর্নর ছিলেন আবদুল্লাহ ইবনে আবু সুরাহ। মুহাম্মাদ ইবনে আবু বকর এবং মুহাম্মাদ ইবনে হুযাইফা মিলে হযরত উসমান রাযি. এবং আবদুল্লাহ ইবনে আবু সুরাহের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে আন্দোলন শুরু করেন। মিশরে উদ্ভব হয় নতুন রাজনৈতিক দলের, নতুন রাজনৈতিক নেতার।

বিদ্রোহ এবং মদীনা অবরোধ

ঘটনাক্রমে এটা ছিল হজের সময়। কুফা, বসরা ও মিশর থেকে প্রায় এক হাজার বিদ্রোহী হজের বাহানায় হেজাজ অভিমুখে যাত্রা করল। তারা মদীনার কাছাকাছি এসে তাঁবু গাড়ল। হযরত আলী রাযি.-সহ বড়-বড় সাহাবা কেরাম রাযি. বাধা দিলেন। অনেক বুঝিয়েসুঝিয়ে তাদেরকে ফেরত পাঠানো হলো। কিন্তু সামান্য কিছু দূর পিছু হটে তারা আবার ফিরে এল। তারা এবার মিশর-গভর্নরের নামে একটা বার্তা দেখাল। তাতে লেখা ছিল—বিদ্রোহীদের মূল হোতারা মিশর পৌঁছামাত্রই হয় কতল করে ফেলবে, না হয় কয়েদ করে ফেলবে। তারা অনুমান করল—এটা মারওয়ানের লেখা বার্তা হবে। তারা হযরত উসমান রাযি.-এর গৃহ অবরোধ করল এবং দুটো দফা দিল—হয় মারওয়ানকে আমাদের হাতে তুলে দিন, না হয় খেলাফতের দায়িত্ব থেকে সরে দাঁড়ান। হযরত উসমান রাযি. দুটো দাবিই প্রত্যাখ্যান করলেন।

অনুজ মুহাম্মাদ ইবনে আবু বকরকে বোঝানো

হযরত আয়েশা রাযি. ছোট ভাই মুহাম্মাদ ইবনে আবু বকরকে ডেকে আনালেন। তাকে এমন অবাঞ্ছিত অনাকাঙ্ক্ষিত হঠকারিতা থেকে ফিরে আসার অনুরোধ জানালেন, এবং সাধ্যমতো বোঝানোর চেষ্টা করলেন। কিন্তু তিনি নাছোড়বান্দা। উম্মুল মুমিনীনের কথায় কর্ণপাত করা তো দূরের কথা, উল্টো হঠকারিতা দেখিয়ে চলে গেলেন।

হজের সফর

হযরত আয়েশা রাযি. প্রতি বছরের ন্যায় হজব্রত পালনের উদ্দেশে মক্কাভিমুখে রওনা হলেন। মুহাম্মাদ ইবনে আবু বকরকেও সঙ্গে নিতে চাইলেন। কিন্তু তিনি তাতেও অসম্মতি জানালেন।

হযরত উসমান রাযি.-এর শাহাদাত

এরপর দু-তিন সপ্তাহ পর্যন্ত অবরুদ্ধ থেকে অবশেষে হযরত উসমান রাযি. বিদ্রোহীদের হাতে শাহাদাতের অমীয় সুধা পান করে প্রিয় বন্ধুদের সঙ্গে মিলিত হন। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিঊন।

হযরত আলী রাযি.-এর শাসনামল

খেলাফত-সঙ্কট

খেলাফতের জন্য চারজন বুযুর্গের প্রতিই ছিল অধিকাংশের নজর। তাঁরা হলেন হযরত তালহা রাযি., হযরত যুবায়ের রাযি., হযরত সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রাযি. এবং হযরত আলী রাযি.। এর মধ্যে হযরত সাদ রাযি. সংসারত্যাগী হয়ে পড়েন। সাধারণভাবে বসরাবাসীর মনোযোগ ছিল হযরত তালহা রাযি.-এর দিকে। আর মিশরবাসীর মনোযোগ ছিল হযরত যুবায়ের রাযি.-এর দিকে। তবে মিশরবাসী ও পরিবর্তনকামীদের একটি বিরাট অংশ চাইছিল হযরত আলী রাযি.-কে। এদের মধ্যে অগ্রণী ছিলেন আশতার নাখঈ, হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসির রাযি. এবং মুহাম্মাদ ইবনে আবু বকর রাযি.। অনেকে দ্বিতীয় খলীফার সাহেবজাদা হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাযি.-এর কথা বলছিল। বনু উমাইয়ারা বলছিল তৃতীয় খলীফার সাহেবজাদা হযরত আবানের নাম। প্রথম খলীফার পুত্র হযরত আবদুর রহমান রাযি.-এর নামও শোনা যাচ্ছিল। এভাবেই প্রায় তিন দিন পার হয়ে গেল। শেষমেষ বিদ্রোহীদের পীড়াপীড়িতে অল্প কিছু লোক ছাড়া মদীনার সর্বসাধারণের সম্মতিতে হযরত আলী রাযি. খেলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। হেজাজে তখনো মতভেদ ছিলই। সিরিয়ায় হযরত মুআবিয়া রাযি. স্বাধীনতা ও স্বায়ত্তশাসনের স্বপ্ন দেখছিলেন। মিশরে মুহাম্মাদ ইবনে আবু হুযাইফা ইতোমধ্যে স্বাধীনতা ঘোষণা করে ফেলেছেন।

হত্যাকাণ্ডে উম্মুল মুমিনীনের প্রতিক্রিয়া ও অবস্থান

নবীজীর একজন প্রিয় সাহাবী, মুসলমানদের রাষ্ট্রীয় নেতা ও সম্মানিত ইমাম হেরেমে নববীর অভ্যন্তরে অতি পবিত্র ও সম্মানিত মাসে মুসলমানদের হাতেই নৃশংসভাবে নিহত হলেন। এ এমন এক ট্রাজেডি ছিল যে, পুরো ইসলামী জাহানে একপ্রকার স্তব্ধতা ছেয়ে গেল। সাহাবা কেরামের মধ্যে হযরত উসমান রাযি.-এর কর্মকাণ্ডে যে সকল মহিমান্বিত ব্যক্তিবর্গ দ্বিমত প্রকাশ করেছিলেন, তাদের মধ্যে একটি বর্ণনা অনুযায়ী হযরত আয়েশা রাযি.-ও ছিলেন।[১] তাঁরাও এ লোমহর্ষক ঘটনায় ছিলেন কিংকর্তব্যবিমূঢ়। তাঁরা কেউই মুসলমানদের মধ্যে এমন অকল্যাণ ও বিপর্যয় কল্পনাও করতে পারেননি। হযরত উসমান রাযি.-এর হত্যাকাণ্ডের কিছুকাল পূর্বে আশতার নাখঈ হযরত আয়েশা রাযি.-কে জিজ্ঞেস করেছিলেন, এই লোকটিকে (হযরত উসমান রাযি.) মেরে ফেললে কেমন হয়? তিনি বললেন—আল্লাহর পানাহ, যিনি ইমামগণের ইমাম তাঁর ব্যাপারে এহেন ধৃষ্টতা![২]

বিদ্রোহীদের দু-একজন গুজব ছড়িয়েছিল, হত্যাকাণ্ডে হযরত আয়েশা রাযি.-এর সম্মতি ছিল। তাদের প্রোপাগান্ডার পক্ষে অবশ্য একটা যুক্তি ছিল—হযরত আয়েশা রাযি.-এর অনুজ মুহাম্মাদ ইবনে আবু বকর বিদ্রোহী গ্রুপের একটি বিরাট অংশের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন। কিন্তু হযরত আয়েশা রাযি. এ গুজবকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। তিনি হযরত উসমান রাযি.-এর স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বলেন—

> ‘আল্লাহর কসম, আমি কখনোই চাইনি যে, হযরত উসমান রাযি.-এর কোনোরকম অসম্মান হোক। যদি কখনো এমন কিছু চেয়ে থাকি, তবে আমারও যেন এমনই হয়। আমি কখনোই চাইনি, তিনি নিহত হন। যদি কখনো চেয়ে থাকি তবে আমিও যেন নিহত হই। হে উবাইদুল্লাহ ইবনে আদি (ইনার পিতা হযরত আলী রাযি.-এর পক্ষে যুদ্ধ করেছিলেন), আর যেন কেউ তোমাদের আমার ব্যাপারে ধোঁকা দিতে না পারে।

---

১. *তাবাকাতে ইবনে সাদ* : আহলে মদীনা, তরজমায়ে মারওয়ান ইবনে হাকাম।

২. *তাবাকাতে ইবনে সাদ*, পৃষ্ঠা : ৩৫৬।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবা কেরামের কর্ম ও কীর্তিকে ভূলুণ্ঠিত করার দুঃসাহস এই অবাঞ্ছিত দলটির উদ্ভব ঘটার আগে আর কারও হয়নি। এরা হযরত উসমান রাযি.-এর নামে অপবাদ আরোপ করেছে। শুধু তা-ই নয়, এরা এমন কিছু করেছেন—যা করা অনুচিত। এরা এমন কিছু বলেছেন—যা বলা অন্যায়। মুসলমানদের নামাযের সঙ্গে এদের নামাযের মিল নেই। আমি গভীরভাবে লক্ষ্য করেছি—এদের চিন্তাধারা, এদের কর্মধারা সাহাবা কেরামের চিন্তাধারা ও কর্মধারা থেকে অনেক দূরে।'[১]

পাঠক, চিন্তা করুন! শত্রুপক্ষের অজ্ঞাতনামা দু-একজনের ছড়ানো গুজবকে অসার বলে প্রত্যাখ্যান করার জন্য হযরত আয়েশা রাযি.-এর এমন দ্ব্যর্থহীন বক্তব্যের পরে আর কী লাগে?

সঙ্কট-নিরসনে আকাবিরে সাহাবার মশওয়ারা

পুরো মুসলিম-সমাজে রাজনৈতিক অস্থিরতা চরমে পৌঁছেছিল। ভীষণ উৎকণ্ঠা আর উত্তেজনার মধ্য দিয়ে কাটছিল সময়। সাহাবা কেরামের আলোকিত কাফেলা বুকের রক্তসিঞ্চনে তিলে-তিলে যে স্বর্গোদ্যান গড়ে তুলেছিলেন, চোখের সামনে আকস্মিক কোনো দুর্যোগে তা যেন তছনছ হয়ে যাচ্ছিল। সাহাবা কেরামের একটি ক্ষুদ্র কাফেলা আর সইতে পারলেন না; সংস্কার আর সংশোধনের ঝাণ্ডা উঁচু করলেন। এই ক্ষুদ্র কাফেলার নেতৃত্বে ছিলেন : হযরত তালহা রাযি., হযরত যুবায়ের রাযি. এবং উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা রাযি.।

কুরাইশের সর্বাগ্রে যাঁরা ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন হযরত তালহা রাযি. ছিলেন তাদের অন্যতম। অগণিত বিজয়াভিযানে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে থেকেছেন তিনি। প্রথম খলীফার জামাতা এবং সম্পর্কে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভায়রা হওয়ার সৌভাগ্য হয়েছে তাঁর। হযরত যুবায়ের রাযি.-ও কম ছিলেন না। তিনি

---

১. পুরো বক্তব্যটি ইমাম বুখারী রহ. خلق أفعال العباد অংশে উদ্ধৃত করেছেন। মাতবায়ে আনসারি, দিল্লি।

ছিলেন মুসলিম বীর, লড়াকু ও সাহসী যোদ্ধাদের অন্যতম। সম্পর্কে ছিলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ফুফাতো ভাই, ভায়রা এবং প্রথম খলীফার জামাতা। উপরন্তু এই দুই মহান মানুষই ছিলেন হযরত উমর রাযি. কর্তৃক খেলাফতের জন্য মনোনীত ছয় সদস্যের অন্তর্ভুক্ত।

যাই হোক, হযরত উসমান রাযি. অবরুদ্ধ থাকাবস্থায়ই হযরত আয়েশা রাযি. প্রতি বছরের রীতি অনুসারে হজের উদ্দেশে মক্কাভিমুখে যাত্রা করেছিলেন। তিনি হজ সম্পাদন করে মদীনায় ফিরছিলেন। পথিমধ্যে হযরত উসমান রাযি.-এর শাহাদাতের সংবাদ পেয়ে মর্মাহত হন। আরও কিছু দূর এগিয়ে আসার পর হযরত তালহা রাযি. এবং হযরত যুবায়ের রাযি.-এর সাক্ষাৎ পান। তাঁরা দুজন মদীনা থেকে পালিয়ে আসছিলেন। তাঁরা হযরত আয়েশা রাযি.-কে বললেন—

إِنَّا تَحَمَّلْنَا بِقِلَّتِنَا هَرَابًا مِّنَ الْمَدِيْنَةِ مِنْ غَوْغَاءٍ وَ أَعْرَابٍ وَفَارَقْنَا قَوْمًا حَيَارَى لَايَعْرِفُوْنَ حَقًّا وَلَا يُنْكِرُوْنَ بَاطِلًا وَلَا يَمْنَعُوْنَ أَنْفُسَهُمْ

অর্থ : আমরা কিছু উচ্ছৃঙ্খল যুবকের দৌরাত্ম্য ও অরাজকতা থেকে বাঁচতে মদীনা থেকে পালিয়ে এসেছি। মানুষের অবস্থা এই যে, তারা কোনটা ঠিক আর কোনটা ভুল, কিছুই বুঝতে পারছে না। গা বাঁচিয়ে চলা বা আত্মরক্ষা করাও সম্ভব হচ্ছে না।[১]

হযরত আয়েশা রাযি. তাঁদেরকে বললেন, আপনারা নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করুন—এই নাজুক মুহূর্তে আমাদের কী করা উচিত! এরপর তিনি নিচের কবিতাটি আবৃত্তি করলেন-

وَلَوْ أَنَّ قَوْمِيْ طَاوَعَتْنِيْ سُرَاتُهُمْ * لَأَنْقَذْتُهُمْ مِنَ الْحَبَالِ أَوِ الْخَبَلِ

অর্থ : যদি আমার জাতির নেতৃস্থানীয়রা আমার কথা মানতেন, তা হলে আমি তাদেরকে এই বিপদ থেকে উদ্ধার করতে পারতাম।

এরপর তাঁরা তিনজনই মক্কা মুআয্যমায় ফিরে এলেন। জনসাধারণ

---

১. *তারীখে তাবারী।*

তাঁদের প্রত্যাবর্তনের কথা জানতে পেরে চতুর্দিক থেকে ছুটে আসতে লাগলেন। তাঁরা সংস্কার ও সংশোধনের আহ্বান করলেন। উমরাহ বিনতে আবদুর রহমান থেকে বর্ণিত আছে, উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা রাযি. বললেন, আল্লাহ তাআলার এই বাণীকে যারা উপেক্ষা করবে তাদের মতো অপরাধী আর কেউ হবে না—[১]

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اقْتَتَلُوْا فَأَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوْا الَّتِيْ تَبْغِيْ حَتَّى تَفِيْءَ إِلَى أَمْرِ اللهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا

অর্থ : যদি মুমিন-সম্প্রদায়ের দুটো দল আত্মকলহে লিপ্ত হয়, তা হলে তাদের সংশোধন করো। আর যদি একটি দল অন্য দলের ওপর অন্যায় করে, তা হলে সকলে মিলে অন্যায়কারী দলটির বিরুদ্ধে লড়াই করো, যতক্ষণ না তারা আল্লাহর নির্দেশ মেনে নেয়। যদি মেনে নেয়, তা হলে তাদের সংশোধন করো। (সূরা হুজুরাত, আয়াত : ৯)

---

১. *মুআত্তা* ইমাম মুহাম্মাদ, বাবুত তাফসীর।

সংশোধনের আহ্বান

মুসলিম নারীর কর্তব্য ও অধিকারের সীমারেখা

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে একজন সাহাবী 'মেয়ের মত' যাচাই না করেই এক জায়গায় বিয়ে দিয়ে দেন। এমতাবস্থায় মেয়েটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শরণাপন্ন হন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার পিতাকে ডাকেন এবং বিবাহ ভেঙে দেওয়ার পরামর্শ দেন। তখন মেয়েটি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল, এখন আর এই বিবাহে আমার কোনো আপত্তি নেই। আমার উদ্দেশ্য ছিল—মেয়েদের ব্যক্তিগত অধিকারের বিষয়টি যেন স্পষ্ট হয়ে যায়।[১] যাই হোক, যদি উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা রাযি. রাজনীতিতে এসে থাকেন, তা হলে তা অবশ্যই এই বিষয়টিই প্রমাণ করবে যে, মুসলিম নারীর কর্তব্য ও অধিকারের সীমারেখা ততটা সংকীর্ণ নয়, যতটা সাধারণভাবে মনে করা হয়।

ইসলামের এই ক্রান্তিকালে উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা রাযি. না জানি কত ব্যথিত হয়েছিলেন! সন্তানদের চরম দুর্ভোগ ও দুরবস্থা দেখে মমতাময়ী মায়ের মনে কী বেদনার ঝড়ই না উঠেছিল! বিশেষ করে যখন তিনি নিশ্চিত হয়েছিলেন যে, একমাত্র তাঁর হস্তক্ষেপই পারে এই ঝড় থামাতে, এই কলহ মেটাতে।

---

১. *সুনানে নাসাঈ*, باب البكر يزوجها أبوها و هي كارهة। *সুনানে দারাকুতনী*, كتاب النكاح *মুসনাদে আহমাদ*।

তিনি ছিলেন উচ্চ মনোবলসম্পন্না

প্রকৃতিগতভাবেই তিনি ছিলেন উচ্চ মনোবলসম্পন্না। তাঁর পবিত্র হৃদয় ছিল তেজস্বিতায় দীপ্ত, সাহসিকতায় ভরা। তিনিই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে জিহাদে (ধর্মযুদ্ধ) অংশগ্রহণ করার অনুমতি চেয়েছিলেন; যদিও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে সে অনুমতি দেননি; বরং বলেছিলেন, হজই নারীর জিহাদ।[১] এরও আগে, যখন পর্দার বিধান ছিল না, তিনি বেশ কিছু বিজয়াভিযানে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে থেকেছিলেন। একটি বর্ণনা অনুযায়ী তিনি বদরের যুদ্ধেও সঙ্গে ছিলেন। উহুদের যুদ্ধে যখন মুসলিম সৈন্যগণ প্রায় পর্যুদস্ত, বীর লড়াকুদের পদও যখন টলমল, এমন ঝুঁকির মুখেও হযরত আয়েশা রাযি. দৌড়ে দৌড়ে আহত সৈনিকদের পানি পান করাচ্ছিলেন।[২] পরিখার যুদ্ধে মুসলিমগণ যখন অবরুদ্ধ, তখনো তিনি দুর্গ থেকে বের হয়ে যুদ্ধের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করছিলেন।[৩]

এ কথা অস্বীকার করার সুযোগ নেই যে, নারীর স্বভাব ও প্রকৃতি নেতৃত্বের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। স্বয়ং ইসলামই নেতৃত্বের যে অপরিহার্য গুণ ও শর্তাবলি আরোপ করেছে, তাতে নারী কখনোই নেতৃত্বের দায়ভার গ্রহণ করতে পারে না। এজন্যই ইসলাম তাদেরকে ঐশী বার্তাবাহকের দায়িত্ব (নবুওয়াত) দেয়নি; সঙ্গে সঙ্গে জনপ্রতিনিধিত্ব (খেলাফত) থেকেও দূরে থাকার নির্দেশনা দিয়েছে। তাই বলে, কখনোই এমন ভুল বোঝা বা বোঝানো উচিত হবে না যে, একজন মুসলিম নারী কোনোক্রমেই জনগণকে পথপ্রদর্শন করতে বা মুসলিম যোদ্ধাদের দিক-নির্দেশনা দিতে পারবেন না—বিশেষত যখন গোলযোগ ও বিশৃঙ্খলা সর্বভুক হয়ে দেশ ও জাতিকে গ্রাস করে ফেলার উপক্রম হয় এবং তিনি মনে করেন যে, মুসলমানদের মধ্যে তিনি ছাড়া আর কেউই এ আগুন নেভাতে পারবেন না। ইমাম মালেক রহ., ইমাম তাবারী রহ., (অন্য এক বর্ণনা অনুযায়ী) ইমাম আবু হানীফা রহ.-সহ কতিপয় ইমামের দৃষ্টিতে

---

১. *সহীহ বুখারী*, নারীদের হজ অধ্যায়।

২. *সহীহ বুখারী*, গাযওয়ায়ে উহুদ।

৩. *মুসনাদে আহমাদ*, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা : ১৪১।

প্রয়োজনে নারীও জনপ্রতিনিধি ও বিচারক হতে পারেন।[১] হযরত উমর রাযি. তাঁর শাসনামলে বাজার-ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব ন্যস্ত করেছিলেন একজন নারীর ওপর।[২] শুধু তা-ই নয়, স্বয়ং হযরত আয়েশা রাযি.-ও যখন নারীদের মজলিসে থাকতেন এবং নামাযের সময় হয়ে যেত, তখন তিনি মধ্যখানে দাঁড়িয়ে যেতেন ইমাম হিসেবে।[৩]

বসরা অভিমুখে

যাই হোক, এটা ছিল হজের বছর। উম্মুল মুমিনীনের আহ্বানে শুধু হেরেম শরীফ থেকেই ছয় হাজার মানুষ লাব্বাইক বলে সাড়া দিলেন। আরবের দুজন নামকরা গোত্রপতি—ইবনে আমের এবং ইবনে মাম্বাহ কয়েক লক্ষ দিরহাম ও সওয়ারি উটের ব্যবস্থা করলেন। কাফেলার গন্তব্য নির্ধারণের জন্য হযরত আয়েশা রাযি.-এর বিশ্রামাগারে পরামর্শ-সভা অনুষ্ঠিত হলো। হযরত আয়েশা রাযি.-এর মত ছিল, যেহেতু অবাঞ্ছিত সাবাঈ গোষ্ঠী এবং অন্যান্য বিদ্রোহীরা মদীনাতেই আছে, সেহেতু বাহিনী নিয়ে সেদিকেই যেতে হবে। হয়তো তাঁর মতই যথার্থ ছিল। এমনটা হলে, খুব সম্ভব, ঘটনার প্রেক্ষিত অন্য রকম হতো। কিন্তু সংক্ষিপ্ত আলোচনা ও পর্যালোচনার পর বসরা অভিমুখে রওনা করার সিদ্ধান্ত হয়। হযরত আয়েশা রাযি. কাফেলা নিয়ে বসরার দিকে রওনা হলেন। উম্মুল মুমিনীনগণ-সহ অপরাপর জনসাধারণ হযরত আয়েশা রাযি.-কে বিদায় জানাতে অনেক দূর পর্যন্ত এগিয়ে এলেন। মানুষ সঙ্গে সঙ্গে পথ চলছিলেন আর অশ্রু বিসর্জন দিচ্ছিলেন—এ কী হলো! এ কী হতে যাচ্ছে! মুসলমানদের ওপর এ কী বিভীষিকাময় সময় এসে পড়ল! ভাই ভাইয়ের রক্তপানে উদগ্রীব! আর সেই উৎকণ্ঠায়, সন্তানের ভালোবাসায় স্বয়ং মাতাকেই বের হতে হচ্ছে এত দিনের আরাধ্য নির্জনতা ও একাকিত্ব ভেঙে!

---

১. *ফাতহুল বারী* ও *কাসতালানি*, باب كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كسرى।

২. *আসমাউর রিজালে* শিফা আদাবিয়ার জীবনী দেখুন।

৩. *তাবাকাতে ইবনে সাদ*, পৃষ্ঠা : ৩৬০। *কিতাবুল উম্ম* : ইমাম শাফেয়ী রহ. : ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা : ১৪৫।

বনু উমাইয়ার দূষিত বীজ

এদিকে বনু উমাইয়ার উচ্ছৃঙ্খল যুবকদের পক্ষে, যাদের অন্যায় আর অনাচারের ফলেই পুরো মুসলিমজাহানে জ্বলে উঠেছিল বিদ্রোহের আগুন, আত্মরক্ষার জন্য এর চেয়ে সুবর্ণ সুযোগ আর কী হতে পারত? এতদিন তারা দাপিয়ে পালিয়ে বেড়িয়েছিল। এখানে-সেখানে আত্মগোপন করে শেষমেশ মক্কা শরীফের হেরেমে আশ্রয় নিয়েছিল। তাই কালক্ষেপন না করে সুযোগসন্ধানী বিষাক্ত বীজটিও ঢুকে পড়ল উম্মুল মুমিনীনের পবিত্র কাফেলায়। আগুনের মতো যেন চারদিক ছড়িয়ে পড়ল, স্বয়ং মাতা আছেন বাহিনীর নেতৃত্বে। পথে পথে অসংখ্য মানুষ যোগ দিতে লাগল শান্তিকামী কাফেলায়—অনির্বাচনীয় আবেগ আর অনুভূতি নিয়ে, অফুরন্ত উৎসাহ আর উদ্দীপনা নিয়ে।

বনু উমাইয়ার যুবকদের মনে না সংস্কারের বাসনা ছিল, না সমাধানের সংকল্প ছিল। তাদের যত মাথাব্যাথা ছিল—কী করে হযরত আলী রাযি.- কে প্যাঁচের পর প্যাঁচ আর নানা গোলকধাঁধায় ফেলা যায়। তারা ধরেই নিয়েছিল, হযরত আয়েশা রাযি.-এর নেতৃত্বে অচিরেই একটি তৃতীয় শক্তি মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে যাচ্ছে। নিঃসন্দেহে সেই তৃতীয় শক্তিটি হবে তাদের আরেক প্রতিপক্ষ। তাই যা করার এখনই করতে হবে। তারা অবিলম্বে গোপন ষড়যন্ত্রের জাল বিছাতে লাগল। যেহেতু সংশোধনকামী কাফেলায় একাধিক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ছিলেন, সেহেতু বনু উমাইয়ার যুবকদের যোগসাজশে জনমনে প্রশ্ন জাগল, অবাঞ্ছিত সাবাঈ গোষ্ঠীর পতনের পর বৃহত্তর মুসলিমজাহানের খলীফা হবেন কে? হযরত তালহা রাযি., না হযরত যুবায়ের রাযি.? হযরত আয়েশা রাযি. বিষয়টি বুঝতে পেরে অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে হাঙ্গামা প্রতিহত করলেন। কিন্তু জেগে উঠল নতুন প্রশ্ন—খেলাফতের কথা না হয় পরে ভাবা যাবে; কিন্তু আপাতত নামাযের ইমামতির হকদার কে? হযরত আয়েশা রাযি. হযরত তালহা রাযি. এবং হযরত যুবায়ের রাযি.-এর পুত্রদ্বয়কে একদিন-একদিন করে পালাক্রমে ইমামতির দায়িত্ব দিলেন।

হাওয়াবের পুষ্করিণী এবং একটি ভবিষ্যদ্বাণী

পথ চলতে চলতে হাওয়াবের পুষ্করিণী সামনে এল। একদল কুকুর কাফেলার ভিড় দেখে ঘেউঘেউ শুরু করল। সঙ্গে সঙ্গে হযরত আয়েশা রাযি.-এর মনে পড়ে গেল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র জবানে উচ্চারিত একটি ভবিষ্যদ্বাণী—একবার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পবিত্র স্ত্রীগণকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন, আল্লাহই জানেন, তোমাদের কাকে দেখে হাওয়াবের কুকুরগুলো ঘেউঘেউ করবে। ভবিষ্যদ্বাণী মনে পড়ামাত্রই হযরত আয়েশা রাযি. পিছু হটার সিদ্ধান্ত নিলেন। একাধারে কয়েকদিন কাফেলা এখানেই স্থির থাকল। অবশেষে প্রায় পঞ্চাশ জন সাক্ষ্য দিল, এটা হাওয়াব নয়। তাদের সাক্ষ্যের ভিত্তিতে হযরত আয়েশা রাযি. নিশ্চিন্ত হলেন।

অন্যদিকে হযরত আলী রাযি. উম্মুল মুমিনীনের বাহিনীর আগমনের কথা শুনে বসরার উদ্দেশে মদীনা থেকে যাত্রা করে ফেলেছেন। এদিকেও লোকমুখে রটে গেল, সামনে চলো, ওদিক থেকে হযরত আলী রাযি.-এর বাহিনী আসছে। দুদিক থেকে দুই বাহিনী যেন তিরগতিতে ধেয়ে চলেছে—এই হলো তাবারী ও অন্যান্য ইতিহাসগ্রন্থের বিবরণ। *মুসনাদে আহমাদে* ঘটনাটি স্বয়ং হযরত আয়েশা রাযি.-এর জবানিতেই বিবৃত :

قَالَتْ لَمَّا أَتَتْ عَلَىٰ الْحَوْأَبِ سَمِعَتْ نُبَاحَ الْكِلَابِ فَقَالَتْ مَا أَظُنُّنِيْ إِلَّا رَاجِعَةً . إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَنَا أَيَّتُكُنَّ تَنْبَحُ عَلَيْهَا كِلَابُ الْحَوْأَبِ فَقَالَ لَهَا الزُّبَيْرُ تَرْجِعِيْنَ عَسَى اللهُ أَنْ يُصْلِحَ بِكِ بَيْنَ النَّاسِ.

অর্থ : যখন কাফেলা হাওয়াবের নিকট পৌঁছল, তখন আমি কুকুরের ঘেউ ঘেউ আওয়াজ শুনতে পেলাম। আমি বললাম, এখন তো আমার মনে হচ্ছে, আমার ফিরে যাওয়া উচিত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের বলেছিলেন, জানি না, তোমাদের কাকে দেখে হাওয়াবের কুকুরগুলো ঘেউঘেউ করবে। তখন হযরত যুবায়ের রাযি. বললেন, আপনি ফিরে যেতে চাচ্ছেন? হতে পারে, আল্লাহ আপনার মাধ্যমে মুসলিম সম্প্রদায়ে শান্তি ফিরিয়ে দেবেন।

অন্য একটি বর্ণনায় শব্দগুলো এভাবে আছে :

فَقَالَ بَعْضُ مَنْ كَانَ مَعَهَا بَلْ تَقَدَّمِيْنَ فَيَرَاكِ الْمُسْلِمُوْنَ فَيُصْلِحُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ ذَاتَ بَيْنِهِمْ

অর্থ : তখন কিছু লোক বললেন, বরং আপনি সামনে এগিয়ে চলুন, কেননা যদি মুসলিমগণ আপনাকে দেখেন, তা হলে আশা করা যায়, আল্লাহ তাদের মধ্যে শান্তি ফিরিয়ে দেবেন।

এরকম একাধিক বর্ণনা থেকে স্পষ্টত প্রতীয়মান হয় যে, উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা রাযি.-এর শান্তিকামী কাফেলার সংশোধন আর শান্তিস্থাপন ছাড়া আর কোনোই উদ্দেশ্য ছিল না।

কুফাবাসীর অবস্থা

মক্কা মুআয্যমা, মদীনা মুনাওওয়ারা ও বসরার পর আরবের সবচেয়ে বড় নগরী ছিল কুফা। এখানকার আমীর ছিলেন হযরত আবু মুসা আশআরি রাযি.। উভয় পক্ষের প্রতিনিধিগণ যখন নিজ নিজ দলের পক্ষসমর্থনে যুক্তিতর্ক আর প্রমাণপঞ্জির মহড়া দিতে শুরু করেছেন, তখন হযরত আবু মুসা আশআরি রাযি. এটাকে একটা বড় ফেতনা মনে করে বিবৃতি ও বক্তব্যের মাধ্যমে জনসাধারণকে সব ছেড়ে নির্জনবাস ও একাকিত্ব বরণের পরামর্শ দিয়ে চলে গেলেন। হযরত আয়েশা রাযি. কুফার নেতৃবর্গের নামে পত্র প্রেরণ করতে লাগলেন। হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসির রাযি. এবং ইমাম হাসান রাযি. হযরত আলী রাযি.-এর পক্ষ নিলেন। তাঁরা হযরত আয়েশা রাযি.-এর আহ্বানে সাড়া দেওয়া থেকে পিছিয়ে গেলেন। উপরন্তু হযরত আম্মার রাযি. একদিন কুফার জামে মসজিদে বর্তমান প্রেক্ষাপট নিয়ে আলোচনা করলেন। তিনি বক্তব্যের শুরুতে হযরত আয়েশা রাযি.-এর মহত্ত্ব ও বড়ত্ব তুলে ধরলেন, এরপর বললেন, সবই ঠিক আছে; কিন্তু আল্লাহ তোমাদের পরীক্ষা করছেন—তোমরা সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য করতে পার কি না। তার বক্তব্য খুবই ক্রিয়াশীল প্রমাণিত হলো। কয়েক হাজার মানুষ তার সঙ্গে সুর মেলালেন। কিন্তু জনমনে সংশয় থেকেই গেল—একদিকে উম্মুল

মুমিনীন, অন্যদিকে রাসূলের পিতৃব্যপুত্র ও জামাতা। ঠিক কী করা উচিত, কেউই যেন ঠাহর করতে পারছিলেন না।

হযরত আয়েশা রাযি. বসরার সন্নিকটে পৌঁছে কয়েকজনকে তথ্য সংগ্রহের জন্য বসরায় পাঠিয়ে দিলেন। শহরের আরব সরদারদের নামে পত্রও পাঠালেন। শহরে পৌঁছে স্বয়ং কয়েকজন নেতার বাড়িতে গেলেন। জনৈক গোত্রপতি অসম্মত ছিল জেনে তিনি নিজেই তার কাছে গেলেন এবং বোঝালেন। লোকটি বললেন, এটা খুবই লজ্জার হবে যে, আমি স্বয়ং মাতার কথাও রাখব না।

বসরায় হযরত আয়েশা রাযি.-এর বক্তৃতা

হযরত আলী রাযি.-এর পক্ষ থেকে বসরার গভর্নর ছিলেন উসমান ইবনে হানীফ। তিনি ইমরান এবং আবুল আসওয়াদকে বাস্তবতা যাচাইয়ের জন্য পাঠিয়ে দিলেন। তারা হযরত আয়েশা রাযি.-এর খেদমতে হাজির হলেন এবং গভর্নরের পক্ষ থেকে তাঁর বসরা আগমনের কারণ জানতে চাইলেন। হযরত আয়েশা রাযি. তাদের জিজ্ঞাসার জবাবে নিম্নোক্ত বক্তব্যটি উপস্থাপন করলেন :

'আল্লাহর কসম, না আমার মতো মানুষ কখনো কোনো দুরভিসন্ধি নিয়ে ঘর থেকে বের হতে পারে, না কোনো মা তাঁর সন্তানদের কাছ থেকে প্রকৃত অবস্থা গোপন রাখতে পারে। ঘটনা এই যে, কিছু কিছু গোত্রের একটি দুষ্টচক্র মহিমান্বিত মদীনাপ্রাঙ্গনে হামলা চালিয়েছে; সেখানে অশান্তির আগুন জ্বালিয়েছে, তাদের সমর্থকরাই শুধু সেখানে নিরাপদে আশ্রিত, এজন্য এরা আল্লাহর অভিশাপের যোগ্য; শুধু তাই নয়, তারা নিরপরাধ খলীফাতুল মুসলিমীনকে নির্মমভাবে হত্যা করেছে, অন্যায়ভাবে পবিত্র রক্ত প্রবাহিত করেছে; যে সম্পদে হস্তক্ষেপের কোনো অধিকারই তাদের ছিল না, সে সম্পদও কুক্ষিগত করেছে; মহিমান্বিত নববীপ্রাঙ্গনের অপমান করেছে, পবিত্র হারাম মাসের অসম্মান করেছে;[১] সম্মানিত ব্যক্তিবৃন্দকে লাঞ্ছিত, অপদস্থ করেছে; নিরপরাধ মুলমানদের

---

১. হযরত উসমান রাযি. জিলহজ মাসে শহীদ হয়েছিলেন।

বেধড়ক মেরেছে, মুসলমানদের বাড়িঘরে জোরপূর্বক ঢুকে পড়েছে; অথচ মুসলিমগণ তাদেরকে জায়গা দিতে চায়নি। এরা ক্ষতিকর প্রমাণিত হয়েছে। এদের মাঝে কোনো কল্যাণ নেই। সহজ-সরল মুসলমানরা না এদের থেকে গা বাঁচিয়ে চলতে পারে, না এদের অনিষ্ট থেকে নিরাপদে থাকতে পারে। আমি মুসলমানগণকে অসহায় অবস্থায় রেখে এসেছি। মুসলিমসমাজের কত ক্ষতি হয়ে যাচ্ছে! ক্ষণে ক্ষণে কত অপরাধ সংঘটিত হচ্ছে! অথচ মহান আল্লাহ ইরশাদ করেছেন,

لَا خَيْرَ فِيْ كَثِيْرٍ مِّنْ نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوْفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ

অর্থ : তাদের অনেক আলাপ-আলোচনায়ই কোনো উপকার নেই। উপকার আছে শুধু তার কথায় যে আদেশ ও উপদেশ দেয় কল্যাণের, ন্যায়সঙ্গত কর্মের অথবা মানুষের মাঝে সংশোধনের। (সূরা নিসা, আয়াত : ১১৪)

শোনো, আমরা এই সংশোধনের আহ্বানই নিয়ে এসেছি। ছোট-বড়, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূল সকলকে এই আদেশই দিয়েছেন। আমাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এটাই। আমরা তোমাদেরকে পূণ্য অর্জনের এবং পাপ বর্জনের আহ্বান করছি।'

ইমরান এবং আবুল আসওয়াদ হযরত আয়েশা রাযি.-এর কাছ থেকে উঠে হযরত তালহা রাযি. এবং হযরত যুবায়ের রাযি.-এর কাছে গেলেন। তাঁদের সঙ্গে সাক্ষাতের পর পুনরায় হযরত আয়েশা রাযি.-এর কাছে গেলেন। হযরত আয়েশা রাযি. তাদের একজনকে সম্বোধন করে বললেন, আবুল আসওয়াদ, দেখো, তোমার প্রবৃত্তি যেন তোমাকে দোজখের দিকে টেনে না নেয়। এরপর তিনি এই আয়াতে কারীমা তেলাওয়াত করলেন :

كُوْنُوْا قَوَّامِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ

অর্থ : তোমরা আল্লাহর কাজের জন্য প্রস্তুত থাকো, ন্যায় ও সত্যের সাক্ষী হও। (সূরা মায়েদা, আয়াত : ৮)

বসরা-গভর্নরের অপরিণামদর্শিতা

ফল এই হলো যে, প্রতিনিধিদ্বয়ের একজন—ইমরান যুদ্ধ থেকে সরে দাঁড়ালেন এবং বসরার গভর্নরকেও যুদ্ধ পরিহারের পরামর্শ দিলেন। কিন্তু গভর্নর তার পরামর্শ প্রত্যাখ্যান করলেন। উল্টো আগে থেকেই একজন বাগ্মী বক্তা ঠিক করে রাখলেন শুক্রবার জুমার নামাযের পূর্বে যখন লোকজন সমবেত হবে, তখন উসকানিমূলক বক্তব্য দেওয়ার জন্য। ওই বক্তার বক্তব্য ছিল এরূপ:

'হাজিরিন, আমার নাম কায়স। এই মানুষগুলো, যাঁরা ইতোমধ্যে শহরের বাইরে এসে তাঁবু গেড়েছেন এবং আপনাদের কাছে সাহায্যের আবেদন করছেন, যদি জালেমদের হাত থেকে পালিয়ে এসে থাকেন এবং আপনাদের কাছে নিরাপত্তা চেয়ে থাকেন, তা হলে তাদের এ কথা মোটেও ঠিক নয়। কেননা তারা এসেছেন মক্কা থেকে, যেখানে মানুষ মারা তো দূরের কথা, পাখি শিকার করাও নিষিদ্ধ। আর যদি তারা এটা মনে করে এখানে এসে থাকেন যে, আমাদের থেকে উসমান-হত্যার প্রতিশোধ নেবেন, তা হলে তো আমরা উসমানের হত্যাকারী নই। আমার কথা শুনুন, তারা যেখান থেকে এসেছেন, সেখানেই তাদেরকে ফিরে যেতে বলুন।'

শাস্ত্রজ্ঞ বক্তার বিভ্রান্তিকর তর্কজালে ফল যা হওয়ার হলো। এরই মধ্যে আগন্তুকদের মধ্য থেকে আরেকজন বলে উঠল :

'এই লোকগুলো কি বলছে যে, আমরা উসমান রাযি.-এর হত্যাকারী? বলছে না তো? এই লোকগুলো এজন্য আমাদের কাছে এসেছে যে, উসমান রাযি.-এর হত্যাকারীদেরকে শাস্তিপ্রদানে এরা আমাদের সাহায্য-সহযোগিতা লাভ করবে; যদি একথা সত্য হয়, যেমনটা তুমি বলছ, যে, তারা নিজ ঘরবাড়ি থেকে বিতাড়িত হয়ে এখানে এসেছে, তা হলে, তাদেরকে রক্ষা করবে কীসে? শহর, না শহরের মাঠ-ঘাট?'

আগন্তুকের শ্লেষাত্মক মন্তব্য বক্তৃতা ও বাগ্মিতার রীতি অনুসারে আগেরটার চেয়ে কোনো অংশে কম ছিল না।

উত্তাল জনসমুদ্র : মতৈক্য ও মতানৈক্য

একের পর এক আক্রমণাত্মক বক্তৃতা, শ্লেষাত্মক মন্তব্য ও বাদানুবাদের ঝড় বয়ে যাচ্ছে। এরই মধ্যে হযরত আয়েশা রাযি., হযরত তালহা রাযি. এবং হযরত যুবায়ের রাযি.-ও সমর্থকদের সঙ্গে নিয়ে ময়দানে এসে গেলেন। প্রথমে হযরত তালহা রাযি. এবং পরে হযরত যুবায়ের রাযি. বক্তৃতা দিলেন। একের পর এক বক্তৃতা উত্তাল জনসমুদ্রে মতৈক্য ও মতানৈক্যের ঝড় তুলল।

হযরত আয়েশা রাযি.-এর বক্তব্য

অবস্থা লক্ষ করে হযরত আয়েশা রাযি. অত্যন্ত ভাবগম্ভীর ও উচ্চ আওয়াজে কথা বলতে লাগলেন। হামদ ও সানার পর তাঁর বক্তব্যের শব্দগুলো ছিল নিম্নরূপঃ

'লোকেরা উসমান রাযি.-এর ওপর আপত্তি করত। তাঁর আমলে বিভিন্ন পদধারী উচ্ছৃঙ্খল যুবকের দোষ-ত্রুটির কথা বলত। মদীনায় এসে আমাদের কাছে অভিযোগ-অনুযোগ করত, পরামর্শ চাইত। আমরা তাদেরকে সান্ত্বনা ও উপদেশ দিতাম এবং বিভিন্নভাবে বোঝানোর চেষ্টা করতাম এবং তারা বুঝত। উসমান রাযি.-এর ওপর যে আপত্তিগুলো উত্থাপিত হয়েছিল, আমরা সেগুলো নিয়ে অনেক ভেবেছি। আসলে তিনি নির্দোষ, খোদাভীরু ও সরল পথের পথিক ছিলেন। পক্ষান্তরে যারা যেখানে-সেখানে হট্টগোল করত, আমাদের দৃষ্টিতে তাদেরকেই পাপী, প্রতারক ও পথভ্রষ্ট মনে হয়েছে। তাদের মনে ছিল এক, মুখে ছিল আরেক। ছলনার আশ্রয়ে যখন তাদের দল ভারী হয়ে গেল, তখন বিনা কারণে নিরপরাধ উসমান রাযি.-এর গৃহে ঢুকে পড়ল। যেই রক্ত তাদের জন্য বৈধ ছিল না, সেই রক্তই বইয়ে দিল। যেই সম্পদে তাদের কোনো অধিকার ছিল না, সেই সম্পদই আত্মসাৎ শুরু করল। যেই পবিত্র ভূমির সম্মান করা তাদের কর্তব্য ছিল, তারও অসম্মান করে ছাড়ল। ...হাঁ, এখন আমাদের যা করতে হবে, এবং যার বিরোধিতা করা মোটেই ঠিক হবে না, তা হলো—হযরত

উসমান রাযি.-এর হত্যাকারীদের অবিলম্বে গ্রেফতার করা এবং তাদের ওপর আল্লাহর বিধান কার্যকর করা। মহান আল্লাহ ইরশাদ করেছেন,

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَىٰ كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّىٰ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ وَهُم مُّعْرِضُونَ

অর্থ : আপনি কি তাদের দেখেননি, যাদেরকে আল্লাহর কিতাবের একটি অংশ দেওয়া হয়েছে? তাদের আল্লাহর কিতাবের দিকে আহ্বান করা হতো, যেন তারা সে অনুযায়ী তাদের মাঝে বিচারাচার করে; অথচ তারপর তাদের একটি দল উপেক্ষা-প্রদর্শনপূর্বক আল্লাহর কিতাব থেকে সরে গেল। (সূরা আ-লি ইমরান, আয়াত : ২৩)'

কিছু কিছু গ্রন্থে[১] বিরাজমান পরিস্থিতিতে হযরত আয়েশা রাযি. থেকে আরও একটি বক্তৃতা সংকলিত হয়েছে, যা বাগ্মিতা ও অলঙ্কারশিল্পে পূর্বোক্ত বক্তৃতা থেকে আরও উন্নত। বক্তৃতাটি এই :

'লোকসকল, থামুন, শান্ত হোন!' হযরত উম্মুল মুমিনীনের মুখে উচ্চারিত শব্দগুলো এতটাই গাম্ভীর্যপূর্ণ ও ঐশী বলে বলীয়ান ছিল যে, মুহূর্তের মধ্যে পুরো ময়দানে স্তব্ধতা ছেয়ে গেল, চোখের পলকে বিশাল জনসমুদ্র নীরব-নির্বাক-নিস্তব্ধ হয়ে গেল। হযরত আয়েশা রাযি. বক্তব্যের শাণিত ধারাকে গতিময় করলেন এভাবে :

'আপনাদের ওপর আমার মাতৃত্বের অধিকার রয়েছে। আপনাদের উপদেশ দেওয়ার সম্মানও আমি প্রাপ্ত হয়েছি। যে তার প্রতিপালকের প্রকৃত অনুগত বান্দা নয় সে ছাড়া, কেউই আমাকে দোষারোপ করতে পারে না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

---

১. বক্তৃতাটি ইবনে আবদি রাব العقد الفريد গ্রন্থের الخطب অধ্যায়ে এবং জঙ্গে জামাল অংশে পুরোপুরি উদ্ধৃত করেছেন। শাহ ওয়ালিউল্লাহ রহ. ইযালাতুল খাফা গ্রন্থে জঙ্গে জামালের আলোচনায় এর একটি অংশের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। আহমদ ইবনে আবি তাহের (মৃত্যু : ২০৪ হি.) বালাগাতুন নিসা গ্রন্থে বক্তৃতাটি তুলে ধরেছেন।

আমার বুকে মাথা রেখেই মৃত্যুবরণ করেছেন। আমি তাঁর প্রিয় পত্নীগণের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ আমাকে অন্য যে কোনো মানব-সংস্পর্শ থেকে সুরক্ষিত রেখেছেন।[১] আমার সম্মানেই মুমিন আর মুনাফিকের ভেদ উন্মোচিত হয়েছে।[২] আমার কারণেই আল্লাহ আপনাদের তায়াম্মুমের বিধান দান করেছেন। আমার সম্মানিত পিতাই[৩] ছিলেন পৃথিবীর বুকে তৃতীয় মুসলমান। তিনিই মহিমান্বিত হেরা গুহার ঈর্ষণীয় দুজনের দ্বিতীয় জন। পৃথিবীতে তিনিই প্রথম সিদ্দীক উপাধিতে ভূষিত হয়েছেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট থেকে, তাঁকে খেলাফতের তাজ প্রদান করে। যখনই ইসলাম ধর্মের ওপর কোনো আঘাত এসেছে, তখনই আমার পিতা শক্ত হাতে তা প্রতিহত করেছেন। মুনাফিকদের ফেতনার মোকাবেলা করেছেন। ধর্মদ্রোহীদের উচ্ছেদ করেছেন। ইহুদিদের চক্রান্তকে নস্যাৎ করেছেন। আপনারা তাঁর সময়ে অভ্যন্তরীণ যে কোনো গোলযোগ ও বিশৃঙ্খলা থেকে নিশ্চিন্তে থাকতে পেরেছেন। নেতৃস্থানীয়দের নিয়ে কোনো বাদানুবাদ, কোনো ঝগড়া-বিবাদ আপনাদের কর্ণগোচর হয়নি। তিনি কন্টকাকীর্ণকে করেছেন কুসুমাস্তীর্ণ, অচলাবস্থাকে করেছেন সচল, প্রহরাকে করেছেন নিশ্ছিদ্র। তিনি অন্তরের ব্যাধিগুলোর নিরাময় করেছেন। যে তৃপ্ত, তাকে পৌঁছে দিয়েছেন ঘরে। যে পিপাসার্ত, তাকে নিয়ে এসেছেন ঘাটে। যে একবার পান করেছে, তাকে আরেকবার পান করিয়েছেন। এভাবে, যখন সকল ফেতনার মূলোৎপাটন হলো এবং মুসলমানরা পেলেন খেলাফতে রাশেদার স্বাদ, তখন আল্লাহ তাঁকে উঠিয়ে নিলেন আপন রহমতের কোলে। বিদায়লগ্নে তিনি এমন এক মহান ব্যক্তিকে স্থলাভিষিক্ত করে গেলেন, প্রজাদের সুরক্ষায় যিনি ছিলেন একনিষ্ঠ, ভ্রান্তি থেকে দূরে—মদীনার দুই পাহাড়ের চেয়েও দূরে।

---

১. তিনিই একমাত্র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কুমারী স্ত্রী ছিলেন।

২. ইফকের (অপবাদ আরোপের) ঘটনার ইঙ্গিত।

৩. এর কাছাকাছি অর্থের আরও একটি সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা *মুজামুত তাবারানি* গ্রন্থে মুহাম্মাদ ইবনে হাসানের সূত্রে বর্ণিত আছে; পৃষ্ঠা : ২১৮ (মাতবুআয়ে আনসারি, দিল্লি)।

যিনি ইসলামের দুশমনদের প্রতি ছিলেন কঠোর। সরলমনা মানুষের প্রতি ছিলেন উদার। মুসলমানদের কল্যাণে জেগেছেন রাতের পর রাত। চলেছেন অগ্রবর্তীদেরই পথে। ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছেন বিশৃঙ্খলা ও গোলযোগের প্রতিটি বীজ। অক্ষরে অক্ষরে বাস্তবায়ন করেছেন পবিত্র কুরআনের প্রতিটি বাণী। ...হাঁ, আজ আমি আমার সন্তানদের প্রশ্নবাণের লক্ষ্যবস্তু—কেন এভাবে সৈন্যসামন্ত নিয়ে ঘর থেকে বের হয়েছি? কী আমার উদ্দেশ্য? আমার উদ্দেশ্য বিশৃঙ্খলা ও গোলযোগকে উসকে দেওয়া নয়; আমার উদ্দেশ্য বিশৃঙ্খলা ও গোলযোগের মূলোৎপাটন করা। আমি যা বলছি, সত্য ও ন্যায়ের সঙ্গে বলছি। আমি যা করছি, সজাগ ও সচেতনভাবে করছি। আল্লাহর কাছে প্রার্থনা, তিনি যেন তাঁর রাসূলের প্রতি করুণা বর্ষণ করেন এবং রাসূলের স্থলবর্তীদের সাহচর্য ও স্থলবর্তিতার সম্মান আপনাদের নসীব করেন।'

পক্ষাবলম্বন : দলাদলি ও বাদানুবাদ

হযরত আয়েশা রাযি.-এর বক্তব্যের প্রভাবে বিশাল উপস্থিতি যেন মন্ত্রমুগ্ধ ও সম্মোহিত হয়ে পড়েছিল। এক-একটা কথা যেন তির হয়ে বিদ্ধ করেছিল শত্রুদের হৃদয়। অবচেতন মনে তাদের মুখ থেকেও বেরিয়ে পড়ল—মাতা ঠিক বলেছেন, মাতা সত্য বলেছেন। মুহূর্তের মধ্যে অসংখ্য মানুষ নিজ নিজ সারি ভেঙে দাঁড়িয়ে যেতে লাগল মহীয়সী মাতার সংশোধনকামী কাফেলায়। তখনো যাদের ভিন্ন মত ছিল, তারা কিছু বললে, সঙ্গে সঙ্গে অন্যরা কড়া ভাষায় উত্তর দিতে একটুও বিলম্ব করছিল না।

একপর্যায়ে দুই দলের লোকজনের মধ্যে তর্ক-বিতর্ক ও বাদানুবাদ শুরু হয়ে গেল। একটু একটু করে অবস্থা অন্য দিকে গড়াতে লাগল। হযরত আয়েশা রাযি. সংঘর্ষ এড়াতে সংশোধনকামী কাফেলাকে প্রত্যাবর্তনের নির্দেশ দিলেন। গভর্নরের লোকদের মধ্যে যারা হযরত আয়েশা রাযি.-এর বক্তব্য শুনে মত পাল্টিয়েছিলেন, তারাও নিজ দল ছেড়ে সংশোধনকামী কাফেলার সঙ্গে চলে এলেন।

বিরোধী পক্ষের আক্রমণ এবং তাঁর ধৈর্যধারণ

পরের দিন উভয় পক্ষের লোকজন দলবেঁধে সারিবদ্ধভাবে বাইরে এল। বিরোধী পক্ষের নেতা ছিলেন হাকিম নামক জনৈক যোদ্ধা। তিনি বরাবরই সংঘাত বাধানোর চেষ্টা করছিলেন। শান্তিবাহিনীর লোকেরা নিজ নিজ স্থানে দাঁড়িয়ে ছিলেন। হযরত আয়েশা রাযি. বরাবরের মতো উভয় পক্ষকে শান্তি ও সমঝোতার এবং ধৈর্য ও সহনশীলতার নির্দেশনা দিচ্ছিলেন। কিন্তু হাকিম নাছোড়বান্দা; কিছু একটা করেই ছাড়বে; একপর্যায়ে অধৈর্য হয়ে আক্রমণের নির্দেশ দিল নিজ দলের লোকদেরকে। শান্তিবাহিনী তবুও হাত গুটিয়ে দাঁড়িয়ে। এ অবস্থা দেখে, হাকিম নিজ বাহিনীকে লক্ষ্য করে বলল—সাথীরা, কাপুরুষ কুরাইশদের দ্যাখো, ওদের ভীরুতাই আজ ওদের মৃত্যুর কারণ হবে। লোকজন রাস্তার মোড়ে দাঁড়ানো। উভয় দিক থেকে ইট-পাটকেল ও পাথর নিক্ষেপ শুরু হলো। একপর্যায়ে রক্তপাত ও হতাহতের ঘটনা ঘটে গেল। হযরত আয়েশা রাযি. এবারও সংঘাত এড়ানোর জন্য নিজ বাহিনীকে পিছু হটার নির্দেশ দিলেন। শান্তিবাহিনী পিছু হটল। তারা ওই স্থান ত্যাগ করে অন্য এক জায়গায় আশ্রয় নিলেন। হাকিমের বাহিনী সেখানেও চড়াও হওয়ার জন্য ধেয়ে এল। কিন্তু রাত ঘনিয়ে আসায় ফিরে যেতে বাধ্য হলো তারা।

আবুল জারবার মধ্যস্থতা

ঝামেলা এখানেই মিটে যাক, এমনটাই চাচ্ছিলেন অধিকাংশ মানুষ। আবুল জারবা তাইমি নামক জনৈক ব্যক্তি হযরত আয়েশা রাযি.-সহ অন্যান্যদের সঙ্গে মতবিনিময় করলেন। সকলে তার সিদ্ধান্ত মেনে নিয়ে অন্যত্র চলে গেলেন এবং তাঁবু ফেললেন।

হাকিমের ধৃষ্টতা

সকাল হলে গভর্নরের বাহিনী আবারও সামনে এল। হাকিম পথ মাড়াচ্ছিল আর হযরত আয়েশা রাযি.-এর সম্পর্কে অশালীন কথা বলছিল। কায়স গোত্রের জনৈক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলেন, কার সম্পর্কে এমন অশালীন মন্তব্য করছেন আপনি? হাকিম যেন তেলে-বেগুনে জ্বলে

উঠল। অত্যন্ত ধৃষ্টতার সঙ্গে বলল, আয়েশা [রাযি.] সম্পর্কে। লোকটি হতভম্ব হয়ে বললেন, আরে শয়তান, উম্মুল মুমিনীনের শানে তোর মুখ থেকে এমন কথা বের হচ্ছে? হাকিম বর্শা মেরে লোকটিকে থামিয়ে দিল। কিছু দূর গিয়ে এক মহিলার সঙ্গেও একই আচরণ করল। আবদুল কায়সের গোত্র হাকিমের এহেন আচরণে তার পক্ষ ত্যাগ করল।

বসরা বিজয়

হাকিমের প্ররোচনায় বিরোধী গোষ্ঠী পুরো দমে প্রস্তুত, যে কোনো মুহূর্তে হামলা করবে; এবং করলও। হযরত আয়েশা রাযি.-এর পক্ষ থেকে জনৈক ঘোষক একের পর এক শপথ বাক্য উচ্চারণ করে করে আক্রমণ বন্ধ করার অনুরোধ করছিলেন। কিন্তু তারা কোনোক্রমেই আক্রমণ বন্ধ করল না। অবশেষে শান্তিবাহিনীও আত্মরক্ষা করতে লাগলে ঘটনাটি যুদ্ধের রূপ পরিগ্রহ করে। বিরোধীদের লাশের স্তূপ পড়ে যায়। তারা হতভম্ব হয়ে দিগ্‌বিদিক ছুটোছুটি শুরু করে এবং চিৎকার করে 'আমান আমান' আওয়াজ তোলে। অবশেষে উভয় পক্ষ এই শর্তে সন্ধি করে যে, বসরা থেকে একজন প্রতিনিধি মদীনায় যাবে এবং জনসম্মুখে জানতে চাইবে—হযরত তালহা রাযি. এবং হযরত যুবায়ের রাযি. কি স্বেচ্ছায় হযরত আলী রাযি.-এর খেলাফত মেনে নিয়েছেন, নাকি তাদেরকে বাধ্য করা হয়েছে? স্বেচ্ছায় হলে বিরোধীদের বসরা ছেড়ে দেওয়া হবে, অন্যথায় বিরোধীরাই বসরা ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য থাকবে।

প্রতিনিধি যেদিন মদীনায় পৌঁছে, ঘটনাক্রমে সেদিন ছিল শুক্রবার। সকল সাহাবা কেরাম এবং অপরাপর মুসলমানগণ মসজিদে নববীতে উপস্থিত ছিলেন। প্রতিনিধি উপস্থিতিকে লক্ষ্য করে উচ্চস্বরে জিজ্ঞেস করেন—হে মদীনাবাসী, আমি বসরা থেকে মদীনায় প্রতিনিধি হয়ে এসেছি। মহিমান্বিত ব্যক্তিদ্বয় (হযরত তালহা রাযি. এবং হযরত যুবায়ের রাযি.) কি খুশিমনে বাইয়াত গ্রহণ করেছেন, নাকি জোরপূর্বক তাদেরকে বাধ্য করা হয়েছে? আগন্তুকের প্রশ্নে মজলিসে অদ্ভুত নীরবতা ছেয়ে গেল। কেউ কোনো কথা বলছিলেন না। হঠাৎ একটি আওয়াজ নীরবতার

আস্তরণ ভেঙে দিল। এটা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পালকপৌত্র, হযরত উসামা ইবনে যায়েদ রাযি.-এর আওয়াজ ছিল। তিনি বলে উঠলেন, তাঁরা স্বেচ্ছায় বাইয়াত গ্রহণ করেননি; বরং জোরপূর্বক করানো হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে সাহল বিন হানীফ আনসারি (হযরত আলী রাযি.-এর ধর্মভাই[১]) লাফ দিয়ে গিয়ে তাঁকে ধরে ফেললেন। এ অবস্থা দেখে হযরত সুহাইব রাযি., হযরত আবু আইয়ুব রাযি., হযরত মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামাহ রাযি.-সহ অন্যান্য সাহাবা কেরাম বলতে লাগলেন—হাঁ, হাঁ, উসামা সত্য বলেছে। এরপর হযরত সুহাইব রাযি. হযরত উসামা রাযি.-কে ছাড়িয়ে নিয়ে ঘরে পৌঁছে দিলেন এবং বললেন—বাবা, আমরা সবাই যেমন চুপচাপ ছিলাম, তুমিও তেমন চুপচাপ থাকতে।

রাস্তায় হযরত আলী রাযি.-কে সন্ধির শর্ত জানানো হলে তিনি বসরার গভর্নরের নামে একটি পত্র লিখলেন :

'যদি তাঁদেরকে জোরপূর্বক বাইয়াত গ্রহণ করানো হয়ে থাকে, তা হলে তা শুধু এজন্য যে মুসলমানদের মধ্যে যেন বিভেদ ও দলাদলির সৃষ্টি না হয়।'

প্রতিনিধি বসরায় ফিরে এসে মদীনার অবস্থা ব্যক্ত করল। বিরোধীরা বিপরীতে হযরত আলী রাযি.-এর পত্র উপস্থাপন করল। তখনো আলোচনা চলছেই। এরই মধ্যে ঘটে গেল আরেক ঘটনা। সন্ধির সময়কালে উভয় পক্ষ একই জায়গায়, একই মসজিদে, একই ইমামের পেছনে নামায পড়ার কথা। কিন্তু ভুলবশত একবার এই পক্ষ তাদের একজনকে ইমাম বানিয়ে আগে বাড়িয়ে দেয় এবং নামায শুরু করে। অনারব-মনা বেশ কিছু লোক ক্ষিপ্ত হয়ে তলোয়ার বের করে হামলা করে। তারাও প্রতিউত্তরে তলোয়ার চালায়। এই ঘটনায় বসরার গভর্নর সংশোধনকামী বাহিনীর হাতে বন্দী হন। হযরত আয়েশা রাযি. জানতে পেরে গভর্নরকে মুক্ত করে দেন এবং ঘোষণা করেন—হযরত উসমান রাযি.-এর হত্যায় জড়িতদের ছাড়া আর কাউকে কিছু করা হবে না।

---

১. *তাহযিব* ও *ইসাবাহ*, ইবনে সাদের উদ্ধৃতি অনুযায়ী।

ঘোষণা শুনে সাধারণ জনগণ অস্ত্র ত্যাগ করেন। কিন্তু হাকিম কোনো কিছুই গায়ে মাখল না। সে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার জেদ ধরল। এক শয়তান রাতের অন্ধকারে হযরত আয়েশা রাযি.-এর ঘরে ঢুকে তাঁকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করল। সে বারান্দা পর্যন্ত পৌঁছেও গিয়েছিল; কিন্তু হাতেনাতে ধরা পড়ায় তার চক্রান্ত নস্যাৎ হয়ে যায়। যাই হোক, শেষমেশ শান্তিকামী কাফেলারই বিজয় হলো। বসরা তাদের দখলে এসে যায়। শহরের অধিকাংশ মানুষই আনুগত্য স্বীকার করে। বসরার ধনভাণ্ডার হতে যোদ্ধাদের ওজিফা প্রদান করা হয়।

আমীর-ওমরার নামে পত্র প্রেরণ

কুফা, দামেশক ও মদীনায় বিজয়নামা প্রেরণ করা হয়। হযরত আয়েশা রাযি. কুফার নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবৃন্দের নামে যে পত্র প্রেরণ করেছিলেন তা এই :

'পরকথা, আমি আপনাদের আল্লাহ এবং ইসলাম স্মরণ করার উপদেশ দিচ্ছি। আল্লাহর কিতাবের যথার্থ বাস্তবায়ন করুন। আল্লাহকে ভয় করুন এবং তাঁর রজ্জুকেই আঁকড়ে থাকুন। কখনোই এই কিতাবের সঙ্গ ছাড়বেন না। আমরা বসরাবাসীকে আল্লাহর কিতাবের বাস্তবায়নের আহ্বান করেছি। উম্মতের সৎ লোকেরা আমাদের ডাকে সাড়া দিয়েছে। কিন্তু যাদের মধ্যে ভালোত্ব ছিল না, তারা অস্ত্রের মাধ্যমে আমাদের মোকাবেলা করতে চেয়েছে। তারা বলেছে, তোমাদেরকেও উসমান [রাযি.]-এর সঙ্গে পরপারে পাঠিয়ে দিচ্ছি। হঠকারিতা করে তারা আমাদের কাফের বলেছে। আমাদের সম্পর্কে অশালীন মন্তব্য করেছে। আমরা তাদেরকে কুরআনের আয়াত পড়ে শুনিয়েছি :

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللّٰهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ وَهُمْ مُّعْرِضُونَ

অর্থ : আপনি কি তাদের দেখেননি, যাদেরকে আল্লাহর কিতাবের একটি অংশ দেওয়া হয়েছে? তাদের আল্লাহর কিতাবের দিকে আহ্বান

করা হতো, যেন তারা সে অনুযায়ী তাদের মাঝে বিচারাচার করে; অথচ তারপর তাদের একটি দল উপেক্ষাপ্রদর্শনপূর্বক আল্লাহর কিতাব থেকে সরে গেল। (সূরা আলে ইমরান, আয়াত : ২৩)

এ কথা শুনে কিছু মানুষ আমাদের মেনে নিয়েছে, কিছু মানুষ ভিন্নমত পোষণ করেছে। আমরা তাদের কিছু বলিনি, পিছু নিইনি। তারপরও তারা আমাদের সাথীদের ওপর তলোয়ার চালিয়েছে। বসরার গভর্নর উসমান বিন হানিফ তাদেরকে আমার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার নির্দেশ দিয়েছে। কিন্তু আল্লাহ তাঁর নেক বান্দাদের দ্বারা আমাকে সাহায্য করেছেন এবং তাদের চক্রান্তকে তাদের ওপরই আপতিত করেছেন। আমরা দীর্ঘ ২৬ দিন ধরে তাদেরকে আল্লাহর কিতাবের দাওয়াত দিয়ে এসেছি। আমরা বোঝানোর চেষ্টা করেছি, অপরাধীরা ছাড়া আর কারও যেন রক্তপাত না ঘটে। কিন্তু তারা আমাদের বিরুদ্ধে নানা অজুহাত দাঁড় করিয়েছে। তারপরও আমরা সন্ধি করেছি। কিন্তু তারা কথা রাখেনি। তারা বিশ্বাসঘাতকতা করে সৈন্য প্রস্তুত করেছে। আল্লাহ হযরত উসমান রাযি.-এর কেসাস বাস্তবায়নের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে দিয়েছেন। এখানকার একজন ছাড়া বিদ্রোহীদের কেউ রক্ষা পায়নি। আল্লাহ কায়েস, রেবাব, আযদ প্রমুখ গোত্রসমূহের মাধ্যমে আমাদের সাহায্য করেছেন। খুব সাবধান, হযরত উসমান রাযি.-এর হত্যাকারীরা ছাড়া, যতক্ষণ আল্লাহ তাদের শায়েস্তা না করছেন, অন্যদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করুন। ভুলেও বিশ্বাসঘাতকদের পক্ষাবলম্বন বা রক্ষণাবেক্ষণ করবেন না। যারা আল্লাহর আইনে শাস্তিযোগ্য, ভুলেও তাদের প্রতি সন্তোষ প্রকাশ করবেন না। নয়তো আপনারাও জালিমদের অন্তর্ভুক্ত হবেন।'

বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নামে পত্রপ্রেরণ

বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিবৃন্দের নামে প্রেরিত পত্রগুলো ছিল এরূপ : 'জনগণকে অবাঞ্ছিত দলটির রক্ষণাবেক্ষণ ও পক্ষাবলম্বন থেকে বিরত রাখুন। আপনারা যার-যার ঘরে আশ্রয় গ্রহণ করুন। এরা হযরত উসমান রাযি.-এর সঙ্গে অন্যায় করেছে, উম্মতের ঐক্য ভেঙে দিয়েছে, কুরআন ও সুন্নাহর বিরোধিতা করেছে। তারা এতেও ক্ষান্ত হয়নি। মানুষকে ধর্মীয়

শাসন ও ঐশী বিধানে উদ্বুদ্ধ করায় আমাদের কাফের বলেছে। আমাদের সম্পর্কে অশালীন কথা বলেছে। নেক বান্দারা তাদেরকে ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেছেন। তাদের অপকর্মের কঠোর নিন্দা জানিয়েছেন। তাদেরকে সম্বোধন করে বলেছেন—তোমরা মুসলিম শাসককে হত্যা করেও শান্তি পাওনি; এখন এসেছ স্বয়ং পয়গম্বরের স্ত্রীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে; কারণ তিনি সত্যের ডাক দিয়েছেন; তোমরা আসলে পয়গম্বরের সাথীদের, ইসলামের পথপ্রদর্শকদের হত্যা করে ইসলামকে মিটিয়ে দিতে চাও। দুষ্টচক্র উসমান বিন হানিফের (বসরার গভর্নর) সহযোগিতায় কিছু নির্বোধ ও ভিনদেশিকে সঙ্গে নিয়ে আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিয়েছিল। আমরা শুধু ছাউনির কিছু সৈন্যের রক্ষণাবেক্ষণ করেছি। ছাব্বিশ দিন একই অবস্থা বিরাজ করেছে। আমরা তাদেরকে সত্যের আহ্বান জানিয়ে এসেছি। আমরা তাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করেছি যে, সত্য-প্রতিষ্ঠায় বাধা হয়ো না। কিন্তু তারা বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। তারা তালহা রাযি. এবং যুবায়ের রাযি.-এর বাইয়াত গ্রহণের বাহানা করত। অবশেষে প্রতিনিধি পাঠিয়ে বাস্তবতা যাচাই করে এসেছে। তারপরও সত্য উপলব্ধি করেনি। এমনকি রাতের অন্ধকারে আমার বিশ্রামাগারে ঢুকে পড়েছে আমাকে হত্যা করবে বলে। হতভাগারা বারান্দা পর্যন্ত পৌঁছেও গিয়েছিল। কায়েস, আরবাব ও আযদের লোকেরা আমার প্রহরায় ছিল। তারা হাতেনাতে ধরা পড়ে। খণ্ডযুদ্ধ হয়। মুসলমানদের হাতে মারা পড়ে। আল্লাহ সমগ্র বসরাবাসীকে তালহা রাযি. এবং যুবায়ের রাযি.-এর সঙ্গে একমত করে দিয়েছেন। কেসাস গ্রহণের পরই আমরা ক্ষান্ত হব।'

এটা ছিল ৩৬ হিজরীর ২৬ রবিউস সানির ঘটনা।

জঙ্গে জামাল (উটের যুদ্ধ)

হযরত আলী রাযি. মদীনা মুনাওওয়ারা থেকে সাতশো জনকে সঙ্গে নিয়ে যাত্রা করেছিলেন। কুফা থেকে সাত হাজার মানুষ তাঁর সহযোগিতায় এগিয়ে আসেন। এভাবে বসরা পৌঁছতে পৌঁছতে বিশ হাজার সৈন্য তাঁর দলে যোগ দেয়। এদিকে হযরত আয়েশা রাযি.-এর সঙ্গে ত্রিশ হাজার মানুষ ছিল। উভয় বাহিনী যুদ্ধের সাজে সজ্জিত হয়ে রণভূমিতে তাঁবু ফেলে। মুযারিরা মুযারিদের বিপরীতে, আযদিরা আযদিদের বিপরীতে, এমিনিরা এমিনিদের বিপরীতে; মোটকথা, প্রত্যেক যোদ্ধা নিজ নিজ গোত্রের যোদ্ধাদের মোকাবেলার জন্য প্রস্তুত হয়। এরচেয়েও কষ্টদায়ক দৃশ্য এই ছিল যে, হৃদয় দুঃখে-কষ্টে ভারাক্রান্ত; কিন্তু রাজনৈতিক মতাদর্শের কারণে একই মায়ের দুই সন্তান রণভূমিতে একে অপরের প্রতিদ্বন্দ্বী। দুজনই সত্যের অনুসারী; কিন্তু দুজনের সত্য দুই মেরুতে। সত্যবোধের সামনে ভ্রাতৃত্ববোধ পরাজিত।

রণভূমির করুণ দৃশ্য

উভয় বাহিনী মুখোমুখি। বুকের ভেতর যেন হু হু করে উঠছে। কালই যে মানুষগুলো একযোগে তলোয়ার চালিয়েছিল শত্রুদের বিরুদ্ধে, আজ তারাই একে অপরকে ক্ষত-বিক্ষত করতে চায়। হযরত যুবায়ের রাযি. এ দৃশ্য দেখে বললেন, আহ, মুসলমানরা যখন শক্তি-সামর্থ্যে পর্বতপ্রমাণ, তখন নিজেরাই নিজেদের টুকরো টুকরো করতে উদ্যত! নিজ নিজ জায়গায় সত্যোপলব্ধিতে একেকজন এতই অটল যে, কোনো কিছুই তাদেরকে চুল পরিমাণও নড়াতে বা সরাতে সক্ষম নয়। কুফার কতিপয় গোত্রের নেতৃবর্গ বসরায় বসবাসকারী নিজ নিজ গোত্রের লোকদের কাছে

গেলেন এবং যুদ্ধ থেকে সরে দাঁড়ানোর অনুরোধ করলেন। কিন্তু প্রত্যেকেরই একই উত্তর: আমরা কিছুতেই উম্মুল মুমিনীনকে নিঃসঙ্গ ছাড়তে পারি না।

সন্ধিস্থাপন

তারপরও উভয় পক্ষের লোকদের প্রবল বিশ্বাস ছিল যে, বিষয়টি যুদ্ধ পর্যন্ত গড়াবে না; বরং আগেই সমঝোতা হয়ে যাবে। জনৈক গোত্রপতি ভাবলেন, তিনি হযরত আলী রাযি.-কে সন্ধি করার জন্য পীড়াপীড়ি করবেন। কিন্তু দেখা গেল, হযরত আলী রাযি. আগে থেকেই মনেপ্রাণে সমঝোতা চাইছেন। তখন তিনি হযরত আলী রাযি.-এর অনুমতি নিয়ে হযরত তালহা রাযি., হযরত যুবায়ের রাযি. এবং হযরত আয়েশা রাযি.-এর কাছে গেলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, হে আমাদের মাতা, এত কিছু কেন করছেন? তিনি বললেন, উসমান রাযি.-এর ঘাতকদের শাস্তিপ্রদান এবং সমাজের সংশোধনের জন্য। তিনি বললেন, হে আমাদের মাতা, দয়া করে একটু ভাবুন; পাঁচশো অপরাধীকে সাজা দিতে গিয়ে পাঁচ হাজারের প্রাণ গেছে। আর এই পাঁচ হাজারের জন্য আরও কত হাজারের প্রাণ যাবে। এ কেমন সংস্কার, মাতা? এ কেমন সংশোধন? কথার ভাব এত গভীর ও সংবেদনশীল ছিল যে, তিনি কোনো উত্তর দিতে পারলেন না। সকলে সম্মতি ব্যক্ত করলেন। সকলে মিলে সন্ধি করে নিলেন।[১]

বনু উমাইয়া ও সাবাঈ গোষ্ঠীর নৈশ হামলা

উভয় পক্ষের সাধারণ যোদ্ধাগণ নিশ্চিন্ত। যুদ্ধের চিন্তা—এক কথায় সকলের মন থেকে মুছে গেল। সন্ধিচুক্তি পাকাপোক্তকরণ ও অন্যান্য মামলার নিষ্পত্তিকরণে কারও কোনো সংশয় ছিল না। কিন্তু উসমান রাযি.-এর ঘাতক সাবাঈগোষ্ঠী ও অপরপক্ষে বনু উমাইয়ার যে বিষাক্ত বীজটুকু তখনো ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ছিল, তারা ভাবল, যদি সত্যিই সন্ধি হয়ে যায় তা হলে আমাদের রক্ষা নেই; আমাদের এত দিনের শ্রম একদম বিফলে যাবে। সাবাঈ গোষ্ঠীর সদস্যরা হযরত আলী রাযি.-এর দলে

---

১. *তারীখে তাবারী* : ৬ষ্ঠ খণ্ড।

ছিল। সকলে যখন রাতের শেষ প্রহরে গভীর ঘুমে নিমগ্ন, সাবাঈরা তখন এলোপাতাড়িভাবে সৈন্যদের ওপর তলোয়ার হাকানো শুরু করল।[১] অন্যদিকে বনু উমাইয়ার ছোকরারা এখানে-ওখানে আগুন ধরিয়ে দিল।

আকস্মিক যুদ্ধের সূচনা

হযরত আলী রাযি. ছুটে এসে আক্রমণকারীদের প্রতিহত করতে লাগলেন। পরিস্থিতি সম্পূর্ণ ওলটপালট হয়ে গেল। যোদ্ধারা হতবুদ্ধি হয়ে যার যার অস্ত্রের দিকে ছুটে গেলেন। উভয় পক্ষের নেতৃস্থানীয়গণ ভাবলেন, অপরপক্ষ বিশ্বাসঘাতকতা করেছে।

রাতের অন্ধকার কাটতে কাটতে পরিস্থিতি চরম হয়ে গেল। চিৎকার চেঁচামেচিতে হযরত আয়েশা রাযি.-এর ধ্যানমগ্নতা কেটে গেল। তিনি জানতে চাইলেন, কী হচ্ছে? উত্তর এল : মাতা, যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে।

যুদ্ধ বন্ধ করার জন্য রণাঙ্গণে

বসরার বিচারক কাব ইবনে সুর ছুটে এলেন; বললেন—মাতা, শীঘ্রই উটে আরোহণ করে ময়দানে চলুন; হতে পারে আপনাকে দেখে মুসলমানগণ শান্ত হবেন।[২] হযরত আয়েশা রাযি. কালক্ষেপন না করে হাওদায় আরোহণ করে রণাঙ্গনে নিজ বাহিনীর মধ্যস্থলে এসে পড়লেন।

হযরত আলী, যুবায়ের ও তালহা রাযি. মুখোমুখি

হযরত আলী রাযি. হযরত তালহা এবং হযরত যুবায়ের রাযি.-এর নাম ধরে ডাকতে লাগলেন। আল্লাহ অশ্বারোহী তিন বীরকে রণক্ষেত্রে মুখোমুখি করলেন। কী করুণ দৃশ্য! কী তিক্ত মুহূর্ত! যাঁরা এতদিন একসঙ্গে একযোগে লড়ে এসেছেন তাগুতি শক্তির বিরুদ্ধে, বদর-উহুদের সেই বীরসেনানীরা যেন পরস্পরকে আহ্বান করবে দ্বন্দ্বের, যুদ্ধের। হযরত আলী রাযি. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি ভবিষ্যদ্বাণী স্মরণ করালেন। মহিমান্বিত দুই সাহাবীর স্মৃতিপটেও ভেসে

---

১. *তারীখে তাবারী* : ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা : ৩১৮২-৩১৮৩।
২. *তারীখে তাবারী* : ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা : ৩১৮৮।

উঠল সেই বিস্মৃত বাণী। আর কোনো ঘোর নেই। আর কোনো ধাঁধা নেই। দিনের আলোর মতো সবকিছু যেন স্পষ্ট হয়ে গেল।

হযরত যুবায়ের রাযি.-এর শাহাদাত

হযরত যুবায়ের রাযি. ঘোড়ার লাগাম টেনে ধরলেন। হৃদয় ব্যাকুল হলো রাসূলের রওযায় ফিরে যেতে। রণভূমি ত্যাগ করে ছুটে চললেন মদীনার পানে। শ্যেনদৃষ্টি দিয়ে সবই লক্ষ করছিল সাবাঈ ইবনে জারমুয। সে হযরত যুবায়ের রাযি.-এর পিছু নিল। রাসূলের হাতে গড়া বীরের মুখোমুখি হওয়ার সাহস তার ছিল না। তাই অপেক্ষা করতে থাকল সময় ও সুযোগের। একটি উপত্যকায় পৌঁছে হযরত যুবায়ের রাযি. নামাযে রত হলেন। তিনি যখন সেজদাবনত হলেন, তখন সেই জালেম ছুটে এসে গর্দানে তরবারির আঘাত করল। হযরত যুবায়ের রাযি. শহীদ হয়ে গেলেন। সে তাঁর মস্তক ও তরবারি নিয়ে হযরত আলী রাযি.-এর কাছে এল। তিনি অশ্রুসজল হলেন; বললেন, এ তো সেই তরবারি যাকে অনেকবার ঝলসে উঠতে দেখেছি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুরক্ষায়।

হযরত তালহা রাযি.-এর শাহাদাত

হযরত তালহা রাযি.-ও রণক্ষেত্র ত্যাগ করতে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ মারওয়ানের চোখে পড়ে গেলেন। মারওয়ান আঁচ করল, আজ যদি হযরত তালহা রাযি. প্রাণে বেঁচে যান, তা হলে উমাইয়াদের বিপদ আছে। তাই সে তৎক্ষণাত একটি বিষাক্ত তির নিক্ষেপ করল। তিরটি হাঁটুতে বিদ্ধ হলো। কোনোভাবেই রক্তক্ষরণ বন্ধ হলো না। হযরত তালহা রাযি.-ও শহীদ হয়ে গেলেন।

রণাঙ্গনে কুরআন-প্রদর্শন

এদিকে কাব ইবনে সুরকে হযরত আয়েশা রাযি. নিজের কুরআন শরীফ দিয়ে বললেন, যাও এটা দেখিয়ে মানুষকে যুদ্ধ বন্ধের আহ্বান করো। তিনি কুরআন উন্মুক্ত করে উভয় বাহিনীর মধ্যস্থলে দাঁড়িয়ে

গেলেন। দুষ্টচক্র পরিণতি বুঝতে পেরে দূর থেকে তাকেও তির মেরে নিশ্চুপ করে দিল।

উম্মুল মুমিনীনের ওপর আক্রমণ এবং বনু দাব্বার প্রতিরোধ

দ্বিপ্রহর হয়ে গেল। সন্ধির কথা জেনে সাধারণ মুসলমানদের একটি বড় অংশ আগেই সরে গিয়েছিলেন। সাবাঈরা সবাই ছিল হযরত আলী রাযি.-এর দলে। এ কারণে হযরত আয়েশা রাযি.-এর বাহিনী হয়ে পড়ে নড়বড়ে। উভয় পক্ষের সাধারণ যোদ্ধাগণ ছিলেন একে অপরের আপনজন। তাই কেউ কাউকে হত্যা করতে চাইছিলেন না। শুধু প্রতিহত ও পরাস্ত করতে চাইছিলেন। তারা একে অপরের হাত ও পায়ে আঘাত করছিলেন। মাথা ও বুক এড়িয়ে যাচ্ছিলেন। তারা তখনো আশা করছিলেন, শীঘ্রই এই অনাকাঙ্ক্ষিত যুদ্ধ বন্ধ হবে। ...রণক্ষেত্রে অসংখ্য ছিন্ন হাত ও পা পড়ে থাকতে দেখা যাচ্ছিল।

সাবাঈরা এত নিকৃষ্ট ছিল যে, তারা ধান্দা করছিল, যদি কোনোভাবে হযরত আয়েশা রাযি.-কে বাগে পায়, তা হলে ভীষণভাবে অপদস্থ করবে।[১] এজন্য কুফার লোকেরা হযরত তালহা রাযি. এবং হযরত যুবায়ের রাযি.-কে হত্যা করার পর হযরত আয়েশা রাযি.-এর উটের দিকে ধেয়ে আসতে শুরু করে।[২] ভয়াবহতা লক্ষ করে মুষ্টিমেয় মুসলিম যোদ্ধাগণ চতুর্দিক থেকে স্তরে স্তরে ব্যূহাকারে মাতাকে ঘিরে ধরেন এবং মাতার সম্মান ও জীবন রক্ষাকেই জীবনের চরম ও পরম প্রাপ্তি জ্ঞান করে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত লড়াই করার সংকল্প গ্রহণ করেন। মুযারি সবগুলো গোত্র, বিশেষ করে বনু আদ ও বনু দাব্বা সমরে আবির্ভূত হন অপরিমেয় জোশ আর তেজস্বিতা নিয়ে। একদিকে শত্রুসাগরের দানবীয় গ্রাস, অন্যদিকে সন্তানদের পর্বতপ্রমাণ প্রতিরোধ। মুসলিম জননীর ডান দিকে বনু বকর, বাম দিকে আযদ, সামনে বনু নাজিয়া। তারা লড়ছে, মরছে—উম্মুল মুমিনীনের সম্মানের জন্য, উম্মুল মুমিনীনের জীবনের জন্য।

---

১. প্রমাণ : সাবাঈরা যখন বিভক্ত হয়ে খারেজি সম্প্রদায়ের গোড়াপত্তন করেছিল, তখন এক পক্ষ অন্য পক্ষকে দোষারোপ করেছিল, তোমরা তো স্বয়ং মাতাকেই দাসী বানাতে চেয়েছিলে।

২. *তারীখে তাবারী* : ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা : ৩১৯৩।

বনু দাব্বার রণসঙ্গীত

মুসলিম জননীর সম্মান রক্ষা করতে তাঁর কলিজার টুকরারা হাসিমুখে জীবন উৎসর্গ করে চলেছে। উট ব্যূহের মধ্যস্থলে দণ্ডায়মান। হাওদাকে লক্ষ্য করে শত্রুরা তিরের ঝড় তুলেছে। সন্তানেরা চারদিক থেকে সেই তিরঝড় হয়তো প্রতিহত করছে, নয়তো বুক পেতে বরণ করছে। যুদ্ধের তালে তালে রণিত, ধ্বনিত হচ্ছিল :

يَا أُمَّنَا يَا خَيْرَ أُمٍّ نَعْلَمْ

أَمَا تَرَيْنَ كَمْ شُجَاعٍ يُكْلَمْ

وَتَخْتَلِيْ هَامَتُهُ وَالْمُعْصَمْ

অর্থ : হে আমাদের মাতা, হে আমাদের শ্রেষ্ঠ মাতা, দেখুন! আপনার বীর সন্তানদের দেখুন! কত বীর কত আঘাত বুক পেতে নিচ্ছে। কত বক্ষ ক্ষতবিক্ষত হচ্ছে। কত মস্তক জমিনে ছিটকে পড়ছে। দেখুন, আপনার বীর সন্তানদের দেখুন!

দাব্বিদের এমন রক্তজোশ আর মরণস্পৃহা দেখে সবার মুখে মুখে একই কথা, যতক্ষণ না উটকে বসানো যাচ্ছে, ততক্ষণ এই উন্মাদনা থামবে না। বনু দাব্বা উটকে ব্যূহের ভেতর সুরক্ষিত রাখার জন্য প্রাণপণে লড়ে যাচ্ছে। প্রতিপক্ষদের মধ্য থেকে যেই এদিকে আসছে, ফিরে যেতে পারছে না। তাদের মুখে মুখে ধ্বনিত হচ্ছে উদ্দীপনার রণসঙ্গীত :

نَحْنُ بَنُوْ ضَبَّةَ لَا نَفِرْ * حَتَّى نَرَى جَمًّا جَمًّا تَخِرْ * يَخِرُّ مِنْها الْعَلَقُ الْمُحْمَرْ

অর্থ : আমরা বনু দাব্বার বীরযোদ্ধা। আমরা যুদ্ধে অটল-অবিচল। যতক্ষণ দেহে প্রাণ আছে, আমরা লড়ে যাব। একটি মস্তকও থাকতে, একবিন্দু রক্তও থাকতে আমরা হার মানব না।

يَا أُمَّنَا يَا عَيْشُ لَنْ تُرَاعْ * كُلُّ بَنِيْكَ بَطَلٌ شُجَاعْ

অর্থ : হে আমাদের মাতা, হে আয়েশা, আপনি একটুও বিচলিত

হবেন না। আপনার একেকটা সন্তান চির দুর্জয় বীর, চির সাহসী যোদ্ধা।

يَا أُمَّنَا يَا زَوْجَةَ النَّبِيْ * يَا زَوْجَةَ الْمُبَارَكِ الْمَهْدِيْ

অর্থ : হে আমাদের মাতা, হে আমাদের প্রিয়তমের প্রিয়তমা, হে আমাদের বরকতময় রাসূলের স্ত্রী, আমাদের আদর্শ পুরুষের সহধর্মিনী।

তবে তাদের সবচেয়ে তেজোদীপ্ত রণকাব্য ছিল এটি :

نَحْنُ ضَبَّةُ أَصْحَابُ الْجَمَلْ * اَلْمَوْتُ أَحْلَى عِنْدَنَا مِنَ الْعَسَلْ

অর্থ : আমরা দাব্বার বীর সন্তান। আপনার উটের রশি আমরাই সামলাব—যদি মৃত্যু আসে আসুক, মৃত্যু তো সুধার মতো।

نَحْنُ بَنُوا الْمَوْتِ إِذَا الْمَوْتُ نَزَلْ * نَنْعِي ابْنَ عَفَّانَ بِأَطْرَافِ الْأَسَلْ * رُدُّوْا عَلَيْنَا شَيْخَنَا ثُمَّ بَجَلْ

অর্থ : যদি মৃত্যু আসে তো ভয় কী? আমরা তো মৃত্যুর সঙ্গেই খেলা-করা রণবীর। আফফানের পুত্রের মৃত্যু-সংবাদ আমরা অস্ত্রাঘাতেই প্রচার করব। পারলে আমাদের নেতাকে ফিরিয়ে দাও, তবেই আমরা ক্ষান্ত হব।

যুদ্ধের সমাপ্তি

দাব্বিরা এতটাই জোশে উঠে গিয়েছিল যে, একজন একজন করে আগে বাড়ছিল আর উটের রশি ধরে দাঁড়িয়ে যাচ্ছিল। একজন লুটিয়ে পড়তে না পড়তেই আরেকজন ছুটে আসছিল। তার কিছু হলে আরেকজন আসছিল। এভাবে সত্তর জন শুধু রশি ধরে থেকেই জীবন উৎসর্গ করল। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের রাযি. উটের কাছে দণ্ডায়মান থেকে ঢাল তলোয়ার চালিয়ে যাচ্ছিলেন। যে-ই উটের দিকে এগিয়ে আসছিল তারই হাত উড়িয়ে দিচ্ছিলেন। বর্ণনাকারী বলেন, তাঁর চারপাশে—মনে হচ্ছিল—ছিন্ন হাতগুলো যেন উড়ছে। একপর্যায়ে হযরত আয়েশা রাযি.-কে ঘিরে এমন ভয়াবহ পরিস্থিতি লক্ষ করে হযরত আলী রাযি. নিজে এগিয়ে এলেন যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটাতে। আশতার নাখঈ (প্রকৃত নাম

মালিক) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের রাযি.-এর কাছে চলে এলেন। দুজনই প্রসিদ্ধ বীর। যুদ্ধ যেন নতুন মোড় নিল। আঘাত পাল্টা আঘাতে দুজনই ক্ষতবিক্ষত হলেন। একপর্যায়ে তারা দৌড়ে গিয়ে একে অপরকে জাপটে ধরলেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের রাযি. চিৎকার করে বলতে লাগলেন,

اُقْتُلُوْنِيْ وَ مَالِكًا * اُقْتُلُوْا مَالِكًا مَّعِيْ

অর্থ : আমাকে এবং মালিককে মেরে ফেল। আমার সঙ্গে মালিককে মেরে ফেল।

আশতার বলেন, লোকে আমাকে মালিক নামে চিনত না। তা না হলে, আমার খবর হয়ে যেত। বনু দাব্বার কিছু লোক অন্য পক্ষেও ছিলেন। তারা চিন্তা করলেন, যদি উম্মুল মুমিনীনের উট দাব্বিদের দৃষ্টির আড়াল না হয়, তা হলে আমাদের গোত্রের একটা লোকও বাঁচবে না। যতক্ষণ একজনেরও জীবন থাকবে এবং উট দণ্ডায়মান থাকবে ততক্ষণ তারা থামবে না। তাই জনৈক দাব্বি পেছন থেকে উটের পায়ে তরবারি দিয়ে আঘাত করলেন। উট পড়ে গেল। হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসির রাযি. এবং হযরত মুহাম্মাদ ইবনে আবু বকর রাযি. দৌড়ে গিয়ে হাওদা সামলে নিলেন। মুহাম্মাদ ইবনে আবু বকর ভেতরে হাত দিয়ে দেখতে চাইলেন যে কোনো জখম হয়েছে কি না। হযরত আয়েশা রাযি. বলে উঠলেন, এ কোন অভিশপ্তের হাত? তিনি তৎক্ষণাত বললেন, আপনার অনুজ মুহাম্মাদের। ভগ্নি, আপনার কোনো জখম হয়নি তো? হযরত আয়েশা রাযি. বললেন, তুমি মুহাম্মাদ (নন্দিত) নও; তুমি মুযাম্মাম (নিন্দিত)। হযরত আলী রাযি.-ও পৌঁছে গেলেন। তিনি হালপুরসি করলেন। উম্মুল মুমিনীন রাযি. উত্তর দিলেন, ভালো আছি।

হেজাজের পথে

হযরত আলী রাযি. উম্মুল মুমিনীন রাযি.-কে তাঁর পক্ষাবলম্বী জনৈক বসরি নেতার বাড়িতে অবতরণ করালেন। উম্মুল মুমিনীনের বাহিনীর আহত সৈন্যরা ওই বাড়িতেই আত্মগোপন করেছিল। পরবর্তীতে হযরত

আলী রাযি. এবং হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসেন। হযরত আলী রাযি. খুব ভালোভাবেই জানতেন যে, এই বাড়িতেই আহত সৈন্যরা আত্মগোপন করে আছে; কিন্তু তারপরও তিনি কিছু করেননি বা বলেননি। এরপর মুহাম্মাদ ইবনে আবু বকরের তত্ত্বাবধানে হযরত আয়েশা রাযি.-কে প্রায় চল্লিশজন সম্ভ্রান্ত মুসলিম মহিলার সঙ্গে হেজাজে পৌঁছে দেওয়া হয়। সাধারণ মুসলমানগণসহ স্বয়ং হযরত আলী রাযি.-ও অনেক দূর পর্যন্ত বিদায় জানাতে এগিয়ে আসেন। ইমাম হাসান রাযি. কয়েক মাইল সঙ্গে গিয়েছিলেন। সফরের শুরুতে হযরত আয়েশা রাযি. জনসম্মুখে ঘোষণা দেন, হযরত আলী রাযি.-এর সঙ্গে আমার আগেও কোনো মনোমালিন্য ছিল না; এখনো নেই। তবে শ্বাশুড়ি ও জামাইয়ের মধ্যে যে দু-একটা বিষয় থাকে তা অস্বীকার করব না। হযরত আলী রাযি.-ও একই ধরনের কথা বলেন। এরপর এই ছোট্ট কাফেলাটি হেজাজের পথে রওয়ানা হয়।[১]

হযরত আয়েশা রাযি.-এর অনুতাপ

হজের মাত্র কয়েক মাস বাকি ছিল। এ কয়টা দিন হযরত আয়েশা রাযি. মক্কা মুকাররামায় অবস্থান করেন। তারপর পূর্বের ন্যায় নবীর রওযা মোবারকে ফিরে যান। এরপর তিনি যতদিন বেঁচে ছিলেন, নিজের এই ইজতিহাদি গলতি ও ভুল সিদ্ধান্তের ওপর আফসোস আর আক্ষেপ করে গেছেন যে, তিনি জাতির সংস্কার ও সংশোধন করতে গিয়ে যে পদ্ধতি অবলম্বন করেছিলেন তা কতটা অযৌক্তিক ও অসময়োপযোগী ছিল।

ইবনে সাদ লিখেছেন, তিনি সবসময় বলতেন—হায়, আমি যদি কোনো গাছ হতাম! হায়, আমি যদি কোনো পাথর হতাম! হায়, আমি যদি কোনো ইটের টুকরা হতাম! হায়, আমি যদি না-ই হতাম![২]

তারীখে তাবারী গ্রন্থে আছে, একবার বসরা হতে একজন লোক

---

১. আলোচ্য ঘটনাগুলো সবই *তারীখে তাবারী* থেকে নেওয়া। দুঃখের বিষয়, ঐতিহাসিক ঘটনাগুলো এর চেয়ে গ্রহণযোগ্য আর কোনো সনদে আসেনি। কেননা, হাদীসগ্রন্থগুলো এসব ঘটনায় প্রায় নীরব।

২. *তাবাকাতে ইবনে সাদ* : جزء النساء, পৃষ্ঠা : ৫১।

হযরত আয়েশা রাযি.-এর সঙ্গে দেখা করতে এলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি আমাদের যুদ্ধে ছিলে? লোকটি বললেন, জি হাঁ, ছিলাম। জিজ্ঞেস করলেন, যে ছেলেটি এই কবিতাপঙ্‌ক্তিগুলো يَا أُمَّنَا يَا خَيْرَ أُمٍّ نَعْلَمُ আবৃত্তি করছিল, তুমি কি তাকে চেন? লোকটি বললেন, হাঁ মাতা, সে আমারই ভাই ছিল। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর হযরত আয়েশা রাযি. এত কাঁদলেন যে, আমার মনে হচ্ছিল, এই কান্না আর থামবে না; তার আগেই হয়তো উম্মুল মুমিনীনের জীবনপ্রদীপ নিভে যাবে। *বুখারী শরীফে* এসেছে—তিনি মৃত্যুর পূর্বে ওসিয়ত করেছিলেন, তোমরা আমাকে রওযা মোবারকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে দাফন করবে না। জান্নাতুল বাকিতে অন্য স্ত্রীগণের সঙ্গেই দাফন করবে।[১] আমি রাসূলের অবর্তমানে একটি অপরাধ করেছি।[২] ইবনে সাদ লিখেছেন, যখন তিনি এই আয়াতটি পড়তেন—

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ

অর্থ : হে নবীপত্নীগণ, তোমরা তোমাদের ঘরেই অবস্থান করো। (সূরা আহযাব, আয়াত : ৩৩)

তখন তিনি এত কাঁদতেন যে, কাঁদতে কাঁদতে তাঁর পবিত্র আঁচল ভিজে যেত।[৩]

মনোমালিন্যের দাবির খণ্ডন

ইফকের ঘটনায় হযরত আলী রাযি. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পরামর্শ দিয়েছিলেন, আপনি চাইলে হযরত আয়েশা রাযি.-কে আলাদা করে দিতে পারেন। কিছু অন্তর্দৃষ্টিহীন মানুষ এ কথা বলতে চান, হযরত আলী রাযি.-এর এমন নিষ্ঠুর উত্তরে হযরত আয়েশা রাযি. ভীষণভাবে মর্মাহত হয়েছিলেন। তাদের দাবি, যুদ্ধে হযরত আয়েশা রাযি.-এর নেতৃত্বদানের প্রকৃত কারণ এটাই ছিল।

---

১. *সহীহ বুখারী*, কিতাবুল জানাইয।

২. *মুসতাদরাকে হাকেম*, جزء عائشة।

৩. *ওয়াকিদি*, সুফিয়ান সাওরির সূত্রে, جزء النساء, পৃষ্ঠা : ৫৬।

যুদ্ধের পূর্ণ বিবরণ আপনাদের সামনে আছে। আলোচনা দীর্ঘ হয়ে যাওয়ার ভয় থাকা সত্ত্বেও আমরা হযরত আয়েশা রাযি.-এর যুদ্ধকালীন বার্তা ও পত্রগুলো উদ্ধৃত করেছি শুধু এজন্যই। এগুলোর কোথাও হযরত আলী রাযি.-এর প্রতি তাঁর কোনো ক্ষোভ বা অসন্তোষ পাঠক পেয়েছেন কি? যুদ্ধটা সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে সংঘটিত হয়েছিল। সুনির্দিষ্ট কিছু পাপী ছাড়া উভয় পক্ষের সবাই নির্দোষ ও নিরপরাধ ছিলেন।

এ কথা সত্য যে, হযরত আয়েশা রাযি. সাবাঈদের একটি অমূলক দাবি প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। তারা দাবি করত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মৃত্যুর সময় হযরত আলী রাযি.-এর অনুকূলে খেলাফতের ওসিয়ত করে গেছেন। এ ব্যাপারে হযরত আয়েশা রাযি. বলতেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার বুকে মাথা রেখে মৃত্যুবরণ করেছেন। তিনি এমন ওসিয়ত কখন করলেন?[১] কিন্তু এ থেকেই তো হযরত আলী রাযি.-এর প্রতি তাঁর ব্যক্তিগত আক্রোশ প্রমাণিত হয় না। এটা তো একটি ঐতিহাসিক বর্ণনা। জনৈক ব্যক্তি একবার হযরত আয়েশা রাযি.-কে জিজ্ঞেস করলেন, এই আয়াতের ব্যাখ্যা কী ?

ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِيْنَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَ مِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَ مِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ

অর্থ : এরপর আমি আমার নির্বাচিত বান্দাদের কিতাব দান করলাম। তাদের কেউ নিজের প্রতি জুলুমকারী, কেউ মধ্য-মতাবলম্বী, কেউ কল্যাণে অগ্রণী। (সূরা ফাতির, আয়াত : ৩২)

হযরত আয়েশা রাযি. বললেন, পুত্র, এই তিন দলই জান্নাতে যাবে। এটা পূর্বোক্ত আয়াতে কারীমার শেষাংশেরই ইঙ্গিত :

جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُوْنَهَا

অর্থ : এরা চিরস্থায়ী জান্নাতে থাকবে। (সূরা রাদ, আয়াত : ২৩)

---

১. *সহীহ বুখারী*, বাবু ওয়াফাতিন নাবিয়্যি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, পৃষ্ঠা : ৬৪১।

এরপর তিনি বললেন, سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ (কল্যাণে অগ্রণী) তাঁরা, যাঁরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে মৃত্যুবরণ করেছেন এবং তিনি তাঁদেরকে জান্নাতের সুসংবাদ দান করেছেন। مُقْتَصِدٌ (মধ্য-মতাবলম্বী) তাঁরা, যাঁরা রাসূলের পূর্ণ আনুগত্য করেছেন এবং এর ওপর মৃত্যুবরণ করেছেন। আর ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ (নিজের প্রতি জুলুমকারী) হলো—আমার আর তোমার মতো সাধারণ মানুষ।

হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসির রাযি. এবং আশতার নাখঈ হযরত আলী রাযি.-এর পক্ষাবলম্বী ও যুদ্ধের মূল হিরো ছিলেন। এরা একবার হযরত আয়েশা রাযি.-এর সঙ্গে দেখা করতে এলেন। হযরত আম্মার রাযি. বললেন, 'হে আমার মাতা, ...' হযরত আয়েশা রাযি. বললেন, আমি তোমার মাতা নই। তিনি বললেন, আপনি অবশ্যই আমার মাতা; যতই অস্বীকার করুন। হযরত আয়েশা রাযি. জিজ্ঞেস করলেন, তোমার সঙ্গে কে এসেছে? তিনি বললেন, আশতার নাখঈ। তিনি আশতার নাখঈকে লক্ষ্য করে বললেন, তুমিই সে ছিলে না, যে আমার ভাগ্নেকে মেরে ফেলতে চাইছিলে? আশতার নাখঈ বললেন, সে আমাকে মেরে ফেলতে চাইছিল, তাই আমিও তা-ই চাইছিলাম। তিনি বললেন, যদি তা-ই হতো, তা হলে তুমি বাঁচতে পারতে না।[১] *মুসনাদে আহমদের* বর্ণনা : এরপর তিনি বললেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, আর *তয়ালিসিতে*[২] আছে, তিনি বললেন, হে আম্মার, তুমি তো জানোই যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—কোনো মুমিনের রক্তপাত ঘটানো বৈধ নয়; তবে তিন কারণে বৈধ : যদি সে মুরতাদ হয়, যদি যিনা করে, যদি কাউকে হত্যা করে। এই হাদীসটি উল্লেখ করার দ্বারা এটাই প্রমাণিত হয় যে, হযরত আয়েশা রাযি. রক্তপাত ঘটানোর জন্য সংশোধনকামী বাহিনী গঠন করেননি।

মূলত এই বিভ্রাট ও আপত্তির সূচনা করেছেন বনু উমাইয়ার লোকেরা। ঘটনা শুধু এই যে, হযরত আলী রাযি. রাসূল সাল্লাল্লাহু

---

১. *মুসনাদে আহমাদ* : ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা : ২০৫।
২. *তয়ালিসি* : মুসনাদে আয়েশা রাযি.।

আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেছিলেন, হে আল্লাহর রাসূল, মুনাফিকদের রটনার প্রতি যদি আপনার ভ্রুক্ষেপ থেকেই থাকে, তা হলে তাঁকে পৃথক করে দিন—এত বিচলিত হওয়ার কী আছে? ...বনু উমাইয়ার হোমরাচোমরারা যখন হযরত আলী রাযি.-এর ওপর আপত্তি করার কিছুই খুঁজে পাচ্ছিলেন না, তখন তিলকে তাল করে এটাকেই কাজে লাগানোর চেষ্টা করেছিলেন। কেননা কুরআনে কারীমে, যারা হযরত আয়েশা রাযি.-এর ওপর অপবাদ আরোপে মূল ভূমিকা পালন করেছিল, তাদের ব্যাপারে জাহান্নামী হওয়ার ঘোষণা এসেছে। একবার ইমাম যুহরী রহ. ওয়ালিদ ইবনে আবদুল মালিকের দরবারে উপস্থিত ছিলেন। ওয়ালিদ বললেন, ওই অভিশপ্ত লোক তো আলী [রাযি.]-ই না? যার ব্যাপারে কুরআনে এসেছে–

وَالَّذِيْ تَوَلّٰى كِبْرَهٗ مِنْهُمْ لَهٗ عَذَابٌ عَظِيْمٌ

অর্থ : আর যে অপবাদ আরোপকারীদের মূল হোতা ছিল, তার জন্য রয়েছে বিরাট আজাব। (সূরা নুর, আয়াত : ১১)

ইমাম যুহরী রহ. বলেন, আমার অন্তর ভীত ছিল, সত্য বলার সাহস হচ্ছিল না; কিন্তু কয়েক মুহূর্তের মধ্যে আমার আল্লাহ আমাকে মুখ খোলার তওফিক দিলেন, আমি বলে উঠলাম, আল্লাহ আমাদের নেতাকে সঠিক বুঝ দান করুন; তাঁর বংশেরই দুইজন মানুষ আমাকে হযরত আয়েশা রাযি.-এর ভাষ্য শুনিয়েছেন :

كَانَ عَلِيٌّ مُسَلَّمًا فِيْ شَأْنِهَا

অর্থ : হযরত আলী রাযি. তাঁর ব্যাপারে ফেতনা থেকে নিরাপদে ছিলেন। (বুখারী)[১]

ইমাম যুহরী রহ.-এর কথা শোনার পরও ওয়ালিদ আশ্বস্ত হননি। তিনি তার দাবির ওপর অটল ছিলেন।

---

১. ঘটনাটি *সহীহ বুখারীর* দুই জায়গায় এসেছে। বিস্তারিত *ফাতহুল বারী* গ্রন্থে ইফকের হাদীসের ব্যাখ্যায় দেখুন।

মৃত্যুরোগে আক্রান্ত হওয়ার পর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হযরত আব্বাস রাযি. এবং হযরত আলী রাযি. মিলে হযরত আয়েশা রাযি.-এর ঘরে পৌঁছে দিতেন। হযরত আয়েশা রাযি. এই বিষয়টি বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছিলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আব্বাস রাযি. এবং আরেকজনের কাঁধে ভর করে ঘরে আসতেন। কুধারণাপোষণকারীদের মন্তব্য, হযরত আয়েশা রাযি. হযরত আলী রাযি.-কে এত অপছন্দ করতেন যে, তাঁর নামও মুখে উচ্চারণ করতে চাননি। অথচ বাস্তবতা হলো, সাধারণত একদিকে হযরত আব্বাস রাযি. ধরতেন, অন্যদিকে কখনো হযরত আলী রাযি., কখনো উসামা বিন যায়েদ রাযি. ধরতেন। এ কারণেই, বলতে গিয়ে মুখে প্রথমে হযরত আব্বাস রাযি.-এর নাম এসেছে, আর অন্যজনের নাম নির্দিষ্ট করে আসেনি। অথবা সংক্ষেপণের জন্যই তিনি বলেছেন, 'আরেকজন'।[১]

এই মহিমান্বিত দুই ব্যক্তির পারস্পরিক মনোমালিন্যের বিষয়টি প্রকাশ্য ঘোষণার মাধ্যমেও খণ্ডিত হয়ে যায়। *তারীখে তাবারী*তে এসেছে, তাঁরা জনসম্মুখে নিজেদের মনঃস্বচ্ছতার কথা ব্যক্ত করেছিলেন। তাঁদের মানাকেব (মর্যাদা) সংবলিত হাদীসগুলোতে এরকম একাধিক বর্ণনা পাওয়া যায়। জনৈক ব্যক্তি হযরত আয়েশা রাযি.-কে জিজ্ঞেস করেছিলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সবচেয়ে কাকে বেশি ভালোবাসতেন? তিনি বললেন, হযরত ফাতেমা রাযি.-কে। লোকটি আবার জিজ্ঞেস করলেন, পুরুষদের মধ্যে? তিনি বললেন, তাঁর জীবনসঙ্গী খুব নামাযী ও রোযাদার ছিলেন।[২]

হযরত আলী রাযি. যে আহলে বাইতের অন্তর্ভুক্ত, আমরা আহলুস সুন্নাহ তা জানতে পেরেছি হযরত আয়েশা রাযি.-এর মাধ্যমেই।[৩] প্রায়ই এমন হতো যে, কোনো জিজ্ঞাসু ব্যক্তি হযরত আয়েশা রাযি.-এর কাছে আসতেন, আর তিনি তাকে হযরত আলী রাযি.-এর খেদমতে পাঠিয়ে

---

১. *সহীহ বুখারী*, ذكر وفاة مع كرماني।

২. *তিরমিযী*, *মানাকিব*।

৩. *সহীহ মুসলিম*।

দিতেন।[১] যখনই তিনি কোনো সফর থেকে ফিরতেন, জামাইয়ের আপ্যায়নের ব্যবস্থা করতেন।[২] খারেজিদের হাতে হযরত আলী রাযি.-এর শাহাদত বরণের পর লোকেরা কুফা থেকে মদীনায় এলে এ নিয়ে আলোচনা উঠত। একবার হযরত আয়েশা রাযি. জনৈক ব্যক্তিকে ডেকে বললেন—হে আল্লাহর বান্দা, আমি তোমাকে যা যা জিজ্ঞেস করব, সত্য সত্য বলবে তো? লোকটি বললেন, কেন বলব না, মাতা? হযরত আয়েশা রাযি. জিজ্ঞেস করলেন, যে লোকগুলোকে হযরত আলী রাযি. মৃত্যুদণ্ড দিয়েছিলেন, তাদের ঘটনাটা কী ছিল? লোকটি তখন আমীর মুআবিয়া রাযি. এবং হযরত আলী রাযি.-এর সমঝোতা, খারেজিদের বিচারে দ্বিমত, হযরত আলী রাযি.-এর বোঝানো এবং তাদের না মানা—সবকিছু বর্ণনা করলেন। সব শুনে হযরত আয়েশা রাযি. বললেন, আল্লাহ হযরত আলী রাযি.-কে রহম করুন, তাঁর যখন কোনো কথা ভালো লাগত, তখন বলতেন, صَدَقَ اللّٰهُ وَ رَسُوْلُهٗ (আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল সত্য বলেছেন)। ইরাকবাসীরা তাঁর ওপর মিথ্যা আরোপ করেছে। তিলকে তাল বানিয়ে অনেক কথা রটিয়েছে।[৩]

---

১. *মুসনাদে আহমদ* : ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা : ১৫৫; ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা : ৯২ ইত্যাদি।
২. *মুসনাদে আহমদ* : ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা : ১৫৫।
৩. *মুসনাদে আহমদ* : ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা : ৮৬-৮৭। *বুখারী* : خلق أفعال العباد, পৃষ্ঠা : ১৯১ (মাতবুআয়ে আনসারি)।

হযরত মুআবিয়া রাযি.-এর শাসনামল

হযরত আলী রাযি.-এর খেলাফতের সময়কাল মাত্র চার বছর ছিল। এরপর আমীর মুআবিয়া রাযি. শাসনভার গ্রহণ করেন। প্রায় বিশ বছর তিনি পুরো ইসলামী জাহানের একচ্ছত্র অধিপতি ছিলেন। তাঁর শাসনামলের পরিসমাপ্তির দুই বছর পূর্বে হযরত আয়েশা রাযি. মুসলিম বিশ্বকে বিদায় জানিয়ে প্রিয় প্রভুর ডাকে সাড়া দেন। সুতরাং আমীর মুআবিয়া রাযি.-এর শাসনে তিনি জীবনের আঠারোটি বছর অতিবাহিত করেন। তিনি এ দীর্ঘ সময়কাল, আনুষঙ্গিক সময়গুলো ছাড়া, সম্পূর্ণ নীরবে কাটিয়ে দেন।

আমীর মুআবিয়া রাযি. এবং হযরত আয়েশা রাযি.

একবার আমীর মুআবিয়া রাযি. মদীনায় হযরত আয়েশা রাযি.-এর সঙ্গে দেখা করার জন্য গেলেন। হযরত আয়েশা রাযি. বললেন, তুমি এভাবে সম্পূর্ণ একা একা আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছ। হতে পারত আমি কাউকে গোপনে প্রস্তুত রাখতাম, তুমি আসামাত্র সে তোমার মাথাটা উড়িয়ে দিত। আমীর মুআবিয়া রাযি. বললেন, এটা দারুল আমান (নিরাপদ ভূমি)। আপনি এখানে এমনটা করতে পারতেন না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ঈমান হলো হত্যাকাণ্ড প্রতিরোধের জন্য জিঞ্জিরস্বরূপ। এরপর আমীর মুআবিয়া রাযি. জিজ্ঞেস করলেন, আপনার সঙ্গে আমার ব্যবহার কেমন? হযরত আয়েশা রাযি. বললেন, ঠিক আছে। আমীর মুআবিয়া রাযি. বললেন, তা হলে উমাইয়া

ও হাশেমি দ্বন্দ্বে দয়া করে কিছু বলবেন না। আল্লাহর আদালতে আমাদের মীমাংসা হবে।[১]

হাজার ইবনে আদি রাযি. একজন সাহাবী ছিলেন। তিনি হযরত আলী রাযি.-এর একনিষ্ঠ অনুসারী ও কুফার বিদ্রোহী গোষ্ঠীর নেতৃস্থানীয় ছিলেন। কুফার তৎকালীন গভর্নর কিছু লোকের সাক্ষ্য অনুসারে বিদ্রোহীদের গ্রেফতার করে দামেশকে পাঠিয়ে দেন। হাজার ইবনে আদি ছিলেন ইয়ামানের কিনদা বংশীয়। কুফা ছিল আরব গোত্রগুলোর কেন্দ্রস্থল। স্বয়ং কিনদা বংশের লোকেরাও এখানে ছিলেন। তারা কেউই হাজারের পক্ষে কথা বলার সাহস করলেন না। কিন্তু তখন পর্যন্ত বিদ্যমান সাহাবা কেরামের মধ্যে তাঁর ভালো মূল্যায়ন ছিল। তাই বিষয়টা কারও কাছেই সুখকর ছিল না। বিভিন্ন গোত্রের নেতৃবর্গ হাজার রাযি.-এর পক্ষে সুপারিশ করলেন। কিন্তু প্রশাসন সবাইকে বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রদর্শন করল। মদীনায় সংবাদ পৌঁছলে হযরত আয়েশা রাযি.-ও বিষয়টি অবগত হন। তিনিও দূত-মারফত সুপারিশনামা পাঠান। কিন্তু আফসোস, দূত দামেশক পৌঁছার আগেই হযরত হাজার ইবনে আদি রাযি.-কে হত্যা করা হয়।[২] এই ঘটনার পর যখন হযরত আমীর মুআবিয়া রাযি. তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসেন তখন প্রথমেই তাঁকে জিজ্ঞেস করেন, মুআবিয়া, হাজারের মামলায় তোমার ধৈর্য্য কোথায় ছিল? হাজারকে হত্যা করার ব্যাপারে তুমি আল্লাহকে ভয় করলে না। আমীর মুআবিয়া রাযি. বললেন, এতে আমার দোষ ছিল না, দোষ ছিল যারা সাক্ষ্য দিয়েছিল তাদের।[৩] আরেকটি বর্ণনা অনুযায়ী হযরত আমীর মুআবিয়া রাযি. বললেন, মাতা, কোনো বিজ্ঞ ব্যক্তি পাশে না থাকায় এমনটা হয়েছে।[৪] তাবেঈ মাসরুক বর্ণনা করেন, তখন হযরত আয়েশা রাযি. বললেন, আল্লাহর কসম, যদি মুআবিয়া জানত যে, এখনো কুফায় সৎ সাহস ও আত্মসম্মানবোধ বলতে কিছু আছে, তা হলে সে কিছুতেই তাদের চোখের সামনে হাজারকে ধরিয়ে

---

১. *মুসনাদে আহমাদ* : ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা : ৯২।
২. *তাবারী* : ৭ম খণ্ড, পৃষ্ঠা : ১৪৫।
৩. *তাবারী* : ৭ম খণ্ড, পৃষ্ঠা : ১৪৫।
৪. *তাবারী* : ৭ম খণ্ড, পৃষ্ঠা : ১১৬।

এনে সিরিয়ায় হত্যা করতে পারত না। কিন্তু রাক্ষসী হিনদার[১] পুত্র খুব ভালো করেই জেনে গেছে যে, এখন সত্যিকারের মানুষ উঠে গেছে। আল্লাহর কসম, একসময় কুফা সাহসী ও সম্মানী নেতৃবৃন্দেরই আবাস ছিল। কবি লাবিদ ঠিকই বলেছেন[২] :

ذَهَبَ الَّذِيْنَ يُعَاشُ فِيْ أَكْنَافِهِمْ * وَبَقِيْتُ فِيْ خَلْفٍ كَجِلْدِ الْأَجْرَابِ

অর্থ : ওই মানুষগুলো চলে গেছে, যাদের ছায়ায় জীবনটা উপভোগ্য মনে হতো। এখন যারা আছে এদের অধীনে জীবনটা খোস-পাঁচড়ায় আক্রান্ত উটের চামড়ায় মতোই ঘৃণিত মনে হয়।

لَا يَنْفَعُوْنَ وَ لَايُرْجَى خَيْرُهُمْ * وَ يُعَابُ قَائِلُهُمْ وَ إِنْ لَّمْ يَتَّعب

অর্থ : এরা না উপকার করে, না এদের কাছে ভালো কিছু আশা করা যায়। এদের মাঝে কথা বললেও দোষী হতে হয় দোষ না করেও।

খারেজীদের ব্যাপারে দৃষ্টিভঙ্গি

ইরাকীগণ এবং মিশরীগণ হযরত উসমান রাযি.-কে দোষারোপ করতেন। সিরীয়গণ অশোভন আচরণ করতেন হযরত আলী রাযি.-এর শানে। খারেজীগণ উভয়কেই দু'চোখে সহ্য করতে পারতেন না। হযরত আয়েশা রাযি. এই ফেরকাগুলো সম্পর্কে জেনে বললেন, কুরআনুল কারীম আমাদের বলে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণের জন্য তোমরা ক্ষমা ও করুণার প্রার্থনা করো; অথচ এই মানুষগুলো তাঁদের গালি-গালাজ করা শুরু করেছে।[৩] খারেজীগণ হযরত আলী রাযি.-এর দল ত্যাগ করে সর্বপ্রথম মাকামে হুরুরে সমবেত হয়েছিলেন। এজন্য তাদের শুরুতে হুরুরিয়া নামে অভিহিত করা হতো। জনৈকা মহিলা হযরত আয়েশা রাযি.-এর দরবারে এসে মাসআলা

---

১. হিনদা—আমীর মুআবিয়া রাযি.-এর মাতা। তিনি উহুদের যুদ্ধে হযরত হামযা রাযি.-এর বুক চিরে তাঁর কলজে চিবিয়েছিলেন।

২. পুরো ঘটনাটি *তাবারী* সপ্তম খণ্ডে আছে।

৩. *সহীহ মুসলিম*, তাফসীর অধ্যায়। নববী।

জিজ্ঞেস করলেন, বিশেষ দিনগুলোর (মাসিকের) রোযার মতো নামাযেরও কাযা করতে হবে না কেন? হযরত আয়েশা রাযি. তার প্রশ্নে বিরক্ত হলেন এবং বললেন, যুক্তির ঘোড়া ছোটাচ্ছ যে? হুরুরিয়া হয়ে গেছ নাকি?[১] অর্থাৎ তিনি এই ফেরকাকে পছন্দ করতেন না।

হযরত মুআবিয়া রাযি.-কে উপদেশ

আমীর মুআবিয়া রাযি. একবার হযরত আয়েশা রাযি.-এর সমীপে পত্র প্রেরণ করলেন। পত্র-মারফত মিনতি করলেন, আমাকে একটি ছোট্ট উপদেশ দিন, যা আমি বিশেষভাবে পালন করব। হযরত আয়েশা রাযি. উত্তরে লিখলেন :

'সালামুন আলাইকুম, পরকথা, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি মানুষের অসন্তুষ্টির পরোয়া না করে আল্লাহর সন্তুষ্টিকে প্রাধান্য দেয়, আল্লাহ তাকে মানুষের অসন্তুষ্টির ক্ষতি থেকে রক্ষা করেন। কিন্তু যে ব্যক্তি আল্লাহর অসন্তুষ্টির পরোয়া না করে মানুষের সন্তুষ্টিকে প্রাধান্য দেয়, আল্লাহ তাকে মানুষের হাতে ছেড়ে দেন। ওয়াস সালামু আলাইক।'[২]

হযরত আয়েশা রাযি.-এর উপদেশবাক্যটি আমীর মুআবিয়া রাযি.-এর পুরো জীবনের ওপর একটি সারগর্ভ আলোকপাত বলা চলে।

ইয়াযিদের বাইয়াত প্রসঙ্গ

আমীর মুআবিয়া রাযি. আপন সন্তান ইয়াযিদকে স্থলাভিষিক্ত করার সংকল্প করেন। মারওয়ান ছিলেন মদীনার গভর্নর। জনসম্মুখে তিনি ইয়াযিদের নাম ঘোষণা করলে হযরত আয়েশা রাযি.-এর ভ্রাতা আবদুর রহমান বিরোধিতা করেন। মারওয়ান তাঁকে গ্রেফতার করতে উদ্যত হন। হযরত আবদুর রহমান দৌড়ে হযরত আয়েশা রাযি.-এর ঘরে ঢুকে পড়েন। মারওয়ান ভেতরে প্রবেশের সাহস করতে পারলেন না। ক্রোধে

---

১. *সহীহ বুখারী* : হায়েয অধ্যায়।
২. *তিরমিযী* : যুহদ অধ্যায়।

কাঁদো কাঁদো হয়ে বললেন, এ তো সে—যাঁর ব্যাপারে এই আয়াতটি নাজিল হয়েছে :

وَالَّذِيْ قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفٍّ لَّكُمَا

অর্থ : আর ওই ব্যক্তি, যে তার পিতামাতার উদ্দেশ্যে বলল, উহ। (সূরা আহকাফ, আয়াত : ১৭)

মারওয়ানের মন্তব্য শুনে হযরত আয়েশা রাযি. পর্দার আড়াল থেকে বললেন, আমাদের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা কোনো আয়াত নাজিল করেননি; শুধু আমার পবিত্রতার ঘোষণা করেছেন।[১] আলোচ্য ঘটনা থেকে অনুমান করা হয়, ইয়াযিদের রাজ্যাভিষেকে হযরত আয়েশা রাযি. অসন্তুষ্ট ছিলেন।

ইমাম হাসান রাযি.-এর দাফনের ঘটনা

ইমাম হাসান রাযি. ৪৯ হিজরীতে আমীর মুআবিয়া রাযি.-এর শাসনামলে মদীনায় মৃত্যুবরণ করেন। হযরত আয়েশা রাযি.-এর গৃহে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, হযরত আবু বকর রাযি. এবং হযরত উমর রাযি. সমাহিত হয়েছিলেন। এক কোণে আরও একটি সমাধির সংকুলান ছিল। ইমাম হাসান রাযি. ওসিয়ত করেছিলেন, ওই কোণে আমাকে কবর দিয়ো। যদি বিবাদ হয়, তা হলে প্রয়োজন নেই। অনুজ ইমাম হুসাইন রাযি. যখন ওসিয়ত পূরণের মনঃস্থ করলেন, তখন মারওয়ান বাধা হয়ে দাঁড়ালেন। তিনি বললেন, হযরত উসমান রাযি.-কে যখন বিদ্রোহীরা এখানে সমাহিত হতে দেয়নি, তখন আর কারও এখানে জায়গা হবে না। ঘটনার প্রেক্ষিত এমন দাঁড়াল যে, হাশেমিগণ ইমাম হুসাইন রাযি.-এর সঙ্গে এবং উমাইয়াগণ মারওয়ানের সঙ্গে অস্ত্রসজ্জিত হয়ে বেড়িয়ে এলেন। মুহূর্তেই রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের উপক্রম হলো। তৎক্ষণাৎ হযরত আবু হুরায়রা রাযি. মধ্যস্থতা করার জন্য এগিয়ে এলেন। তিনি মারওয়ানকে বোঝালেন, দোহিত্রকে মাতামহের সমাধির পাশে সমাহিত

---

১. *সহীহ বুখারী* : তাফসীর—সূরা আহযাব।

করা হবে, এতে তোমার কী আসে যায়? আবার ইমাম হুসাইন রাযি.-কেও বোঝালেন, তোমার অগ্রজ তো তোমাকে ওসিয়তের সঙ্গে সঙ্গে এও বলেছিলেন যে, যদি বাধা আসে তা হলে বিবাদ এড়িয়ে যাবে। যাই হোক, শেষমেশ সম্মানিত ইমামের মৃতদেহ জান্নাতুল বাকিতে আনা হয় এবং মা জননী হযরত ফাতেমা রাযি.-এর সমাধির পাশে সমাহিত করা হয়।

প্রশ্ন হলো, এ বিষয়ে হযরত আয়েশা রাযি.-এর মনোভাব কী ছিল? শিয়া সম্প্রদায়ের কিছু ঐতিহাসিক লিখেছেন, হযরত আয়েশা রাযি. স্বয়ং কয়েকজন যোদ্ধা নিয়ে একটি সফেদ খচ্চরে আরোহণ করে ইমাম হাসান রাযি.-এর জানাযায় বাধা দিতে বের হয়েছিলেন। সৈন্যরা তির চালানো শুরু করলে কোনো এক ভ্রাতা ছুটে আসেন এবং বলেন, এখনো জঙ্গে জামালের দাগই বংশের গা থেকে কাটেনি; এরই মধ্যে এসেছ আরেক জঙ্গ বাধাতে। এ কথা শুনে হযরত আয়েশা রাযি. ফিরে গেলেন। আলোচ্য বর্ণনাটি *তারীখে তাবারী*র অতি প্রাচীন একটি ফারসি অনুবাদে পাওয়া গেছে। ভারতবর্ষে এটা এখন খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। কিন্তু মূল আরবী গ্রন্থের সপ্তম খণ্ড অক্ষরে অক্ষরে অধ্যয়ন করেও এমন কোনো বর্ণনা আমাদের চোখে পড়েনি। উপরন্তু মূলের সঙ্গে আলোচ্য অনুবাদের অনেক অমিল দৃষ্টিগোচর হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, অনুবাদে অনেক সংযোজন-বিয়োজন রয়েছে। অনুবাদক ভূমিকায় তা স্পষ্টও করেছেন। তৃতীয় শতকের শিয়া-মতাবলম্বী প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ইয়াকুবি আলোচ্য বর্ণনাটি উদ্ধৃত করছেন ঠিকই; কিন্তু আর কোনো সূত্র উল্লেখ করেননি। তাও, মূলত যে বাধা হয়েছিলেন মারওয়ান তা উল্লেখ করার পরই قِيْلَ (কথিত আছে/বলা হয়ে থাকে) বাক্যযোগে বর্ণনাটি বিবৃত। এমন উদ্ধৃতি নিঃসন্দেহে তথ্যগত ত্রুটি ও দুর্বলতাই নির্দেশ করে। কিন্তু, আল্লাহ মাফ করুন, কোথাও এমন কথা নেই যে, তিনি তির চালিয়েছেন বা চালানোর নির্দেশ দিয়েছেন, কিংবা যুদ্ধ বাধিয়েছেন।

আবুল ফিদায় শুধু এটুকু আছে যে, বনু হাশেম ও বনু উমাইয়ার মধ্যে যখন যুদ্ধের উপক্রম হলো, তখন হযরত আয়েশা রাযি. বলে পাঠালেন, এটা আমার মালিকানাধীন জায়গা। এতে আমি আর কাউকে দাফন করার

অনুমতি দেব না। কিন্তু এ বর্ণনাও সঠিক নয়। কেননা ইবনে আসির-সহ সকল গ্রহণযোগ্য ঐতিহাসিকগণ লিখেছেন, উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা রাযি. খুশিমনেই অনুমতি ব্যক্ত করেছিলেন। এমনকি, আমীর মুআবিয়া রাযি.-এর পক্ষ হতে মদীনায় নিযুক্ত গভর্নরও বাধা হননি। শুধুমাত্র মারওয়ানই ব্যক্তিগত উদ্যোগে কয়েকজনকে সঙ্গে নিয়ে বিবাদ বাধানোর চেষ্টা করেছিলেন। ইমাম হাসান রাযি. বলে গিয়েছিলেন, যদি বিবাদের আশঙ্কা থাকে তবে মুসলমানদের সাধারণ গোরস্তানেই দাফন করবে। মারওয়ানের আচরণে হয়তো ইমাম হুসাইন রাযি. ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন; কিন্তু জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নির্দেশকে উপেক্ষা করতে চাননি।[১] প্রখ্যাত হাদীসবিশারদ ইবনে আবদুল বার *ইসতিআব* গ্রন্থে, ইবনে আসির *উসদুল গাবাহ* গ্রন্থে এবং আল্লামা সুয়ূতি রহ. *তারীখুল খুলাফা* গ্রন্থে হুবহু একই ভাষায় একই বর্ণনাকারীর সূত্রে বর্ণনা করেছেন; উপরন্তু আলোচ্য বিবরক এমন একজন ব্যক্তি, যিনি ইমাম হাসান রাযি.-এর মৃত্যুর সময় স্বয়ং সেখানে উপস্থিত ছিলেন :

...وَ قَدْ كُنْتُ طَلَبْتُ إِلَى عَائِشَةَ رض إِذَا مِتُّ أَنْ تَأْذَنَ لِيْ فَأُدْفَنَ فِيْ بَيْتِهَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ نَعَمْ، وَ إِنِّيْ لَأَدْرِيْ لَعَلَّهَا كَانَ ذَلِكَ مِنْهَا حَيَاءً، فَإِنْ طَابَتْ نَفْسُهَا فَادْفَنِّيْ فِيْ بَيْتِهَا، وَ مَا أَظُنُّ إِلَّا الْقَوْمُ سَيَمْنَعُوْكَ إِذَا أَرَدْتَ ذَلِكَ. فَإِنْ فَعَلُوْا فَلَا تُرَاجِعْهُمْ فِيَّ وَادْفَنِّيْ فِي الْبَقِيْعِ الْغَرْقَد...

অর্থ : ইমাম হাসান রাযি. ওসিয়ত করলেন, আমি হযরত আয়েশা রাযি.-এর কাছে মৃত্যুর পর তাঁর গৃহে সমাহিত হওয়ার অনুমতি চেয়েছিলাম। তিনি বলেছিলেন, আচ্ছা ঠিক আছে। কিন্তু কে জানে, হয়তো তিনি লজ্জাবশত হাঁ বলেছিলেন। তাই আমার মৃত্যুর পর পুনরায় অনুমতি চাইবে। যদি খুশিমনে অনুমতি দেন, তা হলেই দাফন করবে। তবে আমার মনে হচ্ছে, কিছু লোক তোমাকে বাধা দেবে। যদি সত্যিই

---

১. বিস্তারিত : *ইবনে আসির*, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা : ৩৮৩ (ইউরোপের ছাপা)।

বাধা দেয়, তা হলে বিবাদে জড়াবে না; জান্নাতুল বাকিতে দাফন করবে। ...

فَلَمَّا مَاتَ الْحَسَنُ أَتَى الْحُسَيْنُ عَائِشَةَ فَطَلَبَ ذَلِكَ إِلَيْهَا فَقَالَتْ نَعَمْ وَ كَرَامَةً فَبَلَغَ ذَلَكَ مَرْوَانَ فَقَالَ كَذَبَ وَ كَذَبَتَ وَاللهِ لَا يُدْفَنُ هُنَاكَ أَبَدًا... مَنَعُوْا عُثْمَانَ مِنْ دَفْنِهِ فِي الْمَقْبَرَةِ وَ يُرِيْدُوْنَ دَفْنَ الْحَسَنَ فِيْ بَيتِ عَائِشَةَ ؟

অর্থ : এরপর যখন হযরত হাসান রাযি. মৃত্যুবরণ করলেন তখন হুসাইন রাযি. হযরত আয়েশা রাযি.-এর কাছে গেলেন এবং অনুমতি চাইলেন। তিনি বললেন, আমি খুশিমনেই অনুমতি দিচ্ছি। মারওয়ানের কাছে সংবাদ পৌছলে তিনি বললেন, হুসাইন রাযি. এবং আয়েশা রাযি. দুজনেই মিথ্যা (ভুল) বলেছেন। হুসাইন রাযি.-কে ওখানে কিছুতেই দাফন করতে দেওয়া হবে না। ...

উসমান রাযি.-কে গোরস্তানেও দাফন করতে দেওয়া হচ্ছিল না; আর হুসাইন রাযি.-কে হযরত আয়েশা রাযি.-এর ঘরে দাফন করা হবে?

হযরত আয়েশা রাযি.-এর মৃত্যু

আমীর মুআবিয়া রাযি.-এর শাসনামলের শেষকাল ছিল হযরত আয়েশা রাযি.-এর জীবনের পড়ন্ত বিকেল। এ সময় তাঁর বয়স হয়েছিল সাতষট্টি বছর। আঠারো হিজরী, রমযান মাসে তিনি অসুস্থ হন। কয়েক দিন অসুখে কষ্ট পান। কেউ ভালোমন্দ জানতে চাইলে বলতেন, ভালো আছি।[১] যারা দেখতে আসতেন, সান্ত্বনা দিতেন, সুসংবাদ দিতেন ও ভালো ভালো কথা শোনাতেন; আর তিনি বলতেন, হায়, আমি যদি পাথর হতাম! হায়, আমি যদি গাছ হতাম! হায়, আমি যদি লতাপাতা হতাম![২] হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি. দেখা করার অনুমতি চাইলেন। হযরত আয়েশা রাযি.-এর মনে হলো, তিনিও এসে প্রশংসা করবেন ও সুসংবাদ দেবেন। তাই অনুমতি দিতে চাইলেন না। শেষে ভাতিজার অনুরোধে অনুমতি দিলেন। অনুমতি পেয়ে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি. ভেতরে এলেন। তিনি বললেন, অনন্তকাল আপনি 'উম্মুল মুমিনীন' হয়ে থাকবেন; রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সবচেয়ে প্রিয়তমা স্ত্রী ছিলেন, প্রিয়তমের সাক্ষাৎ পেতে শুধু প্রাণটা বের হতে বাকি; আপনারই ওসিলায় আমরা তায়াম্মুমের অনুমতি পেয়েছি, আপনার শানে কুরআনের আয়াত নাজিল হয়েছে; মসজিদে-মিম্বারে রাত-দিন সেগুলোর তেলাওয়াত হচ্ছে। হযরত আয়েশা রাযি. বললেন, আব্বাসের বেটা,

১. *তাবাকাতে ইবনে সাদ* : جزء النساء , পৃষ্ঠা : ৫১।

২. *তাবাকাতে ইবনে সাদ* : جزء النساء . পৃষ্ঠা : ৫১।

আমাকে এসব বন্দনা থেকে মুক্ত রাখো। আমি তো এটাই চাইতাম যে, আমার অস্তিত্বই যদি না হতো।[১]

মৃত্যুশয্যায় হযরত আয়েশা রাযি. ওসিয়ত করেছিলেন, আমাকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পাশে কবর দেবে না। আমি রাসূলের অবর্তমানে বড় অপরাধ করেছি। আমাকে অন্য স্ত্রীগণের সঙ্গে জান্নাতুল বাকিতে দাফন করবে। রাতেই দাফন করে ফেলবে।[২] সকালের অপেক্ষা করবে না। কেউ একজন বলল, আপনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আবু বকর রাযি. প্রমুখের সঙ্গে সমাহিত হলেই সমীচীন হতো। তিনি বললেন, এভাবে তো নতুন প্রথার সূচনা হবে।[৩]

আটান্ন হিজরী, রমযান মাস, সতেরো তারিখ (মোতাবেক ১৩ জুন ৬৭৮ খ্রি.) রাতে বিতর নামাযের পর হযরত আয়েশা রাযি. প্রিয় প্রভুর ডাকে সাড়া দিয়ে পৃথিবীকে বিদায় জানালেন। কান্নার আওয়াজ শুনে আনসারিগণ বাইরে এলেন। জানাযায় এত ভিড় হলো যে রাবীগণ বলেন, রাতে আমরা কখনো এত লোকসমাগম দেখিনি। কিছু কিছু বর্ণনায় আছে, নারীদের ভিড়ভাড়ে ঈদের দিন ভ্রম হচ্ছিল।[৪] হযরত উম্মে সালামা রাযি. কান্নার আওয়াজ শুনে বললেন, হযরত আয়েশা রাযি.-এর জন্য জান্নাত ওয়াজিব। তিনি রাসূলের প্রিয়তমা স্ত্রী ছিলেন। এটা *হাকেমের* বর্ণনা। *মুসনাদে তয়ালিসিতে* আছে, তিনি বললেন, আল্লাহ তাঁকে রহম করুন। তিনি তাঁর পিতার পরে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সবচেয়ে প্রিয় ছিলেন।[৫]

হযরত আবু হুরায়রা রাযি. ওই সময় মদীনায় অবস্থান করছিলেন।

---

১. বর্ণনাটির শুধু প্রথম অংশটুকু *সহীহ বুখারী*—মানাকিবে আয়েশা-তে আছে। বাকিটুকু সূরা নূরের তাফসীরে আছে। কিন্তু পূর্ণ বর্ণনা আছে *মুসতাদরাকে হাকেমে*। (সহীহাইনের শর্তানুসারেই) *মুসনাদে আহমাদেও* বর্ণনাটি পাওয়া যায়।

২. *সহীহ বুখারী*, কিতাবুল জানাইয-এর শেষে এবং باب الاعتصام بالسنة অংশে সংক্ষেপে আছে। ইবনে সাদ, النساء অংশে পুরোপুরি আছে।

৩. *মুয়াত্তা*, باب النوادر মূল ইবারত : إني إذا لأنا المبتدئة به।

৪. *তাবাকাতে ইবনে সাদ* : جزء النساء পৃষ্ঠা : ৫২।

৫. *তয়ালিসি* : মুসনাদে উম্মে সালামা রাযি., পৃষ্ঠা : ২২৪।

তিনি বিচারকার্যে নিয়োজিত ছিলেন। তিনিই জানাযার নামায পড়ান। কাসেম ইবনে মুহাম্মাদ, আবদুল্লাহ ইবনে আবদুর রহমান, আবদুল্লাহ ইবনে আতিক, উরওয়াহ ইবনে যুবায়ের, আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের প্রমুখ ভ্রাতুষ্পুত্র ও ভাগ্নেগণ সমাধিতে অধিষ্ঠিত করেন।[১] ওসিয়ত অনুসারে তাঁকে জান্নাতুল বাকিতে সমাহিত করা হয়। মদীনায় এক অবর্ণনীয় বিষণ্নতা ছেয়ে ছিল। নবীপরিবারের আরও একটি আলোকবর্তিকা নিভে গেল। তাবেঈ মাসরুক রহ. বলেন, যদি একটি কথা আমার মনে না থাকত, তা হলে উম্মুল মুমিনীনের জন্য মাতমের হালকা বসাতাম।[২] বহিরাগত কিছু লোক একজন জনৈক মাদানীকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, হযরত আয়েশা রাযি.-এর মৃত্যুশোক মদীনাবাসীকে কেমন আচ্ছন্ন করেছিল? লোকটি উত্তর দিয়েছিলেন, সন্তানমাত্রই (অর্থাৎ প্রত্যেক মুসলমান) মাতার মৃত্যুশোকে মুহ্যমান ছিলেন।[৩]

উত্তরাধিকার

হযরত আয়েশা রাযি. অল্প কিছু জিনিস রেখে গিয়েছিলেন। এগুলোর মধ্যে একটি জমিও ছিল। এটা হযরত আসমা রাযি.-এর ভাগে পড়ে। আমীর মুআবিয়া রাযি. বরকতের উদ্দেশ্যে জমিটি অনেক চড়া মূল্যে (এক লক্ষ দিরহামে) কিনে নিয়েছিলেন।

পাঠক জানেন কি, হযরত আসমা রাযি. অত মুদ্রা কী করেছিলেন? প্রিয়জনদের মধ্যে বিতরণ করে দিয়েছিলেন![৪]

পোষ্যগ্রহণ ও সন্তান-লালনপালন

হযরত আয়েশা রাযি.-এর কোনো সন্তান ছিল না।[৫] কিন্তু সারা

---

১ সবগুলো বিবরণ ইমাম হাকেম রহ.-এর *মুসতাদরাক* গ্রন্থে আছে। তিনি অধিকাংশ বর্ণনা সম্পর্কেই লিখেছেন, على شرط الصحيحين (সহীহায়নের শর্তানুসারে গৃহীত)।

২. *তাবাকাতে ইবনে সাদ* : جزء النساء , পৃষ্ঠা : ৫৪।

৩. *তাবাকাতে ইবনে সাদ* : جزء النساء, পৃষ্ঠা : ৫৪।

৪. *সহীহ বুখারী* : باب هبة الواحد للجماعة।

৫. *আবু দাউদ* : শিষ্টাচার অধ্যায়।

জীবনে এমন কোনো ঘটনা নেই, যা থেকে ভাবা যেতে পারে যে ভাগ্যের প্রতি তাঁর কোনো অভিযোগ ছিল। আরবের অভিজাত লোকেরা নামের পাশাপাশি সন্তানদের নামে উপনাম গ্রহণ করতেন। কেননা সম্মানিত ব্যক্তির নাম নেওয়া ছিল অশোভন। তাই উপনামে সম্বোধিত হতেন। হযরত আয়েশা রাযি. একবার আরজ করলেন, হে আল্লাহর রাসূল, আপনার স্ত্রীগণ যার যার আগের ঘরের সন্তানদের নামে উপনাম গ্রহণ করেছেন। কিন্তু আমি কার নামে উপনাম গ্রহণ করব? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমিও তোমার পুত্র আবদুল্লাহর নামে উপনাম গ্রহণ করো।[১]

ইবনুল আরাবী রহ. এখানে ভ্রান্তির শিকার হয়েছেন। তিনি বর্ণনা করেছেন, হযরত আয়েশা রাযি. একটি অপূর্ণাঙ্গ শিশু প্রসব করেছিলেন। তারই নাম ছিল আবদুল্লাহ।[২] কিন্তু এ কথা একদমই অগ্রহণযোগ্য। কেননা বর্ণনাটি অত্যন্ত দুর্বল। সেই সঙ্গে বিশুদ্ধ বর্ণনাসমূহের সঙ্গে সাংঘর্ষিক। একটি বিশুদ্ধ বর্ণনাও এমন তথ্য দেয় না। বরং বেশ কিছু হাদীসে স্পষ্টত উল্লেখ আছে যে হযরত আয়েশা রাযি. নিঃসন্তান ছিলেন।[৩]

হাদীসে আবদুল্লাহ বলে আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের রাযি. উদ্দিষ্ট। তিনি হযরত আয়েশা রাযি.-এর ভাগ্নে ছিলেন। তাঁর গর্ভধারিণী মাতা ছিলেন হযরত আসমা রাযি.। মুহাজির সাহাবীগণের মদীনায় ভূমিষ্ঠ হওয়া ইনিই প্রথম সন্তান। হিজরতের পর মদীনার কাফেররা বলাবলি করত, মুসলমান বিবিরা এখানে এসে দেখি বাঁজা হয়ে গেছে। তাই হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের রাযি. যখন জন্মগ্রহণ করলেন, তখন মুসলমানগণ অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছিলেন। এমনকি স্বয়ং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আনন্দিত হয়ে তাঁর জিহ্বায় নিজের মুখে চিবানো খেজুর ও লালা লাগিয়ে দিয়েছিলেন।

হযরত আয়েশা রাযি. যেন তাঁকে পোষ্যরূপে গ্রহণ করেছিলেন।

---

১. *আবু দাউদ* : শিষ্টাচার অধ্যায়।

২. *যুরকানি* : ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা : ২৬৯।

৩. *মুসনাদে আহমাদ* : ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা : ১৫।

মনেপ্রাণে তাঁকে ভালোবাসতেন। শিশু আবদুল্লাহও তাঁকে মায়ের চেয়ে বেশি ভালোবাসতেন। তিনি আরও কয়েকটি শিশুকে অপত্যস্নেহে বড় করেছিলেন।[১] রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায়ও এক আনসারি শিশুর লালন-পালন ও বিবাহ দেওয়ার কথা হাদীসে এসেছে।[২]

মাসরুক ইবনে আজদা,[৩] উমরাহ বিনতে আয়েশা রাযি., উমরাহ বিনতে আবদুর রহমান আনসারিয়াহ রাযি., আসমা বিনতে আবদুর রহমান ইবনে আবু বকর রাযি., উরওয়াহ ইবনে যুবায়ের রাযি.,[৪] কাসেম ইবনে মুহাম্মাদ[৫] ও তার ভাই এবং আবদুল্লাহ ইবনে ইয়াযিদ প্রমুখকে[৬] হযরত আয়েশা রাযি. মায়ের মমতায় বড় করেছিলেন। মুহাম্মাদ ইবনে আবু বকর রাযি.-এর কন্যাদের দেখাশোনাও তিনিই করেছিলেন।[৭] তাদের বিবাহশাদিও হয়েছিল তাঁরই তত্ত্বাবধানে।[৮]

সাজ-সজ্জা ও পোশাক-পরিচ্ছদ

হযরত আয়েশা রাযি. ওইসব শিশুকন্যার অন্তর্ভুক্ত ছিলেন যাদের শারীরিক বর্ধনশীলতা অতিমাত্রায় লক্ষণীয়। আট-দশ বছর বয়সেই পূর্ণযৌবনা নারীআকৃতি ধারণ করেন।[৯] শৈশব ও কৈশোরে ছিলেন ছিপছিপে, দোহারা গড়ন।[১০] একটু বয়স হতেই মোটাসোটা ও ভারী হয়ে ওঠেন।[১১] দুধে আলতা বরণ।[১২] হাসিখুশি, সুন্দর।[১৩]

---

১. *মুয়াত্তা ইমাম মালেক* রহ. : কিতাবুল যাকাত।
২. *মুসনাদে আহমাদ* : ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা : ২৬৯।
৩. *তাযকিরাতুল হুফফায*, তরজমায়ে মাসরুক।
৪. *আসমাউর রিজালে* তাঁর জীবনী দ্রষ্টব্য।
৫. *মুয়াত্তা* : যাকাতু আমওয়ালিল ইয়াতামা।
৬. *মুসনাদে আহমাদ* : ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা : ৩২।
৭. *মুয়াত্তা* : كتاب الزكوة ، زكوة الحلي।
৮. *মুয়াত্তা* : কিতাবুত তালাক।
৯. *সহীহ বুখারী* : হযরত আয়েশা রাযি.-এর বিবাহ।
১০. *সহীহ বুখারী* : ইফক। *আবু দাউদ* : باب السبق।
১১. *আবু দাউদ* : باب السبق।
১২. *মুসনাদে আহমাদ* : ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা : ১৩৮। হয়তো এজন্যই তাঁর একটি উপাধি হুমায়রা।
১৩. *সহীহ বুখারী* : ইফক ও ঈলা।

স্বভাবে অল্পেতুষ্টি ও অনাড়ম্বতা ছিল। সাদাসিধে জীবন-যাপনে অভ্যস্ত ছিলেন। কাপড়চোপড় এক জোড়ার বেশি রাখতেন না। সেটিই ধুয়ে ধুয়ে পরতেন।[১] সঙ্গে একটি দামি কুর্তাও ছিল। যার তৎকালীন মূল্য ছিল চার দিরহাম। ওই সময়ের বিবেচনায় সেটি এতই মূল্যবান ছিল যে অনুষ্ঠানাদিতে ব্যবহার্য ছিল। নারীগণ বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠানের জন্য চেয়ে নিয়ে যেতেন।[২] কখনো কখনো কাপড়ে জাফরানের রঙ মেশাতেন।[৩] থেকে-থেকে অলঙ্কারও পরতেন। গলায় ইয়েমেনের বানানো সাদা-কালো পাথরের হার ছিল।[৪] আঙ্গুলে সোনা-চাঁদির আংটিও পরতেন।[৫]

স্বভাব-প্রকৃতি ও আচার-ব্যবহার

উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা রাযি. শৈশব থেকে শুরু করে পরিণত বয়স পর্যন্ত পুরো সময়টাই অতিবাহিত করেছিলেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র সত্তার সান্নিধ্য-শোভায়, পৃথিবীতে যাঁর আগমন হয়েছিল উত্তম চরিত্রের ফুলকলিকে বিকশিত করতে, যাঁর স্বভাব-সৌন্দর্য ও চরিত্রমাধুরী স্বয়ং আল-কুরআন। মহান আল্লাহ ইরশাদ করেছেন :

وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ

অর্থ : নিশ্চয় আপনি মহৎ চরিত্রবৈশিষ্ট্যের উপরে প্রতিষ্ঠিত। (সূরা কলাম, আয়াত : ৪)

নববী-নীড়ের আত্মিক দীক্ষা নিঃসন্দেহে বিদুষী মাতাকে উন্নত চরিত্রের সর্বোচ্চ শিখর অবলোকন করিয়েছিল, যা মানবাত্মার উন্নতির চূড়ান্ত পর্যায়। সেই সৌন্দর্য ও সুঘ্রাণই তাঁকে বিমোহিত করেছে। তিনিও

---

১. *সহীহ বুখারী* : باب هل تصلي المرأة في ثوب حاضت فيه ।

২. *সহীহ বুখারী* : باب الاستعار للعروس ।

৩. *সহীহ বুখারী* : باب ما يلبس المحرم من الثياب ।

৪. *সহীহ বুখারী* : باب التيمم / باب الإفك ।

৫. *সহীহ বুখারী* : باب خاتم النساء ।

হয়েছেন বিকশিত। এজন্যই তিনি ছিলেন বিদুষী, বিবেচক, বদান্য, অল্পেতুষ্ট, আবেদা এবং মহৎ।

অল্পেতুষ্টি

নারীত্ব এবং অল্পেতুষ্টি, এখন যেন দুই মেরুর দুই বিপরীতমুখী বস্তু। বিশুদ্ধ সূত্রে বর্ণিত হাদীসে এসেছে, হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমি দোজখে নারীদেরকেই বেশি দেখেছি। কারণ জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেছিলেন, তারা জীবনসঙ্গীদের প্রতি অকৃতজ্ঞ হয়। কিন্তু হযরত আয়েশা রাযি.-এর মধ্যে এই দুই গুণেরই সমাবেশ ঘটেছিল। তিনি দাম্পত্যজীবন কতটা অভাব-অনটনের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত করেছিলেন, তার একটা স্বচ্ছ ধারণা আগের অধ্যায়গুলোতে এসেছে। কিন্তু তিনি কখনোই অভিযোগ বা অনুযোগ করেননি। জমকালো জামা, দামি গয়না, বড় বাড়ি, রকমারি খাবার কিছুই পাননি স্বামী-সংসারে। অথচ চোখের সামনে গনিমতের মাল বন্যার ঢলের মতো এসেছে এবং গিয়েছে। তারপরও কিছু চাননি। চাওয়া তো দূর; কামনাও করেননি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তিকালের পর একবার হযরত আয়েশা রাযি. আহার করতে চাইলেন, এরপর বললেন, আমি কখনোই তৃপ্তিভরে খেতে পারি না; আমার কান্না পায়। জনৈক শাগরেদ জিজ্ঞেস করলেন, কেন, মাতা? তিনি বললেন, মনে পড়ে, কী অভাব-অনটনের মধ্য দিয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছিলেন। আল্লাহর কসম, কখনোই এমন হয়নি যে, তিনি পেট পুরে দু'বেলা গোশত-রুটি আহার করেছেন।[১]

আল্লাহ তাআলা হযরত আয়েশা রাযি.-কে সন্তান-সন্ততি থেকেও বঞ্চিত রেখেছিলেন। কিন্তু সাধারণ মুসলমানদের শিশুদের, বিশেষ করে—এতিম শিশুদের নিয়ে লালন-পালন করতেন; তাদের শিক্ষা-দীক্ষার ব্যবস্থা করতেন; বিবাহ-শাদি দিতেন; এবং এমন একটা সাদামাটা সহজ-সরল জীবনেই তুষ্ট থাকতেন।[২]

---

১. *তিরমিযী* : যুহদ।

২. দেখুন, *মুয়াত্তা মালেক* রহ. : কিতাবুয যাকাত।

সমশ্রেণির সহযোগিতা

মহান আল্লাহ হযরত আয়েশা রাযি.-কে নববী-নীড়ের মালিকা ও গৃহকর্তী বানিয়েছিলেন। এই জীবনবোধ ও অনুভূতি তাঁর অন্তরে স্থিত হয়েছিল। তিনি আবির্ভূত হয়েছিলেন নারীসমাজের দায়িত্ববান প্রতিনিধির ভূমিকায়। নারীসমাজের আনাগোনা ছিল তাঁর কাছে। তাদের আবদার, অভিযোগ, প্রয়োজন, সমস্যা—উত্থাপিত হতো তাঁর কাছে। মূলত তিনি ছিলেন নারীসমাজে নববী নূরের প্রতিফলনে স্বচ্ছ সুন্দর প্রতিবিম্ব।[১]

স্বামীর আনুগত্য

হযরত আয়েশা রাযি. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনুগত্য ও নির্দেশপালন এবং তাঁর সুখ ও সন্তুষ্টির কথা ভেবে দিন-রাত চব্বিশ ঘণ্টা তটস্থ থাকতেন। নবীজীর চোখেমুখে বিন্দুমাত্রও কষ্টের ছাপ, অসন্তোষের ভাব বা দুশ্চিন্তা সহ্য করতে পারতেন না। এমনকি, অস্থির হয়ে যেতেন।[২] রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আত্মীয়-স্বজনদের এত গুরুত্ব দিতেন যে, কখনো তাদের কোনো কথা ফেলতেন না। একবার তিনি অভিমান করে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের রাযি.-এর সঙ্গে যোগাযোগ না রাখার শপথ করে বসেন। কিন্তু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাতুল পক্ষের আত্মীয়দের কথা রাখতে তাঁকে সেই শপথ ভাঙতে হয়।[৩] রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিয়মিত কাজে কর্মেও তাঁর গুরুত্ববোধ ছিল অনেক বেশি। তিনি কখনোই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোনো কথা খণ্ডন করতেন না, কথার ওপর কথা বলতেন না।[৪]

---

১. *মুসনাদে আহমাদ* : ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা : ২২৬। *সহীহ বুখারী*, পৃষ্ঠা : ৩৬১। باب شهادة القاذف।

২. *মুসনাদে আহমাদ* : ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা : ১১। *মুসনাদ* : ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৮৫। *মুসনাদ* : ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা: ১৩৮। *সহীহ বুখারী* : হযরত জাফর রাযি.-এর মৃত্যুশোকের আলোচনা, باب مناقب قريش।

৩. *সহীহ বুখারী* : باب مناقب قريش।

৪. *সহীহ বুখারী* : باب الاعتصام بالسنة।

গীবত ও অন্যের দোষচর্চা থেকে বেঁচে থাকা

তিনি কখনো কারও ক্ষতি করতেন না। দোষচর্চা করতেন না। তাঁর সূত্রে বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা কয়েক হাজার। কিন্তু এত বড় সংগ্রহশালায় কারও প্রতি অবজ্ঞামূলক একটি অক্ষরও নেই। সতিনদের দোষচর্চা করা নারীর সহজাত প্রবৃত্তি। কিন্তু আমরা দেখেছি তিনি কত উদার মনোভাব নিয়ে সতিনদের প্রশংসা ও গুণকীর্তন করতেন। কত প্রসন্ন বদনে তাঁদের মহত্ত্ব-বড়ত্বের আলোচনা করতেন। হযরত হাস্‌সান রাযি. অপবাদ আরোপের ফেতনা থেকে আত্মরক্ষা করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন। তিনিও সুর মিলিয়েছিলেন অবাঞ্ছিত কপটশ্রেণির সঙ্গে। যে কেউ বুঝবেন হযরত আয়েশা রাযি. তার এহেন আচরণে কতটা ব্যথিত ও মর্মাহত হয়েছিলেন। অথচ এই হাস্‌সান রাযি.-ই হযরত আয়েশা রাযি.-এর মজলিসে আসতেন এবং তিনি সানন্দে তাকে জায়গা করে দিতেন। একবার হযরত হাস্‌সান রাযি. এলেন এবং স্বরচিত একটি কবিতা আবৃত্তি করে শোনালেন। কবিতাপঙ্‌ক্তির একাংশের ভাবার্থ ছিল : তিনি কখনো কোনো সহজ-সরল নারীর দোষচর্চা করেন না। এ কথা শুনে হযরত আয়েশা রাযি.-এর ইফকের ঘটনা মনে পড়ে যায়; তিনি শুধু এটুকুই বললেন, কিন্তু হে হাস্‌সান, তুমি তো এমন ছিলে না।[১] তাঁর কাছের কিছু মানুষ অপবাদ আরোপের ঘটনায় জড়িত থাকায় হযরত হাসসান রাযি.-কে দেখতে পারতেন না। তারা দু-একবার তাঁকে উদ্দেশ্য করে বিরূপ মন্তব্য করতে চাইলে হযরত আয়েশা রাযি. খুবই কঠোরভাবে বাধা দেন এবং বলেন, তাকে মন্দ বোলো না, সেই তো তার কবিপ্রতিভায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ থেকে কাফের-মুশরিকদের সমালোচনার দাঁতভাঙা জবাব দিত।[২]

একবার জনৈক ব্যক্তির আলোচনা চলছিল। লোকটির প্রতি তাঁর অসন্তোষ লক্ষ করা গেল। লোকেরা বলল, উম্মুল মুমিনীন, তার ইন্তেকাল হয়ে গেছে। এ কথা শুনে সঙ্গে সঙ্গে তার রুহের মাগফেরাতের দুআ করলেন। লোকেরা জিজ্ঞেস করল, আপনাকে তো তার প্রতি অসন্তুষ্ট মনে

---

১. *সহীহ বুখারী* : ইফকের ঘটনা, তাফসীর—সূরা নুর।

২. *সহীহ বুখারী* : মানাকিবে হাসান রাযি.।

হলো; অথচ তার জন্য দুআ করলেন? তিনি বললেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যারা মারা গেছে, তাদের শুধু গুণই স্মরণ করো, কখনো দোষ স্মরণ কোরো না।[১]

অন্যের অনুগ্রহ গ্রহণ না করা

হযরত আয়েশা রাযি. অন্যের অনুগ্রহ গ্রহণ করতে চাইতেন না। কখনো গ্রহণ করলেও শীঘ্রই বিপরীতে তিনিও কিছু না কিছু দিতেন। ইরাক বিজয়ের পর গনিমতের মধ্যে মোতির একটি দামি ডিব্বা পাওয়া গেল। সকলের অনুমতিক্রমে হযরত উমর রাযি. হযরত আয়েশা রাযি.-এর খেদমতে পাঠিয়ে দিলেন। হযরত আয়েশা রাযি. ডিব্বাটি উন্মুক্ত করে বললেন, আল্লাহ, ইবনে খাত্তাবের অনুগ্রহ গ্রহণের জন্য আমাকে আর বেশি বাঁচিয়ে রেখো না।[২] পুরো মুসলিমবিশ্বের বিভিন্ন জায়গা হতে একের পর এক উপঢৌকন আসতে থাকত। তাঁর কঠোর নির্দেশ ছিল, অবশ্যই যেন প্রত্যেক বস্তুর যথার্থ বিনিময় হয়।[৩] আবদুল্লাহ ইবনে আমর, জনৈক আরব নেতা, কিছু দিনার ও কাপড় পাঠালেন। তিনি সেগুলোকে এই বলে ফেরত পাঠাতে চাইলেন যে, আমরা কারও অনুগ্রহ গ্রহণ করি না। কিন্তু পরক্ষণেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি বাণী মনে পড়ে যাওয়ায় তিনি তা রেখে দিতে বললেন।[৪]

আত্মপ্রশংসা থেকে পরহেজ করা

হযরত আয়েশা রাযি. আত্মপ্রশংসা অপছন্দ করতেন। এমনকি, মৃত্যুশয্যায় একবার হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি. দেখা করার অনুমতি চাইলে তিনি বুঝতে পারলেন, সে এসে আমার প্রশংসা করা শুরু করবে। তাই অনুমতি দিতে চাইছিলেন না। কিন্তু অন্যদের অনুরোধে ভেতরে আসার অনুমতি দিলেন। হযরত ইবনে আব্বাস ভেতরে এসে সত্যি সত্যিই প্রশংসা করা শুরু করলেন। তাঁর প্রশংসা শুনে হযরত

---

১. *তয়ালিসি* : মুসনাদে আয়েশা রাযি.।

২. *মুসতাদরাকে হাকেম*।

৩. *আল আদাবুল মুফরাদ*, ইমাম বুখারী রহ. : বাবুল কিতাবাতি ইলান নিসা।

৪. *মুসনাদে আহমাদ* : ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা : ৭৭।

আয়েশা রাযি. বললেন, হায় আমার যদি অস্তিত্বই না হতো![1]

আত্মসম্মানবোধ

বাস্তবজীবনের অনেক অক্ষমতা ও অপারগতা সত্ত্বেও উম্মুল মুমিনীন রাযি.-কে মহান আল্লাহ ভীষণ আত্মসম্মান দান করেছিলেন। এই আত্মসম্মানবোধ যেমন তাঁর প্রকৃতিকে মহৎ করেছে, তেমনই কখনো কখনো অনুদারও করেছে। দীর্ঘদিনের বুকফাটা কষ্ট চেপে রাখার পর মহাগ্রন্থ আল কুরআনে যখন তাঁর দোষমুক্তি ও পবিত্রতা ঘোষিত হয়েছিল, তখনো এই প্রকৃতিস্থ আত্মাভিমানের দারুণ প্রকাশ ঘটেছিল তাঁর ভাষ্যে। মা বললেন, যাও মা, স্বামীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো। তিনি কী আবেগঘন গভীর আবেদনে বললেন, আমি তো শুধু আমার প্রিয় প্রভুর প্রতিই কৃতজ্ঞ, যিনি আমার সতীত্বকে সম্মানিত করেছেন; আমার পবিত্রতাকে অলঙ্কৃত করেছেন।[2] পাঠক নিশ্চয় জেনেছেন, যখন পবিত্র জীবনসঙ্গীর প্রতি তাঁর অভিমান হতো, তখন শপথবাক্যে আর তাঁর নাম নিতেন না। এগুলো সবই প্রেমময়ী নারীর প্রেমের দাবি। এগুলো দাম্পত্যজীবনেরই অবিচ্ছেদ্য উপাদান।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের রাযি. মাতৃপ্রতিম খালার খুবই সেবাযত্ন করতেন। কিন্তু হযরত আয়েশা রাযি. ছিলেন অত্যন্ত বদান্য ও দানশীল। তিনি ভাগ্নের দেওয়া সবকিছুই এখানে-সেখানে দান করে দিতেন। ইবনে যুবায়ের রাযি. মনঃক্ষুণ্ন হয়ে একবার বললেন, খালার হাত বেঁধে রাখতে হবে। ঘটনাক্রমে কথাটি হযরত আয়েশা রাযি.-এর কানে পৌঁছে যায়। তিনিও মনঃক্ষুণ্ন হলেন। তিনি শপথ করলেন, ভাগ্নের সঙ্গে কোনো যোগাযোগ রাখবেন না, তার দেওয়া কিছু গ্রহণ করবেন না। লোকেরা অনেক কাকুতি-মিনতি করেও যখন কাজ হলো না, তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাতুল পক্ষের নিকটাত্মীয়দের শরণাপন্ন হলেন। অবশেষে তাদের হস্তক্ষেপে মাতার মানও ভাঙল, মানতও ভাঙল।[3]

---

১. *সহীহ বুখারী*। *মুসতাদরাক*। *মুসনাদ*।

২. *সহীহ বুখারী* : ইফক।

৩. *সহীহ বুখারী* : মানাকিবে কুরাইশ।

ন্যায় ও নিষ্ঠা

অনেক সময়, আত্মমর্যাদাবোধের অধিকারীগণ আত্মসম্মানের কাছে পরাজিত হয়ে ন্যায় ও ধর্ম থেকে বিচ্যুত হন। কিন্তু নববী উদ্যানের স্বর্গীয় মালির পরিচর্যায় প্রস্ফুটিত সাদা গোলাবটি এমন ছিলেন না। মহান আল্লাহ তাঁকে উত্তম চরিত্রমাধুরীর পূর্ণাঙ্গতা দান করেছিলেন। বিচিত্র, বিরোধী, চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যাবলির নিখুঁত সমন্বয়েই তিনি ছিলেন মহীয়সী। তাই তো তাঁর আত্মসম্মান ছিল; কিন্তু ন্যায় ও ধর্ম থেকে অনাসক্তি ছিল না। যা ন্যায়—আত্মগর্বে কখনোই তা অস্বীকার করেননি। যা ধর্ম—আত্ম-অহংকারে কখনোই তা উপেক্ষা করেননি।

সহীহ মুসলিমে এসেছে, একবার জনৈক মিশরী হযরত আয়েশা রাযি.-এর সঙ্গে দেখা করতে এলেন। হযরত আয়েশা রাযি. জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের বর্তমান শাসক ও গভর্নরের মনোভাব কীরূপ? লোকটি বললেন, তাদের প্রতি আমাদের কোনো অভিযোগ নেই। কারও বাহনের অভাব হলে বাহনের ব্যবস্থা করেন। সেবক না থাকলে সেবকের ব্যবস্থা করেন। অর্থের প্রয়োজন হলে অর্থের ব্যবস্থা করেন। হযরত আয়েশা রাযি. বললেন, তারা আমার অনুজ মুহাম্মাদ ইবনে আবু বকর রাযি.-এর সঙ্গে যে আচরণ করেছে তা হৃদয়বিদারক; কিন্তু তারপরও আমাকে বলতেই হবে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার এই ঘরে বসেই দুআ করেছিলেন, হে আল্লাহ, যারা আমার উম্মতের শাসনভার গ্রহণ করবে, তারা যদি আমার উম্মতের প্রতি নির্দয় হয়, তবে তুমিও তাদের প্রতি নির্দয় হয়ো; যদি সদয় হয়, তবে তুমিও তাদের প্রতি সদয় হয়ো।[১]

সাহসিকতা

হযরত আয়েশা রাযি. অত্যন্ত সাহসী ও তেজস্বী ছিলেন। রাতের অন্ধকারে উঠে গোরস্তানে যেতেও ভয় পেতেন না।[২] যুদ্ধের বিভীষিকা ও দাবানলেও ভীত হতেন না। উহুদের যুদ্ধে মুসলিম যোদ্ধাগণ প্রায় পর্যুদস্ত

১. *সহীহ মুসলিম* : বাবু ফযিলাতিল ইমামিল আদিল।
২. *সহীহ বুখারী*-সহ বিশুদ্ধ গ্রন্থগুলোর বাবু যিয়ারাতিল কুবুর দ্রষ্টব্য।

ছিলেন। কী অবর্ণনীয় ভীতি ও ত্রাস প্রাণ কণ্ঠাগত করে রেখেছিল অন্তঃপুরবাসিনীর। অথচ মৃত্যুর ওই ভয়াল গ্রাসেও তিনি ঝাঁপ দিয়েছিলেন অসীম সাহসিকতা নিয়ে। অস্ত্রের ঝঙ্কার আর রক্তের ফিনকিতে বিচলিত হননি; অনবরত পিঠে করে পানি বহন করেছেন এবং একের পর এক আহত যোদ্ধাদের পান করিয়েছেন।[১] খন্দক যুদ্ধে মুশরিকরা পুরো মদীনা অবরুদ্ধ ও অচল করে রেখেছিল। শহরের অভ্যন্তরে যে কোনো মুহূর্তে ইহুদিদের চড়াও হওয়ার ছিল সমূহ শঙ্কা। কিন্তু হযরত আয়েশা রাযি. শুধু নির্ভয়ই ছিলেন না; রণভূমিতে এসে মুসলিম সৈন্যদের যুদ্ধপরিকল্পনা প্রত্যক্ষ ও পর্যবেক্ষণও করেছেন।[২] শুধু তা-ই নয়, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে যুদ্ধে অংশগ্রহণের অনুমতিও চাইতেন এই মহীয়সী নারী।[৩] তিনি যে শান-সওকতের সঙ্গে সংশোধনকামী বাহিনীর নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তা নিঃসন্দেহে স্বভাবসিদ্ধ সাহসিকতা ও সুউচ্চ মনোবলেরই পরিচায়ক। জঙ্গে জামালে তাঁর ব্যক্তিত্বের অপরিসীম প্রভাব যে কাউকে হতবাক করে দেয়।

বদান্যতা

হযরত আয়েশা রাযি.-এর চরিত্রমাধুরীর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয়—বদান্যতা ও দানশীলতা। হযরত আয়েশা রাযি. এবং হযরত আসমা রাযি. দুই বোনই ছিলেন অত্যন্ত উদার ও মহৎ। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের রাযি. বলতেন, আমার মা ও খালার চেয়ে বদান্য ও দানশীল কাউকে দেখিনি। তবে দুজনের দানশীলতার ধরনে পার্থক্য ছিল। হযরত আয়েশা রাযি. ছোট ছোট জিনিসও একটু একটু করে জড়ো করতেন। যখন বড় অবয়ব দাঁড়াত, তখন দান করে দিতেন। পক্ষান্তরে হযরত আসমা রাযি.-এর হাতে কিছু এলে, সেটাকে জড়ো করা, বড় করা—তাঁর দ্বারা হতো না; তবে যাই আসত, অবলীলায় বিলিয়ে দিতেন।[৪] হযরত আয়েশা রাযি. প্রায় সময়ই থাকতেন ঋণগ্রস্ত, এখান

---

১. *সহীহ বুখারী* : ذكر أحد।

২. *মুসনাদে আহমাদ* : ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা : ৯৯।

৩. *সহীহ বুখারী* : বাবু হাজ্জিন নিসা।

৪. *আল আদাবুল মুফরাদ*. ইমাম বুখারী রহ. : বাবু সাখাওয়াতিন নাফস।

থেকে-ওখান থেকে ধার-কর্জ হতেই থাকত। লোকে জানতে চাইত, আপনার কর্জ করার কী প্রয়োজন? তিনি বলতেন, কর্জ করলে পরিশোধ করার নিয়ত থাকে, এতে আল্লাহর সাহায্য আসে; আর আমি আল্লাহর সাহায্যের অপেক্ষা করি।[১]

দান খয়রাতে কম-বেশির পরোয়া করতেন না। হাতে যা থাকত, ফকির-মিসকিনকে দান করে দিতেন। একবার এক ভিখারিনী এল। তার দুই কোলে দুটো শিশু ছিল। ঘটনাক্রমে ওই সময় এক টুকরো শুকনো খেজুর ছাড়া ঘরে কিছুই ছিল না। হযরত আয়েশা রাযি. ওটুকুই দুই ভাগ করলেন এবং বাচ্চা দুটোর মুখে তুলে দিলেন। পরে যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাশরীফ আনলেন, তখন ঘটনাটি তাঁকে জানালেন।[২] একবার এক ভিখারী এল। সামনে কয়েকটি আঙ্গুর ছিল। হযরত আয়েশা রাযি. একটি দানা তাকে তুলে দিলেন। ভিখারী ভ্রু কোঁচকাল। বলল, একদানা আঙ্গুরও কেউ দেয়? হযরত আয়েশা রাযি. বললেন, আরে, এটা তো দ্যাখো যে, এতে কতগুলো 'যাররা'[৩] আছে।[৪] হযরত আয়েশা রাযি. এই আয়াতটির প্রতি ইঙ্গিত করে কথাটি বলেছিলেন :

فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهٗ

অর্থ : আর যে এক 'যাররা' পরিমাণও নেক আমল করবে, তারও সুফল দেখতে পাবে। (সূরা যিলযাল, আয়াত : ৭)

হযরত উরওয়াহর সূত্রে বর্ণিত, একবার হযরত আয়েশা রাযি. তার সামনে সত্তর হাজার দিরহাম আল্লাহর ওয়াস্তে সদকা করে দিলেন, নিজের কাছে কিছুই রাখলেন না।[৫]

---

১. *মুসনাদে আহমাদ* : ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা : ৯৯।

২. *আল আদাবুল মুফরাদ*, ইমাম বুখারী রহ. : باب من يعقول يتيما।

৩. 'যাররা' বলা হয় ছিদ্রপথে সূর্যালোকে দৃশ্যমান ধুলোকণাকে।

৪. *মুয়াত্তা*, ইমাম মালেক রহ. : বাবুত তারগীবি আলাস সাদাকাহ।

৫. *তাবাকাতে ইবনে সাদ*, পৃষ্ঠা : ৬, جزء النساء।

আমীর মুআবিয়া রাযি. একবার এক লক্ষ দিরহাম পাঠালেন। সন্ধ্যা হতে হতে একটিও বাকি ছিল না। সব গরিব-দুঃখীদের মাঝে বিতরণ করে দিলেন। ঘটনাক্রমে সেদিন রোযা রেখেছিলেন। সেবিকা বলল, ইফতারের জন্য তো কিছু রাখতে হতো। হযরত আয়েশা রাযি. বললেন, মনে করিয়ে দিতে।[১] একই রকম আরেকটি ঘটনা : হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের রাযি. একবার দুটো থলেতে করে প্রায় এক লক্ষ মুদ্রা পাঠিয়ে দিলেন। হযরত আয়েশা রাযি. একটি তাকে মুদ্রাগুলো রাখলেন এবং বিতরণ করতে লাগলেন। সেদিনও রোযা রেখেছিলেন। সন্ধ্যায় ইফতারের সময় সেবিকা বলল, ইফতারের জন্য কিছু গোশত কিনলে ভালো হতো। তিনি বললেন, এখন বলে কী হবে? তখন বলতে।[২]

আরও একবার একই ঘটনা ঘটল। তিনি রোযা রেখেছিলেন। ঘরে ছিল শুধুমাত্র একটি রুটি। হঠাৎ এক ভিখারিনী এল। সেবিকাকে বললেন, ওই রুটিটাই দিয়ে দাও। সেবিকা বলল, সন্ধ্যায় ইফতার করবেন কী দিয়ে? বললেন, দিয়ে দাও। সন্ধ্যায় কোনো প্রতিবেশী বকরির গোশতের তরকারি পাঠাল। সেবিকাকে বললেন, দ্যাখো, তোমার রুটির চেয়ে আল্লাহ আরও ভালো জিনিস পাঠিয়েছেন।[৩] তিনি তাঁর একটি জায়গা আমীর মুআবিয়া রাযি.-এর কাছে বিক্রি করেছিলেন। মূল্য যা পেয়েছিলেন, সবই সদকা করে দিয়েছিলেন।[৪]

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের রাযি. তাঁর ভাগ্নে ছিলেন। তিনি খালার দেখাশোনাকে সবচেয়ে গুরুত্ব দিতেন। অনেক সেবাযত্ন করতেন। কিন্তু তাঁর দানশীলতার কারণে তিনিও বিরক্ত হয়ে পড়েছিলেন। একবার তাঁর মুখ ফসকে এ কথা বের হয় যে, খালার হাত বেঁধে রাখতে হবে। হযরত আয়েশা রাযি. জানতে পেরে কসম করে বললেন, আমি আর ওর সঙ্গে কোনোদিন কথা বলব না। ও আমার হাত বেঁধে রাখবে? হযরত

---

১. *মুসতাদরাকে হাকেম*।

২. *ইবনে সাদ* : جزء النساء।

৩. *মুয়াত্তা*, ইমাম মালেক : كتاب الجامع/ باب الترغيب على الصدقة।

৪. *ইবনে সাদ* : ذكر حجرات أمهات المؤمنين।

আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের রাযি. অনেকদিন ধরে, অনেক কষ্ট করে হযরত আয়েশা রাযি.-এর মান ভাঙাতে পেরেছিলেন।[১]

আল্লাহর ভয় ও বিগলিত হৃদয়ের কান্না

প্রতিমুহূর্তে অন্তরে আল্লাহর ভয় ছিল। পিতার মতোই কান্নাকাতর ছিলেন। বিদায় হজে মেয়েলি সমস্যার কারণে হজের কিছু গুরুত্বপূর্ণ আমলে বাধা আসে। তিনি অবচেতন মনে কেঁদে ফেলেন। আর কান্না থামাতে পারছিলেন না। পরে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসে বুঝিয়েসুঝিয়ে শান্ত করেন।[২] একবার দাজ্জালের ফেতনার কথা মনে পড়ায় তিনি খুবই কেঁদেছিলেন।[৩] জঙ্গে জামালের কথা মনে হলে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতেন।[৪] মৃত্যুশয্যায় জীবনের কিছু ভুল সিদ্ধান্তের কথা স্মরণ করে আক্ষেপে, অনুশোচনায় কাঁদতেন আর বলতেন, হায়, যদি আমার অস্তিত্বই না হতো![৫]

একবার কোনো এক বিষয়ে কসম খেয়েছিলেন। কিন্তু মানুষের পীড়াপীড়িতে বাধ্য হয়ে কসম ভাঙতে হয়। কাফফারাস্বরূপ চল্লিশ জন দাসকে মুক্ত করেছিলেন। তবু অন্তরে এটার প্রভাব এতই প্রবল ছিল যে, মনে হলেই কাঁদতে কাঁদতে আঁচল ভিজিয়ে ফেলতেন।[৬] ইফকের ঘটনা আপনারা জেনে এসেছেন। মুনাফিকদের অপবাদ আরোপের বিষয়ে জানতে পেরে তিনি কী কান্নাই না কেঁদেছিলেন। পিতা-মাতা কোনোভাবেই শান্ত করতে পারেননি।

একবার এক ভিখারিনী এল। ভিখারিনীর সঙ্গে ছোট-ছোট দুটো সন্তান ছিল। ওই সময় হযরত আয়েশা রাযি.-এর ঘরে কিছু ছিল না।

---

১. *সহীহ বুখারী* : باب مناقب قريش ।

২. *সহীহ বুখারী* : كتاب الحج পৃষ্ঠা : ২৪০।

৩. *মুসনাদে আহমাদ* : ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা : ৭৫।

৪. *তাবাকাতে ইবনে সাদ* : جزء النساء পৃষ্ঠা : ৫৬।

৫. *তাবাকাতে ইবনে সাদ* : جزء النساء পৃষ্ঠা : ৫১।

৬. *সহীহ বুখারী* : باب الهجرات ।

মাত্র তিনটি খেজুর দিলেন ভিখারিনীকে। সে দুটো খেজুর দুই সন্তানের মুখে দিল এবং একটি খেজুর নিজের মুখে নিল। বাচ্চা দুটো যার যার খেজুর খেয়ে ফেলল এবং অতৃপ্ত চোখে মায়ের দিকে তাকাল। মা তখন নিজের মুখের খেজুরটি না খেয়ে বের করল এবং দুই ভাগ করে আবার দুই সন্তানের মুখে দিয়ে দিল। মায়ের ভালোবাসা ও নিঃস্বতার টানাপোড়েনের হৃদয়বিদারক দৃশ্য তাঁকে মর্মাহত করে। তাঁর দুচোখ বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ে।[১]

ইবাদত-বন্দেগী

তিনি অধিকাংশ সময়ই ইবাদত-বন্দেগীতে রত থাকতেন। চাশতের নামায পড়তেন এবং বলতেন, আমার পিতাও যদি কবর থেকে উঠে আসেন এবং নিষেধ করেন তবু এই নামায ছাড়ব না।[২] রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে উঠে তাহাজ্জুদ আদায় করতে অভ্যস্ত ছিলেন।[৩] রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মৃত্যুর পরও এত গুরুত্বের সঙ্গে তাহাজ্জুদ পড়তেন যে যদি কোনোদিন ঘুম ভাঙতে দেরিও হতো, তবু উঠে আগে তাহাজ্জুদ পড়তেন; এরপর ফজর পড়তেন। একদিন এরকম সময়ে তাহাজ্জুদ পড়ছিলেন। এমন সময় ভ্রাতুষ্পুত্র কাসেম বিন মুহাম্মাদ কাছে এলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, ফুফি, এটা কীসের নামায? তিনি বললেন, রাতে পড়তে পারিনি; তাই বলে এখন ছাড়তেও পারব না।[৪] রমযানে বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে তারাবীহ আদায় করতেন। যাকওয়ান নামক জনৈক গোলাম ছিলেন। তিনি ইমাম হতেন এবং সামনে কুরআন রেখে তেলাওয়াত করতেন। হযরত আয়েশা রাযি. মুক্তাদি হতেন।[৫]

অধিকাংশ দিনই রোযা রাখতেন। কিছু কিছু বর্ণনায় এভাবে এসেছে

---

১. *মুসতাদরাকে হাকেম*। *তয়ালিসি* : পৃষ্ঠা : ২০৪।
২. *মুসনাদে আহমাদ* : ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা : ১৩৮।
৩. *মুসনাদে আহমাদ* : ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা : ৯২।
৪. *দারাকুতনী* : কিতাবুস সালাহ।
৫. *মুয়াত্তা* ও *সহীহ বুখারী* : বাবু কিয়ামি রামাযান।

যে, তিনি সব সময়ই রোযা রাখতেন।[১] একবার প্রচণ্ড গরমে আরাফার দিবসে রোযা অবস্থায় ছিলেন। গরম ও পিপাসা এত বেশি লেগেছিল যে, মাথায় পানি ঢালতে হচ্ছিল। ভাই আবদুর রহমান বললেন, এই গরমে এত কষ্ট করে রোযা রাখার কী দরকার? রোযা ভেঙে ফেলুন এবং কিছু মুখে দিন। তিনি বললেন, যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুখে শুনেছি—আরাফার দিবসে রোযা রাখলে সারা বছরের গুনাহ মাফ হয়, তখন এই রোযা ভাঙি কী করে?[২]

নিয়মিত হজ-পালনে ছিলেন অত্যন্ত কঠোর। এমন বছর খুব কমই ছিল, যে বছর তিনি হজ করেননি। হযরত উমর রাযি. তাঁর শাসনামলের শেষের দিকে হযরত উসমান রাযি. এবং হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ রাযি.-কে উম্মাহাতুল মুমিনীনের সঙ্গে হজের সফরে প্রেরণ করেছিলেন।[৩] হজের সফরে তাঁদের অবতরণের জায়গা আগে থেকেই নির্ধারিত থাকত। প্রথমে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণে আরাফার ময়দানের শেষ সীমানা নামিরায় অবতরণ করানো হতো। যখন এখানে ভিড় হতে লাগল, তখন একটু সরে আরাকে তাঁবু ফেলা হতো। কখনো কোহে ছাবিরের পাদদেশেও তাঁবু গাড়া হতো। যতক্ষণ এখানে অবস্থান করতেন, তিনি এবং তাঁর সঙ্গের সকলে তাকবীর পড়তে থাকতেন। যখন এখান থেকে উঠে চলে যেতেন, তখন তাকবীর বলা বন্ধ করতেন। প্রথমে এই অভ্যাস ছিল যে, হজের পর জিলহজ মাসের মধ্যেই উমরা আদায় করতেন। কিন্তু পরে অভ্যাসে পরিবর্তন আনেন। মহররম মাসের পূর্বেই জুহফায় গিয়ে তাঁবু ফেলতেন। এরপর মুহাররমের চাঁদ দেখে উমরার নিয়ত করতেন।[৪] আরাফার দিনে রোযা রাখতেন। সন্ধ্যায় যখন সবাই রওনা হতো, তখন ইফতার করে নিতেন।[৫]

---

১. *তাবাকাতে ইবনে সাদ*, পৃষ্ঠা : ৪৭।

২. *মুসনাদে আহমাদ* : ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা : ১২৮।

৩. *সহীহ বুখারী* : বাবু হাজ্জিন নিসা।

৪. পুরো বর্ণনা আছে *মুয়াত্তা*, باب قطع التلبية অংশে। কোহে ছাবিরে অবস্থানের ঘটনা আছে *সহীহ বুখারী* : باب طواف النساء।

৫. *মুয়াত্তা*, ইমাম মালেক রহ. : صيام يوم عرفة।

ছোটখাটো বিষয়েও পরহেজগারি

ছোটখাটো নিষিদ্ধ বিষয়গুলোও অত্যন্ত পরহেজ করে চলতেন। যদি কখনো রাস্তায় বের হতেন আর ঘণ্টির আওয়াজ পেতেন তা হলে দাঁড়িয়ে যেতেন—যেন ওই আওয়াজ আর শুনতে না হয়।[১] তাঁর একটি ঘরে ভাড়াটিয়া ছিল। তিনি জানতে পারলেন, লোকটি পাশা খেলে। তাকে বলে পাঠালেন, যদি এই বদঅভ্যাস না ছাড়, তা হলে ঘর থেকে বের করে দেব।[২]

একবার ঘরে একটি সাপ বের হলো। তিনি সাপটিকে মেরে ফেললেন। কেউ বলল, আপনি সাপটিকে মেরে ঠিক করলেন না। যদি এ কোনো মুসলমান জিন হয়ে থাকে। তিনি বললেন, এ যদি মুসলমান হতো, তা হলে উম্মুল মুমিনীনের ঘরে ঢুকত না। লোকটি বলল, যখন সে এসেছে, তখন আপনি তো পর্দার সঙ্গেই ছিলেন। এ কথা শুনে তিনি প্রভাবিত হলেন। ফিদয়া স্বরূপ একটি গোলাম আজাদ করলেন।[৩]

দাস-দাসীর প্রতি মমত্ব

শুধুমাত্র একটি কসম ভাঙার কারণেই তিনি চল্লিশ জন গোলামকে আজাদ করে দিয়েছিলেন।[৪] তাঁর আজাদ-করা গোলামের সংখ্যা ছিল সাতষট্টিটি।[৫] তার কাছে তামিম গোত্রের একটি দাসী ছিল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র জবানে শুনেছিলেন, তামিমিরাও হযরত ইসমাঈল আ.-এর বংশধর। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইঙ্গিতে তিনি এই দাসীকে আজাদ করে দেন।[৬] মদীনায় বারীরাহ রাযি. নাম্নী এক দাসী ছিলেন। তার মনিব তার সঙ্গে মুকাতাবার চুক্তি করেছিল। অর্থাৎ তাকে বলেছিল, যদি আমাকে এত টাকা দিতে

---

১. *মুসনাদে আহমাদ* : ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা : ১৫৬।
২. *আল আদাবুল মুফরাদ*, ইমাম বুখারী রহ., পৃষ্ঠা : ২৩২।
৩. *মুসনাদে আহমাদ* : ৬ষ্ঠ খণ্ড।
৪. *সহীহ বুখারী* : باب الهجرة।
৫. *শরহে বুলুগুল মারাম*, আমীর ইসমাঈল : كتاب العتق।
৬. *সহীহ বুখারী* : كتاب العتق।

পারো, তা হলে তুমি মুক্ত। বারীরাহ মদীনায় ঘুরে ঘুরে চাঁদা আদায় করছিলেন। হযরত আয়েশা রাযি. জানতে পেরে পুরো টাকাই নিজে পরিশোধ করলেন এবং বারীরাহকে মুক্ত করে দিলেন।[১] একবার তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লেন। লোকেরা বলল, কেউ যাদুটোনা করেছে। তিনি এক দাসীকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমিই কি যাদুটোনা করেছ? সে স্বীকার করল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কেন? সে বলল, আপনাকে মেরে ফেলার জন্য। কারণ আপনি মারা গেলে আমি ছাড়া পাব। তিনি বললেন, এই দুষ্টকে কোনো দুষ্ট লোকের কাছেই বেচে দাও, আর এর পয়সা দিয়ে অন্য কাউকে নিয়ে এসো।[২] এটা এক ধরনের সাজা ছিল। কিন্তু কেমন অদ্ভুত!

অভাবী ও ফকির-মিসকিন : আলাদা আচার ব্যবহার

অভাবী ও ফকির-মিসকিনের সঙ্গে অবস্থান ও মর্যাদাভেদে আলাদা আচার ব্যবহার করা উচিত। যদি কোনো নীচু পর্যায়ের ফকির বা মিসকিন আসে, তা হলে শুধু কিছু দিলেই সে খুশি। কিন্তু যদি এমন কোনো অভাবী ও প্রয়োজনগ্রস্ত আসে, যে ফকির-মিসকিনের মতো অত নীচু নয়; যদিও চেয়ে-মেঙ্গেই দিন চলে, তা হলে প্রয়োজন পূরণের পাশাপাশি একটু সম্মানেরও ব্যাপার থাকে। হযরত আয়েশা রাযি. এই বিষয়টিও লক্ষ রাখতেন। একবার এক ভিক্ষুক এল। তিনি এক টুকরো রুটি দিলেন। সে চলে গেল। একটু পর আরেকজন লোক এল। গায়ে কাপড়চোপড় ছিল। চলনে-বলনে মনে হচ্ছিল, একরকম সম্মানবোধ আছে। হযরত আয়েশা রাযি. তাকে বসালেন, খানা খাওয়ালেন, এরপর বিদায় করলেন। কেউ জিজ্ঞেস করল, দুজনেই তো ফকির; কিন্তু দুজনের সঙ্গে দুরকম আচরণ কেন করলেন? তিনি বললেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মানুষের মর্যাদার দিকে লক্ষ রেখে আচার ব্যবহার করবে।[৩]

---

১. *সহীহ বুখারী*, *মুসলিম*, *মুসনাদে আহমাদ*-সহ আরও অনেক গ্রন্থে এসেছে।

২. হাদীসটি *দারাকুতনী*, *মুয়াত্তা মালিক* : (من رواية العضى), *মুয়াত্তা মুহাম্মাদ* : (باب العتق), *মুসতাদরাকে হাকেম* : (كتاب الطب) ইত্যাদি গ্রন্থে আছে। দাসীকে শাস্তি দিয়েছিলেন শরীয়তের খেলাফ কাজে জড়িত হওয়ার কারণে।

৩. *আবু দাউদ* : كتاب الأدب।

পর্দার প্রতি গুরুত্ব

তিনি পর্দার ব্যাপারে অনেক যত্নশীল ছিলেন। পর্দার আয়াত নাজিল হওয়ার পর থেকে পর্দা করা ফরজ হয়ে যায়।[১] তাই যেই সব শিশুদের বড় হয়ে তালীম তারবিয়াতের জন্য তাঁর কাছে অবাধে আসা-যাওয়ার প্রয়োজন হবে বলে মনে করতেন, তাদেরকে কোনো মাহরাম নারীকে দিয়ে দুধ পান করাতেন।[২] এভাবে তিনি তাদের দুধখালা, দুধনানী ইত্যাদি হতেন;[৩] ফলে তাদের সঙ্গে বিশেষভাবে পর্দা করার প্রয়োজন হতো না। এছাড়া অন্যান্য তালিবুল ইলমগণের সঙ্গে কঠোরভাবে পর্দা রক্ষা করতেন। দরসে মধ্যখানে পর্দা ঝুলিয়ে রাখতেন।[৪] একবার হজের সফরে কয়েকজন বিবি সঙ্গে ছিলেন। কেউ বললেন, উম্মুল মুমিনীন, চলুন, হাজরে আসওয়াদ চুম্বন করি। তিনি বললেন, আপনি যেতে পারেন, পুরুষদের ভিড়ে আমি ঢুকব না।[৫] কখনো দিনের বেলা তাওয়াফ করতে হলে খানায়ে কাবা থেকে পুরুষদেরকে সরিয়ে দেওয়া হতো।[৬] একটি বর্ণনা থেকে জানা যায়, তাওয়াফরত অবস্থায়ও তিনি মুখমণ্ডলে নেকাব পরে থাকতেন।[৭] তিনি একটি গোলামকে মুকাতাব করেছিলেন। তিনি বললেন, তুমি যখন মুকাতাবা চুক্তি সম্পন্ন করে ফেলবে, তখন তো তোমার সামনে আর আসতে পারব না।[৮] তাবেঈ ইসহাক অন্ধ ছিলেন। তিনি একবার খেদমতে হাজির হলেন। হযরত আয়েশা রাযি. তাঁর সঙ্গেও পর্দা করলেন। ইসহাক বললেন, আমার সঙ্গেও পর্দা করতে হবে? আমি তো আপনাকে দেখতে পাব না। হযরত আয়েশা রাযি. বললেন, তুমি

---

১. *সহীহ বুখারী* : ذكر افك।

২. *সহীহ মুসলিম* : كتاب الرضاعة , *মুসনাদে আহমাদ* : ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা : ২৭১।

৩. এ পদ্ধতি শুধু হযরত আয়েশা রাযি.-ই অবলম্বন করেছিলেন। পবিত্র স্ত্রীগণের আর কেউ এমন করেননি। একটি হাদীসের ওপর ভিত্তি করেই তিনি এমন করতেন। সামনে ফিকহের ইখতেলাফি মাসায়েলের কোনো পাদটীকায় এ সংক্রান্ত আলোচনা আসবে।

৪. *সহীহ বুখারী* : كتاب الحج ، باب طواف النساء।

৫. *সহীহ বুখারী* : كتاب الحج ، باب طواف النساء।

৬. *মুসনাদে আহমাদ* : ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা : ১১৭।

৭. أخبار مكة للازرقي ২য় খণ্ড, ১০ নং পৃষ্ঠা। মক্কা মুআযযামা।

৮. *মুসনাদে আহমাদ* : ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা : ৮৫।

দেখতে পাবে না; কিন্তু আমি তো দেখতে পাব।[১] শরীয়তে মুর্দাদের থেকে পর্দা করতে হয় না। কিন্তু তাঁর সতর্কতা দেখুন, হযরত উমর রাযি.-এর দাফনের পর থেকে হুজরায় কখনো বেপর্দা অবস্থায় যেতেন না।

মানাকেব : বিশেষ মর্যাদা ও মাহাত্ম্য

সহীহ মুসলিম, কিতাবুল ফাজাইলে এসেছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

أَنَا تَارِكٌ فِيْكُمُ الثَّقَلَيْنَ كِتَابَ اللهِ .... وَ أَهْلَ بَيْتِيْ.

আমি তোমাদের জন্য মহামূল্যবান দুটো বস্তু রেখে যাচ্ছি, আল্লাহর কিতাব এবং আমার 'আহলে বাইত'।

নিঃসন্দেহে কুরআন পুরো জীবনব্যবস্থার সহজ ও সামগ্রিক পথনির্দেশ। ইসলামের সরল পথে জীবনকে পরিচালিত করতে সবকিছুর কর্মভিত্তিক দৃষ্টান্ত থাকা আবশ্যক নয়। কিন্তু তারপরও পৃথিবীতে এমন কিছু মানুষ থাকা প্রয়োজন যারা ঐশী বাণীর নিগূঢ় তাৎপর্য তুলে ধরতে পারেন, সূক্ষ্ম ভেদ ও রহস্য উন্মোচন করতে পারেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অবর্তমানে আমরা এই মহামহিম মানুষগুলোকে পাব তাঁরই 'আহলে বাইত'-এর মধ্যে। আহলে বাইত কারা? সেটাও সূরা আহযাবের বেশ কিছু আয়াতে বিধৃত। আমরা সে আয়াতগুলো পূর্বে আলোচনা করেছি।

হযরত আয়েশা রাযি.-এর মর্যাদা ও মাহাত্ম্যকে বিশেষ মূল্যায়নে বিশিষ্ট করেছেন স্বয়ং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। নববী সান্নিধ্যে তিনি যে পরিচর্যা লাভ করেছেন তা আর কারও ভাগ্যে জোটেনি। তাঁর আল্লাহপ্রদত্ত বিশেষ প্রতিভা ও যোগ্যতা সর্বজনবিদিত। এই বিবেচনায় কারও কোনোও দ্বিমত থাকার কথা নয় যে, আহলে বাইতের গুরুত্বপূর্ণ সদস্য হিসেবে হযরত আয়েশা রাযি. বিশেষ মর্যাদায় অভিষিক্ত। সুতরাং কিতাব ও সুন্নাহর ব্যাখ্যায়, মুসলিম আইন ও বিধানের

---

১. *তাবাকাতে ইবনে সাদ*, পৃষ্ঠা : ৪৭।

বিশ্লেষণে তাঁর চেয়ে অগ্রগণ্য আর কে হতে পারে? তা ছাড়া তিনি যত কাছে থেকে রাসূলকে দেখেছেন তা আর কারও পক্ষেই সম্ভব হয়নি। এজন্যই ঐশী[১] প্রত্যাদেশের অনবদ্য সিদ্ধান্ত :

فَضْلُ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضْلِ الثَّرِيْدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ

সকল নারীর ওপর আয়েশার মর্যাদা তেমন, সকল খাদ্যের ওপর সারিদের মর্যাদা যেমন।[২]

স্বয়ং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও রুয়াতে সাদেকায় (সত্য স্বপ্নযোগে) হযরত আয়েশা রাযি.-এর আহলে বাইতের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সুসংবাদপ্রাপ্ত হয়েছেন।[৩] হযরত আয়েশা রাযি. ছাড়া আর কোনো উম্মুল মুমিনীনের বিছানায় ওহী নাজিল হয়নি।[৪] জিবরীল আমিন আ. তাঁর হুজরা মোবারকে করুণার বারিধারা নিয়ে এসেছেন।[৫] চর্মচক্ষেই তিনি দুবার নামুসে আকবারকে দেখার সৌভাগ্য লাভ করেছেন। স্বয়ং আল্লাহ তাঁর পবিত্রতার সাক্ষ্য দিয়েছেন। ইলহামে সাদেকের মাধ্যমে (ঐশী অনুপ্রেরণার আলোকে) আখেরাতে রাসূলের প্রিয়তমা হওয়ার সুসংবাদ পেয়েছেন।[৬]

হযরত আয়েশা রাযি. বলেন, গর্ব করার জন্য নয়; ঘটনা বর্ণনার জন্য বলছি, আল্লাহ আমাকে এমন নয়টি বৈশিষ্ট্য দান করেছেন, যা পৃথিবীতে আর কাউকে দান করেননি। স্বপ্নে ফেরেশতা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে আমার আকৃতি তুলে ধরেছিলেন। যখন আমার বয়স মাত্র সাত বছর তখন তিনি আমাকে বিবাহ করেছেন। যখন আমার বয়স নয় বছর তখন আমি তাঁর ঘরে এসেছি। আমিই তাঁর একমাত্র

---

১. [سورة النجم : 43] وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى—অর্থ : তিনি কোনো কিছুই নিজের ইচ্ছায় বলেন না; তিনি যা বলেন তাই ওহী, (ঐশী প্রত্যাদেশ)...

২. *সহীহ বুখারী*, *তিরমিযী* : مناقب عائشة رض।

৩. *সহীহ বুখারী*, *তিরমিযী* : مناقب عائشة رض।

৪. *সহীহ বুখারী* : مناقب عائشة رض।

৫. *সহীহ বুখারী* : مناقب عائشة رض।

৬. *সহীহ বুখারী* : مناقب عائشة رض।

কুমারী বিবি। তিনি আমার বিছানায় থাকাকালেও তাঁর ওপর ওহী নাজিল হয়েছে। আমি তাঁর সবচে প্রিয় বিবি ছিলাম। আমার শানে কুরআনের আয়াত নাজিল হয়েছে। আমি নিজের চোখে জিবরীল আ.-কে দেখেছি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার বুকে মাথা রেখেই মৃত্যুবরণ করেছেন।[১]

জ্ঞানের জগতে শ্রেষ্ঠত্ব

জ্ঞানগত দিক থেকে শুধু নারীদের ওপর, কিংবা উম্মাহাতুল মুমিনীনের ওপর, কিংবা অল্প কিছু সাহাবীর ওপর নয়; বরং হাতেগোনা দু-একজন ছাড়া সকল সাহাবা কেরামের ওপর তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব ছিল সর্বজনস্বীকৃত। *সহীহ তিরমিযীতে* হযরত আবু মুসা আশআরি রাযি. থেকে বর্ণিত,

مَا أَشْكَلَ عَلَيْنَا أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيْثٌ قَطُّ فَسَأَلْنَا عَائِشَةَ إِلَّا وَجَدْنَا عِنْدَهَا مِنْهُ عِلْمًا

অর্থ : আমাদের, সাহাবীগণের কাছে কোনো হাদীস অস্পষ্ট লাগলে, আমরা হযরত আয়েশা রাযি.-এর শরণাপন্ন হতাম। তাঁর কাছে অবশ্যই কোনো না কোনো ধারণা পাওয়া যেত।[২]

আতা ইবনে আবি রাবাহ রহ. অসংখ্য সাহাবীর ছাত্রত্ব লাভে ধন্য হয়েছিলেন। তিনি বলেন,

كَانَتْ عَائِشَةُ أَفْقَهَ النَّاسِ وَ أَعْلَمَ النَّاسِ وَ أَحْسَنَ رَأْيًا فِي الْعَامَّةِ

অর্থ : একজন ভালো ফকীহ এবং ভালো আলেম হিসেবে সবচেয়ে এগিয়ে ছিলেন হযরত আয়েশা রাযি.। তাঁর মতামত জনগণের মধ্যে গ্রহণযোগ্যতা পেত সবচেয়ে বেশি।[৩]

---

১. *মুসতাদরাকে হাকেম*। *তাবাকাতে ইবনে সাদ*।
২. *জামে তিরমিযী* : মানাকেবে আয়েশা রাযি.।
৩. *মুসতাদরাকে হাকেম*।

ইমাম যুহরী রহ. তাবেঈদের মধ্যে অগ্রগণ্য ছিলেন। অনেক বড় বড় সাহাবীর সাহচর্য-লাভে ধন্য হয়েছেন তিনি। তিনি বলেন,

كَانَتْ عَائِشَةُ أَعْلَمَ النَّاسِ يَسْأَلُهَا الْأَكَابِرُ مِنْ أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

অর্থ : সবচেয়ে ভালো জ্ঞান ছিল হযরত আয়েশা রাযি.-এর। বড় বড় সাহাবীগণ তাঁর কাছে জানতে চাইতেন।[১]

হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ রাযি.-এর সাহেবজাদা আবু সালামা রহ. অনেক বড় মাপের তাবেঈ ছিলেন। তিনি বলেন,

مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَعْلَمَ بِسُنَنِ رَسُوْلِ اللهِ وَ لَا أَفْقَهَ فِيْ رَأْيٍ إِنِ احْتِيْجَ إِلَى رَأْيِهِ وَ لَا أَعْلَمَ بِآيَةٍ فِيْمَا نَزَلَتْ وَ لَا فَرِيْضَةٍ مِنْ عَائِشَةَ

অর্থ : আমি কিতাব, সুন্নাহ, ফিকহ ও ফারায়েযের জ্ঞানে সবচে পাণ্ডিত্য দেখেছি হযরত আয়েশা রাযি.-এর।[২]

একদিন আমীর মুআবিয়া রাযি. জনৈক দরবারিকে জিজ্ঞেস করলেন, এখন যারা আছে তাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় জ্ঞানী কে? লোকটি বলল, আমীরুল মুমিনীন, আপনি। তিনি বললেন, আমি তোমাকে কসম দিয়ে বলছি, সত্য বলো; চাটুকারিতা কোরো না। লোকটি বলল, যদি তা-ই হয়, তা হলে হযরত আয়েশা [রাযি.]।[৩]

হাওয়ারিয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কলিজার টুকরা হযরত উরওয়াহ ইবনে যুবায়ের রাযি. বলেন,

مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَعْلَمَ بِالْحَلَالِ وَ الْحَرَامِ، وَ الْعِلْمِ وَ الشِّعْرِ وَالطِّبِّ مِنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ

---

১. *তাবাকাতে ইবনে সাদ* : ২য় জুয, ২য় কিসম, পৃষ্ঠা : ৬২।
২. *তাবাকাতে ইবনে সাদ* : ২য় জুয, ২য় কিসম, পৃষ্ঠা : ৬২।
৩. *মুসতাদরাকে হাকেম*।

অর্থ : আমি হালাল-হারামের জ্ঞানে, কবিত্ববোধ ও চিকিৎসাবিদ্যার পাণ্ডিত্যে উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা রাযি.-এর চেয়ে অগ্রবর্তিনী কাউকে দেখিনি।[১]

অন্য একটি বর্ণনায় কথাগুলো এভাবে আছে :

مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَعْلَمَ بِالْقُرْآنِ وَ لَا بِفَرِيضَةٍ وَ لَا بِفِقْهٍ وَ لَا بِشِعْرٍ وَ لَا بِطِبٍّ وَلَا بِحَدِيْثِ الْعَرَبِ وَ لَا نَسَبٍ مِّنْ عَائِشَةَ

অর্থ : আমি কুরআন, ফারায়েয, হালাল, ফিকহ, কবিতা, চিকিৎসা, বংশনামায় হযরত আয়েশা রাযি.-এর চেয়ে জ্ঞানী কাউকে দেখিনি।[২]

তাবেঈ মাসরুক হযরত আয়েশা রাযি.-এর পরিপূর্ণ সোহবত লাভ করেছিলেন। এক ব্যক্তি তাঁকে জিজ্ঞেস করল, হযরত আয়েশা রাযি. কি ফারায়েয সম্বন্ধে ভালো ধারণা রাখতেন? মাসরুক বললেন,

إِيْ، وَ الَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ لَقَدْ رَأَيْتُ مَشْيَخَةَ أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللهِ يَسْأَلُوْنَهَا عَنِ الْفَرَائِضِ

অর্থ : আল্লাহর কসম, আমি বড় বড় সাহাবীকেও তাঁর কাছে ফারায়েয সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে দেখেছি।[৩]

হাদীস-সংরক্ষণ ও হাদীসের প্রচার-প্রসারে অন্যান্য স্ত্রীগণও ভূমিকা রেখেছিলেন। কিন্তু তাঁদের কেউই হযরত আয়েশা রাযি.-এর মর্যাদাকে ছুঁতে পারেননি। মাহমুদ ইবনে লাবিদ বলেন,

كَانَ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ يَحْفَظْنَ مِنْ حَدِيْثِ النَّبِيِّ كَثِيْرًا وَ لَا مِثْلَ لِعَائِشَةَ وَ أُمِّ سَلَمَةَ

অর্থ : পবিত্র স্ত্রীগণ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনেক হাদীস সংরক্ষণ করতেন। কিন্তু হযরত আয়েশা রাযি. এবং হযরত উম্মে সালামা রাযি.-এর মতো নয়।[৪]

---

১. *মুসতাদরাকে হাকেম*।

২. *যুরকানি* : ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা : ২২৭। *হাকেম* ও *তাবারানির* সূত্রে। সনদ সহীহ।

৩. *মুসতাদরাকে হাকেম*। *তাবাকাতে ইবনে সাদ* : ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা : ১২৬।

৪. *তাবাকাতে ইবনে সাদ* : ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা : ১২৬।

ইমাম যুহরী রহ. বলেন,

لَوْ جُمِعَ عِلْمُ النَّاسِ كُلِّهِمْ وَ عِلْمُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ فَكَانَتْ عَائِشَةُ أَوْسَعَهُمْ عِلْمًا

অর্থ : যদি সকল মানুষের জ্ঞান এবং পবিত্র স্ত্রীগণের জ্ঞান একত্রিত করা হয়, তা হলে হযরত আয়েশা রাযি.-এর জ্ঞান সবচে বেশি হবে।[১]

কোনো কোনো মুহাদ্দিস হযরত আয়েশা রাযি.-এর ফজিলত বর্ণনা করতে নিম্নোক্ত হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

خُذُوْا شَطْرَ دِيْنِكُمْ مِنَ الْحُمَيْرَاءِ

অর্থ : তোমরা তোমাদের ধর্মের একটি বড় অংশ গ্রহণ করো হুমায়রার কাছ থেকে।

হাদীসটি ইবনে আসির *নেহায়াহ* গ্রন্থে এবং ফেরদাউস *মুসনাদে* (সামান্য শব্দভেদসহ) বর্ণনা করেছেন। তবে সনদ সহীহ নয়। হাদীসটি মাওযুআতেরই অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।[২] কিন্তু অর্থের বিচারে এর শুদ্ধতা নিয়ে কারও কোনো দ্বিমত নেই।

---

১. *মুসতাদরাকে হাকেম*।

২ *মাওযুয়াতে শাওকানি*, পৃষ্ঠা : ১৩৫। *মাজমাউল বিহার*, পৃষ্ঠা : ৫১৪। *মাকাসিদে হাসানাহ*, পৃষ্ঠা : ৯৪।

ইলম ও ইজতিহাদ

হযরত আয়েশা রাযি.-এর জীবন ও কর্মের একটি গৌরবময় অঙ্গন হলো ইলম ও ইজতিহাদ—অর্থাৎ ধর্মীয় বিধান-প্রণয়নের গবেষণামূলক প্রয়াস। ইসলামী দুনিয়ার এ গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গনে দৃপ্ত পদচারণা তাঁকে আলাদা মহিমায় করেছে ভাস্বর। এখানে তাঁর বিশিষ্টতা নারী-পুরুষ নির্বিশেষে। কিতাব, সুন্নাহ ও ফিকহের আলোচনায় এই মহীয়সী মানবীর নাম উচ্চারিত হয় অবলীলায়—হযরত ফারুকে আযম, আলী মুরতাযা, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ, আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি. প্রমুখের ন্যায় মহিমান্বিত ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে। গুরুত্ব-বিবেচনায় এ আলোচনার সূচনা করছি কিতাবুল্লাহ দিয়ে।

কুরআন মাজীদ

কুরআন এবং তাঁর বাল্যকাল

সবাই জানেন, কুরআন মাজীদ অবতীর্ণ হয়েছে দীর্ঘ তেইশ বছরের ধারাবাহিকতায়। হযরত আয়েশা রাযি. নবুওয়াতপ্রাপ্তি ও কুরআন অবতরণের চতুর্দশ বছরে, নয় বছর বয়সে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘরে আসেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে তাঁর সহাবস্থানকাল প্রায় দশ বছর। এই বিবেচনায়, কুরআন অবতরণের ধারাবাহিকতার বেশি অর্ধেকই কেটে গিয়েছে তাঁর প্রাথমিক বোধোদয়ের আগেই। কিন্তু এই অসাধারণ মন-মস্তিষ্কের অধিকারিণী এই সময়টাকেও, যা সাধারণত শিশুসুলভ অনবগতি ও খেলাধুলার উদাসীনতায় পার হয়ে যায়, বৃথা যেতে দেননি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতিদিন

নিয়মিতভাবে সিদ্দীকে আকবর রাযি.-এর ঘরে যেতেন।[১] হযরত সিদ্দীকে আকবর রাযি. নিজ গৃহে একটি নামাযগাহ বানিয়েছিলেন। তিনি সেখানে বসে অত্যন্ত বিনয় ও নম্রতার সঙ্গে কুরআনের অবতীর্ণ আয়াতগুলো তেলাওয়াত করতেন।[২] এমন উর্বর আলোকময় পরিবেশ থেকে এই অলৌকিক ধারণক্ষমতা ও স্মৃতিশক্তি উপকৃত না হয়ে পারে না। তিনি বলেন, যখন এই আয়াতটি নাজিল হয় :

بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُّ

অর্থ : বরং কেয়ামত তাদেরই প্রতিশ্রুত মহাকাল, যা অতি বিষাদ ও বিষাদময় হয়ে দেখা দেবে। (সূরা কমার, আয়াত : ৪৬)

তখন আমি খেলছিলাম।[৩]

হযরত আয়েশা রাযি. তেরো-চৌদ্দ বছর বয়স পর্যন্ত (৫ম হিজরী) কুরআন মাজীদ খুব বেশি পড়তে পারেননি। তিনি নিজেই বলেছেন,

وَ أَنَا جَارِيَةٌ حَدِيْثَةُ السِّنِّ لَا أَقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ كَثِيْرًا

অর্থ : আমি ওই সময় অল্পবয়স্কা ছিলাম, তখনো কুরআন খুব বেশি পড়া হয়নি।[৪]

কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হলো, ওই সময়ও তিনি কুরআনের উদ্ধৃতি দিতেন।

কুরআন মাজীদ লিপিবদ্ধকরণ

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মৃত্যুর আগ পর্যন্ত কুরআন লিখিত আকারে গ্রন্থবদ্ধ হয়নি। হযরত আবু বকর রাযি. স্বীয় শাসনামলেই প্রথম কাগজে বিন্যস্ত করেন। অবশ্য অন্যান্য সাহাবীগণও দৈনিক তেলাওয়াতের জন্য ব্যক্তিগত উদ্যোগে নিজ নিজ পদ্ধতিতে

---

১. *সহীহ বুখারী* : হিজরত।
২. *সহীহ বুখারী* : হিজরত।
৩. *সহীহ বুখারী* : তাফসীর—সূরা কমার ।
৪. *সহীহ বুখারী* : ইফক।

কুরআন বিন্যাসে মনোযোগী হয়েছিলেন। এগুলোর মধ্যে অন্য কোনো মৌলিক ভিন্নতা ছিল না। শুধু সূরাসমূহের পর্যায়ক্রমিক (সিরিয়ালে) তারতম্য ছিল।

মুসহাফে আয়েশা রাযি.

আবু ইউনুস ছিলেন হযরত আয়েশা রাযি.-এর গোলাম।[১] তিনি লিপিশাস্ত্রে পারদর্শী ছিলেন। হযরত আয়েশা রাযি. তার হাতেই নিজের মুসহাফ লিখিয়েছিলেন।[২] অনারবদের আধিক্যের কারণে, কেরাতের ভিন্নতার প্রভাব ইরাকেই পড়ে সবচেয়ে বেশি। ইরাক থেকে একজন ব্যক্তি হযরত আয়েশা রাযি.-এর সঙ্গে দেখা করতে আসেন এবং আবেদন করেন, উম্মুল মুমিনীন, আমাকে আপনার মুসহাফ শরীফ যদি দেখাতেন।[৩] কারণ জানতে চাইলে লোকটি বললেন, আমাদের ওখানে এখনো কুরআন মাজীদ সুবিন্যস্ত নয়। আমার ইচ্ছা, আমার মুসহাফটি আপনার মুসহাফের সঙ্গেই মিলিয়ে নেব। তিনি বললেন, সূরা আগে পরে হলে কোনো সমস্যা হয় না। এরপর তিনি নিজ মুসহাফের সূরাবিন্যাসের অনুলিপি প্রদান করলেন।[৪]

কুরআন মাজীদ এবং উম্মুল মুমিনীন রাযি.

কোনো আয়াতের মর্ম উদ্ধারে অসমর্থ হলে স্বয়ং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছ থেকে জেনে নিতেন—বিশুদ্ধ গ্রন্থগুলোতে এ ধরনের অনেক হাদীস পাওয়া যায়।[৫] উপরন্তু উম্মাহাতুল মুমিনীন রাযি.-এর প্রতি আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্দেশ ছিল :

وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللهِ وَالْحِكْمَةِ

অর্থ : তোমাদের ঘরে কুরআনের যে আয়াতগুলো এবং হেকমতের

---

১. *মুসনাদে আহমাদ* : ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা : ৭৩।
২. *সহীহ বুখারী* : তাফসীর—সূরা বাকারা। *মুসনাদে আহমাদ* : ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা : ৭৩।
৩. *সহীহ বুখারী* : বাব—জামউল কুরআন।
৪. *সহীহ বুখারী* : বাব—তালিফুল কুরআন।
৫. তালীম ও তারবিয়াত অংশে দেখুন।

যে বাণীগুলো পড়ে শোনানো হয়, সেগুলো আত্মস্থ রেখো। (সূরা আহযাব, আয়াত : ৩৪)

মহান আল্লাহর এই নির্দেশের বাস্তবায়নও আবশ্যক ছিল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাজ্জুদের নামাযে কুরআন মাজীদের বড় বড় সূরা ও আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করতেন। তিনি অত্যন্ত বিনয় ও নম্রতার সঙ্গে, চিন্তা ও ধ্যানমগ্নতার সঙ্গে সেগুলো তেলাওয়াত করতেন। হযরত আয়েশা রাযি. রাসূলের এই সুগভীর নামায ও আবেদনময় তেলাওয়াতে নিয়মিত অংশগ্রহণ করতেন।[১] কুরআন মাজীদের অবতরণ আর কোনো স্ত্রীর বিছানাতেই হয়নি।[২] কুরআন অবতীর্ণ হলে, অধিকাংশ সময়, সবার আগে তিনিই জানতে পারতেন। তিনি বলেন, সূরা বাকারা এবং সূরা নিসা যখন নাজিল হয়, তখন আমি তাঁর কাছেই ছিলাম।[৩] মোটকথা, কুরআন মাজীদ অবতীর্ণ হওয়ার ক্ষেত্রগুলোই এমন ছিল যে, হযরত আয়েশা রাযি. প্রতিটি আয়াত ও সূরার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, মর্ম ও তাৎপর্য এবং বাচনভঙ্গি ও প্রমাণক্ষেত্র সম্পর্কে সম্যক অবগতি লাভ করতেন। আর তাই—অনুধাবন, প্রয়োগ ও বিশ্লেষণে এবং শরীয়তের বিধি-বিধান প্রণয়ন ও উদ্ঘাটনে গভীর থেকে গভীরে পৌঁছে যেতে পারতেন।

তিনি প্রত্যেকটি জিজ্ঞাসায় সর্বপ্রথম কুরআন কারীমে মনোনিবেশ করতেন। আকাইদ, আহকাম এবং ফিকহ তো আছেই; রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবন ও কর্মও বিশ্লেষণ করতেন কুরআনের আলোকে; যদিও তা কোনো ঐতিহাসিক বিষয়। এবং ঘরের মানুষ ছিলেন তিনি নিজেই। উদাহরণস্বরূপ, একবার কিছু লোক তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এল। তারা আবেদন করলেন, মাতা, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চরিত্রমাধুরী সম্পর্কে কিছু বলুন। তিনি বললেন, তোমরা কুরআন পড় না? আপাদমস্তক তিনি ছিলেন কুরআন। তারা জিজ্ঞেস

---

১. *মুসনাদে আহমাদ* : ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা : ৯২।
২. *সহীহ বুখারী* : বাব—তালিফুল কুরআন।
৩. *সহীহ বুখারী* : বাব—তালিফুল কুরআন।

করলেন, তাঁর ইবাদত-বন্দেগী সম্পর্কে কিছু বলুন। তিনি বললেন, তোমরা সূরা মুযযাম্মিল পড়নি?[১]

আকায়েদ, আহকাম, ফিকহ—ইসলামী মতবাদ ও বিশ্বাস, ইসলামী জীবন-দর্শন ও জীবন-বিধানের প্রণয়ন ও পর্যালোচনায় এবং উদ্ঘাটন ও হেতুনির্দেশে তিনি যেভাবে কুরআন মাজীদের উদ্ধৃতি দিতেন, তা বিভিন্ন শিরোনামের অধীনে আলোচনা করা হবে। আমরা দেখব, বস্তুর মর্ম-মূলে কী সহজে তাঁর হাত যেত। বিষয়ের সারবত্তায় কী সহজে তাঁর দৃষ্টি প্রসারিত হতো।

হাদীস গ্রন্থগুলোতে তাফসীরের পরিমাণ

সাহাবা কেরাম রাযি. থেকে কুরআন মাজীদের তাফসীর বিশুদ্ধ সূত্রে খুব কমই বর্ণিত হয়েছে। ইমাম বুখারী রহ. যদিও একটি বিশাল অংশ নিবেদন করেছেন শুধু তাফসীরের ওপর; কিন্তু সর্বোচ্চ তাবেঈদের পক্ষ থেকে কোনো আয়াতের শব্দার্থ এনেছেন; অথবা, নিজ রীতি অনুসারে, সামান্য থেকে সামান্য সম্পর্কেরও সূত্র ধরে একের পর এক ঘটনার বিবরণ দিয়েছেন। প্রকৃত তাফসীর বলতে যা বোঝায়, খুবই কম। *তিরমিযী শরীফে*ও সেরকম তাফসীর তেমন নেই বললেই চলে।

অবশ্য ইমাম মুসলিম রহ. গ্রন্থের শেষাংশে অত্যন্ত সচেতনতা ও সতর্কতার সঙ্গে তাফসীরের সারনির্যাস তুলে এনেছেন; কিন্তু তাও অপ্রতুল—শুধু হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি. এবং হযরত আয়েশা রাযি.-এর বর্ণনার আলোকে।

হযরত আয়েশা রাযি.-এর কয়েকটি তাফসীর

যাই হোক, হযরত আয়েশা রাযি. থেকে তাফসীরমূলক বর্ণনার সংখ্যা একেবারে কম নয়। আলোচ্য অধ্যায়ে আমরা শুধু ওই আয়াতগুলোই আনব, যেগুলোতে কোনো না কোনো বিশেষত্ব আছে।

তাফসীর : إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ

১. *আবু দাউদ* : কিয়ামুল লাইল। *মুসনাদে আহমাদ* : ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা : ৮৪।

হজের আমলগুলোর মধ্যে সাফা-মারওয়া পর্বতের মধ্যখানে দৌড়ানোও একটি। কুরআন মাজীদে এ ব্যাপারে নিম্নোক্ত শব্দগুলো এসেছে :

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا

অর্থ : সাফা এবং মারওয়া আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং যে হজ কিংবা উমরা করবে, যদি সেগুলোর তাওয়াফ করে, তা হলে কোনো সমস্যা নেই। (সূরা বাকারা, আয়াত : ১৮৫]

উরওয়াহ ইবনে যুবায়ের রাযি. বললেন, খালাজান, তা হলে তো এর অর্থ দাঁড়াচ্ছে, যদি কেউ তাওয়াফ না করে তা হলেও সমস্যা নেই। তিনি বললেন, ভাগ্নে, তুমি ঠিক বোঝনি। যদি আয়াতের অর্থ সেটাই হতো, যেটা তুমি বুঝেছ, তা হলে আল্লাহ এভাবে বলতেন : لَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَطَّوَّفَ بِهِمَا—অর্থ : যদি তাওয়াফ না করে তা হলে কোনো সমস্যা নেই। আসলে আয়াতটি নাজিল হয়েছিল আনসার সাহাবীদের শানে। আওস ও খাযরাজ ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে 'মানাত'-এর জয়ধ্বনি দিত। 'মানাত'-এর অবস্থান ছিল মুশাল্লালে। এজন্য আনসারিগণ সাফা-মারওয়ার মধ্যবর্তী স্থানে তাওয়াফ করাকে খারাপ মনে করতেন। তারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেন, আমরা আগে এমনটা করতাম; এখন কী হুকুম? তখন আল্লাহ তায়ালা এই আয়াতটি নাজিল করে হুকুম দিলেন, তোমরা সাফা-মারওয়া তাওয়াফ করো, এতে কোনো সমস্যা নেই। এরপর তিনি বললেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাফা-মারওয়ার তাওয়াফ করেছেন, সুতরাং এটা বাদ দেওয়ার অধিকার কারও নেই।

আবু বকর ইবনে আবদুর রহমান রহ. একজন প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস ছিলেন। তিনি হযরত আয়েশা রাযি.-এর বক্তব্যটি শুনে বলেছিলেন, জ্ঞান একেই বলে।[১]

---

১. *সহীহ বুখারী* : বাব—উজুবুস সাফা ওয়াল মারওয়াহ।

তাফসীরশাস্ত্রের একটি মূলনীতি

প্রকৃত প্রস্তাবে, হযরত আয়েশা রাযি.-এর এই সংক্ষিপ্ত আলোকপাত তাফসীর-শাস্ত্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি হয়ে আছে। যে কোনো আয়াতের তাফসীরে এই মূলনীতি সামনে রাখতে হয়। আরবদের বাচনভঙ্গি অনুযায়ী শব্দের যে অর্থটি ফুটে ওঠে, সেটিকেই কুরআনের উদ্দিষ্ট অর্থ ধরতে হবে, অন্যটি নয়; নয়তো, যেমনটি উম্মুল মুমিনীন বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা অন্য শব্দে অন্যভাবে কথাটি বলতে পারতেন, তখন ওই অর্থটিই বিবেচ্য হতো।

তাফসীর : حَتّٰى إِذَا اسْتَيْأَسَ

কুরআন মাজীদে সূরা ইউসুফে একটি আয়াত আছে :

حَتّٰى إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا

অর্থ : এমনকি, যখন রাসূলগণ সম্পূর্ণ নিরাশ হয়ে গেলেন এবং তারা মনে করলেন যে তাদেরকে মিথ্যা বলা হয়েছে, তখনই আমার সাহায্য এল। (সূরা ইউসুফ, আয়াত : ১১০)

উরওয়া জিজ্ঞেস করলেন, كُذِبُوا (তাদেরকে মিথ্যা বলা হয়েছে) নাকি كُذِّبُوا (তাদেরকে মিথ্যাবাদী বলা হয়েছে)?

তিনি উত্তর দিলেন, كُذِّبُوا (তাদেরকে মিথ্যাবাদী বলা হয়েছে)। উরওয়াহ বললেন, রাসূলগণ তো নিশ্চিত ছিলেন যে তাদেরকে মিথ্যাবাদী বলা হয়েছে। কেননা তাদের উম্মত তাদের নবুওয়াত ও রিসালাতকে অস্বীকার করেছিল। এটা তো ধারণা বা মনে করার বিষয় নয়। সুতরাং كُذِبُوا (তাদেরকে মিথ্যা বলা হয়েছে)-ই সঠিক।[১] তিনি বললেন, আল্লাহর পানাহ, নবী-রাসূলগণ কি এমন ধারণা করতে পারেন যে, তাদেরকে আল্লাহ মিথ্যা বলেছেন, মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন? উরওয়াহ বললেন, তা হলে আয়াতের তাৎপর্য কী? তিনি বললেন, এটা বলা হয়েছে

---

১. সাধারণভাবে এই কেরাতই গৃহীত হয়েছে। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি.-এর মতও এটাই। দেখুন *সহীহ বুখারী* : তাফসীর— ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس।

ঈমানদার উম্মতদের ব্যাপারে, অর্থাৎ : তারা ঈমান আনল, নবুওয়াতকে বিশ্বাস করল, এবং এ কারণে সমাজের লোকেরা তাদের কষ্ট দিতে লাগল; অথচ আল্লাহর সাহায্য বিলম্বিত হচ্ছিল; এমনকি রাসূলগণ কাফেরদের ঈমান আনার ব্যাপারে নিরাশ হয়ে গেলেন এবং তাদের মনে হলো যে তাদের ঈমানদার উম্মতেরাও বুঝি আল্লাহর সাহায্য না আসার কারণে তাদের মিথ্যাবাদী বলে বসবে; এমন সময় হঠাৎ আল্লাহর সাহায্য এল।[১]

তাফসীর : وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا

যেই আয়াতে চারজন নারীকে বিবাহ করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে সেই আয়াতের শব্দগুলো এই :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً

অর্থ : যদি তোমাদের ভয় হয় যে এতিমদের ব্যাপারে ন্যায় আচরণ করতে পারবে না, তা হলে দুটো-দুটো করে বিবাহ করো, তিনটে-তিনটে করে বিবাহ করো, চারটে চারটে করে বিবাহ করো; ন্যায় ব্যবহার করতে না পারার আশঙ্কা হলে একটাই করো। (সূরা নিসা, আয়াত : ৩)

বাহ্যত, আয়াতে পূর্বাপরের মিল নেই মনে হয়। এতিমদের সঙ্গে ন্যায় ব্যবহার করতে না পারা আর বিবাহ করার অনুমতি প্রদান—এর মধ্যে মিল কোথায়? একজন শিক্ষার্থী এই আপত্তিই করলেন হযরত আয়েশা রাযি.-এর কাছে। তিনি বললেন, আয়াতটি নাজিল হওয়ার পেছনে একটি বিশেষ প্রেক্ষাপট রয়েছে। কিছু কিছু লোক এতিম শিশুকন্যাদের অভিভাবক হতো। এদের মধ্যে উত্তরাধিকারের ব্যাপার থাকত। এই লোকগুলো জোর করে মেয়েগুলোকে বিবাহ করত। উদ্দেশ্য—এদের সম্পদগুলো দখল করবে। যেহেতু এরাই অভিভাবক, এরাই স্বামী; সেহেতু কথা বলার কেউ থাকত না। এরা মেয়েগুলোকে স্ত্রীর মর্যাদা তো দিতই না, উল্টো নানাভাবে নির্যাতন করত। আল্লাহ এই

---

১. *সহীহ বুখারী* : তাফসীর—সূরা ইউসুফ।

লোকগুলোকেই সম্বোধন করে বলেছেন, যদি তোমরা এই এতিম মেয়েগুলোর প্রতি ন্যায় ও সদাচার করতে না পারো, তা হলে অন্য মেয়েদের বিয়ে করো। দুইটা-দুইটা করে করো। তিনটা-তিনটা করে করো। চারটা-চারটা করে করো। কিন্তু এই এতিম মেয়েগুলোকে বিবাহ করে নিজেদের অধীনে রেখো না।[১]

তাফসীর : وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ

সূরা নিসার আরও একটি আয়াত :

وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ

অর্থ : এই মেয়েগুলোর ব্যাপারে লোকেরা আপনাকে জিজ্ঞেস করে। আপনি বলে দিন, আল্লাহ এদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত দিচ্ছেন, এই কিতাবে তোমাদের যা তেলাওয়াত করে শোনানো হয়েছে ওইসব এতিম মেয়েদের ব্যাপারে, যাদের তোমরা না প্রাপ্য অধিকার দাও, না বিবাহ করতে চাও... (সূরা নিসা, আয়াত : ১২৭)

ওই একই জিজ্ঞাসু ব্যক্তি এই আয়াতটির মর্মও জানতে চাইল। তিনি বললেন, এই আয়াতে যা বলা হয়েছে, (কিতাবে তোমাদের যা তেলাওয়াত করে শোনানো হয়েছে...) তা দ্বারা উদ্দেশ্য আগের আয়াতটিই। এই নির্দেশনা ওইসব অভিভাবকদের প্রতি, যারা এতিম মেয়েগুলোকে—সুন্দর বা মনমতো না হওয়ায় বিয়ে করতেও চাইত না, আবার সম্পদের লোভে অন্য কোথাও বিয়ে দিতেও চাইত না।[২]

তাফসীর : وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ

নিম্নোক্ত আয়াতটির অর্থ নিয়ে মতভেদ আছে :

وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ

---

১. *সহীহ মুসলিম* : কিতাব—তাফসীর। *সহীহ বুখারী* : কিতাব—নিকাহ।

২. *সহীহ মুসলিম* : কিতাব—তাফসীর। *সহীহ বুখারী* : কিতাব—নিকাহ।

অর্থ : যে ধনী সে বিরত থাকবে, আর যে অভাবী সে ন্যায়ভাবে গ্রহণ করবে। (সূরা নিসা, আয়াত : ৬)

হযরত আয়েশা রাযি. বলেন, আয়াতটি এতিমদের অভিভাবকের ব্যাপারে। যদি তারা গরিব হয়, তা হলে অধীনস্থ এতিমের সম্পদ থেকে গ্রহণ করতে পারবে।

হযরত ইবনে আব্বাস রাযি.-এর ইখতিলাফ

হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. বলেন, আয়াতটি অন্য একটি আয়াত দ্বারা রহিত হয়েছে[১] :

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا

অর্থ : যারা অন্যায়ভাবে এতিমের সম্পদ ভোগ করে, তারা পেটে জাহান্নামের আগুন ভরায়। (সূরা নিসা, আয়াত : ১০)

কিন্তু এই আয়াতে শাস্তির কথা বলা হয়েছে, যারা অন্যায়ভাবে এতিমের সম্পদ ভোগ বা আত্মসাৎ করে তাদের ব্যাপারে। হযরত আয়েশা রাযি. বলেন, যারা এতিমদের সম্পদ দেখা-শোনা করে এবং সম্পদে কারবার করে, তাদের যদি নিজেদের সম্পদ দিয়ে পেট চলে, তা হলে দেখা-শোনা ও কায়কারবারের বিনিময় না নেওয়া উচিত; পক্ষান্তরে যদি তারা গরিব হয় এবং নিজেদের অর্থ দিয়ে তাদের পেট না চলে, তা হলে ন্যায়সঙ্গতভাবে অবস্থাভেদে কিছু গ্রহণ করবে।[২] হযরত আয়েশা রাযি.-এর তাফসীর অনুযায়ী আলোচ্য আয়াত দুটোর মধ্যে কোনো বিরোধ থাকে না।

তাফসীর : وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ

একটি আয়াতে আছে :

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا

---

১. *নববী, শরহে মুসলিম* : কিতাব—তাফসীর।

২. *সহীহ মুসলিম* : কিতাব—তাফসীর। *সহীহ বুখারী* : তাফসীর—সূরা নিসা।

بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ

অর্থ : যদি কোনো নারী তার স্বামীর পক্ষ থেকে অসন্তুষ্টি বা উপেক্ষার ভয় করে, তা হলে তারা নিজেদের মধ্যে সমঝোতা করে নিতে কোনো বাধা নেই; সমঝোতা সবসময়ই ভালো। (সূরা নিসা, আয়াত : ১২৮)

মনে হতে পারে, অসন্তুষ্টি দূর করার জন্য স্বামী-স্ত্রী সমঝোতা করা একেবারেই সাধারণ কথা। এজন্য কুরআন মাজীদে আয়াত অবতীর্ণ হওয়া এবং বিশেষভাবে নির্দেশ প্রদান করার কী প্রয়োজন? হযরত আয়েশা রাযি. বলেন, এই আয়াত ওই সমস্ত নারীর ব্যাপারে, যাদের স্বামীরা তাদের কাছে তেমন আসে না, অথবা বয়স বেশি হওয়ায় বা রোগে শোকে স্বামীর অধিকার রক্ষা করতে পারে না। এমতাবস্থায় স্ত্রী যদি বিচ্ছেদ এড়াতে স্বামীর সঙ্গে এমন সমঝোতা করে যে, তোমার কাছে আমার পাওনা অধিকার ছেড়ে দিচ্ছি, তুমি শুধু স্ত্রী হিসাবে আমাকে রেখে দাও। তা হলে এমন সমঝোতা মন্দ নয়; বরং একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া থেকে এটাই ভালো।

তাফসীর : إِذْ جَاءُوكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ

কুরআন মাজীদে যে আয়াতে কোনো ভয়ানক অবস্থা ও পরিস্থিতির কথা বলা হয়েছে, তাফসীরকারকদের সাধারণ রীতি অনুসারে, সেটিকে কেয়ামত সম্পর্কিত বলে বিবেচনা করা হয়। কিন্তু সাহাবা কেরাম যেহেতু সাধারণত প্রত্যেকটি আয়াতের তাৎপর্য সম্পর্কে অবগত থাকতেন, সেহেতু প্রকৃত ক্ষেত্র নির্ধারণে তাদের ভুল খুব কম হতো। কুরআন মাজীদে একটি আয়াত আছে :

فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ

অর্থ : আপনি অপেক্ষা করুন সেই দিনের, যেদিন আসমান ধোঁয়া নিয়ে আসবে... (সূরা দুখান, আয়াত : ১০)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. বলেন, হিজরতের পূর্বে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বদদুআর ফলে মক্কায় যে দুর্ভিক্ষ দেখা

দিয়েছিল সে সম্পর্কে এ কথা বলা হয়েছে।[১] একইভাবে কুরআন মাজীদে আরও একটি আয়াত আছে :

إِذْ جَاءُوكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ...

অর্থ : যখন তারা তোমাদের সামনে এল—তোমাদের ওপর থেকে, তোমাদের নিচে থেকে; যখন তোমাদের চক্ষু বিস্ফারিত হলো, এবং প্রাণ কণ্ঠাগত হলো... (সূরা আহযাব, আয়াত : ১০)

হযরত আয়েশা রাযি. বলেন, আয়াতটি পরিখা যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে নাজিল হয়েছে।[২]

তাফসীর : حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ

কুরআন মাজীদে নামাযের ব্যাপারে নির্দেশনামা :

حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى

অর্থ : তোমরা নামাযগুলোর প্রতি যত্নবান হও; যত্নবান হও মধ্যবর্তী নামাযের প্রতি। (সূরা বাকারা, আয়াত : ২৩৮)

মধ্যবর্তী নামায বলে কী উদ্দেশ্য? এ নিয়ে সাহাবা কেরামের মতভেদ আছে। *মুসনাদে আহমাদে* হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত রাযি. এবং হযরত উসামা রাযি. থেকে বর্ণিত আছে—এর উদ্দেশ্য হলো যোহরের নামায।[৩] কোনো কোনো সাহাবী বলেন, এর উদ্দেশ্য হলো ফজরের নামায। হযরত আয়েশা রাযি. মনে করেন, মধ্যবর্তী নামায বলতে আসরের নামাযকে বোঝানো হয়েছে। এ মতের ওপর তাঁর এত বেশি নিশ্চয়তাবোধ ছিল যে নিজ মুসহাফের পাদটীকায়ও তা লিখে দিয়েছিলেন।[৪] তাঁর এই তাফসীরের বিশুদ্ধতা হযরত আলী রাযি., হযরত

---

১. *সহীহ মুসলিম* : কিতাব—তাফসীর। *সহীহ বুখারী* : কিতাব—তাফসীর।

২. *সহীহ মুসলিম* : কিতাব—তাফসীর।

৩. *মুসনাদে আহমাদ* : ৫ম খণ্ড, পৃষ্ঠা : ২০২।

৪. *সহীহ বুখারী* : তাফসীর—আলোচ্য আয়াত।

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. এবং হযরত সামুরা ইবনে জুনদুব রাযি.-এর বিভিন্ন বর্ণনা থেকেও প্রমাণিত হয়।[১] মধ্যবর্তী নামায বলতে দৈনন্দিন নামাযগুলোর মধ্যবর্তী নামায উদ্দেশ্য, আর তা আসরের নামায, কেননা তা যোহর ও মাগরিবের মধ্যবর্তী সময়ে পড়তে হয়।

তাফসীর : وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ

সূরা বাকারায় আছে :

وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ

অর্থ : তোমাদের অন্তরে যা আছে, তা গোপন করো বা প্রকাশ করো, আল্লাহ তার হিসাব নেবেন। তখন তিনি যাকে ইচ্ছা করেন, ক্ষমা করবেন; যাকে ইচ্ছা করেন, শাস্তি দেবেন। (সূরা বাকারা, আয়াত : ২৮৪)

এই আয়াত থেকে বোঝা যায়, মনের মধ্যেও যেসব কল্পনা-জল্পনা হয়, আল্লাহ সেগুলোরও হিসাব নেবেন। তিনি এগুলোর ব্যাপারে ক্ষমাও করতে পারেন, শাস্তিও দিতে পারেন। কিন্তু অন্তরে অনিচ্ছাবশত যে ইচ্ছা বা ওসওয়াসা আসে, সেগুলোর হিসাব নিলে মানুষের বিপদ হয়ে যাবে। হযরত আলী রাযি. এবং হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. বলেন, আয়াতটি অন্য আর একটি আয়াত দ্বারা রহিত হয়েছে[২] :

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ

অর্থ : আল্লাহ মানুষকে সাধ্যের বাইরে কিছু চাপান না। সে যা ভালো করবে, তার সুফল পাবে; যা মন্দ করবে, তার কুফল পাবে। (সূরা বাকারা, আয়াত : ২৮৬)

---

১. *জামে তিরমিযী* : তাফসীর—আলোচ্য আয়াত।
২. *জামে তিরমিযী* : তাফসীর—আলোচ্য আয়াত।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাযি.-ও একই মত ব্যক্ত করেছেন।[১] হযরত আয়েশা রাযি.-কে একজন এই আয়াতটি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি কাছাকাছি অর্থের আর একটি আয়াত উল্লেখ করেন :

مَنْ يَعْمَلْ سُوٓءًا يُجْزَ بِهِ

অর্থ : যে কোনো বদ আমল করবে, তাকে তার বদ আমলের সাজা দেওয়া হবে। (সূরা নিসা, আয়াত : ১২৩)

প্রশ্নকারীর উদ্দেশ্য ছিল, যদি এমনই হয় তা হলে আল্লাহর দয়া ও করুণার কী হলো? মুক্তির আশা করা যাবে কী করে? হযরত আয়েশা রাযি. বললেন, আমিও আয়াতটির ব্যাখ্যা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে জানতে চেয়েছিলাম, এরপর তুমিই প্রথম আমার কাছে জানতে চাইলে। আল্লাহর কথা চিরসত্য। কিন্তু আল্লাহ তাঁর বান্দাদের ছোট-ছোট গুনাহের সাজা ছোট-ছোট বিপদ ও ঝামেলা দিয়ে দেন। মুমিন তখন অসুস্থ হয়, কিংবা কোনো বিপদ আসে; এমনকি পকেটে কিছু রেখে আর পায় না, খুঁজে খুঁজে পেরেশান হয় (অর্থাৎ এই সমস্ত ছোটখাটো সাজা দিয়ে আল্লাহ ক্ষমা ও মাগফেরাত করেন)। সোনা পুড়ে পুড়ে যেমন খাঁটি সোনা হয়, তেমন মুমিনও পূত-পবিত্র হয়ে পৃথিবী ত্যাগ করে।[২]

এই আয়াতগুলো ছাড়াও আরও অনেক আয়াতের ব্যাখ্যা ও তাফসীর হযরত আয়েশা রাযি. থেকে এসেছে। কিন্তু আমরা সেগুলো আলোচনায় আনিনি। সেগুলো স্বাভাবিকভাবে সবারই জানা। মুফাসসিরগণের মধ্যে ব্যাপকভাবে পর্যালোচিত। অনেক আয়াতে স্বতন্ত্র কোনো মত নেই। কুরআন মাজীদে হযরত আয়েশা রাযি.-এর পাণ্ডিত্য হাদীস, ফিকহ, ধর্মতত্ত্ব ইত্যাদি আলোচনা থেকেও অনুমান করা যায়।

কেরাতে শাযযাহ (ব্যতিক্রমী কেরাত)

কুরআন মাজীদে বিদ্যমান আয়াত, শব্দ বা বর্ণ ছাড়াও অন্য কোনো আয়াত, শব্দ বা বর্ণ যদি গায়রে মুতাওয়াতির সনদে বর্ণিত হয়, তা হলে

---

১. *সহীহ বুখারী* : তাফসীর—আলোচ্য আয়াত।
২. *জামে তিরমিযী* : তাফসীর—আলোচ্য আয়াত।

সেটাকে বলে 'কেরাতে শাযযাহ'। এ ধরনের দু-একটি কেরাতও হযরত আয়েশা রাযি. থেকে পাওয়া যায়। যেমন :

حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى (صَلٰوةِ الْعَصْرِ)

অর্থ : তোমরা নামাযের প্রতি যত্নশীল হও, যত্নশীল হও মধ্যবর্তী নামাযের প্রতি (অর্থাৎ আসরের নামাযের প্রতি)।

আবু ইউনুস হযরত আয়েশা রাযি.-এর গোলাম ছিলেন। তিনি বলেন, হযরত আয়েশা রাযি. আমাকে দিয়ে কুরআন লিখিয়েছিলেন। তিনি আমাকে বলেছিলেন, যখন এই আয়াতে পৌঁছবে তখন আমাকে জানাবে। আমি যখন এই আয়াতে পৌঁছলাম, তখন তিনি এভাবেই লিখতে বললেন। তিনি বললেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এভাবেই শুনেছি।[১] মূল কুরআনে صَلٰوةِ الْعَصْرِ শব্দটি নেই।

বাস্তবতা হলো, তিনি صَلٰوةِ الْعَصْرِ কুরআনের অংশ হিসেবে লেখাননি; বরং ব্যাখ্যা হিসেবে লিখিয়েছেন। বর্ণনাকারী বুঝতে ভুল করেছেন।

রযাআত (দুগ্ধপান) সম্পর্কিত ভুল ধারণা

রযাআত সম্পর্কে হযরত আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত আছে, কুরআন মাজীদে প্রথমে দশ ফোঁটা দুধ পান করলে রেযাআত সাব্যস্ত হওয়ার কথা এসেছে, তারপর পাঁচ ফোঁটার কথা এসেছে; এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মৃত্যুর আগ পর্যন্ত কুরআন মাজীদে এই বিধানই ছিল।[২] কিন্তু সকলে একমত যে, কুরআনে এমন কোনো আয়াত ছিল না। যদি হযরত আয়েশা রাযি. সত্যিই এমন কিছু বলে থাকেন, তা হলে, আমাদের বলতেই হবে যে, তিনি কোনোভাবে ভুল বুঝেছেন; অথবা তিনি শুধু বলেছেন, আগে এমন ছিল। এমন সংযোজন যে, কুরআনে এমন ছিল—এটা নির্ঘাত বর্ণনাকারীর ভুল।[৩]

---

১. *জামে তিরমিযী* : তাফসীর—আলোচ্য আয়াত।

২. *সহীহ মুসলিম* : কিতাব—রাযাআত।

৩. কিছু কিছু বর্ণনাকারী (যেমন : *দারাকুতনী*, *ইবনে মাজাহ*) কিতাবুর রযাআহ—অংশে হযরত আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, রাযাআত-সংক্রান্ত হাদীসটি একটি কাগজে

হাদীস শরীফ

হযরত আয়েশা রাযি. এবং পবিত্র স্ত্রীগণ

হাদীসশাস্ত্রের আলোচ্য বিষয় মূলত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। অর্থাৎ তাঁর পবিত্র সত্তাই এ মহিমাময় শাস্ত্রের আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু। সুতরাং যিনি যত বেশি তাঁর নৈকট্য ও সাহচর্য লাভ করেছেন, জ্ঞানের এ অমূল্য শাখায় তার পাণ্ডিত্য ও ব্যুৎপত্তিও তত বেশি। ভাগ্যক্রমে এ সুযোগ ও সম্ভাবনায় এগিয়ে ছিলেন হযরত আয়েশা রাযি.।

হিজরতের তিন বছর পূর্বে তাঁর বিবাহ হয়। এ সময় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতিদিন লাগাতার তাঁদের ঘরে আসা-যাওয়া করেছেন।[১] অবশ্য হিজরতের পর ছয় মাস এই মহান মানুষটিকে দেখার পরম সৌভাগ্য তাঁর হয়নি। এরপর শাওয়াল মাসের কোনো এক সৌভাগ্যময় দিনে নববী-নীড়ের পবিত্র আঙিনায় পদার্পণ করেন উম্মুল মুমিনীনের 'তাজ' মস্তকে ধারণ করে। এরপর থেকে, অষ্টপ্রহর এই পবিত্র সত্তার মোবারক সান্নিধ্যলাভে ধন্য হয়েছেন আমৃত্যু। ইসলামের প্রাথমিক পর্যায়টুকু তাঁর ছেলেবেলায় কাটলেও, প্রকৃতিগত বুদ্ধিমত্তা ও প্রখর স্মৃতিশক্তি ছিল যথার্থ পরিপূরক। একজন সহধর্মিনী হিসেবে হযরত সাওদা রাযি. হয়তো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কয়েক মাস বেশি পেয়েছিলেন; কিন্তু মেধা-প্রতিভার তারতম্য ছাড়াও, সার্বিক বিচারে, নৈকট্য ও সাহচর্য লাভের অগ্রগামিতা হযরত আয়েশা রাযি.-এরই ভাগে। কেননা হযরত সাওদা রাযি. বয়সভারে দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন।[২] এমনকি,

---

লেখা ছিল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মৃত্যুশয্যায় ছিলেন, তখন এটা তাঁর শিয়রে রাখা ছিল। আমরা তাঁর সেবায় নিয়োজিত ছিলাম। হঠাৎ একটি বকরি এসে কাগজটি মুখে নিয়ে চিবিয়ে নষ্ট করে ফেলে। হাদীসটি সর্বদিক থেকে 'বাতিল'—অগ্রহণযোগ্য। সকলে একমত যে, মৃত্যুশয্যায় কোনো আয়াত নাজিল হয়নি। যদি আয়াতটি আগে নাজিল হয়ে থাকে তা হলে তা অবশ্যই ওহীলেখক সাহাবীদের কাছে থাকত এবং সাহাবা কেরাম অনেকেই জানতে পারতেন। মূলত হাদীসটি বর্ণনাকারী হলেন মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক। ইনি হাদীস এবং আহকামের জগতে গ্রহণযোগ্য ব্যক্তিত্ব নন।

সহীহ মুসলিম, *মুয়াত্তা*-সহ আরও উচ্চ মর্যাদার কিতাবগুলোতেও হযরত আয়েশা রাযি.-এর 'পাঁচ ফোঁটা দুধ' সংক্রান্ত হাদীসটি এসেছে। কিন্তু কোথাও বকরি এসে কাগজটি খেয়ে গেছে—এমন কথা নেই। এটা কোনো দুষ্ট লোকের সংযোজন।

১. *সহীহ বুখারী*, বাবু হিজরত।

২. *সহীহ মুসলিম*, باب جواز هبتها نوبتها لضرتها।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মৃত্যুর বেশ কিছুকাল আগেই স্বামীসেবায়ও অপরাগ হয়ে পড়েন তিনি।[১] পক্ষান্তরে, হযরত আয়েশা রাযি. যুবতী ছিলেন। যতই দিন যাচ্ছিল, তাঁর বুঝ ও বুদ্ধি এবং ধারণক্ষমতা ততই বাড়ছিল। এবং এভাবেই, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাঁর সেবাযত্ন করার সুযোগ ও সৌভাগ্যলাভে ধন্য হন। সুতরাং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সার্বিক অবস্থা সম্পর্কে সম্যক অবগতি লাভের সুযোগও তাঁরই বেশি হয়েছে।

হযরত সাওদা রাযি. ছাড়া অন্য স্ত্রীগণ হযরত আয়েশা রাযি.-এর পরে নববী-সান্নিধ্যে আসেন। আট দিনে একদিন তাঁদের স্বামীসেবার সুযোগ হতো। পক্ষান্তরে হযরত আয়েশা রাযি.-এর এ সৌভাগ্য হতো দুই দিন। কেননা হযরত সাওদা রাযি. নিজের দিনটি হযরত আয়েশা রাযি.-এর অনুকূলে ছেড়ে দিয়েছিলেন।[২] তা ছাড়া, তাঁর ঘরটি ছিল মসজিদে নববীর সঙ্গে লাগানো, যা ছিল দরসে নববীর মূল কেন্দ্র। এই বিবেচনায়, পবিত্র স্ত্রীগণের মধ্যে কেউই হাদীসে নববীর জ্ঞানে হযরত আয়েশা রাযি.-এর সমকক্ষা ছিলেন না।

আকাবির সাহাবার রেওয়ায়েত কম হওয়ার কারণ

হযরত আয়েশা রাযি. কর্তৃক বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা এত বেশি যে—কি নারী সাহাবী, কি উম্মাহাতুল মুমিনীন; আর কি পুরুষ সাহাবীগণ—অল্প কয়েকজন ছাড়া কেউই তাঁর সম-মর্যাদার দাবি করতে পারতেন না। হযরত আবু বকর রাযি., হযরত উমর রাযি., হযরত উসমান রাযি. এবং আলী রাযি. প্রমুখ মহিমান্বিত ব্যক্তিবর্গ যদিও নববী-সান্নিধ্য, ধর্মতত্ত্ব ও যোগ্যতায় হযরত আয়েশা রাযি. থেকে অনেক উঁচুমানের ছিলেন; কিন্তু একে তো স্বাভাবিক রীতি অনুসারে স্ত্রী কয়েক মাসে যতখানি জানতে পারে, বন্ধুমহল কয়েক বছরেও তা পারে না; অন্য দিকে, এই মহিমান্বিত ব্যক্তিবর্গকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মৃত্যুর পরই

---

১. *সহীহ মুসলিম*, باب جواز هبتها نوبتها لضرتها।

২. *সহীহ মুসলিম*, باب جواز هبتها نوبتها لضرتها।

পর্যায়ক্রমে খেলাফতের গুরুদায়িত্ব আঞ্জাম দিতে হয়েছে; তাই হাদীস-বর্ণনার সুযোগ তাঁদের কমই হয়েছে; এরপরও তাঁদের সূত্রে বর্ণিত অল্প যে কটি হাদীস সংরক্ষিত হয়েছে, অধিকাংশই রাষ্ট্র ও প্রশাসনের সঙ্গে সম্পর্কিত আইন-কানুন ও সংবিধান বলা চলে, যা আমাদের ফিকহশাস্ত্রের মূল ভিত্তি। এজন্য প্রকৃত হাদীস-বর্ণনার দায়িত্ব পালন করতে পেরেছেন শুধুমাত্র ওইসব সাহাবীই, যাঁরা রাষ্ট্রীয় ও প্রশাসনিক বিভিন্ন দায় ও দায়িত্ব থেকে মুক্ত হয়ে নির্বিঘ্ন জীবন-যাপন করেছেন।

বড় বড় সাহাবা কেরাম কর্তৃক বর্ণিত হাদীস-সংখ্যা কম হওয়ার আরও একটি রহস্য আছে। মূলত তাঁদের যুগটি ছিল স্বয়ং সাহাবীগণের যুগ। সাহাবা কেরাম প্রত্যেকেই এক-এক জন ছিলেন হাদীসের জ্ঞানভাণ্ডার। তাঁদের অন্য কাউকে জিজ্ঞেস করার প্রয়োজন হতো খুবই কম। তাবেঈগণ—যাঁরা এই অমীয় সুধার মধুসরোবর থেকে অতৃপ্ত ছিলেন—জন্মগ্রহণ করেছেন মোটামুটি বিশ পঁচিশ বছর পরে। তাঁরা তাঁদের প্রিয় নবীর পবিত্র সত্তা সম্পর্কে জানার জন্য ছিলেন উদগ্রীব। কিন্তু বড় বড় সাহাবা কেরাম ততদিনে পরপারের যাত্রী; পৃথিবী ও পৃথিবীবাসী এই মহাপুরুষদের হারিয়ে তখন অনেকখানি নিঃস্ব হয়ে গেছে। কমবয়সী সাহাবা কেরাম তখন শক্ত-সমর্থ যুবক অথবা প্রৌঢ়। হিজরী প্রথম শতক পর্যন্ত সাহাবা কেরামের এই শেষ পরম্পরাটুকুই পৃথিবীর বুকে হাদীসে নববীর আলো ছড়িয়েছিল। এজন্য 'মুকসিরীন' বা সর্বাধিক হাদীসবর্ণনাকারী সাহাবীর মর্যাদা পেয়েছেন তাঁরাই। তাঁদের বর্ণনায়ই হাদীসের সংগ্রহশালা পুষ্ট হয়েছে।[১]

সর্বাধিক হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবা

'মুকসিরীন' বা সর্বাধিক হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবী বিবেচিত হয়েছেন সাত জন। তাঁদের এক-এক জনের বর্ণিত হাদীস-সংখ্যা হাজারের কোঠা পেরিয়ে গেছে। একটি ছকে তাঁদের নাম, মৃত্যু-সন, ও বর্ণিত হাদীস-সংখ্যা দেওয়া গেল :[২]

---

১. *ইবনে সাদ*, ২য় খণ্ড, ২য় পরিচ্ছেদ।

২. ছকটি فتح المغيث شرح ألفية الحديث গ্রন্থ থেকে গৃহীত, পৃষ্ঠা : ৩৭১ (লক্ষ্ণৌর ছাপা)।

নাম	মৃত্যু-সন (হি.)	হাদীস সংখ্যা
হযরত আবু হুরায়রা রাযি.	৫৭/৫৮/৫৯	৫৩৬৪
হযরত ইবনে আব্বাস রাযি.	৬৮	২৬৬০
হযরত ইবনে উমর রাযি.	৭৩	২২৩০
হযরত জাবের রাযি.	৭৪	২৫৪০
হযরত আনাস রাযি.	৯১	২৬৮৬
হযরত আবু সাঈদ খুদরি রাযি.	৭৪	২২৭০
হযরত আয়েশা রাযি.	৫৭/৫৮	২২১০

সর্বাধিক হাদীস-বর্ণনায় তাঁর অবস্থান

সর্বাধিক হাদীস-বর্ণনার ক্ষেত্রে হযরত আয়েশা রাযি. তালিকায় সবার শেষে আছেন। যেসব সাহাবী তালিকায় শীর্ষে আছেন, তাঁদের অধিকাংশই হযরত আয়েশা রাযি.-এর পরেও জীবিত ছিলেন। তাঁদের হাদীস বর্ণনার ধারা আরও কয়েক বছর অব্যাহত থেকেছে। তা ছাড়া, হযরত আয়েশা রাযি.-এর ব্যাপারে এই বিষয়টিও মাথায় রাখতে হবে যে, তিনি একজন নারী ছিলেন। সমসাময়িকদের মতো সকল মজলিসে উপস্থিত হতে পারতেন না। শিক্ষানবিশগণও অবাধে তাঁর কাছে পৌঁছতে পারতেন না। ইসলামী জাহানের বড় বড় শহরে সফর করে করে হাদীস বর্ণনা করা তাঁর পক্ষে ছিল অসম্ভব। এই সবগুলো বিষয় বিবেচনা করলে, হাদীসের জগতের সাতটি তারকার মধ্যে তাঁকেই বেশি জ্যোতির্ময় মনে হয়।

বর্ণিত হাদীস-সংখ্যা

উপর্যুক্ত ছক থেকে আমরা জানতে পেরেছি, হযরত আয়েশা রাযি. কর্তৃক বর্ণিত হাদীস-সংখ্যা সর্বসাকুল্যে দুই হাজার দুইশো দশটি। এর মধ্যে *সহীহ বুখারী* ও *সহীহ মুসলিমে* দুইশো ছিয়াশিটি। একশো চুয়াত্তরটি হাদীস উভয় গ্রন্থে এসেছে। চুয়ান্নটি হাদীস এসেছে শুধু *সহীহ*

*বুখারী*তে এবং আটান্নটি হাদীস এসেছে শুধু *সহীহ মুসলিমে*। এই হিসেবে *সহীহ বুখারী*তে তাঁর দুইশো আটাশটি এবং *সহীহ মুসলিমে* দুইশো বত্রিশটি হাদীস আছে। অবশিষ্ট হাদীসগুলো আছে অন্যান্য গ্রন্থে। ইমাম আহমাদ রহ. তাঁর অনবদ্য গ্রন্থ *মুসনাদ*-এর ষষ্ঠ খণ্ডে শুধু হযরত আয়েশা রাযি.-এর হাদীসগুলোই এনেছেন, যা মিশরের ছাপা এই সুবিশাল গ্রন্থটির দুইশো তেপ্পান্নটি পৃষ্ঠা বিস্তৃত। যদি হযরত আয়েশা রাযি. কর্তৃক বর্ণিত হাদীসগুলোকে আলাদা করা যায়, তা হলে একটি স্বতন্ত্র-সুবিশাল গ্রন্থে পরিণত হবে।

হাদীস : রেওয়ায়েত ও দিরায়াত

শুধু বর্ণনার সংখ্যাধিক্যই হযরত আয়েশা রাযি.-কে হাদীসের জগতে বিশিষ্ট করেনি। এ জগতে তাঁর বিশিষ্টতার মূল কারণ হলো বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে বর্ণিত বিষয়ের বুঝ ও গভীর উপলব্ধি অর্থাৎ এর সূক্ষ্মতা, নিগূঢ়তা, তাৎপর্য-অনুধাবন এবং সে আলোকে শরঈ বিধান-উদ্ঘাটন। যে সকল সাহাবী 'মুকিললীন'—অর্থাৎ সবচেয়ে কম হাদীস বর্ণনা করেছেন, তাঁদের মধ্যে অনেকে বড় বড় ফকীহ ও মুজতাহিদ ছিলেন। কিন্তু যাঁরা নিছক সংখ্যাধিক্যে এগিয়ে গেছেন, তাদের অধিকাংশই হাদীসের গভীরে পৌছতে ছিলেন অক্ষম। সর্বাধিক বর্ণনাকারী সাতজন সাহাবীর মধ্যে পাঁচজনই শাস্ত্রীয় মূলনীতিবিদগণের দৃষ্টিতে নিছক রাবী হিসেবে মূল্যায়িত হয়েছেন; ফকীহ ও মুজতাহিদ সাহাবী হিসেবে তাঁদের মূল্যায়ন নেই। কেননা হাদীসের রেওয়ায়েত ও বর্ণনার যে একটি বিশাল ভাণ্ডার আমাদের আছে, তাতে হযরত আবু হুরায়রা রাযি., হযরত ইবনে উমর রাযি., হযরত আনাস রাযি., হযরত জাবের রাযি. এবং হযরত আবু সাঈদ খুদরি রাযি. থেকে দিরায়াত তথা ফিকহী ইজতিহাদ তেমন পাওয়া যায় না। এই বিশেষত্বটুকু হযরত আয়েশা রাযি. এবং হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. লাভ করেছেন। তাঁরা বর্ণনার সংখ্যাধিক্যে যেমন এগিয়ে, তেমনি বর্ণিত বিষয়ের গভীর বুঝ ও উপলব্ধিতেও এগিয়ে, ফিকহ ও ইজতিহাদের দিক থেকেও এগিয়ে।

বর্ণিত বিষয়ের কল্যাণ ও ইতিবাচকতা-অনুধাবন

তবে হযরত আয়েশা রাযি.-এর হাদীসের জগতের গুণ ও বৈশিষ্ট্যের সীমা এখানেই শেষ নয়। বর্ণনার সংখ্যাধিক্য ও বর্ণিত বিষয়ের গভীর উপলব্ধির পাশাপাশি তাঁর আরও একটি বিশেষত্ব এই—তিনি যে বিধি-নিষেধ ও ঘটনাপ্রবাহ বর্ণনা করতেন, তা যেই কল্যাণ ও ইতিবাচকতাকে লক্ষ্য করে, তাও স্পষ্ট করতেন। *সহীহ বুখারী*তে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাযি., হযরত আবু সাঈদ খুদরি রাযি. এবং হযরত আয়েশা রাযি.—তিনজন থেকেই একই বিষয়ের বর্ণনা আছে যে, জুমআর দিন গোসল করতে হবে। আমরা তিনজনের বর্ণনাই উদ্ধৃত করছি :

হযরত ইবনে উমর রাযি.-এর বর্ণনা :

سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُوْلُ مَنْ جَاءَ مِنْكُمُ الْجُمْعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ

অর্থ : আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি জুমআর নামাযে আসবে, সে যেন গোসল করে।

হযরত আবু সাঈদ খুদরি রাযি.-এর বর্ণনা :

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ غُسْلُ يَوْمِ الْجُمْعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ

অর্থ : রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, জুমার দিন গোসল করা প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির ওপর ওয়াজিব।

এই বিষয়টিকে হযরত আয়েশা রাযি. এভাবে বর্ণনা করছেন :

قَالَتْ كَانَ النَّاسُ يَنْتَابُوْنَ مِنْ مَّنَازِلِهِمْ وَ الْعَوَالِيْ فَيَأْتُوْنَ فِي الْغُبَارِ تُصِيْبُهُمُ الْغُبَارُ وَالْعَرَقِ فَيَخْرُجُ مِنْهُمُ الْعَرَقُ فَأَتَى رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْسَانٌ مِّنْهُمْ وَ هُوَ عِنْدِيْ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَو أَنَّكُمْ تَطَهَّرْتُمْ لِيَوْمِكُمْ هَذَا.

অর্থ : লোকেরা নিজ নিজ বাড়ি থেকে এবং মদীনার বিভিন্ন বসতি

থেকে আসত। তারা ধুলা ও ঘামে একাকার হয়ে থাকত। এভাবে একদিন একজন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এল। তিনি আমার কাছেই বসা ছিলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, যদি তোমরা আজকে গোসল করে আসতে তা হলে ভালো হতো।

এই একই বিষয়ে হযরত আয়েশা রাযি. থেকে আরও একটি বর্ণনা পাওয়া যায় :

قَالَتْ عَائِشَةُ كَانَ النَّاسُ مَهَنَةَ أَنْفُسِهِمْ كَانُوْا إِذَا رَاحُوْا إِلَى الْجُمْعَةِ رَاحُوْا فِيْ هَيْئَتِهِمْ فَقِيْلَ لَهُمْ لَوِ اغْتَسَلْتُمْ

অর্থ : অনেক শ্রমজীবী মেহনতি মানুষ ছিল। তারা কাজের শরীর নিয়েই জুমার নামাযে চলে আসত। এজন্য তাদের বলা হলো, তোমরা গোসল করে এলে ভালো হতো।[১]

কোনো এক বছর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নির্দেশ দিলেন, কোরবানির গোশত তিন দিনের মধ্যেই খেয়ে ফেলতে হবে। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাযি. এবং হযরত আবু সাঈদ খুদরি রাযি.-সহ অনেকে এই নির্দেশটিকে স্থায়ী মনে করেছেন।[২] এজন্য তারা এরকম দিক-নির্দেশনাই দিতেন। পক্ষান্তরে হযরত আয়েশা রাযি. মনে করতেন, এটা জরুরি নয়; করলে ভালো, না করলে সমস্যা নেই। এজন্যই এ বিষয়টিকে তিনি এভাবে ব্যক্ত করেছিলেন,

اَلضَّحِيَّةُ كُنَّا نُمَلِّحُ مِنْهَا فَنُقَدِّمُ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِيْنَةِ فَقَالَ لَا تَأْكُلُوْا إِلَّا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَّ لَيْسَتْ بِعَزِيْمَةٍ وَ لَكِنْ أَرَادَ أَنْ نُّطْعِمَ مِنْهُ وَ اللهُ أَعْلَمُ

অর্থ : আমরা কোরবানির গোশত লবণ দিয়ে মেখে রেখে দিতাম।

---

১. *সহীহ বুখারী*, كتاب الجمعة، باب وقت الجمعة إذا زالت الشمس হাদীস নং ৯০৩। *আবু দাউদ*, كتاب الطهارة، باب الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة হাদীস নং ৩৫২

২. *তিরমিযী*, أبواب الأضاحي، باب في كراهية أكل الأضحية فوق ثلاثة أيام হাদীস নং ১৫০৯।

মদীনায় আমরা এগুলো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে উপস্থাপন করতাম। একদিন তিনি বললেন, তোমরা তিন দিনের বেশি খেয়ো না। তবে এটা জরুরি নয়। তিনি আসলে চাইতেন যে, আমরা অন্যদেরও খাওয়াই।[১]

অতঃপর অন্য একটি বর্ণনায় এর মূল কারণই তিনি বলে দিলেন। একজন লোক জিজ্ঞেস করল, উম্মুল মুমিনীন, কোরবানির গোশত কি তিনদিনের বেশি খাওয়া নিষেধ? হযরত আয়েশা রাযি. বললেন,

لَا وَ لَكِنْ قَلَّ مَنْ كَانَ يُضَحِّيْ مِنَ النَّاسِ فَأَحَبَّ أَنْ يُّطْعَمَ مَنْ لَّمْ يَكُنْ يُضَحِّيْ

অর্থ : না, নিষেধ নয়; আসলে তখন কোরবানি-করা লোকের সংখ্যা খুব কম ছিল। এজন্য তিনি চাইতেন, যেই লোকগুলো কোরবানি দিতে পারেনি, তাদেরকেও খাওয়ানো হোক।[২]

আবু দাউদ ছাড়া সিহাহ-র সবগুলো কিতাবেই এসেছে, হযরত আবু হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বকরির গোশত খুব পছন্দ করতেন; কিন্তু হযরত আয়েশা রাযি. বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে এটা খুব পছন্দ করতেন তা নয়; বরং ওই সময় গোশত পাওয়াই যেত না, আর এটা তুলনামূলকভাবে তাড়াতাড়ি রান্না করা যেত, তাই তিনি এটাই খেতেন।[৩]

বিভিন্ন হাদীসে আছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতি বছর কাউকে না কাউকে খায়বারে পাঠিয়ে দিতেন। সে গিয়ে ফসলের ধারণা নিয়ে আসত। বর্ণনাকারীগণ শুধু এটুকু বলেই রেখে দিয়েছেন। কিন্তু হযরত আয়েশা রাযি. এই বিষয়টি আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন,

وَ إِنَّمَا كَانَ أَمْرُ النَّبِيِّ بِالْخَرَصِ لِكَيْ يُحْصِيَ الزَّكٰوةَ قَبْلَ أَنْ تُؤْكَلَ الثَّمَرَةُ وَ تُفَرَّقَ

---

১. *সহীহ বুখারী*, كتاب الأضاحي، باب ما يؤكل من لحوم الأضاحي হাদীস নং ৫৫৭০।

২. *তিরমিযী*, كتاب الأضاحي، باب في الرخصة في أكل لحوم الأضاحي... হাদীস নং ১৫১১।

৩. *তিরমিযী*।

অর্থ : রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফসলের আন্দাজ করতে পাঠাতেন এজন্য যে, এতে করে খাদ্য বণ্টনের পূর্বে যাকাতের ধারণা নেওয়া সহজ হতো।[১]

বারবার জিজ্ঞেস করে নেওয়া

হযরত আয়েশা রাযি.-এর বর্ণনায় ভুল কম হওয়ার একটি বিশেষ কারণ এই যে, অন্যান্য সাহাবীগণ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে একবার কোনো কথা শুনে বা দেখেই বর্ণনা করতেন। কিন্তু হযরত আয়েশা রাযি.-এর নীতি ছিল, যতক্ষণ পর্যন্ত কোনো বিষয় ভালো করে বুঝতে না পারতেন, ততক্ষণ সেটা বর্ণনা করতেন না। যদি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোনো কথা বুঝে না আসত, তা হলে বারবার জিজ্ঞেস করে সেটা স্পষ্ট করেই ক্ষান্ত হতেন।[২] এরকম সুযোগ অন্যদের হওয়াও কঠিন ছিল। এরকম অনেক বিষয় আছে, যেগুলোতে তাঁর বর্ণনা আর অন্যদের বর্ণনার মধ্যে ভালোমন্দ তুলে ধরার ক্ষেত্রে, কারণ উল্লেখ করার ক্ষেত্রে আকাশ-পাতাল ব্যবধান মনে হয়। সামনে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা আসবে।

যেই বর্ণনাগুলো তিনি সরাসরি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শুনতেন না, বরং অন্য কারও থেকে শুনতেন, সেই বর্ণনাগুলোর ক্ষেত্রে খুবই সতর্কতা অবলম্বন করতেন এবং ভালোভাবে জেনে নিয়ে তার পরই ভরসা করতেন। একবার হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস রাযি. একটি হাদীস বর্ণনা করলেন। এক বছর পর যখন তিনি এলেন, তখন একজনকে পাঠিয়ে পুনরায় হাদীসটি শুনতে বললেন। তিনি কোনোরকম কম-বেশি না করে হুবহু সেভাবেই বলে দিলেন। লোকটি ফিরে এসে হযরত আয়েশা রাযি.-এর সামনে হাদীসটির পুনরাবৃত্তি করল। হযরত আয়েশা রাযি. অবাক হয়ে বললেন, বাহ, আমরের বেটা ভালোই মনে রেখেছে।[৩]

---

১. *মুসনাদে আহমাদ* : ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা : ১৬৩।

২. *সহীহ বুখারী*, كتاب العلم।

৩. *সহীহ বুখারী*, باب ما يذكر من ذم الرأي।

হাদীস-বর্ণনায় সতর্কতা

একই রীতির ভিত্তিতে, তিনি যখন কোনো হাদীস অন্য কারও কাছে শুনতেন, এবং তাঁর কাছে কেউ ওই বিষয়ে শুনতে আসত, তখন তিনি নিজে না বলে বরং সেই বর্ণনাকারীর কাছেই পাঠিয়ে দিতেন। এক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বনের পাশাপাশি তাঁর আরও একটি উদ্দেশ্য থাকত যে, হাদীস-বর্ণনায় মধ্যস্থতা যত কম হবে এবং সনদ যত উঁচু হবে ততই ভালো।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসরের পরে ঘরে এসে সুন্নাত পড়তেন; অথচ কঠিন নিষেধাজ্ঞা ছিল যে, আসরের পরে কোনো নামায পড়া যাবে না। কিছু লোক হযরত আয়েশা রাযি.-এর নিকট প্রতিনিধি পাঠিয়ে জানতে চাইল, আপনার পক্ষ থেকে এমন কথা বর্ণনা করা হয়ে থাকে। প্রকৃত বিষয়টি কী? তিনি উত্তর দিলেন, হযরত উম্মে সালামা রাযি.-কে জিজ্ঞেস করো। মূল বর্ণনাকারী তিনিই। একইভাবে এক ব্যক্তি মোজার ওপর মাসেহ সম্পর্কে জানতে চাইল। তিনি বললেন, হযরত আলী রাযি.-কে জিজ্ঞেস করো। তিনি সফরে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে থাকতেন।

ইমাম হাযেমি রহ. আল-ইতিবার গ্রন্থে (হায়দারাবাদের ছাপা) হাদীসের বিষয়ে হযরত আয়েশা রাযি.-এর রীতি ও অভ্যাসের প্রতি খুব সংক্ষেপে আলোকপাত করেছেন।

সাহাবা কেরামের বর্ণনার ভুল সংশোধন

হযরত আয়েশা রাযি. শুধু নিজের বর্ণনাকেই ভুল-ত্রুটি-মুক্ত রাখতে চাইতেন তা নয়; বরং অন্যদের বর্ণনারও শুদ্ধ্যশুদ্ধি করে দিতেন। হাদীস-শাস্ত্রে বরং পুরো ইসলাম ধর্মে তাঁর একটি বড় অবদান এই যে, তিনি সমসাময়িকদের ত্রুটি-বিচ্যুতির কঠোর সমালোচনা করেছেন এবং ভুল ধারণা ও কুসংস্কারের অপনোদন করেছেন। মুহাদ্দিসগণের পরিভাষায় এটিকে 'ইস্তিদরাক' (ভুল সংশোধন) বলে। হাদীসবিশারদগণ অনেকেই তাঁর এই সংশোধনীগুলোর সংকলন করেছেন। এগুলোর সর্বশেষ সংকলন হলো عَيْنُ الْإِصَابَةِ فِيْ مَا اسْتَدْرَكَتْهُ عَائِشَةُ عَلَى الصَّحَابَةِ।

সংকলক অমূল্য রিসালাটিকে ফিকহশাস্ত্রের ক্রমানুসারে অধ্যায়ভিত্তিক বিন্যাস দান করেছেন।[১]

হাদীস-শাস্ত্রের মূলনীতিগুলোর প্রাথমিক ধারণা

সাহাবা কেরামের যুগে যদিও হাদীস-শাস্ত্রের মূলনীতিগুলো কোনো শাস্ত্রীয় রূপ পরিগ্রহ করেনি; তথাপি প্রাথমিক ও মৌলিক নীতিমালা বিন্যস্ত হয়ে গিয়েছিল। হযরত আয়েশা রাযি. সমসাময়িকদের প্রতি যে সংশোধনীগুলো আরোপ করেছিলেন, তাতে গভীরভাবে দৃষ্টি নিবদ্ধ করলে আমরা নিম্নোক্ত ধারাগুলো পাই :

কুরআনবিরোধী বর্ণনা অগ্রহণযোগ্য

হাদীস-শাস্ত্রে হযরত আয়েশা রাযি.-এর সর্বপ্রথম নীতি মনে করা হয়—বর্ণনা কুরআন মাজীদের সঙ্গে সাংঘর্ষিক হতে পারবে না।

১. প্রথম উদাহরণ

এই মূলনীতির আলোকে তিনি কয়েকটি বর্ণনার বিশুদ্ধতা অস্বীকার করেছেন। সঙ্গে সঙ্গে সেই বর্ণনাগুলোর মূল কথা ও প্রকৃত মর্ম নিজের জ্ঞান ও বুঝ মোতাবেক ব্যাখ্যা করেছেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি. এবং আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাযি.-সহ বিভিন্ন সাহাবী বর্ণনা করেছেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

إِنَّ الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ

অর্থ : মাইয়েতকে তার পরিবারের লোকদের কান্নাকাটির জন্য শাস্তি দেওয়া হয়।

হযরত আয়েশা রাযি. যখন বর্ণনাটি শুনলেন, তখন তা মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানালেন এবং বললেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনোই এ কথা বলতে পারেন না। প্রকৃত ঘটনা এই যে, একবার তিনি

---

১. আলোচ্য রিসালাটি আমি হায়দারাবাদ দাক্ষিণাত্যের একটি ছাপাখানায় পেয়েছিলাম। সেটিই আমার কাছে আছে।

এক ইহুদি মহিলার মৃতদেহের পাশ দিয়ে পথ অতিক্রম করলেন। মাইয়েতের কোনো এক আত্মীয় কান্নাকাটি করছিল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এ এখানে কাঁদছে, আর ওখানে ওকে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে। হযরত আয়েশা রাযি.-এর কথার অর্থ হলো, যেমনটি *সহীহ বুখারী*তে বদর যুদ্ধের আলোচনায় আছে, আত্মীয়ের কান্না মাইয়েতের শাস্তির কারণ নয়। দুটো আলাদা আলাদা বিষয়। অর্থাৎ আত্মীয় কাঁদছে মাইয়েতের মৃত্যুর কারণে, আর তার আজাব হচ্ছে জীবনে কৃত পাপের কারণে। কেননা কান্না অন্যের কাজ। এর আজাব যে কাঁদছে সেই ভোগ করবে।[১] মাইয়েত কেন সেজন্য দায়ী হবে? সবাইকে নিজের আমলেরই সাজা ভোগ করতে হবে। এ প্রসঙ্গে হযরত আয়েশা রাযি. একটি আয়াতও উল্লেখ করেন,

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ أُخْرَى

অর্থ : কেউ কারও পাপের বোঝা বহন করবে না। (সূরা ইসরা, আয়াত : ১৫)

বর্ণনাকারী বলেন, হযরত ইবনে উমর রাযি. যখন হযরত আয়েশা রাযি.-এর ব্যাখ্যাটি শুনেছেন, তখন কোনো উত্তর দেননি।[২]

ইমাম বুখারী রহ. হযরত আয়েশা রাযি. এবং হযরত ইবনে উমর রাযি.-এর মতভেদের মধ্যস্থতা করেছেন এভাবে : যদি বিলাপ করা স্বয়ং মাইয়েতেরও রীতি হয়ে থাকে এবং সে তার আত্মীয়-স্বজনদের এসব করার নির্দেশ দিয়ে যায়, তা হলে তাদের বিলাপের কারণে তার আজাব হবে। কেননা সে তাদের শেখানোর দায়িত্বটি পালন করেনি। মহান আল্লাহ ইরশাদ করেছেন :

---

১. এখানে একটি মাসআলা বুঝতে হবে, তা এই যে, প্রিয়জনের মৃত্যুতে স্বভাবতই যে কান্না আসার কথা তাতে গুনাহ নেই। স্বয়ং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-ই পুত্র কাসিমের মৃত্যুতে অশ্রুসিক্ত হয়েছিলেন। প্রকৃত প্রস্তাবে—মৃত্যুশোকে কাঁদা, বিলাপ করা, কাপড়চোপড় ছেঁড়া, শরিয়তবিরোধী বাক্য মুখে আনা, মাথায় মাটিতে হাত চাপড়ানো ইত্যাদি বাড়াবাড়িগুলো শরীয়তে নিষিদ্ধ। এজন্য বেশ কিছু হাদীসে স্পষ্টভাবেই এসেছে, যে ধরনের কান্নায় শরীয়তবিরোধী বিষয়গুলো এসে যায় সে ধরনের কান্না নিষিদ্ধ। সাধারণ দুঃখ, কান্না ও অশ্রুপাত নিষিদ্ধ নয়।

২. *সহীহ বুখারী* ও *মুসলিম* : কিতাবুল জানাইয।

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

অর্থ : হে মুমিনগণ, তোমরা নিজেদের এবং তোমাদের পরিবারকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করো। (সূরা তাহরীম, আয়াত : ৫)

যদি শেখানো সত্ত্বেও পরিবারের লোকেরা বিলাপ করে, তা হলে হযরত আয়েশা রাযি.-এর কথাই ঠিক। যেমনটি কুরআনে এসেছে :

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى

অর্থ : কেউ কারও পাপের বোঝা বহন করবে না। (সূরা ইসরা, আয়াত : ১৫)

এমনকি, অন্যত্র এর পর বলা হয়েছে[১] :

وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ

অর্থ : এমনকি, যদি কেউ ভার বহন করতে না পেরে সাহায্যের জন্য ডাকে, তবুও তার বোঝা থেকে কিছু বহন করা হবে না। (সূরা ফাতির, আয়াত : ১৮)

আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক রহ.-এর সিদ্ধান্তও এটিই।[২]

কিন্তু শালিসি ফায়সালার সঙ্গে আমরা একমত নই। প্রথম অবস্থায় মাইয়েত নিজের পাপের কারণেই শাস্তি পাবে। কেননা পরিবারকে না শেখানোর অপরাধটা তার নিজের। আর এই অপরাধের শাস্তিই সে পাবে। পরিবারের বিলাপ করার অপরাধে সে অপরাধী নয়। এজন্য প্রথম অবস্থায়ও হযরত আয়েশা রাযি.-এর সিদ্ধান্তই ঠিক। ইমাম শাফেঈ রহ.[৩] ইমাম মুহাম্মাদ রহ. এবং ইমাম আবু হানীফা রহ.[৪] আলোচ্য মাসআলায় হযরত আয়েশা রাযি.-এর অনুসরণ করেছেন।

---

১. *সহীহ বুখারী*, কিতাবুল জানাইয।
২. *সহীহ বুখারী*, কিতাবুল জানাইয।
৩. *জামে তিরমিযী*, কিতাবুল জানাইয।
৪. *মুয়াত্তা*, ইমাম মুহাম্মাদ রহ., কিতাবুল জানাইয।

২. দ্বিতীয় উদাহরণ

বদর যুদ্ধে নিহতদের কবরের পাশে দাঁড়িয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,

فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا

অর্থ : তোমাদের প্রতিপালক তোমাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তোমরা কি সত্যরূপে পেয়েছ?

সাহাবা কেরাম রাযি. (একটি বর্ণনা অনুযায়ী শুধু হযরত উমর রাযি.) জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল, আপনি মৃতদেরকে ডাকছেন? হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাযি.–খুব সম্ভব হযরত উমর রাযি. এবং আনাস রাযি. মিলে হযরত তালহা রাযি.-কে বলেছেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ কথার উত্তরে বলেছিলেন,

مَا أَنْتُمْ بِأَسْمَعَ مِنْهُمْ وَ لَكِنْ لَّا يُجِيْبُوْنَ

অর্থ : তোমরা তাদের থেকে বেশি শুনতে পাও না; কিন্তু তারা উত্তর দেয় না।

হযরত আয়েশা রাযি. যখন এই বর্ণনাটি শুনলেন, তখন বললেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসলে এটা বলেননি; তিনি বলেছেন,

إِنَّهُمْ لَيَعْلَمُوْنَ الْآنَ أَنَّ مَا كُنْتُ أَقُوْلُ لَهُمْ حَقٌّ

অর্থ : তারা এখন নিশ্চিতভাবে জানতে পারছে যে, আমি তাদের যা বলতাম তা সত্য ছিল।

এরপর হযরত আয়েশা রাযি. নিম্নোক্ত আয়াতটি তেলাওয়াত করলেন,

إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ

অর্থ : হে নবী, আপনি তো মৃতদের শোনাতে পারেন না। ... (সূরা নাম্‌ল, আয়াত : ৮০)

وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّنْ فِي الْقُبُورِ

অর্থ : যারা কবরে আছে, আপনি তাদের শোনাতে পারবেন না। (সূরা ফাতির, আয়াত : ২২)

হাদীসবিশারদগণ হযরত আয়েশা রাযি.-এর যুক্তি মেনে নিয়ে বর্ণনা দুটোর মধ্যে সমন্বয়সাধনের চেষ্টা করেছেন। তাবেঈ কাতাদাহ রহ. বলেন, সামান্য সময়ের জন্য আল্লাহ তাদের জীবিত করেছিলেন।[১] অর্থাৎ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মানার্থে মুজিযাস্বরূপ মৃত কাফেরদের শ্রবণ-শক্তি ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

৩. তৃতীয় উদাহরণ

লোকজন হযরত আয়েশা রাযি.-কে এসে বলল, হযরত আবু হুরায়রা রাযি. বলছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কুলক্ষুণে তিনটি বস্তু : নারী, ঘোড়া, ঘর। হযরত আয়েশা রাযি. বললেন, এটা ঠিক নয়; আসলে হযরত আবু হুরায়রা রাযি. কিছু কথা শুনেছেন, কিছু কথা শোনেননি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথম অংশ বলে ফেলার পর আবু হুরায়রা রাযি. এসেছিলেন। তিনি মূলত বলেছেন—ইহুদিরা বলে, কুলক্ষুণে তিনটি বস্তু : নারী, ঘোড়া ও ঘর।[২]

ইমাম আহমাদ রহ. *মুসনাদে* লিখেছেন, জনৈক ব্যক্তি হযরত আয়েশা রাযি.-এর কাছে এসে আবেদন করল, আমাকে কিছু হাদীস শোনান। তখন হযরত আয়েশা রাযি. বললেন, মন্দাভ্যাস মন্দভাগ্য থেকে আসে।[৩] তবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুভ লক্ষণ ও সুন্দর নাম অবশ্যই পছন্দ করতেন। অন্য একটি বর্ণনায় আছে, হযরত আয়েশা রাযি. যখন হযরত আবু হুরায়রা রাযি.-এর বর্ণনা শুনলেন, তখন বললেন, শপথ আল্লাহর, যিনি আবুল কাসেম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর কুরআন অবতীর্ণ করেছেন—রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

---

১. বর্ণনাগুলো *সহীহ বুখারী*, বদর যুদ্ধের আলোচনায় আছে।

২. *আবূ দাউদ*। *তয়ালিসি* : মুসনাদে আয়েশা রাযি.।

৩. *মুসনাদে আহমাদ* : ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা : ১৩০।

কখনোই এভাবে বলেননি। এরপর তিনি এই আয়াতটি তেলাওয়াত করলেন :

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا

অর্থ : জমিনে এবং তোমাদের জীবনে যে বিপদই আসে, সবই কিতাবে—ভাগ্যের খাতায়—লিপিবদ্ধ, আমি তা ঘটানোর আগে থেকেই। (সূরা হাদিদ, আয়াত : ২২)

কিছু কিছু বর্ণনা এমনও আছে, যাতে হযরত আয়েশা রাযি. এবং হযরত আবু হুরায়রা রাযি.-এর বর্ণনার মধ্যে সামঞ্জস্যবিধান হয়। যেমন একটি বর্ণনায় আছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একথা বলেননি যে, এই তিনটি অলক্ষুণে; বরং তিনি বলেছেন, যদি অশুভ কিছু থাকত তা হলে এই তিনটি জিনিসেই থাকত। অর্থাৎ এটা বাস্তব উক্তি নয়, অবাস্তব সম্ভাব্যতাভিত্তিক উক্তি।

৪. চতুর্থ উদাহরণ

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি.-এর একটি বর্ণনা আছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুই বার তাঁর প্রভুর দর্শন লাভ করেছেন। তাবেঈ মাসরুক রহ. হযরত আয়েশা রাযি.-এর কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, আম্মাজান, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি সত্যিই আল্লাহকে দেখেছেন? হযরত আয়েশা রাযি. বিস্ময়ের স্বরে বললেন, পুত্র, তোমার কথা শুনে আমার গায়ের লোম খাড়া হয়ে গেল। যে তোমাকে এ ধরনের কথা বলেছে, সে অবশ্যই মিথ্যা বলেছে। এরপর তিনি নিম্নোক্ত আয়াতটি তেলাওয়াত করলেন,

لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ

অর্থ : দৃষ্টি-শক্তি তাঁকে ধরতে পারে না; কিন্তু তিনি দৃষ্টি-শক্তিকে ধরতে পারেন। ... (সূরা আনআম, আয়াত : ১০৩)

এরপর তিনি এই আয়াতটি তেলাওয়াত করলেন,

وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ

অর্থ : কোনো মানুষেরই এই শক্তি নেই যে, সে আল্লাহর সঙ্গে কথা বলবে। তবে ওহীর মাধ্যমে, কিংবা পর্দার অন্তরালে। (সূরা শুরা, আয়াত : ৫১)

কিছু কিছু হাদীস থেকেও হযরত আয়েশা রাযি.-এর মতের সমর্থন মেলে। *সহীহ মুসলিমে* এসেছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তো নূর (জ্যোতি), আমি কীভাবে তাঁর দেখা পাব। হাদীসের আরবী ভাষ্য এই : نُورٌ أَنَّىٰ أَرَاهُ

৫. পঞ্চম উদাহরণ

মুতা হলো একটি নির্দিষ্ট সময়ের চুক্তিতে সম্পন্ন বিবাহ। জাহেলি যুগে—এমনকি, ইসলামের শুরুর দিকে, অর্থাৎ সপ্তম হিজরী পর্যন্ত এটা বৈধ ছিল। খায়বার যুদ্ধের সময় প্রথমবারের মতো নিষিদ্ধ হয়। এরপর থেকে বর্ণনাসমূহে কিছুটা ভিন্নতা দেখা যায়। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি.-সহ অনেকে এর বৈধতার কথা বলতেন। কিন্তু অধিকাংশ সাহাবীই এর নিষিদ্ধতা ব্যক্ত করেছেন এবং বিভিন্ন হাদীসের মাধ্যমে তার প্রমাণও করেছেন। একবার এক শিক্ষানবিশ হযরত আয়েশা রাযি.-কে মুতার বৈধতা-সংশ্লিষ্ট বর্ণনাটি সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি এর উত্তর হাদীসের মাধ্যমে দিলেন না; বরং বললেন, আমাদের মাঝে আল্লাহর কিতাব আছে, এরপর তিনি নিম্নোক্ত আয়াতটি তেলাওয়াত করলেন :

...وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ...

অর্থ : ...যারা আপন স্ত্রী ও মালিকানাধীন দাসী ছাড়া অন্যদের থেকে লজ্জাস্থানের হেফাজত করবে... (সূরা মুমিনুন, আয়াত : ৫-৬)

সুতরাং এই দুইটি পদ্ধতি ছাড়া আর কোনো পদ্ধতি বৈধ নয়।[১] মুতা পদ্ধতি এই দুইয়ের কোনোটারই অন্তর্ভুক্ত নয়। কেননা মুতা-কৃত নারী না স্ত্রী, না দাসী।

---

১. *ইসাবা*, সুয়ূতি রহ., হাকেমের উদ্ধৃতিতে।

৬. ষষ্ঠ উদাহরণ

হযরত আবু হুরায়রা রাযি. বর্ণনা করেছেন, জারজ শিশু তিনজনের (জন্মদাতা, জন্মদাত্রী, জারজ) নিকৃষ্ট জন। হযরত আয়েশা রাযি. শুনে বললেন, এটা ঠিক নয়। বাস্তবতা এই যে, এক মুনাফিক ছিল, সে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে গালমন্দ করত, লোকেরা আরজ করল, হে আল্লাহর রাসূল, সে শুধু মুনাফিকই নয়; জারজও। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, কিন্তু তিনজনের নিকৃষ্টজন সে-ই। অর্থাৎ, সে জারজ হলেও সে তার মা বাবার চাইতেও নিকৃষ্ট। এটা একটা বিশেষ ঘটনার প্রেক্ষিতে বিশেষ কাউকে উদ্দেশ্য করে বলা কথা। এটা সকলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। কেননা আল্লাহ বলেছেন,

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ أُخْرَى

অর্থ : কেউ কারও পাপের বোঝা বহন করবে না। (সূরা আনআম, আয়াত : ১৪৬)

অর্থাৎ অপরাধ মা-বাবার, সন্তান তো নিরপরাধ। সুতরাং সে নিকৃষ্ট হতে যাবে কেন?[১]

গভীর বুঝ ও উপলব্ধি

কিছু কিছু মাসআলায় যে সাহাবা কেরামের মতপার্থক্য দেখা যায়, তা মূলত তাঁদের বুঝশক্তি ও উপলব্ধির পার্থক্যের কারণে। হযরত আয়েশা রাযি. জ্ঞানের গভীর বুঝ ও উপলব্ধিতে আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশেষ করুণাপ্রাপ্ত ছিলেন। আল্লাহপ্রদত্ত এই মহাসম্পদকে কাজে লাগিয়ে হাদীস-শাস্ত্রে তিনি রেখে গেছেন অসামান্য অবদান।

১. প্রথম উদাহরণ

হযরত আবু হুরায়রা রাযি. থেকে একটি গল্প[২] বর্ণিত আছে—জনৈকা মহিলা একটি বিড়ালছানাকে বেঁধে রেখেছিল, সে বিড়ালটিকে খানা-পানি কিছু দিত না; এভাবে একসময় বিড়ালছানাটি মারা গেল; এবং এ কারণে

---

১. *ইসাবা*, সুয়ূতি রহ., হাকেমের উদ্ধৃতিতে।

২. ইবনে উমর রাযি.-এর বর্ণনা অনুযায়ী ঘটনাটি বনী ইসরাইলের।

মহিলাটির আজাব হলো। হযরত আবু হুরায়রা রাযি. একবার হযরত আয়েশা রাযি.-এর সঙ্গে দেখা করতে এলেন। হযরত আয়েশা রাযি. বললেন, তুমিই তো সে না, যে একটি বিড়ালছানার কারণে একটি মহিলাকে আজাব দেওয়ার কথা বলেছ? তিনি বললেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকেই এ কথা শুনেছি। তিনি বললেন, আল্লাহর কাছে একজন মুমিনের দাম এরচেয়ে অনেক বেশি যে, তিনি তাকে একটি বিড়ালছানার কারণে আজাব দেবেন। ওই মহিলা বিড়ালকে কষ্ট দিয়েছিল ঠিকই; কিন্তু জাহান্নামে যাওয়ার কারণ—সে কাফের ছিল। আরে আবু হুরায়রা, যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে কোনো হাদীস বর্ণনা করবে তখন একটু ভেবে বর্ণনা করবে যে, কী বলছ।[১]

২. দ্বিতীয় উদাহরণ

হযরত আবু সাঈদ খুদরি রাযি.-এর মৃত্যু ঘটার উপক্রম হলে তিনি একটি নতুন কাপড় চেয়ে নিয়ে পরিধান করলেন। কারণ জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন, মুসলমান যেই পোশাকে মৃত্যুবরণ করে সেই পোশাকেই তাকে উঠানো হয়। হযরত আয়েশা রাযি. ঘটনাটি জানতে পেরে বললেন, আল্লাহ আবু সাঈদকে রহম করেন, পোশাক দ্বারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বুঝিয়েছেন মানুষের আমল।[২] রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো স্পষ্ট করেই বলে দিয়েছেন যে, কেয়ামতের দিন মানুষ বিবস্ত্র অবস্থায় উঠবে।[৩]

৩. তৃতীয় উদাহরণ

ইসলামের একটি বিধান এই যে, তালাকপ্রাপ্তা নারী ইদ্দতের সময়টুকু স্বামীর ঘরেই অতিবাহিত করবে। কিন্তু ফাতেমা নাম্নী জনৈকা সাহাবীয়া

---

১. *আবু দাউদ*। *তয়ালিসি*, মুসনাদে আয়েশা রাযি.।

২. আরবী বাগধারার প্রয়োগ।

৩. হযরত আবু সাঈদ খুদরি রাযি.-এর ঘটনা *আবু দাউদ*—কিতাবুল জানাইয, এবং *সহীহ ইবনে হিব্বান* ও *মুসতাদরাকে হাকেম*-এ আছে। আর কিয়ামতের দিন বিবস্ত্র অবস্থায় ওঠার কথা অধিকাংশ কিতাবেই আছে। কিন্তু এভাবে প্রত্যাখ্যান ও যুক্তিপ্রদর্শনের বর্ণনাটি এনেছেন ইমাম সুয়ূতি রহ. *আইনুল ইসাবাহ* গ্রন্থে—যারকশি রহ.-এর উদ্ধৃতিতে।

রাযি. একটি ভিন্ন তথ্য দিয়ে দেন। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে ইদ্দতের ভেতরেও স্বামীর ঘর ছেড়ে চলে যাওয়ার অনুমতি দিয়েছিলেন। তিনি একাধিকবার অনেক সাহাবীর কাছে তার এ ঘটনাটি প্রমাণস্বরূপ ব্যক্ত করেন। অনেকে মেনে নিতেন। অনেকে মেনে নিতেন না। ঘটনাক্রমে মারওয়ানের শাসনামলে এ ধরনের একটি পরিস্থিতি সামনে আসে। অনেকে ফাতেমার কথা অনুযায়ী মামলা মেটানোর দাবি জানান। হযরত আয়েশা রাযি. জানতে পেরে ফাতেমার বর্ণনার কঠোর সমালোচনা করেন এবং বলেন, ফাতেমার উচিত নয় যে, সে তার ঘটনা যেখানে-সেখানে বলে বেড়াবে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে অবশ্যই সে অনুমতি দিয়েছিলেন। কিন্তু তার কারণ এই ছিল যে, তার স্বামীর ঘর ছিল অরক্ষিত; দুর্ঘটনা এড়াতেই তাকে এই অনুমতি দেওয়া হয়েছিল।[১]

৪. চতুর্থ উদাহরণ

হযরত আবু হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহর রাহে কষাঘাত বরণ করা আমার কাছে কোনো জারজ শিশুকে আজাদ করার চেয়ে উত্তম। এই বর্ণনা থেকে বোঝা যায়, যদি কোনো জারজ শিশু গোলাম হয়, তা হলে তাকে আজাদ করায় কোনো সওয়াব নেই। হযরত আয়েশা রাযি. যখন কথাটা শুনতে পেলেন, তখন বললেন, আল্লাহ আবু হুরায়রা রাযি.-কে রহম করুন। তিনি ভালো করে শোনেননি, তাই ভালো করে বলেনওনি। প্রকৃত বিষয় হলো, যখন এই আয়াতটি অবতীর্ণ হলো :

فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ

অর্থ : কিন্তু সে তো সে দুর্গম গিরি পাড়ি দেয়নি। জানো, সে দুর্গম গিরি কী? তা হচ্ছে দাসত্বের শৃঙ্খল খুলে দেওয়া। (সূরা বালাদ, আয়াত : ১১-১৩

তখন একজন বলল, আমরা গরিব মানুষ, গোলাম-বাঁদি পাব

---

১. *সহীহ বুখারী* ও *জামে তিরমিযী*—তালাক অংশে।

কোথায়? অন্য একজন বলল, আমাদের কাছে একটা হাবশি বাঁদি আছে, ওকে না হয় অবৈধভাবে বাচ্চা নিতে বলি, তারপর সেই বাচ্চাগুলোকে আজাদ করে দিই। লোকটার এমন অবান্তর কথায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন, আল্লাহর রাহে কষাঘাত বরণ করা, তাও ভালো; কিন্তু অবৈধ পদ্ধতি অবলম্বন করে কোনো জারজ শিশুকে আজাদ করার অনুমতি দেব না।[১]

৫. পঞ্চম উদাহরণ

আবু দাউদ ছাড়া প্রায় সবগুলো সহীহ কিতাবে একটি হাদীস আছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বকরির গোশত খুব পছন্দ করতেন। কিন্তু আয়েশা রাযি. বলেন, বকরির গোশত যে খুব পছন্দ করতেন তা নয়; আসলে তখন গোশত পাওয়াই যেত না; আর এটা সহজে রান্না করা যেত; তাই তিনি এটাই খেতেন।[২]

৬. ষষ্ঠ উদাহরণ

হযরত উমর রাযি.-সহ অনেক সাহাবা কেরাম বর্ণনা করেছেন, ফজর ও আসর নামাযের পর কোনোরকম কোনো নামায পড়া যাবে না। হযরত আয়েশা রাযি. বলেন, আল্লাহ উমর রাযি.-কে রহম করুন! তিনি ভুল বুঝেছেন। আসলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন, সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের সময় কোনো নামায পড়া যাবে না।[৩] ফিকাহবিদগণ এই সময়গুলোতে নামায না পড়ার একটি হেতু নির্ধারণ করেছেন : এ সময় সূর্যপূজারীরা সূর্যের পূজা করে, তাই বিভ্রাট ও অনাকাঙ্ক্ষিত মিল এড়াতে এমন নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ব্যাখ্যাটি যদি সঠিক হয়, তা হলে হযরত আয়েশা রাযি. যথার্থই বলেছেন এবং নিষেধাজ্ঞার প্রকৃত কারণ বুঝেই বলেছেন।

অন্য একটি বর্ণনায় আছে, যদি কারও ফজরের সুন্নাত ছুটে যায়, তা

---

১. *মুসতাদরাকে হাকেম*।

২. *শামায়েলে তিরমিযী*।

৩. *সহীহ বুখারী ও জামে তিরমিযী*—আওকাতুস সালাহ। *মুসনাদে আহমাদ* : ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা : ১২৪।

হলে ফরজের পর পড়ে নেবে।[১] আহলে মক্কা এর ওপরই আমল করেন। আরও কিছু হাদীসে আছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসরের পর দু'রাকাত নামায পড়তেন। হযরত আয়েশা রাযি. বলেন, তিনি কখনোই আমার ঘরে এ নামায ছাড়েননি। কতিপয় সাহাবী ও তাবেঈ এই নামাযটি পড়তেন। আবার অনেক সাহাবী বলতেন, আসলে এটা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিশেষত্ব। আমরা পড়তে পারব না। হযরত উম্মে সালামা রাযি. বর্ণনা করেছেন, তিনি একবার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আসরের পরে নামায পড়তে দেখে জিজ্ঞেস করলেন, এটা কীসের নামায? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যোহরের সুন্নত পড়া হয়নি, এটা সেটার কাযা।

যাই হোক, যুক্তি এবং উল্লিখিত বর্ণনাসমূহের আলোকে বলা চলে, হযরত আয়েশা রাযি.-এর বর্ণনা অধিক বোধগম্য ও ইতিবাচক। কিন্তু হযরত উমর রাযি. অবশ্যই এমন পর্যায়ের কোনো সাহাবী ছিলেন না, যিনি হযরত আয়েশা রাযি.-এর মতো শরীয়তের দাবি ও তাৎপর্য-অনুধাবনে ব্যর্থ হবেন। প্রকৃতপক্ষে, শরীয়তের একটি মূলনীতি এই যে, যখন একটি বিষয় নিষিদ্ধ হয়, তখন সতর্কতামূলকভাবে আগা-গোড়া-অনুষঙ্গ সবই নিষিদ্ধ হয়। আসলে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের মুহূর্তটাই মূল নিষিদ্ধ সময়; কিন্তু সতর্কতামূলকভাবে ফজর ও আসরের নামায-পরবর্তী একটি অনির্দিষ্ট সময়কালের ওপরই নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হয়েছে।

৭. সপ্তম উদাহরণ

হযরত আবু হুরায়রা রাযি. বর্ণনা করেন,

مَنْ لَّمْ يُوْتِرْ فَلَا صَلٰوةَ لَهٗ

অর্থ : যে ব্যক্তি বিতরের নামায পড়ল না, তার কোনো নামাযই হলো না।

হযরত আয়েশা রাযি. শুনে বললেন, আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, এবং এখনো তা খুব ভালো করে

---

১. *তিরমিযী*, কিতাবুস সালাম।

মনে রেখেছি, তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি পাঁচ ওয়াক্ত ফরজ নামায ওযু সহকারে যথাসময়ে ঠিকমতো রুকু-সেজদা করে আদায় করল এবং কোনোটাতে কোনো ঘাটতি রাখল না, সে আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রতিশ্রুতি নিয়ে নিল যে, আল্লাহ তাকে শাস্তি দেবেন না; পক্ষান্তরে যে এতে ঘাটতি করল তার প্রতি আল্লাহর কোনো দায় নেই; তিনি চাইলে তাকে ক্ষমা করে দেবেন, চাইলে শাস্তি দেবেন।[১] হযরত আয়েশা রাযি.-এর বক্তব্যের সারকথা হলো—বিতর যেহেতু পাঁচ ওয়াক্ত ফরজ নামাযের অন্তর্ভুক্ত নয়, সেহেতু ঘটনাক্রমে এটা পড়া না হলে যে তার কোনো নামাযই গ্রহণযোগ্য হবে না—এর অর্থ হলো—সে বিতরের সওয়াব থেকে বঞ্চিত হবে; কিন্তু তার ফরজ নামাযগুলোও যে বাতিল হয়ে যাবে, এবং তাকে সেই সাজা ভোগ করতে হবে—তা নয়।

ব্যক্তিগত অবগতি

স্বীকৃত বিষয়, বন্ধুমহল মানুষের ব্যক্তিগত বিষয় যতটা অবগত হন ঘরের লোকেরা তার চেয়ে বেশি অবগত হন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপাদমস্তক আদর্শ ছিলেন। তাঁর প্রতিটি কর্মই আইনের উৎস। কিন্তু পবিত্র স্ত্রীগণ তাঁর সম্পর্কে যতটা ব্যক্তিগত অবগতি লাভ করেছিলেন, অন্য কারও পক্ষে তা সম্ভব হয়নি। এজন্যই অনেক বিষয়ে সাহাবা কেরাম রাযি. নিজ নিজ জ্ঞান ও বুঝ অনুযায়ী অথবা অন্য কোনো বর্ণনার আলোকে কিছু বলতেন আর হযরত আয়েশা রাযি. ব্যক্তিগত অবগতির কল্যাণে সেগুলোর সংশোধন করে দিতেন। আজ পর্যন্ত এ ধরনের বিষয়গুলোতে হযরত আয়েশা রাযি.-এর কথাই প্রামাণ্য হয়ে আছে।

১. প্রথম উদাহরণ

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাযি. ফতোয়া দিয়েছিলেন, মেয়েদেরকে গোসল করার সময় খোঁপা খুলে চুল ভেজাতে হবে। হযরত আয়েশা রাযি. এ কথা শুনে বললেন, সে এ কথাই বলে দিত যে,

---

১. *আওসাত। তাবরানি।*

মেয়েদেরকে চুলের খোঁপা চেঁছে ফেলতে হবে। আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনেই গোসল করতাম। আমি খোঁপা খুলতাম না।[১]

২. দ্বিতীয় উদাহরণ

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাযি. বলতেন, চুমু খেলে ওযু নষ্ট হয়ে যায়। হযরত আয়েশা রাযি. এ কথা জানতে পেরে বললেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চুমু খাওয়ার পর নতুন করে ওযু করতেন না।[২] এ কথা বলে তিনি মৃদু হেসেছিলেন।

৩. তৃতীয় উদাহরণ

একবার তিনি জানতে পারলেন যে, হযরত আবু হুরায়রা রাযি. বলেছেন, নামাযের মধ্যে পুরুষের সামনে দিয়ে যদি কোনো মহিলা, গাধা বা কুকুর অতিক্রম করে তা হলে নামায নষ্ট হয়ে যাবে। এ কথা শুনে তিনি খুব রেগে গেলেন এবং বললেন, তোমরা আমাদের নারীদেরকে কুকুর আর গাধার সমান করে দিলে! আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে পা ছড়িয়ে শুয়ে থাকতাম, ঘুমিয়ে থাকতাম (ঘরে জায়গা ছিল না) আর তিনি নামায পড়তে থাকতেন। যখন সেজদায় যেতেন, হাত দিয়ে টোকা দিতেন আর আমি পা সরিয়ে নিতাম। তিনি উঠে গেলে আবার পা ছড়িয়ে দিতাম।[৩] অনেক সময় প্রয়োজন হলে শরীর কাত করে সামনে দিয়ে বের হয়ে যেতাম।[৪]

৪. চতুর্থ উদাহরণ

হযরত আবু দারদা রাযি. একদিন ওয়াজের মধ্যে মাসআলা বর্ণনা করলেন, যদি সকাল হয়ে যায় আর বিতর পড়া না হয়, তা হলে এই বিতর আর পড়া যাবে না। এ কথা শুনে হযরত আয়েশা রাযি. বললেন,

---

১. *সহীহ মুসলিম* ও *সুনানে নাসাঈ*। শেষোক্ত বাক্যটি শুধু *নাসাঈ*-তে আছে।
২. *সহীহ বুখারী* ও অন্যান্য।
৩. *সহীহ বুখারী* : ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা : ৭৩, باب التطوع خلف المرأة।
৪. *সহীহ বুখারী* : باب لا يقطع الصلوة شيء و باب السرير।

আবু দারদা রাযি. ঠিক বলেনি। সকাল হয়ে গেলেও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিতর পড়ে নিতেন।[১]

৫. পঞ্চম উদাহরণ

কিছু কিছু লোক বলল, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইয়েমেনি চাদরে কাফন দেওয়া হয়েছিল। এ কথা শুনে হযরত আয়েশা রাযি. বললেন, এটা ঠিক আছে যে তাঁকে কাফন দেওয়ার জন্য ইয়েমেনি চাদর আনা হয়েছিল; কিন্তু সেটা তাঁর কাফনের কাপড় হিসেবে গৃহীত হয়নি।[২]

৬. ষষ্ঠ উদাহরণ

হযরত আবু হুরায়রা রাযি. একদিন ওয়াজের মধ্যে বললেন, যদি কারও রোযার সময় সকালে গোসল করার প্রয়োজন হয় তা হলে সেদিন আর রোযা রাখবে না। লোকেরা হযরত আয়েশা রাযি. (এবং হযরত উম্মে সালামা রাযি.)-এর কাছে গিয়ে কথাটা সত্য কি না জানতে চাইল। তিনি বললেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আমল এমন ছিল না। লোকেরা গিয়ে হযরত আবু হুরায়রা রাযি.-কে আবার জিজ্ঞেস করল। তিনি তখন হযরত আয়েশা রাযি.-এর হাদীস শুনে নিজের কথা ফিরিয়ে নিলেন।[৩]

৭. সপ্তম উদাহরণ

হজে রমঈ (কঙ্কর নিক্ষেপ) ও হালাক (মাথা মুণ্ডানো) করার পর সুগন্ধি ও স্ত্রী-সহবাস ছাড়া সবকিছু বৈধ। হযরত আয়েশা রাযি. বলেন, সুগন্ধি লাগাতেও কোনো সমস্যা নেই। আমি নিজ হাতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সুগন্ধি লাগিয়ে দিয়েছি।[৪]

---

১. *সুনানে বাইহাকী ও মুসনাদে আহমাদ* : ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা : ১৪৩।

২. *সহীহ বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ* : كتاب الجنائز।

৩. *সহীহ মুসলিম ও মুয়াত্তা* : كتاب الصوم।

৪. *সহীহ বুখারী* : কিতাবুল হজ।

৮. অষ্টম উদাহরণ

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি. ফতোয়া দিতেন, যদি কোনো ব্যক্তি হজ না করে শুধু নিজ কুরবানি হেরেমে পাঠিয়ে দেয়, তা হলে যতক্ষণ তা হেরেমে জবেহ না হবে ততক্ষণ সে ব্যক্তির ওপর হজের বিধানসমূহ আরোপিত থাকবে। হযরত আয়েশা রাযি. বলেন, আমি নিজ হাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোরবানির জন্তুগুলোকে কিলাদা পরিয়েছি, তিনি তাঁর পবিত্র হাতে সেগুলোকে কোরবানির পশুপালে পৌঁছে দিয়েছিলেন এবং স্বয়ং আমার পিতা সেগুলোকে মক্কায় নিয়ে গিয়েছিলেন। তখন তো সবকিছুই হালাল ছিল। কোনো কিছুই তো কোরবানি পর্যন্ত হারাম ছিল না।[১]

৯. নবম উদাহরণ

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাযি. বলতেন, যেদিন সকালে হজের ইহরাম বাঁধা হবে, সেদিন সকালে আমি সুগন্ধি লাগানো পছন্দ করি না। বিষয়টি হযরত আয়েশা রাযি.-কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন, আমি নিজ হাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সুগন্ধি লাগিয়ে দিয়েছি। কখনো তিনি বলতেন, আমার খুব ভালো করে মনে আছে, ইহরামের সকালে তাঁর জামার কলারে সুগন্ধির চমক ছিল। আমার খুব ভালো করে মনে আছে।[২]

স্মৃতিশক্তির প্রখরতা

স্মৃতিশক্তির প্রখরতা আল্লাহপ্রদত্ত একটি বিশেষ গুণ। হযরত আয়েশা রাযি.-কে মহান আল্লাহ এ গুণেও গুণান্বিত করেছিলেন বিশেষভাবে। আমরা জেনেছি, ছোটবেলা সখীদের সঙ্গে খেলার সময়ও যে আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছিল সেটিও তাঁর স্মরণ ছিল। হাদীস-শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভে মুখ্যত স্মৃতিশক্তির প্রখরতারই প্রয়োজন হয়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনকালের দৈনন্দিন ঘটনাগুলো স্মরণ রাখা, সেগুলো সর্বদা একই রকম বিবৃত করা, তাঁর পবিত্র জবানে যে শব্দগুলো যেভাবে

---

১. *সহীহ বুখারী* : কিতাবুল হজ।

২. *সহীহ বুখারী* : কিতাবুল হজ। *ফাতহুল বারী* : ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা : ৩১৫।

উচ্চারিত হয়েছে হুবহু সেভাবেই উল্লেখ করা—একজন মুহাদ্দিসের সবচেয়ে বড় গুণ। উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা রাযি. সমসাময়িকদের বর্ণনার যে সমালোচনাগুলো করতেন তাতে স্মৃতিশক্তির পার্থক্যভেদ ও প্রভাবকের কাজ করেছে।

১. প্রথম উদাহরণ

হযরত সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রাযি. মৃত্যুবরণ করলে হযরত আয়েশা রাযি. চাইলেন, জানাযা মসজিদে করা হোক, তা হলে তিনিও জানাযা পড়তে পারবেন। লোকজন আপত্তি করলেন। তিনি বললেন, মানুষ কত তাড়াতাড়ি ভুলে যায়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহল ইবনে বায়যা রাযি.-এর জানাযা মসজিদেই পড়েছিলেন।[১]

২. দ্বিতীয় উদাহরণ

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাযি.-কে লোকেরা জিজ্ঞেস করল, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কতবার উমরা করেছিলেন? তিনি উত্তর দিলেন, চারবার, এর মধ্যে একটি ছিল রজব মাসে। উরওয়াহ ডাক দিয়ে বললেন, খালাজান, আপনি শুনেছেন ইনি কী বলেন? জিজ্ঞেস করলেন, কী বলেন? তিনি আরজ করলেন, ইনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নাকি চারবার উমরা করেছিলেন এবং এর মধ্যে একটি করেছিলেন রজব মাসে। হযরত আয়েশা রাযি. আরজ করলেন, আল্লাহ আবু আবদির রহমানকে (ইবনে উমর রাযি.-এর কুনিয়ত) রহম করুন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন কোনো উমরা করেননি, যাতে তিনি সঙ্গে ছিলেন না; রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনোই রজব মাসে উমরা করেননি।[২]

৩. তৃতীয় উদাহরণ

হযরত ইবনে উমর রাযি. হাদীসের দরসে বললেন, আরবী মাস উনত্রিশ দিনে হয়। আলোচনা প্রসঙ্গে কথাটি হযরত আয়েশা রাযি.-এর

---

১. *সহীহ মুসলিম* : কিতাবুল জানাইয।

২. *সহীহ বুখারী* : كتاب العمرة।

দরসেও উঠল। লোকেরা হযরত ইবনে উমর রাযি.-এর বর্ণনাটি উল্লেখ করলেন। তখন হযরত আয়েশা রাযি. বললেন, আল্লাহ ইবনে উমর রাযি. -কে রহম করুন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কথাটি এভাবে বলেছিলেন যে, চন্দ্রমাস কখনো উনত্রিশ দিনেও হয়।[১]

৪. চতুর্থ উদাহরণ

কয়েকজন সাহাবী রাযি. বর্ণনা করলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, স্বজনদের কান্নাকাটিতে মৃতের শাস্তি হয়। লোকেরা হযরত আয়েশা রাযি.-কে বিষয়টি অবহিত করলে তিনি বললেন,

إِنَّكُمْ لَتُحَدِّثُوْنَ مِنْ غَيْرِ كَاذِبِيْنَ وَ لَا مُكَذَّبِيْنَ وَ لَكِنَّ السَّمْعَ يُخْطِئُ

অর্থ : তোমরা যাদের থেকে বর্ণনা করছ, তারা না মিথ্যা বলেছেন, আর না তাদেরকে মিথ্যাবাদী বলা যায়; কিন্তু মানুষ শুনতে ভুল করে।

অন্য একটি বর্ণনায় আছে,

رَحِمَ اللهُ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ سَمِعَ شَيْئًا فَلَمْ يَحْفَظْ

অর্থ : আল্লাহ আবু আবদির রহমানকে রহম করুন, তিনি হাদীসটি শুনেছেন, কিন্তু ধরে রাখতে পারেননি।

আরও একটি হাদীসে এ রকম বাক্য পাওয়া যায় :

يَغْفِرُ اللهُ لِأَبِيْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَمَا إِنَّهُ لَمْ يَكْذِبْ وَ لَكِنَّهُ نَسِيَ أَوْ أَخْطَأَ

অর্থ : আল্লাহ আবু আবদির রহমানকে ক্ষমা করুন। শোনো, তিনি মিথ্যা বলেননি; কিন্তু তিনি ভুলে গেছেন, অথবা ভুল করেছেন।

এরপর তিনি বললেন, প্রকৃত ঘটনা এই যে, একবার এক ইহুদি মহিলা মারা গেল, লাশ সামনে নিয়ে স্বজনরা বিলাপ করছিল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে দেখে বললেন, এদিকে এরা কাঁদছে, ওদিকে মহিলাটির আজাব হচ্ছে।[২]

---

১. *মুসনাদে আহমাদ* : ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা : ২৪৩।

২. সবগুলো হাদীস *সহীহ মুসলিম*, কিতাবুল জানাইয অংশে আছে।

হযরত আয়েশা রাযি.-এর হাদীস সংরক্ষণ ও সংকলন

সাহাবা কেরাম রাযি.-এর বর্ণনাসমূহ লিপিবদ্ধকরণ শুরু হয় হিজরী প্রথম শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে। হিজরী সনের একশো বছর পূর্তি লগ্নে হযরত উমর ইবনে আবদুল আজিজ রহ. প্রকৃত ইসলামী খেলাফতের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন। ওই সময় মদীনার বিচারবিভাগে দায়িত্বরত ছিলেন আবু বকর ইবনে আমর ইবনে হাযাম আল আনসারি রহ.। ইলমে ওহী ও নববী জ্ঞানে এই মানুষটিই তখন ভাস্বর হয়ে ছিলেন পুরো ইসলামী জাহানে। কিন্তু যাঁর আলোয় তিনি এতটা আলোকিত হয়েছিলেন তিনি হলেন—হযরত উমরাহ, হযরত আয়েশা রাযি.-এর পোষ্যকন্যা; তাঁর জীবনে যত প্রাপ্তি ও অর্জন ছিল উম্মুল মুমিনীনের প্রতিপালনেরই কল্যাণে। হযরত উমর ইবনে আবদুল আজিজ রহ.-এর শাহি ফরমানে হযরত উমরাহর যাবতীয় বর্ণনা লিপিবদ্ধ করার প্রয়াস পান হযরত আবু বকর ইবনে হাযাম আল আনসারি রহ.।[১]

১. *তাবাকাতে ইবনে সাদ* : ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা : ১৩৬। *তাহযিব* : جزء النساء ، ترجمة عائشة।

ফিকহ্ ও কিয়াস

ইসলামী ধর্মতত্ত্বে গবেষণার মূল সূত্র হলো কিতাব ও সুন্নাহ। আর সেই সূত্র ধরে সমাধান বের করার নাম ফিকহ। কুরআন মাজীদ, হাদীস শরীফ, ফতোয়া, ইরশাদ–শীর্ষক অধ্যায়গুলোতে যে পর্যালোচনা এসেছে এবং আসতে যাচ্ছে তা থেকে প্রতিভাত হয়, ফিকহ-শাস্ত্রে উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা রাযি.-এর দখল কতটা জোরালো ছিল এবং কিয়াস ও বিবেচনায় তাঁর মূলনীতিগুলো কতটা বলিষ্ঠ ও সংহত ছিল।

ফিকহ্-শাস্ত্রের প্রাথমিক ইতিহাস

নববী যুগ পর্যন্ত স্বয়ং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-ই ছিলেন ইলম ও ফতোয়ার মারকায। এই পবিত্র যুগটি অতিবাহিত হওয়ার পর বড় বড় সাহাবা কেরাম রাযি. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্থলাভিষিক্ত হন। কেননা তাঁরাই ছিলেন দীন ও শরীয়তের নিত্য সহচর এবং ইসলামী আহকামের একান্ত আপনজন। হযরত আবু বকর রাযি. এবং হযরত উমর রাযি.-এর সামনে যখন কোনো নতুন মাসআলা আসত, তখন তাঁরা সকল বিজ্ঞ সাহাবীকে একত্রিত করতেন এবং তাঁদের পরামর্শ গ্রহণ করতেন। যদি তাঁদের মধ্যে কারও কোনো বিশেষ হাদীস জানা থাকত, তা হলে তিনি তা বর্ণনা করতেন। না হলে সুবিদিত বিধি মোতাবেক বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হতো। ফিকহের এই একাডেমি তৃতীয় খেলাফতের প্রথমার্ধ পর্যন্ত মারকাযে নবুওয়াতকে কেন্দ্র করে পরিচালিত হয়। এরপর হযরত উসমান রাযি.-এর শাসনামলের দ্বিতীয়ার্ধে একের পর এক গোলযোগ ও বিশৃঙ্খলা মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে শুরু করে। লোকজন মক্কা মুআযযামা, তায়েফ, দামেশক ও বসরায় গিয়ে

আবাস গড়তে শুরু করেন। হযরত আলী রাযি. কুফা নগরীকে দারুল খেলাফত মনোনীত করেন। ইত্যাকার নানাবিধ কারণে দরসে নববী থেকে দীক্ষিত সাহাবীগণ বিভিন্ন শহরে ছড়িয়ে পড়েন। অনভিপ্রেত ঘটনাগুলো জ্ঞান-চর্চার ভৌগোলিক পরিধিকে বিস্তৃত করলেও সার্বিক মাহাত্ম্য ধরে রাখতে পারেনি। এ মাহাত্ম্য, এ আভিজাত্য যদি কোথাও থেকেও থাকত, তা হলে তা সেই নববী-নীড়ের চার দেয়ালের মাঝেই।

আকাবিরে সাহাবার তিরোধানের পর মদীনা তাইয়্যেবায় হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাযি., হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি., হযরত আবু হুরায়রা রাযি. এবং উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা রাযি. মাত্র এই চার মহিমান্বিত ব্যক্তিই ফিকহ ও ফতোয়ার মসনদে সমাসীন ছিলেন। গায়রে মানসুস আহকাম—অর্থাৎ যেসব সমস্যার সমাধান কিতাব ও সুন্নাহয় সরাসরি ব্যক্ত হয়নি—উদ্ঘাটনে তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গিগত পার্থক্য ছিল। হযরত ইবনে উমর রাযি. এবং হযরত আবু হুরায়রা রাযি. উত্থাপিত সমস্যায় যদি কিতাব, সুন্নাহ ও হাদীস থেকে কোনো সমাধান পেতেন, তা হলে জিজ্ঞাসুকে জানিয়ে দিতেন; কিন্তু কোনো আয়াত, হাদীস বা পূর্ববর্তী সাহাবা কেরাম—বিশেষত খোলাফায়ে রাশেদীন—থেকে কোনো বাণী না পেতেন তা হলে অপরাগতা প্রকাশ করতেন। পক্ষান্তরে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি. এরকম ক্ষেত্রে কিয়াস তথা বিবেচনার আশ্রয় নিতেন। তিনি কিতাব ও সুন্নাহর সুবিদিত বিষয়গুলোর আলোকে নিজের উপলব্ধি ও দক্ষতা অনুসারে সমাধান দিতেন।[১]

হযরত আয়েশা রাযি.-এর ফিকহের মূলনীতিমালা

কুরআন মাজীদ থেকে উদ্ঘাটন

হযরত আয়েশা রাযি. যে কোনো বিষয়ে ধর্মীয় অনুশাসন-উদ্ঘাটনে সর্বপ্রথম কুরআন মাজীদে মনোনিবেশ করতেন। যদি এতে ব্যর্থ হতেন তা হলে হাদীসে মনোযোগী হতেন। এভাবে পর্যায়ক্রমে কিয়াস ও বিবেচনার আশ্রয় নিতেন। হাদীসসংক্রান্ত আলোচনায় আমরা দেখেছি,

---

১. *তাবাকাতে ইবনে সাদ*-সহ অন্যান্য জীবনীগ্রন্থে আলোচ্য ব্যক্তিবৃন্দের বৃত্তান্ত দ্রষ্টব্য।

জনৈক শাগরেদ মুতা বিবাহ সম্পর্কে জানতে চাইলে হযরত আয়েশা রাযি. নিম্নোক্ত আয়াতের আলোকে এর নিষিদ্ধতা প্রমাণিত করেন :[১]

...وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ...

অর্থ : ...যারা আপন স্ত্রী ও মালিকানাধীন দাসী ছাড়া অন্যদের থেকে লজ্জাস্থানের হেফাজত করবে... (সূরা মুমিনুন, আয়াত : ৫-৬)

অর্থাৎ মুতা-কৃত নারী না-স্ত্রী, না-দাসী।

জনৈক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলেন, অনারবরা তাদের ধর্মীয় উৎসবের দিনে যে জন্তু জবেহ করে তা খাওয়া কি বৈধ হবে? হযরত আয়েশা রাযি. বললেন, শুধু সেই দিনই যে জন্তু জবেহ করা হয়, তা খাওয়া বৈধ হবে না।[২] খুব সম্ভব, নিম্নোক্ত আয়াতটির ভিত্তিতে তিনি এ সমাধান দিয়েছিলেন।

وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ

অর্থ : আর যে জন্তু গায়রুল্লাহর নামে জবেহ করা হয়, তা তোমাদের আহার করা হারাম। (সূরা বাকারা, আয়াত : ১৭৩)

হযরত যায়েদ ইবনে আরকাম রাযি. জনৈকা মহিলার কাছ থেকে আটশো মুদ্রায় বাকিতে একটি বাঁদি খরিদ করেন, সঙ্গে সঙ্গে শর্ত করেন, ওযিফা পেলে মূল্য পরিশোধ করে দেব। কিন্তু এরই মধ্যে তিনি ওই মহিলার কাছেই ওই বাঁদিই নগদ ছয়শো মুদ্রায় বিক্রি করেন। মহিলাটি এই লেনদেনের কথা হযরত আয়েশা রাযি.-কে অবগত করেন। হযরত আয়েশা রাযি. বলেন, তুমিও অন্যায় করেছ, যায়েদ ইবনে আরকাম রাযি.-ও অন্যায় করেছেন। তাকে গিয়ে বলো, তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়সাল্লামের সঙ্গে থেকে যুদ্ধ করে যে সওয়াব অর্জন করেছিলেন, সবই বরবাদ হয়ে যাবে—যদি তওবা না করেন।

---

১. *আইনুল ইসাবা*, সুয়ূতি রহ., হাকেমের উদ্ধৃতিতে।
২. *তাফসীর ইবনে কাসির* রহ. (কুরতুবির উদ্ধৃতিতে)।

তাৎপর্য এই যে, হযরত আয়েশা রাযি. আলোচ্য সমস্যায় অতিরিক্ত দুইশো মুদ্রাকে সুদ বিবেচনা করেছেন। কিছু কিছু হাদীসে ঘটনাটি এটুকুই বিবৃত হওয়ায় একটু দ্বিধান্বিত হতে হয় যে, ঠিক কীভাবে তিনি এই সিদ্ধান্তটি দিলেন। কিন্তু *মুসান্নাফে আবদুর রাযযাক* ও *সুনানে দারাকুতনী*র অন্য একটি বর্ণনায় বিষয়টি সুস্পষ্ট হয়। তিনি মূলত নিম্নোক্ত আয়াতটির ভিত্তিতে[১] এই সিদ্ধান্তটি দিয়েছিলেন—যা সুদের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করতে অবতীর্ণ হয় :

فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ

অর্থ : সুতরাং যে আপন প্রতিপালকের পক্ষ থেকে উপদেশপ্রাপ্ত হলো এবং (এ গর্হিত কাজ থেকে) ফিরে এল, সে ততটুকুই পাবে যতটুকু সে দিয়েছে। (সূরা বাকারা, আয়াত : ১৭৫)

কুরআন মাজীদে আছে, তালাকের পর নারী তিন 'কুরু' পর্যন্ত অপেক্ষা করবে; অর্থাৎ তার ইদ্দতের মেয়াদ তিন কুরু। কুরু অর্থ কী এ নিয়ে মতভেদ আছে। হযরত আয়েশা রাযি.-এর ভাতিজিকে তার স্বামী তালাক দিয়েছিলেন। তিনি ভাতিজিকে স্বামীর ঘর থেকে ফেরত আনলেন তিনটি পবিত্রতা-কাল পার হওয়ার পরই। এ নিয়ে অনেকে আপত্তি করল। তারা বলল, এটা কুরআনের পরিপন্থী। তারা 'তিন কুরু'-র আয়াতটিকে প্রমাণ হিসেবে পেশ করল। হযরত আয়েশা রাযি. বললেন, 'তিন কুরু'-র আয়াত ঠিকই আছে; কিন্তু 'কুরু' অর্থ কী, সেটা তোমরা জানো না। 'কুরু' অর্থ হলো তুহুর—অর্থাৎ দুই ঋতুর মধ্যবর্তী পবিত্রতা-কাল। ইমাম মালেক রহ. তাঁর শায়খগণের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন,[২] আলোচ্য মাসআলায় মদীনার সকল ফকীহ হযরত আয়েশা রাযি.-এর অনুসরণ করতেন। পক্ষান্তরে ইরাকের লোকেরা 'কুরু' বলতে বুঝতেন হায়েয—অর্থাৎ ঋতু-কাল।

---

১. *মুসনাদে আহমাদ*, *মুসান্নাফে আবদুর রাযযাক*, *সুনানে বাইহাকী*, *সুনানে দারাকুতনী* : কিতাবুল বুয়ু। অনেকে হাদীসটি প্রথম রাবী-কে مجهول (অজ্ঞাত) বলেছেন; কিন্তু দাবিটি সঠিক নয়।

২. *মুয়াত্তা*, ইমাম মালেক রহ.। কিতাবুত তালাক দ্রষ্টব্য।

হাদীস শরীফ থেকে উদ্ঘাটন

কুরআন মাজীদের পর হাদীস শরীফের অবস্থান। একবার একটি মাসআলা দেখা দিল, যদি কোনো স্বামী তার স্ত্রীকে তালাক গ্রহণের ইচ্ছাধিকার দেয়, আর স্ত্রী সেই ইচ্ছাধিকার গ্রহণ না করে স্বামীকেই গ্রহণ করে, তা হলে স্ত্রীর ওপর কোনো তালাক আপতিত হবে কি না? হযরত আলী রাযি. এবং হযরত যায়েদ রাযি.-এর দৃষ্টিতে এক তালাক আপতিত হবে। কিন্তু হযরত আয়েশা রাযি. বলেন, এ অবস্থায় কোনো তালাকই আপতিত হবে না। তিনি তাঁর সমাধানের পক্ষে তাখঈরের ঘটনাটি তুলে ধরেন। মহান আল্লাহ পবিত্র স্ত্রীগণকে ইচ্ছাধিকার দিয়েছিলেন—তাঁরা ইচ্ছা করলে পার্থিব সুখ-শান্তি গ্রহণ করতে পারেন, ইচ্ছা করলে নবীপরিবারের অভাব-অনটন বরণ করতে পারেন। পবিত্র স্ত্রীগণ সকলে দ্বিতীয় বিকল্পটিই গ্রহণ করেছিলেন। পবিত্র স্ত্রীগণের কারও ওপর এক তালাকও আপতিত হয়নি।[১]

মনিব যদি গোলামকে আজাদ করে দেন, তা হলে মনিব ও গোলামের মধ্যে এক ধরনের অভিভাবকত্ব স্থাপিত হয়। এই অভিভাবকত্বের ফলে উত্তরাধিকারও সাব্যস্ত হয়। এমনকি, গোলামকে মনিবের বংশীয় বিবেচনা করে আইনি সম্মানও প্রদান করা হয়। এ কারণে গোলাম ও মনিবের অভিভাবকত্বের বিষয়টি তৎকালীন সময়ে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ছিল। যাই হোক, এক গোলাম এসে বলল, আমি উতবা ইবনে আবু লাহাবের গোলাম ছিলাম। তারা স্বামী-স্ত্রী আমাকে বেচে দিয়েছিল। কিন্তু শর্ত করেছিল, আমার অভিভাবকত্ব-সম্বন্ধ থাকবে তাদের সঙ্গে। এখন আমার সম্বন্ধটি কার সঙ্গে হবে? হযরত আয়েশা রাযি. বললেন, বারীরাহ রাযি.-এর ঘটনাটা এমনই ছিল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলেছিলেন, বারীরা রাযি.-কে খরিদ করে আজাদ করে দাও। অভিভাবকত্ব তোমারই থাকবে। ক্রেতা-বিক্রেতা যত অবৈধ শর্তই আরোপ করুক না কেন।[২]

---

১. *সহীহ বুখারী* : باب من خير نسائه ।

২. *সুনানে বাইহাকী* : كتاب البيوع ।

হযরত বারীরাহ্ রাযি. একজন দাসী ছিলেন। তার আগের মনিব এই শর্তে তাকে বিক্রি করতে রাজি হয়েছিল যে, অভিভাবকত্ব-সম্বন্ধ থাকবে তার সঙ্গে। বারীরাহ্ রাযি. হযরত আয়েশা রাযি.-এর কাছে আসেন এবং বিষয়টি ব্যক্ত করেন। তিনি কিনতে রাজি হন; কিন্তু শর্তটা মেনে নিতে পারছিলেন না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘরে এলে বিষয়টি উত্থাপন করলেন। তিনি বললেন, নির্দ্বিধায় কিনে ফ্যালো এবং আজাদ করে দাও। অবৈধ শর্ত আপনা-আপনি হাওয়া হয়ে যাবে। হযরত বারীরাহ্ রাযি. আজাদ হয়ে গেলেন। এরপর দাসী অবস্থায় যে স্বামীর অধীনে ছিলেন তাকে ত্যাগ করলেন। লোকে তাকে সদকা করত, তিনি সেগুলো গ্রহণ করতেন। কখনো কখনো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকেও কিছু খেতে দিতেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই খাবার ফেরত দিতেন না।

এ বিষয়গুলো থেকে হযরত আয়েশা রাযি. কিছু মূলনীতি নির্ধারণ করেছিলেন। তিনি বলতেন, বারীরাহ্ রাযি.-এর ওসিলায় ইসলামে তিনটি বিধান সুবিদিত হয়েছে :[১]

১. অভিভাবকত্ব থাকবে আজাদকারীর সঙ্গে।

২. দাসী থাকাকালে যদি কোনো বাঁদির বিবাহ হয় এবং পরে বাঁদি আজাদ হয় তা হলে দাস স্বামীর অধীনে থাকা না থাকার ইচ্ছাধিকার তার হাতে।

৩. যদি সদকার হকদার ব্যক্তি কোথাও থেকে সদকা পেয়ে সদকার হকদার নয় এমন কাউকে সেটা হাদিয়া দেয়, তা হলে সেটা গ্রহণ করা সেই ব্যক্তির জন্য বৈধ হবে; অর্থাৎ মালিকানা পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বস্তুটির গুণগত পরিবর্তনও ঘটবে।

হযরত আয়েশা রাযি. কর্তৃক কিছু কিছু ইসতিমবাত বা উদ্ঘাটন এমন আছে, যেগুলোর ব্যাখ্যা বা বিশদ বিবরণ তিনি নিজে দেননি। কিন্তু তাঁর ফতোয়ার ধারাবাহিকতায় সেগুলোর প্রতি ইঙ্গিত হয়ে গেছে। ধর্মতত্ত্ববিদ

---

১. *সহীহ বুখারী* : باب الحرة تكون تحت العبد।

ও গবেষকগণ সেগুলোর ওপর ভিত্তি করে বড় বড় ইমারত গড়ে তুলেছেন। বিদায় হজে প্রায় এক লাখ মুসলমান রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়সাল্লামের সঙ্গে ছিলেন। বড় বড় সাহাবা কেরামও ছিলেন। এই সফরে যত কিছু ঘটেছিল সকলে সবই মনে রেখেছিলেন। হযরত আয়েশা রাযি.-ও নিজের ঘটনাগুলো সংরক্ষণ করেছিলেন। হাদীসগ্রন্থগুলোতে সবই আগাগোড়া স্থান পেয়েছে। কিন্তু হযরত আয়েশা রাযি. যে ঘটনাগুলো বর্ণনা করেছেন সেগুলো ফিকাহ-শাস্ত্রের মূলনীতিমালার অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে। হযরত আয়েশা রাযি. হজের সফরে বিশেষ কারণে (মেয়েলি ওজরে) অপারগ হয়ে পড়েছিলেন। এজন্য তিনি খুবই মর্মাহত হয়েছিলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে সান্ত্বনা দিয়েছিলেন। তাঁর নির্দেশে তিনি তানঈমে গিয়ে নতুন করে ইহরাম বাঁধেন এবং তাওয়াফ করেন।[১] হাফেজ ইবনে কাইয়ুম রহ. এই ঘটনাটি বর্ণনা করে লিখেছেন,

وَ حَدِيْثُ عَائِشَةَ هَذَا يُؤْخَذُ مِنْهُ أُصُوْلٌ عَظِيْمَةٌ مِّنْ أُصُوْلِ الْمَنَاسِكِ

অর্থ : হযরত আয়েশা রাযি.-এর হাদীসটি থেকে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ মাসআলার উদ্ঘাটন হয়। যেমন :

১. যে ব্যক্তি এক সঙ্গে হজ ও উমরা দুটোই করবেন (কেরান হজ), তার জন্য হজ ও উমরার মাঝখানে একটি তাওয়াফ ও একটি সাঈ-ই যথেষ্ট হবে।

২. মাসিকের কারণে নারীদের থেকে তাওয়াফুল কুদুম রহিত হয়ে যায়।

৩. ঋতুবতী নারীর জন্য হজের পর উমরার নিয়ত করা জায়েয আছে।

৪. ঋতুবতী নারী কাবা শরীফের তাওয়াফ ছাড়া হজের সকল বিধান পালন করতে পারবে।

৫. তানঈম হেরেমের অন্তর্ভুক্ত নয়। হিল্লের অন্তর্ভুক্ত।

---

১. *মুয়াত্তা*, ইমাম মালেক রহ. : إفاضة الحائض।

৬. উমরা এক বছরে দুটো, বরং এক মাসেও দুটো করা যেতে পারে।

৭. তামাত্তু হজকারী (অর্থাৎ যিনি হজ ও উমরার আলাদা আলাদা নিয়ত করেছেন) যদি উমরা ছুটে যাওয়ার আশঙ্কা করেন, তা হলে হজের পর উমরা আদায় করে নিতে পারেন।

৮. উমরায়ে মাক্কিয়্যাহর বৈধতার প্রমাণ শুধুমাত্র এই হাদীসটিই।

হযরত সাফিয়্যা রাযি.-এর একটি ঘটনা আছে। তিনি হজে আখেরি তাওয়াফে অপারগ হয়ে পড়লেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মাসআলা জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, এর পূর্বে তাওয়াফ করোনি? হযরত আয়েশা রাযি. এই ঘটনা থেকে উদ্ঘাটন করেছেন, বিদায়ি তাওয়াফ জরুরি নয়, এবং মাজূর নারীগণ এ নির্দেশের বাইরে। এ কারণে যেসব মহিলা হযরত আয়েশা রাযি.-এর সঙ্গে হজে যেতেন, তারা এই মাসআলা অনুযায়ীই আমল করতেন।

কিয়াসে আকলী বা বিবেচনাকে কাজে লাগানো

কুরআন ও হাদীসের পর কিয়াসে আকলীর অবস্থান। কিয়াসে আকলীর অর্থ এই নয়, যে কেউ নিজের খেয়াল-খুশিমতো শরীয়তের বিধান রচনা করবে; বরং কিয়াসে আকলীর অর্থ এই যে, বিদগ্ধ আলেমগণ, যারা শরীয়তের মর্ম অনুধাবন করতে পেরেছেন, ধর্মীয় বিধি-নিষেধে অগাধ পাণ্ডিত্য ও ব্যুৎপত্তি অর্জন করেছেন, কিতাব ও সুন্নাহর চর্চা ও গবেষণা করতে করতে তাঁদের মধ্যে এমন অভিজ্ঞতা হয়ে যায় যে, তাঁদের সামনে যখন কোনো নতুন সমস্যা উত্থাপিত হয়, তখন তাঁরা কিতাব ও সুন্নাহর পূর্ব অভিজ্ঞতার আলোকে উপলব্ধি করতে পারেন যে, যদি শরীয়ত-প্রণেতা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বেঁচে থাকতেন, তা হলে কী সমাধান দিতেন। এর একটি সুন্দর উদাহরণ হলো, কোনো যোগ্য ও অভিজ্ঞ উকিল কোনো বিশেষ আদালতের মামলা-মোকদ্দমায় এত কাজ করেছেন যে, পূর্ব অভিজ্ঞতার ওপর ভিত্তি করে কোনো নতুন মোকদ্দমার ব্যাপারে তিনি আগেই সিদ্ধান্ত জানাতে পারেন যে, যদি এই আদালতে এই মোকদ্দমা পেশ হয়, তা হলে এই রায় আসবে। শরীয়তের

এরকম হাজারও মোকদ্দমায় হযরত আয়েশা রাযি. ওকালতি করেছেন এবং কখন কোন রায় কেন এসেছে সবই নখদর্পণে রেখেছেন। তাই তাঁর কিয়াসে আকলী তথা বিবেচনা ও সিদ্ধান্ত খুব কমই ভ্রান্তির শিকার হয়েছে।

১. প্রথম উদাহরণ

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জামানায় নারীগণ সাধারণত মসজিদে আসতেন এবং জামাতের নামাযে অংশগ্রহণ করতেন। পুরুষদের পেছনে শিশুদের, এবং শিশুদের পেছনে নারীদের কাতার হতো। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাধারণ নির্দেশ দিয়ে রেখেছিলেন, কেউ যেন নারীদের মসজিদে আসতে বাধা না দেয়। তাঁর পবিত্র জবানে উচ্চারিত বাণীটি ছিল :

لَا تَمْنَعُوْا إِمَاءَ اللهِ مِنْ مَسَاجِدِ اللهِ

অর্থ : তোমরা আল্লাহর বান্দীদের আল্লাহর ঘরে আসা থেকে বাধা দিয়ো না।

কিন্তু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কুরআনিক যুগটি অতিবাহিত হওয়ার পর বিভিন্ন জাতি ও সম্প্রদায়ের মেলামেশা, সাংস্কৃতিক প্রসার এবং অর্থনৈতিক উন্নতির ফলে নারীসমাজে ব্যাপক সাজ-সজ্জা ও আড়ম্বরতার প্রচলন ঘটে। অবস্থাদৃষ্টে হযরত আয়েশা রাযি. বলেন, যদি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আজ বেঁচে থাকতেন তা হলে নারীদের মসজিদে আসতে নিষেধ করে দিতেন। তাঁর পবিত্র জবানে উচ্চারিত বাণীটি এই :

عَنْ عُمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ رض قَالَتْ لَوْ أَدْرَكَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَحْدَثَ النِّسَاءِ لَمَنَعَهُنَّ الْمَسْجِدَ كَمَا مُنِعَتْ نِسَاءُ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ

অর্থ : উমরাহ হযরত আয়েশা রাযি. সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, নারীরা আজ যা শুরু করেছে, যদি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই যুগটি পেতেন, তা হলে অবশ্যই তাদের মসজিদে

যেতে বারণ করে দিতেন; যেমন করে বনী ইসরাইলের নারীদের বারণ করা হয়েছিল।[১]

ওই সময় যদিও উম্মুল মুমিনীনের এই রায় অনুযায়ী ফায়সালা হয়নি; কিন্তু রায়টির মূল উৎস ছিল কিয়াসে আকলী।

২. দ্বিতীয় উদাহরণ

হযরত আবু হুরায়রা রাযি.-এর ফতোয়া ছিল, যদি কেউ কোনো মুরদাকে গোসল করায় তা হলে তাকে গোসল করতে হবে। যদি কেউ জানাযা বহন করে তা হলে তাকে ওযু করতে হবে। হযরত আয়েশা রাযি. ফতোয়াটি শুনে বললেন,

أَ وَ يُنَجَّسُ مَوْتَى الْمُسْلِمِيْنَ وَ مَا عَلَى رَجُلٍ لَوْ حَمَلَ عُوْدًا

অর্থ : মুসলমান মরে যদি নাপাক হয়ে যায়, তা হলে কেউ কোনো কাঠের খড়ি বহন করলে কী হবে?

৩. তৃতীয় উদাহরণ

শরঈ গোসল ফরজ হওয়ার জন্য স্খলন জরুরি কি না—এ ব্যাপারে হযরত যাবের রাযি. বলতেন—জরুরি। কেননা اَلْمَاءُ بِالْمَاءِ—পানির পরে পানি। হযরত আয়েশা রাযি. তাঁর এ ফতোয়া শুনে বিপরীতে আর একটি হাদীস পেশ করলেন; এরপর বললেন, যদি কেউ ব্যাভিচার করে, কিন্তু স্খলন না হয়, তা হলেও তাকে পাথর মেরে হত্যা করতে হয়; অথচ গোসল করা জরুরি হবে না? এ কেমন কথা!

সুনানের প্রকারভেদ

ফিকহের একটি অতি সূক্ষ্ম বিষয় এই যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে যে আচরণ-উচ্চারণ ও কর্মগুলো প্রকাশ পেয়েছিল, সেগুলোর কোনোটি ছিল ধর্মীয় বিধান হিসেবে, কোনোটি নিছক অভ্যাস হিসেবে, আবার কোনোটি শুধু বিশেষ কোনো কল্যাণের দিকে লক্ষ

---

১. *সহীহ বুখারী* : ১/২৯৬/৮৩১, باب خروج النساء إلى المساجد।

রেখে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে যে কর্ম প্রকাশিত হয়েছে তাকে সুন্নাত বলে। ফিকহবিদগণ প্রথমত এই সুন্নাতকে দুটো প্রধান ভাগে বিভক্ত করেছেন : ইবাদি ও আদি। ইবাদি সুন্নাত বলা হয় ওই সমস্ত কর্মকে যেগুলো তিনি করেছেন সওয়াবের নিয়তে ইবাদত হিসেবে। সুন্নাতে ইবাদি আবার দুই প্রকার : মুআক্কাদা ও মুসতাহাব্বা। মুআক্কাদা বলা হয় যেগুলো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সবসময় করেছেন, কখনো তরক করেননি। আর মুসতাহাব্বা বলা হয় যেগুলো মাঝেমধ্যে তরকও করেছেন।

সুন্নাতে আদি হলো ওই সমস্ত কর্ম যেগুলো তিনি সওয়াবের আশায় ইবাদত হিসাবে করেননি; বরং অভ্যাসগত কারণে, কিংবা ব্যক্তিগত বা সাময়িক প্রয়োজনে করেছেন। উম্মতের ওপর সুন্নাতে আদির অনুসরণ জরুরি নয়। তবে ভালোবাসা জিনিসটা অন্যরকম। প্রিয়তমের অভ্যাসের অনুকরণও প্রেমেরই প্রকাশ। এজন্যই কবি বলেছেন :

ہر ادا محبوب کی محبوب ہی

অর্থ : প্রিয়তমের সব কিছুই প্রিয় লাগে।

বিভিন্ন হাদীস থেকে প্রতীয়মান হয়, হযরত আয়েশা রাযি. নিজেও ফিকহবিদগণের অনেক আগেই এই মূলনীতিটি হৃদয়ে গেঁথে নিয়েছিলেন। তারাবীর নামাযের ব্যাপারে তিনি—এবং একমাত্র তিনিই শুধু—বর্ণনা করেছেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমযান মাসে তিন দিন জামাত করে তারাবী পড়িয়েছিলেন। চতুর্থ দিন তিনি আর এলেন না। সকাল বেলা সাহাবা কেরামকে বললেন, আমি এজন্য আসিনি যে, আমার ভয় হচ্ছিল, এই নামায না ফরজ করে দেওয়া হয়। এ থেকে জানা যায়, হযরত আয়েশা রাযি. অনেক আগেই জেনেছিলেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে কাজটি নিয়মিতভাবে করবেন, তা জরুরি হয়ে পড়বে; আর যে কাজটি কখনো ছেড়ে দেবেন, তা এত গুরুতরতা ও আবশ্যকতার পর্যায়ে পৌঁছবে না।

সাহাবা কেরামের মধ্যে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাযি. সুনানে আদি ও ইবাদির পার্থক্য করতেন না। তাঁর দৃষ্টিতে নবী সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে কাজটি করেছেন—যখনই করুন, আর যে কারণেই করুন—সুন্নাত। এজন্য তিনি সফরের বিভিন্ন মনজিলেও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণ করতেন। এমনকি, যদি কোনো মনজিলে তিনি ওযু করতেন তা হলে তিনিও তাঁর অনুসরণে ওযু করতেন, প্রয়োজন থাকুক আর না থাকুক। কিন্তু হযরত আয়েশা রাযি. এবং হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি. এ সকল পার্থক্য খেয়াল করতেন। হজে ওয়াদিল আবতাহে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁবু ফেলেছিলেন। তারা এটাকে সুন্নাত মনে করতেন না। সহীহ মুসলিম ও মুসনাদে আহমাদে আছে,

نُزُوْلُ الْأَبْطَحِ لَيْسَ بِسُنَّةٍ إِنَّمَا نَزَلَهُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَنَّهُ كَانَ أَسْمَحَ لِخُرُوْجِهِ إِذَا خَرَجَ

অর্থ : আবতাহে অবতরণ করা সুন্নাত নয়; রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এখানে অবতরণ করেছিলেন সফরে সুবিধা হয়, তাই।[১]

সমসাময়িকদের সঙ্গে মতভেদের তালিকা

হযরত আয়েশা রাযি. অসংখ্য ফিকহী মাসআলায় সমসাময়িকদের সঙ্গে মতভেদ করেছেন এবং সত্য তাঁকে সঙ্গ দিয়েছে। হেজাজের ফিকহবিদগণ অধিকাংশ বিষয়ে সে অনুযায়ীই আমল করেছেন। আমরা এ ধরনের উল্লেখযোগ্য কিছু মাসআলার একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা *জামে তিরমিযী* ও অন্যান্য হাদীসগ্রন্থ থেকে সংগ্রহ করেছি :

ক্রম	হযরত আয়েশা রাযি.-এর অভিমত	অন্যান্য সাহাবা কেরাম রাযি.-এর অভিমত
১	থুথুতে ওযু ভাঙে না।	ইবনে উমর রাযি.—ভাঙে।
২	জানাযা-বহনে ওযু ভাঙে না।	আবু হুরায়রা রাযি.—ভাঙে।

---

১. *সহীহ বুখারী*, كتاب الحج، باب المحصب : ১৭৬৫। *সহীহ মুসলিম*, كتاب الحج، باب استحباب نزول المحصب : ৩১৬৯।

৩	গোসলে নারীর খোঁপা খোলা জরুরি নয়।	ইবনে উমর রাযি.—জরুরি।
৪	শুধু মিলনেই গোসল ওয়াজিব হয়।	জাবের রাযি. : স্খলন শর্ত।
৫	'কুরু' অর্থ তুহুর—পবিত্রতা।	অন্যান্য—হায়েয (ঋতু/মাসিক)।
৬	মাইয়েতকে গোসল করালে গোসল ওয়াজিব হয় না	আবু হুরায়রা রাযি.—ওয়াজিব হয়।
৭	নারী-মাইয়েতের চুল আঁচড়ানো যাবে না।[১]	উম্মে আতিয়্যা রাযি.—যাবে।
৮	নামাযে নারী সামনে এলে নামায নষ্ট হয় না।	আবু হুরায়রা রাযি.—নামায নষ্ট হয়।
৯	ফজরের নামায অন্ধকার থাকতে পড়া উচিত।	রাফে ইবনে খাদিজ রাযি.—ফরসা হলে পড়া উচিত।
১০	আসরের নামায তাড়াতাড়ি পড়তে হবে।	উম্মে সালামা রাযি.—বিলম্বে পড়তে হবে।
১১	মাগরিবের নামায তাড়াতাড়ি পড়তে হবে।	আবু মুসা রাযি.—বিলম্বে পড়তে হবে।
১২	নাপাক অবস্থায় সকাল করলে রোযা নষ্ট হয় না।	আবু হুরায়রা রাযি.—নষ্ট হয়।
১৩	ইফতার তাড়াতাড়ি করতে হবে।	আবু মুসা রাযি.—বিলম্বে করতে হবে।
১৪	কুরবানির গোশত তিন দিনের	আলী রাযি. ও ইবনে উমর

আহনাফের ফতোয়া হযরত আয়েশা রাযি.-এর কওলের ওপর। *হেদায়া* : কিতাবুল জানাইয, আবদুর রাযযাকের উদ্ধৃতিতে। হযরত উম্মে আতিয়া রাযি.-এর হাদীসটি অধিকাংশ সিহাহগ্রন্থেই আছে।

	বোশও খাওয়া যাবে।	রাযি.—না।
১৫	হজে ওয়াদিয়ে মাহসাবে অবতরণ সুন্নাত নয়।	ইবনে উমর রাযি.—সুন্নাত।
১৬	হজে মাথা মুণ্ডানোর পর সুগন্ধি ব্যবহার করা যাবে।	ইবনে উমর রাযি.—যাবে না।
১৭	কাবায় কোরবানি পাঠালে প্রেরণকারীর ওপর হজের বিধান আরোপিত হয় না।	ইবনে আব্বাস রাযি.—হয়।
১৮	হজে ঋতুবতী নারীকে বিদায়ি তাওয়াফের অপেক্ষা করতে হবে না।	উমর রাযি.—অপেক্ষা করতে হবে।[১]
১৯	হজে নারী জাফরানি কাপড় পরতে পারবে।	উমর রাযি.—মাকরুহ হবে।[২]
২০	হজে নারীর জন্য সামান্য চুল ছাঁটাই যথেষ্ট।	ইবনে যুবায়ের রাযি.—কমপক্ষে চার আঙ্গুল কাটা জরুরি।
২১	অলঙ্কারে যাকাত নেই (একটি বর্ণনা অনুযায়ী)।	যাকাত আছে।
২২	এতিম ও নাবালেগের মালেও যাকাত আছে।	ইবনে মাসউদ রাযি.—নেই।
২৩	গর্ভবতী বিধবা হলে ইদ্দতের সময়কাল হলো গর্ভপাতের সময়কাল।	ইবনে আব্বাস রাযি.—গর্ভপাত ও বৈধব্যের যে সময়টি বেশি হবে সেটিই হবে ইদ্দতের সময়কাল।

---

১. *মুয়াত্তা ও যুরকানী*।
২. *সহীহ বুখারী, ফাতহুল বারী* : باب ما يلبس المحرم من الثياب।

২৪	তালাকের ইচ্ছাধিকার প্রাপ্ত স্ত্রী তালাক না নিলে কোনো তালাকই হবে না।	আলী রাযি. ও ইবনে সাবেত রাযি.—এক তালাক হবে।
২৫	বালেগ মানুষও কারও দুধ পান করলে মাহরাম হবে।	অন্য উম্মাহাতুল মুমিনীন—হবে না।[১]
২৬	রেযাআত হবে কমপক্ষে পাঁচ ফোঁটা দুধ পান করলে।	অন্যান্য[২]—এক ফোঁটা দুধও যথেষ্ট।
২৭	গোলামের ওপর যদি একটি দানাও ধার্য হয় তবু মুকাতাব হবে।	যায়দ ইবনে সাবেত রাযি.—এক দিরহামের কম হলে মুকাতাব হবে না।[৩]
২৮	চোরাই মালের মূল্য তিন	ইবনে আব্বাস ও ইবনে

১. ঘটনা এই যে, সাহাবী হযরত আবু হুযায়ফা রাযি.-এর সালেম নামক একটি নাবালেগ গোলাম ছিলেন, যিনি ইসলামের ইতিহাসে মাওলায়ে আবি হুযায়ফা রাযি. (হুযায়ফা রাযি.-এর আজাদকৃত গোলাম) নামে পরিচিত। তিনি ছোটবেলা থেকেই তার মনিবের ঘরেই থাকতেন এবং অন্দরেও তার অবাধ বিচরণ ছিল। হযরত হুযায়ফা রাযি.-এর স্ত্রী সাহলা বিনতে সুহাইল তার সাথে পর্দা করতেন না। কিন্তু যখন হযরত সালেম রাযি. বড় হয়ে গেলেন তখন তার সঙ্গে স্ত্রীর পর্দা না করার বিষয়ে হযরত আবু হুযায়ফা রাযি. মনঃক্ষুণ্ন হতেন। এক পর্যায়ে হযরত সাহলা রাযি. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হয়ে আবেদন করলেন, হে আল্লাহর রাসূল, আমার সালেম বড় হচ্ছে। আমি বুঝতে পারছি, তার সঙ্গে পর্দা না করার বিষয়ে আবু হুযায়ফা রাযি. মনঃক্ষুণ্ন হচ্ছেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সালেমকে দুধ খাইয়ে দাও, তা হলে আবু হুযায়ফার অসন্তোষ কেটে যাবে। হযরত সাহলা রাযি. তা-ই করলেন। এবং বাস্তবেও হযরত আবু হুযায়ফা রাযি. ঠিক হয়ে গেলেন। এই ঘটনার ভিত্তিতেই হযরত আয়েশা রাযি. মনে করতেন, বালেগ শিশুকেও যদি কোনো মহিলা দুধ পান করায় তা হলে হুরমতে রেযাআত অর্থাৎ মাহরামের সম্পর্ক সাব্যস্ত হবে। কিন্তু পবিত্র স্ত্রীগণ অন্য সকলে এটাকে হযরত সাহলা রাযি. ও সালেম রাযি.-এর জন্য বিশেষ ছাড় বলে মনে করতেন। তাঁদের দৃষ্টিতে অন্য কারও জন্য এ অনুমতি নেই। ইমাম দাউদ যাহিরি রহ. ছাড়া সকল ইমাম আলোচ্য মাসআলায় পবিত্র স্ত্রীগণের মতকেই গ্রহণ করেছেন। অন্যান্য সহীহ হাদীসের আলোকেও প্রমাণিত যে, হুরমত সাব্যস্ত হবে শুধু শিশু অবস্থায় দুধ পান করলে। কুরআনেও দুধপানের মেয়াদ আছে দু-বছর। এ জন্য জমহুর ফুকাহা কেরাম হযরত আয়েশা রাযি.-এর এ মতটিকে সমর্থন করেননি [*শরহে সহীহ মুসলিম*, নববী : বাবু রিযাআতিল কাবির]।

২. *সহীহ বুখারী* : كتاب العتق।

৩. *নাসাঈ*-তে আছে হযরত আলী রাযি. এবং হযরত ইবনে মাসউদ রাযি.-এর মাযহাবও এটি।

	দিরহামের কম হলেও চোরের হাত কাটা যাবে।[১]	মাসউদ রাযি.—কমপক্ষে দশ দিরহাম হতে হবে।[২]
২৯	যদি জোরপূর্বক স্ত্রীকে তালাক দেওয়ানো, কিংবা গোলাম আজাদ করানো হয়, তা হলে স্ত্রীও তালাক হবে না; গোলামও আজাদ হবে না।[৩]	হানাফী ইমামগণ বলেন—তালাক ও আজাদ হয়ে যাবে।
৩০	তিন তালাকপ্রাপ্তা নারীও ইদ্দতের সময় স্বামীর ঘরে থাকবে।	ফাতেমা বিনতে কায়স রাযি.—স্বামীর ঘরে থাকবে না।
৩১	মিরাসে দুই মেয়ে, এক নাতনী ও এক নাতী থাকলে এক তৃতীয়াংশ মেয়েরা ও একতৃতীয়াংশ নাতী-নাতনী মিলে পাবে।	ইবনে মাসউদ রাযি.—অবশিষ্টাংশ শুধু নাতী পাবে, নাতনী পাবে না।

যাই হোক, ফিকহের জগতে হযরত আয়েশা রাযি.-এর অবদান অপরিসীম। সংক্ষিপ্ত পরিসরে সেগুলোর প্রতি পূর্ণাঙ্গ আলোকপাত সম্ভব নয়। ইমাম মালেক রহ. উম্মুল মুমিনীন রাযি.-এর রেখে যাওয়া ফিকহী মাসআলাগুলোর একটি বিরাট অংশ সংরক্ষণ করতে পেরেছেন অনবদ্য মুয়াত্তায়। মদীনাবাসী মুসলমানদের পক্ষে এই মহামূল্যবান বর্ণনাগুলোই ফিকহের মূল ভিত্তি।

---

১. *সহীহ বুখারী* : السرقة و الحدود।

২. *দারাকুতনী*, كتاب الحدود। *মুসনাদে আহমাদ* : كتاب الجنائز।

৩. لا طلاق و لا إعتاق في إغلاق অর্থ : জোরপূর্বক তালাক ও ইতাক হয় না [*আবু দাউদ* : كتاب الطلاق, ২১৯৩]।

ধর্মতত্ত্ব এবং আকীদা-বিশ্বাস

প্রকৃতিগতভাবে ইসলাম একটি সহজ সরল ধর্ম। ইসলামের দিক-নির্দেশনাগুলোও সুস্পষ্ট সরল। কিন্তু ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের সঙ্গে মেলামেশা, বুদ্ধিবৃত্তিক তর্ক-বিতর্ক ইত্যাকার নানা কারণে সাহাবা-যুগের শেষের দিকে নতুন নতুন জিজ্ঞাসা মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে শুরু করে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায় তাঁর বিবৃতিই ছিল যে কোনো উদ্ভূত সমস্যার অকাট্য সমাধান। কারও মনে কোনো সংশয় উঁকি দিলে স্বয়ং তিনিই তাকে আশ্বস্ত করতে পারতেন। কিন্তু বুদ্ধিবৃত্তিক অঙ্গনের অনিন্দ্যসুন্দর সময়টির অবসান হলে লোকে সাহাবা কেরাম রাযি.-এর শরণাপন্ন হতো। সাহাবা কেরাম রাযি. কিতাবের কোনো সুস্পষ্ট নিদর্শন বা সুন্নাহর কোনো সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা পেলে জানিয়ে দিতেন; নয়তো সুবিদিত নির্ভুল পথনির্দেশের সূত্র ধরে উত্থাপিত প্রশ্নের সমাধান খুঁজতেন। বুদ্ধিবৃত্তিক এ অঙ্গনে ইসলামের ইতিহাসে উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা রাযি. থেকে যে ভাবধারা ও মতাদর্শের প্রমাণ মেলে সেগুলো তুলে ধরার প্রয়াস পাওয়া গেল :

আল্লাহর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ প্রসঙ্গ

হিজরী দ্বিতীয় শতকে—হযরত আয়েশা রাযি.-এর মৃত্যুর অনেক পরে—আল্লাহর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ প্রসঙ্গটি সারা ইসলামী জাহানে আলোচনা ও বিতর্কের বিষয়ে পরিণত হয়। অর্থাৎ কুরআন ও হাদীসে বিভিন্ন জায়গায় আল্লাহর হাত, পা, চোখ ইত্যাদি বিভিন্ন অঙ্গের উল্লেখ এসেছে। প্রশ্নের বিষয় হয়ে দাঁড়াল—এগুলো কি মূল অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে, না রূপক

অর্থে? আরও স্পষ্ট করে, আল্লাহর হাত বলতে কি আল্লাহর হাতই বুঝব, না আল্লাহর কুদরত? অনুরূপ, আল্লাহর চোখ বলতে কি আল্লাহর চোখই বুঝব, না আল্লাহর জ্ঞান ইত্যাদি? সাহাবা কেরাম রাযি. থেকে এ বিষয়ে কোনো সুস্পষ্ট বক্তব্য আসেনি। তবে সালাফে সালিহীন—আমাদের অনুসরণীয় পূর্বসূরিগণ—বিশ্বাস করতেন, কিতাব ও সুন্নাহয় বিধৃত মহান আল্লাহর যাবতীয় গুণ ও বৈশিষ্ট্যের প্রতি ইয়াকীন রাখতে হবে, এগুলোর মূল ও আভিধানিক অর্থের প্রতিও ঈমান রাখতে হবে; তবে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণে যাওয়া যাবে না। ধারণা করা হয়, হযরত আয়েশা রাযি.-এর বিশ্বাসও এমনই হবে। কেননা *সহীহ বুখারী*তে তাঁর সম্পর্কে একটি বাক্য এমন পাওয়া যায় :

اَلْحَمْدُ لِلهِ الَّذِيْ وَسِعَ سَمْعَ الْأَصْوَاتِ

অর্থ : প্রশংসা ওই আল্লাহর, যাঁর শ্রবণ-শক্তি সকল স্বর ও শব্দকে ধারণ করেছে।

আল্লাহর দর্শন লাভ

মুতাযিলা সম্প্রদায় ও তাদের ভাবধারার লোকেরা বিশ্বাস করেন, না এই পৃথিবীতে কেউ আল্লাহর দর্শন লাভ করতে পারে, না আখেরাতে। কিন্তু অধিকাংশ মুসলমান শুধু এর সম্ভাবনারই নন, বরং বাস্তবতারও প্রবক্তা। সত্যান্বেষী মুসলিমসম্প্রদায় বিশ্বাস করেন, আল্লাহর দর্শন লাভ মায়ার পৃথিবীতে চর্মচোখে সম্ভব না হলেও আখেরাতে পূর্ণিমার চাঁদ যেভাবে সকলে একসঙ্গে দেখতে পারে, সেভাবেই আল্লাহর দর্শন লাভ করা যাবে। কিন্তু হযরত আয়েশা রাযি. থেকে খুবই সুস্পষ্ট নির্দেশনা এসেছে। তিনি তাঁর শিক্ষানবিশদের বলেছিলেন, যদি কেউ বলে যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহকে দেখেছেন, তা হলে সে অবশ্যই মিথ্যা বলে। এই দাবির স্বপক্ষে তিনি কুরআন মাজীদের দুটো আয়াত প্রমাণস্বরূপ পেশ করেন। মুতাযিলা সম্প্রদায় আজ পর্যন্ত এরচেয়ে শক্তিশালী আর কোনো প্রমাণ উপস্থাপন করতে পারেননি। প্রথম আয়াতটি হলো :

لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ

অর্থ : দৃষ্টি-শক্তি তাঁকে ধরতে পারে না; কিন্তু তিনি দৃষ্টি-শক্তিকে ধরতে পারেন। তিনি চিরসূক্ষ্ম, চিরজ্ঞাত। (সূরা আনআম, আয়াত : ১০৩)

অর্থাৎ তিনি যেহেতু চিরসূক্ষ্ম, এজন্য কোনো দৃষ্টিশক্তিই তাঁকে ধরতে পারে না; আবার তিনি যেহেতু চিরজ্ঞাত, এজন্য সবকিছুই তিনি ধরতে পারেন।

দ্বিতীয় আয়াতটি হলো :

وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ

অর্থ : কোনো মানুষেরই এই শক্তি নেই যে, সে আল্লাহর সঙ্গে কথা বলবে; তবে ওহীর মাধ্যমে, কিংবা পর্দার অন্তরালে। (সূরা শুরা, আয়াত : ৫১)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি. বলতেন, রাসূলুল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মেরাজের রজনীতে আল্লাহর দিদার (দর্শন) লাভ করেছিলেন। তিনি তাঁর দাবির স্বপক্ষে সূরা নাজমের কয়েকটি আয়াত তুলে ধরেন :

وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى

অর্থ : তিনি তাঁকে আরও একবার প্রকট হতে দেখেছেন। (সূরা নাজম, আয়াত : ১৩)

لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى

অর্থ : তিনি তাঁর রবের সবচেয়ে বড় নিদর্শনগুলো প্রত্যক্ষ করলেন। (সূরা নাজম, আয়াত : ১৮)

হযরত আয়েশা রাযি. বলেন, এখানে আল্লাহকে দেখার কথা বলা হয়নি; বরং জিবরীল আ.-কে দেখার কথা বলা হয়েছে। কুরআন

মাজীদের বাণীসমূহের ধারাপ্রবাহে মনোনিবেশ করলে বিষয়টি সুস্পষ্ট হয় :

عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى أَفَتُمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَى وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى

অর্থ : তাকে তা শিখিয়েছেন—যিনি প্রবল শক্তির অধিকারী, সহজাত বুদ্ধিমত্তার অধিকারী; একদিন তিনি প্রকট হলেন, তিনি ছিলেন সর্বোচ্চ দিগন্তে; অতঃপর তিনি কাছে এলেন, এবং আরও কাছে এলেন—দুই ধনুকের সমান কাছে; বরং তারচেয়ে কাছে। তখন তিনি তার বান্দার অন্তরে প্রক্ষেপণ করলেন, যা করার ছিল। তিনি মনের চোখে যা দেখেছেন, তাতে মিথ্যার আশ্রয় নেননি। তিনি যা প্রত্যক্ষ করেন, সে বিষয়ে তোমরা সন্দেহ কর? তিনি তাকে আরও একবার প্রকট হতে দেখেছেন—'সিদরাতুল মুন্তাহা'—র নিকটে। (সূরা নাজম, আয়াত : ৫-১৪)

এই বর্ণনাগুলোর ভিত্তিতে মুতাযিলা সম্প্রদায় মনে করেন, হযরত আয়েশা রাযি. আল্লাহর দর্শন লাভের প্রবক্তা ছিলেন না। কিন্তু বাস্তবতা হলো, হযরত আয়েশা রাযি. পৃথিবীতে আল্লাহর দর্শনলাভকে অস্বীকার করলেও আখেরাতে আল্লাহর দর্শনলাভকে অস্বীকার করেননি। কেননা তাঁর বক্তব্য ছিল এই :[১]

مَنْ حَدَّثَكَ أَنَّ مُحَمَّدًا رَأَى رَبَّهُ فَقَدْ كَذَبَ

অর্থ : যে বলেছে, মুহাম্মাদ তাঁর রবকে দেখেছে, সে মিথ্যা বলেছে।

তিনি ইহকালে মেরাজের রজনীতে আল্লাহর দর্শনলাভকে অস্বীকার করলেন, কিন্তু পরকালে আল্লাহর দর্শনলাভকে কোথায় অস্বীকার করলেন? হযরত আয়েশা রাযি.-এর বক্তব্য থেকে আল্লাহর দর্শনলাভের বিষয়টি একেবারে সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাখ্যাত হয় না।

---

১. আলোচ্য বর্ণনাগুলোর জন্য *সহীহ বুখারী* ও *জামে তিরমিযী* : তাফসীর—সূরা নাজম, এবং *মুসনাদে আহমাদ* : ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা : ২৪১ দ্রষ্টব্য।

গায়েব জানা প্রসঙ্গ

অদৃশ্য-জগতের কথা আল্লাহ ছাড়া কেউ জানেন না। গায়েব জানা বা অদৃশ্যে জ্ঞাত হওয়া একমাত্র আল্লাহর শান। কুরআন মাজীদে আছে :

عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ

অর্থ : তিনি দৃশ্য-অদৃশ্যের জ্ঞানী। (সূরা মুমিনুন, আয়াত : ৯৩)

আরও একটি আয়াতে আছে :

لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ

অর্থ : আকাশমণ্ডলীতে এবং পৃথিবীতে (যত কিছু এবং) যত কেউ আছে, কেউই অদৃশ্যে জ্ঞাত নয়। শুধুমাত্র আল্লাহ অদৃশ্যে জ্ঞাত। (সূরা নামল, আয়াত : ৬৫)

অনেকে মনে করেন, গায়েব জানা বা অদৃশ্যের অবগতি নবী-রাসূলেরও একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য। হযরত আয়েশা রাযি. এ বিষয়টিকে কঠোরভাবে প্রত্যাখ্যান করেছেন। তিনি বলেন, যদি কেউ বলে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গায়েব জানতেন তা হলে সে মিথ্যাবাদী। হযরত আয়েশা রাযি. তাঁর স্বপক্ষে কুরআন মাজীদের আয়াত উপস্থাপন করতেন :[১]

وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا

অর্থ : কেউই জানে না কাল সে কি করবে? (সূরা লুকমান, আয়াত : ৩৪)

যদি কেউই না জানে, তা হলে রাসূল জানবেন কীভাবে? এই আয়াত থেকে গায়বের ইলম বা অদৃশ্যের জ্ঞান সম্পূর্ণরূপে নাকচ করা হচ্ছে।

আরও একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা আছে, কয়েকটি শিশুকন্যা গান গাইছিল, তাদের গানের একটি কলি ছিল :

---

১. *সহীহ বুখারী* : তাফসীর—সূরা নাজম।

وَ فِيْنَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِيْ غَدٍ

অর্থ : আমাদের মাঝে এমন একজন নবী আছেন, যিনি জানেন কাল কী হবে?

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, অ্যাই অ্যাই..., এসব বোলো না, আগে যা গাইছিলে তা-ই গাও।[১]

আলোচ্য ঘটনা থেকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ থেকেই তাঁর পুরোপুরি গায়েব জানার দাবিটি নাকচ হয়ে যায়। তবে এ কথা অবশ্যই সত্য যে, কোনো কল্যাণ ও প্রজ্ঞার দাবিতে অনেক সময় আল্লাহ তায়ালা অদৃশ্য-জগতের অনেক বিষয় নবী-রাসূলকে অবহিত করতেন।

ওহী গোপন করা প্রসঙ্গ

নবী-রাসূলের ব্যাপারে এমনটা কল্পনাও করা যায় না যে, তাঁরা কোনো ওহী গোপন করেছেন। হযরত আয়েশা রাযি. বলেন, যদি কেউ কখনো বলে যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর কোনো বিধান থেকে সামান্য কিছুও গোপন করেছেন, তা হলে তাকে বিশ্বাস কোরো না। আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন,[২]

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ

অর্থ : হে রাসূল, আপনি পৌঁছে দিন যা আপনার ওপর অবতীর্ণ হয়েছে আপনার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে। যদি না করেন, তা হলে আপনি রিসালাতের দায়িত্ব পালন করলেন না। (সূরা মায়েদা, আয়াত : ৬৭)

হযরত আয়েশা রাযি. তাঁর দাবির স্বপক্ষে একটি বিশেষ ঘটনার আলোকেও প্রমাণ পেশ করেছেন। পৃথিবীর কেউই চায় না, তার ছোট

---

১. *সহীহ বুখারী* : কিতাবুন নিকাহ।

২. *সহীহ বুখারী* : باب قول الله : يا أيها الرسل بلغ ما...... ।

থেকে ছোট কোনো দুর্বলতাও মানুষের সামনে প্রকাশ পাক। অথচ কুরআনে কারীমে এমন অনেক আয়াত আছে যেগুলোতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোনো চিন্তাগত ত্রুটির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। তা ছাড়া, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক পালকপুত্রের স্ত্রীকে বিবাহ-করা জাহেলি আরবদের পক্ষে ছিল খুবই আপত্তিকর ও কটূক্তি করার মতো। কিন্তু এ ঘটনাটিও কুরআন কারীমে খোলামেলাভাবে আলোচিত হয়েছে। হযরত আয়েশা রাযি. বলেন, যদি হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরআন কারীমের কোনো আয়াত গোপন করতে পারতেন, তা হলে অবশ্যই এই আয়াতটি গোপন করতেন[১] :

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ

অর্থ : আর স্মরণ করুন, যখন আপনি বলছিলেন তাকে—(পালকপুত্র যায়েদ রাযি.) যাকে করুণা করেছেন আল্লাহ, এবং করুণা করেছেন আপনি—তুমি তোমার স্ত্রীকে রেখে দাও এবং আল্লাহকে ভয় করো। অথচ, আপনি মনের মধ্যে চাপিয়ে রাখছিলেন যা আল্লাহ শীঘ্রই প্রকাশ করতে যাচ্ছেন। আপনি ভয় করছিলেন মানুষকে, অথচ ভয় পাওয়ার প্রকৃত হকদার আল্লাহ। (সূরা আহযাব, আয়াত : ৩৭)

অথচ এ রকম একটি স্পর্শকাতর বিষয়ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গোপন করেননি। এ থেকেই বোঝা যায়, তাঁর প্রতি যত ওহী অবতীর্ণ হয়েছে, সবই অক্ষরে অক্ষরে উম্মতের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন।

নবী-রাসূল নিষ্পাপ

সূরা ইউসুফে একটি আয়াত আছে, যার কেরাতে হযরত আয়েশা রাযি. এবং হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি.-এর মধ্যে দ্বিমত

---

১. *মুসনাদে আহমাদ* : ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা : ২৩৩।

ছিল। আয়াতটি ইবনে আব্বাস রাযি. পড়তেন এভাবে :[১]

وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا

অর্থ : নবী-রাসূল ধারণা করলেন, তাদেরকে মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে।

অর্থাৎ একপর্যায়ে তাদের এমন ধারণাও হয়ে গেল যে, আল্লাহ তায়ালা তাঁদের সঙ্গে মিথ্যা কথা বলেছেন এবং তাদের মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

একজন শাগরেদ হযরত আয়েশা রাযি.-কে জিজ্ঞেস করল, বিষয়টা কি ঠিক? হযরত আয়েশা রাযি. বললেন,

مَعَاذَ اللهِ لَمْ تَكُنِ الرُّسُلُ تَظُنُّ ذَلِكَ بِرَبِّهَا

অর্থ : আল্লাহর পানাহ! রাসূলগণ কখনোই এমন হতে পারেন না যে তাঁরা আপন প্রতিপালক সম্পর্কে এমন ধারণা করে বসবেন।

হযরত আয়েশা রাযি. كُذِّبُوا। পড়তেন।[২] এর অর্থ হলো তাঁরা কওমের লোকদের পক্ষ থেকে মিথ্যাপ্রতিপন্ন হয়েছেন। অর্থাৎ—যখন আল্লাহর আজাব আসতে বিলম্ব হচ্ছিল তখন তাদের ভয় হলো যে, আজাব আসার ব্যাপারে তাঁদের ভবিষ্যদ্বাণীর ক্ষেত্রেও বুঝি এবার তাঁরা মিথ্যাপ্রতিপন্ন হবেন। কিন্তু নিরাশ হওয়ার উপক্রম হতেই আল্লাহর আজাব এসে যায়, কাফেররা ধ্বংস হয় এবং আম্বিয়া কেরাম সাহায্যপ্রাপ্ত হন।

রুহানী মেরাজ বা আত্মিক উর্ধ্বগমন

কিছু কিছু বর্ণনা অনুযায়ী এ বিষয়ে মতভেদ হয়েছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মেরাজ বা উর্ধ্বগমন কি রুহানী ছিল, না জিসমানী ছিল? অর্থাৎ—আত্মায় হয়েছিল, না শরীরে হয়েছিল? স্বপ্নে হয়েছিল, না জেগে হয়েছিল?

---

১. *সহীহ বুখারী* : তাফসীর—সূরা ইউসুফ।
২. *সহীহ বুখারী* : তাফসীর—সূরা ইউসুফ।

কুরআন মাজীদ বিষয়টিকে স্বপ্ন অভিহিত করেছে। সূরা বনী ইসরাঈলে এসেছে :

وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ

অর্থ : আর আমি আপনাকে যে স্বপ্নটি দেখিয়েছি, তা শুধুই মানুষকে পরীক্ষা করার জন্য দেখিয়েছি। (সূরা বনী ইসরাঈল, আয়াত : ৬০)

কুরআন মাজীদ আরও একটি আয়াতে এটিকে বলেছে—রুইয়াতে কলবী বা মনের চোখে দেখা। সূরা নাজমে বলা হয়েছে :

مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى

অর্থ : তিনি মনের চোখে যা প্রত্যক্ষ করেছেন, তাতে তিনি মিথ্যার আশ্রয় নেননি। (সূরা নাজম, আয়াত : ১১)

বিশুদ্ধ বর্ণনাগুলোতে স্পষ্টত এসেছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই সময় بَيْنَ الْقَائِمِ وَ النَّائِمِ—'ঘুমন্ত ও চেতন—এ দুয়ের মধ্যবর্তী' অবস্থায় ছিলেন। একটি বর্ণনায় মেরাজের ঘটনার আগাগোড়া বিস্তারিত বিবরণ দেওয়ার পর فَاسْتَيْقَظْتُ—'অতঃপর আমি জাগ্রত হলাম'—কথাটি এসেছে।

কিন্তু ইবনে ইসহাকের একটি বর্ণনায় পাই, হযরত আয়েশা রাযি. রুহানি মেরাজ তথা আত্মিক ঊর্ধ্বগমনের কথা বলতেন। অর্থাৎ তাঁর ভাষ্যমতে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আত্মাকে উঠিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। বর্ণিত বর্ণনাটির আরবী ভাষ্য এরূপ :

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ وَ حَدَّثَنِيْ بَعْضُ آلِ أَبِيْ بَكْرٍ رض أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ تَقُوْلُ مَا فُقِدَ جَسَدُ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ لَكِنْ أُسْرِيَ بِرُوْحِهِ

অর্থ : ইবনে ইসহাক বলেছেন, আমাকে আবু বকর রাযি.-এর পরিবারের একজন জানিয়েছেন, হযরত আয়েশা রাযি.—নবীপত্নী—

বলতেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দেহ ঠিকই ছিল; কিন্তু তাঁর আত্মাকে উঠিয়ে নেওয়া হয়।[১]

কাজি ইয়ায রহ. *শিফা* গ্রন্থে আলোচ্য বর্ণনাটির ওপর আপত্তি করেছেন।[২] আল্লামা কাসতালানি রহ. হুবহু তাঁর উদ্ধৃতি উল্লেখ করেছেন। তাঁদের সমালোচনার সারকথা—মেরাজ হযরত আয়েশা রাযি.-এর একদমই ছোটবেলার কথা; বরং একটি বর্ণনা অনুযায়ী তখন তাঁর জন্মই হয়নি। এজন্য এ বর্ণনাটি গ্রহণযোগ্য হবে না।

আমরা কাজি ইয়ায রহ.-এর এই সমালোচনা-নীতির সঙ্গে একমত হতে পারছি না। কারণ হযরত আয়েশা রাযি. থেকে এমন অনেক বর্ণনা আছে যেগুলো সকল মুহাদ্দিসের নিকটই গ্রহণযোগ্য; এমনকি তার নিকটও গ্রহণযোগ্য। অথচ বর্ণনাগুলো এমন সময়ের সঙ্গেই সম্পর্কিত যখন হযরত আয়েশা রাযি.-এর জন্মই হয়নি। যেমন বলা যায়, ওহীর প্রাথমিক পর্যায়গুলো বিশুদ্ধ গ্রন্থগুলোতে হযরত আয়েশা রাযি.-এর সূত্র ধরেই এসেছে সর্বাধিক। বরং তাঁর বর্ণিত হাদীসগুলোই এ বিষয়ে বিশদ জানতে মূল ভূমিকা পালন করে। সুতরাং কাজি ইয়ায রহ.-এর সমালোচনা-নীতিটি গৃহীত হলে হযরত আয়েশা রাযি.-এর শুধু এই হাদীসটিই নয়; ওহী সংক্রান্ত সবগুলো হাদীসই সমালোচনার লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হবে। কেননা মেরাজের তুলনায় এগুলো তাঁর জন্মের আরও আগের ঘটনা।

প্রকৃতপক্ষে, যেমনটি আল্লামা যুরকানী, ইবনে ওয়াহাব ও ইবনে সারিহ স্পষ্ট করেছেন, আলোচ্য বর্ণনাটি হযরত আয়েশা রাযি. থেকে প্রমাণিতই নয়।[৩] কেননা এর বিবরক হলেন ইবনে ইসহাক। তিনি নিজেই কতিপয় মুহাদ্দিসের নিকট যঈফ (দুর্বল)। আবার মূল বিবরকের নামটিও উল্লেখ করেননি। শুধু বলেছেন, আবু বকর রাযি.-এর পরিবারের একজন সদস্য। আবার সেই বিবরকও সরাসরি হযরত আয়েশা রাযি.-এর নাম উল্লেখ করে বসেছেন। অথচ ইবনে ইসহাকের সমসাময়িক হতে হলে

---

১. সীরাতে ইবনে হিশাম : ذكر الإسراء।

২. خفاجي على الشفاء : ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা : ৩০৪।

৩. *যুরকানী* : ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা : ৫।

তার এবং হযরত আয়েশা রাযি.-এর মাঝখানে আরও একজন বিবরকের প্রয়োজন হবে। এ কারণেই মূলত, আলোচ্য হাদীসটি প্রমাণ হিসেবে গ্রহণযোগ্য নয়।

ন্যায়নিষ্ঠ সাহাবা কেরাম

আহলুস সুন্নাহ মনে করেন, সাহাবা কেরাম রাযি. সকলে সর্ব দিক থেকে ন্যায়নিষ্ঠ ছিলেন। বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য ছিলেন। তাঁদের প্রতি উম্মতের কৃতজ্ঞ থাকতে হবে। হযরত উসমান রাযি.-এর হৃদয়বিদারক ঘটনার পর হযরত আলী রাযি. এবং হযরত মুআবিয়া রাযি.-এর রাজনৈতিক দ্বন্দ্বে মিশর, ইরাক ও সিরিয়ার লোকেরা একে অপরের পক্ষাবলম্বী ও হিতাকাঙ্ক্ষী সাহাবা কেরামের সমালোচনা করত, গাল-মন্দ ও অভিশাপ-অভিশম্পাত করত। হযরত আয়েশা রাযি. এটাকে কুরআন মাজীদের নির্দেশের পরিপন্থী মনে করতেন, সেই সঙ্গে প্রমাণ পেশ করতেন। তিনি বলেন,

يَا ابْنَ أُخْتِيْ، أُمِرُوْا أَنْ يَسْتَغْفِرُوْا لِأَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَبُّوْا

অর্থ : ভাগ্নে, তাদের প্রতি নির্দেশ ছিল যে, তারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীদের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করবে; অথচ তারা তাঁদের গালাগালি শুরু করেছে।[১]

হযরত আয়েশা রাযি. পবিত্র কুরআনের যে আয়াত থেকে এই নির্দেশটি উদ্ঘাটন করেছিলেন, তা আনসারি ও মুহাজির সাহাবীগণের প্রশংসায় অবতীর্ণ হয়েছিল। আয়াতটি এই :

وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ

অর্থ : আর তাদের (সাহাবীদের) পরে যে প্রজন্মটি আসবে তারা বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক, আপনি আমাদের ক্ষমা করুন এবং

১. *সহীহ মুসলিম* : কিতাবুত তাফসীর।

(ক্ষমা করুন) আমাদের ওই সব ভাইদের যারা আমাদের পূর্বে বিগত হয়েছেন। হে আমাদের প্রতিপালক, যারা ঈমান এনেছেন তাদের প্রতি আমাদের অন্তরে কোনো বিদ্বেষ রাখবেন না। নিঃসন্দেহে আপনি পরম করুণাময়, চির দয়ালু। (সূরা হাশর, আয়াত : ১০)

তারতীবে খেলাফত

সহীহ মুসলিমে হযরত আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মৃত্যুশয্যায় তাঁকে বললেন, তোমার পিতা আবু বকর [রাযি.] এবং তোমার ভ্রাতাকে ডাকো। আমি লিখিয়ে দিই। আমার আশঙ্কা হয়, কোনো উচ্চাভিলাষী বলে বসবে, আমিই শ্রেষ্ঠ। কিন্তু আল্লাহ ও মুসলামানগণ আবু বকর [রাযি.] ছাড়া আর কারও বিষয়ে একমত হবে না। সহীহ মুসলিমে আরও একটি বর্ণনা আছে, হযরত আয়েশা রাযি.-এর খুবই প্রিয় ছাত্র হযরত ইবনে আবি মুলাইকা জিজ্ঞেস করলেন, যদি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাউকে খলীফা মনোনীত করে যেতেন, তা হলে কাকে করতেন? তিনি বললেন, হযরত আবু বকর রাযি.-কে। জিজ্ঞেস করলেন, তারপর? তিনি বললেন, হযরত উমর রাযি.-কে? জিজ্ঞেস করলেন, তারপর? তিনি বললেন, উবায়দা ইবনুল জাররাহ রাযি.-কে। এরপর তিনি চুপ হয়ে গেলেন।[১]

কবরের আজাব

কুরআন মাজীদে কবরের সঙ্গে আজাবের কথা নেই। তবে বারযাখের সঙ্গে আজাবের কথা আছে। বারযাখ বলতে মৃত্যুর পর থেকে কেয়ামতের পূর্ব পর্যন্ত সময়কালকে বোঝায়। কিন্তু এতে যেহেতু সরাসরি কবরের আজাবের কথা বুঝে আসে না, সেহেতু মুতাযিলা সম্প্রদায় এখনো তা অস্বীকার করে।

ইসলামে এ বিষয়টিরও নিষ্পত্তি হযরত আয়েশা রাযি.-এর কল্যাণেই হয়েছে। দুই ইহুদি মহিলা হযরত আয়েশা রাযি.-এর কাছে এল। কথা

---

১. *সহীহ মুসলিম* : فضائل أبي بكر رضي الله عنه।

প্রসঙ্গে একজন বলে উঠল, আল্লাহ্ তোমাকে কবরের আজাব থেকে রক্ষা করুন। কথাটি হযরত আয়েশা রাযি.-এর জন্য একদমই নতুন ছিল। তিনি হতচকিত হয়ে গেলেন। তিনি কবর আজাবের বিষয়টি মেনে নিতে পারছিলেন না। অবশেষে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট জিজ্ঞেস করলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ঠিকই আছে।[১] এরপর থেকে হযরত আয়েশা রাযি. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দুআ-মুনাজাতগুলো লক্ষ করতে লাগলে দেখলেন, তিনি কবরের আজাব থেকে পানাহ চান। হয়তো প্রথমে তিনি এদিকে মনোযোগ দেননি।

সামায়ে মাওতা বা মাইয়েতের শ্রবণ

মৃতরা শোনে কি না—সাহাবা কেরাম এ ব্যাপারে মতভেদ করেছেন। হযরত উমর রাযি., আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাযি. এবং আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি. মনে করতেন, মৃতরা শুনতে পায়। হযরত আয়েশা রাযি. এটা মানতেন না। তাঁর সিদ্ধান্তটি শুধু বিবেচনা ও বুদ্ধির নিরিখে নয়; বরং কুরআনের আলোকে ছিল। নিজ দাবির স্বপক্ষে তিনি নিম্নোক্ত দলিলগুলো পেশ করতেন :[২]

إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ

অর্থ : আপনি মৃতদেরকে শোনাতে পারবেন না। (সূরা নামল, আয়াত: ৮০)

وَمَا أَنتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ

অর্থ : যারা কবরে আছে, তাদের আপনি শোনাতে পারেন না। (সূরা ফাতির, আয়াত : ২২)

উপর্যুক্ত আয়াতগুলো থেকে বুঝে আসে, মৃত্যুর পর মৃতরা শ্রবণ-শক্তি থেকে বঞ্চিত হন। তবে কোনো বিশেষ মুহূর্তে বিশেষ আওয়াজ শোনানো হয়।

---

১. *সহীহ বুখারী* : كتاب الجنائز ، باب التعوذ من عذاب القبر ।

২. *সহীহ বুখারী* : গাযওয়ায়ে বদর।

ধর্মীয় রহস্যবিদ্যা ও তাৎপর্যজ্ঞান

নিঃসন্দেহে, ইসলাম ধর্মের প্রতিটি অনুশাসন সর্বাঙ্গীন কল্যাণের নিমিত্তেই নিবেদিত। এসব তাৎপর্যজ্ঞান, মর্মোপলব্ধি ও রহস্য-ভেদ নিবেদিতপ্রাণ ধার্মিকের জন্য নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু তারপরও মহান আল্লাহ অনেক ক্ষেত্রে আপন অনুগ্রহ ও অনুকম্পায় ধর্মীয় অনুশাসন ও বিধি-নিষেধগুলোর বিভিন্ন কল্যাণ ও ইতিবাচকতা এবং বাস্তবতা ও তত্ত্বকথা ব্যক্ত করেছেন। স্বয়ং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও যে দিক-নির্দেশনাগুলো উম্মতকে দিয়ে গেছেন, কখনো নিজেই সেগুলোর ইতিবাচকতা তুলে ধরেছেন, কখনো কারও প্রশ্নের জবাবে তা স্পষ্ট করেছেন। মুহাদ্দিসে দেহলভি শাহ ওয়ালিউল্লাহ রহ. ধর্মের মর্মকথা নিয়ে একটি অনবদ্য গ্রন্থ রচনা করেছেন : حُجَّةُ اللهِ الْبَالِغَة (*হুজ্জতুল্লাহিল বালেগাহ*)। আমাদের পূর্বসূরিগণ ধর্মীয় অনুশাসনের তাৎপর্য ও রহস্য নিয়ে মাথা না ঘামালেও আমরা কেন ঘামাচ্ছি—এ প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে তিনি লিখেছেন :

قُلْنَا لَا يَضُرُّ عَدَمُ تَدْوِيْنِ السَّلَفِ إِيَّاهُ بَعْدَمَا مَهَّدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ أُصُوْلَهُ وَ فَرَّعَ فُرُوْعَهُ وَ اقْتَفَى أَثَرَهُ فُقَهَاءُ الصَّحَابَةِ كَأَمِيْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ عُمَرَ وَ عَلِيٍّ وَكَزَيْدٍ وَ ابْنِ عَبَّاسٍ وَ عَائِشَةَ وَ غَيْرِهِمْ بَحَثُوْا عَنْهُ وَ أَبْرَزُوْا وُجُوْهًا مِّنْهُ

অর্থ : আমরা মনে করি, আমাদের পূর্বসূরিগণ কর্তৃক এ বিষয়টিকে কোনো শাস্ত্রীয় রূপ দান না করাটা আমাদের জন্য কোনো বাধা হতে পারে না। কেননা স্বয়ং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-ই এ

জাতীয় অনেক মূলনীতি ও অনুষঙ্গ ব্যক্ত করে গেছেন। ফিকহবিদ সাহাবা কেরাম, যেমন : হযরত আলী রাযি., হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত রাযি., হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি. এবং হযরত আয়েশা রাযি. প্রমুখ ব্যক্তিবৃন্দও—ধর্মীয় অনুশাসনগুলোর নানামুখী কল্যাণ ও যৌক্তিকতা আলোচনা করেছেন।

আমার প্রতি দুঃসাহস দেখানোর অপবাদ আরোপিত না হলে, শাহ ওয়ালিউল্লাহ রহ.-এর তালিকায় হযরত আয়েশা রাযি.-এর নাম সবার শেষে নয়, সবার আগে উল্লেখ করব। তবে এর অর্থ এই নয় যে, পূর্বোক্ত মহিমান্বিত ব্যক্তিবর্গ ধর্মের মর্মকথায় হযরত আয়েশা রাযি.-এর চেয়ে পিছিয়ে ছিলেন; বরং আমি মনে করি, হযরত আয়েশা রাযি.-ই সবচেয়ে বেশি এই অমূল্য তত্ত্বগুলো মানুষের কাছে পৌঁছে দিয়েছিলেন। এবং এটা ঐতিহাসিকভাবেও সত্য। হাদীসগ্রন্থগুলোর পাতায়-পাতায় এর ভূরিভূরি প্রমাণ মেলে।

ধর্মীয় তাৎপর্যজ্ঞান ও হযরত আয়েশা রাযি.

পূর্বে আলোচিত হয়েছে, নববী যুগে মুসলিম নারীগণ নির্বিঘ্নে মসজিদে নববীতে আসতেন এবং জামাতে পুরুষ ও শিশুদের পেছনে কাতার করে দাঁড়াতেন। স্বয়ং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও নির্দেশ দিয়েছিলেন, কেউ যেন তাদের মসজিদে আসতে বাধা না দেয়। কিন্তু নববী যুগের অবসানের পর ধন-সম্পদের প্রাচুর্য ও বিধর্মীদের সঙ্গে মেলামেশা জীবন-জগতের স্বচ্ছতা, সরলতা, অকৃত্রিমতা ও আত্মিক সুস্থতার যথেষ্ট ক্ষতিসাধন করেছিল। হযরত আয়েশা রাযি. আপন সময় ও সমাজের নিরীক্ষণে বলেছিলেন, আজ যদি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বেঁচে থাকতেন এবং নারীরা যা শুরু করেছে তা দেখতেন, তা হলে অবশ্যই তাদের মসজিদে আসতে বারণ করে দিতেন।[১] এটি একটি ছোট্ট অনুষঙ্গমাত্র। কিন্তু এ থেকেও প্রতীয়মান হয় যে তিনিও মনে করতেন, শরীয়তের প্রতিটি বিধানই সর্বাঙ্গীন কল্যাণের নিমিত্তেই হয়

---

১. *সহীহ বুখারী* : বাবু খুরুজিন নিসা ইলাল মাসাজিদ।

এবং সেগুলোর যৌক্তিক কারণও অবশ্যই থাকে; এবং প্রেক্ষাপটের পরিবর্তনে আনুষঙ্গিক বিধি-নিষেধেও পরিবর্তন ঘটে।

একবার জনৈক ব্যক্তি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এল। লোকটি ভেতরে আসার অনুমতি চাইল। হযরত আয়েশা রাযি. তার ভাবির দুধ পান করেছিলেন। কিন্তু হযরত আয়েশা রাযি. অনুমতি দিলেন না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ঘরে তাশরিফ আনলেন, তখন ঘটনাটি তাঁকে জানালেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, অনুমতি দিয়ে দিতে। তিনি আরজ করলেন, হে আল্লাহর রাসূল, তার ভাই তো আমাকে দুধ পান করাননি; আমাকে দুধ পান করিয়েছিলেন তার ভাইয়ের স্ত্রী (অর্থাৎ ভাবি ও দেবরের মধ্যে তো কোনো রক্তসম্পর্ক ছিল না, যে সে আমার মাহরাম হবে)। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সে তোমার চাচাই হবে।[১] এই ঘটনা থেকেও স্পষ্ট ধারণা লাভ করা যায় যে, হযরত আয়েশা রাযি. ধর্মীয় বিধি-নিষেধে ইতিবাচক ও যৌক্তিক কারণও অন্বেষণ করতেন।

এ পর্যায়ে আমরা এমন কিছু মাসায়েল আলোচনা করব, যেগুলোর তাৎপর্য ও মর্মকথা হযরত আয়েশা রাযি. প্রকাশ করেছিলেন। আমরা যদিও সবগুলো হাদীসগ্রন্থই সন্ধান করেছি, তথাপি অনেক তত্ত্বকথাই বাদ পড়ে যাওয়াটা খুবই স্বাভাবিক।

কুরআন অবতরণের ক্রমধারা ও বিষয়-বিন্যাস

অবতরণের স্থানিক পার্থক্যভেদে কুরআন দুই ভাগে বিভক্ত : মাক্কী ও মাদানী। মাক্কী বলতে—কুরআন মাজীদের যে অংশ মক্কায় এবং মাদানী বলতে—যে অংশ মদীনায় অবতীর্ণ হয়েছে, বোঝানো হয়। উভয়ই আলাদা আলাদা বৈশিষ্ট্যে ভাস্বর। সাধারণ মানুষ এগুলো সহজে না বুঝলেও, আরবী ভাষায় যাদের ব্যুৎপত্তি রয়েছে, যারা এ ভাষার বাগ্‌বৈচিত্র ও ইঙ্গিতভেদ বোঝেন, তারা সূরার শব্দপ্রয়োগ দেখেই বলতে

---

১. *সহীহ মুসলিম* : বাবুর রিযাআহ।

ারেন—সূরাটি মাক্কী না মাদানী। মাক্কী ও মাদানী সূরার কিছু হজবোধ্য প্রভেদ প্রদত্ত হলো :

মাক্কী সূরাসমূহের বৈশিষ্ট্য :	মাদানী সূরাসমূহের বৈশিষ্ট্য :
ভাষাগত ওজস্বিতা, তেজস্বিতা ও উদ্দীপনায় ভরপুর।	ভাষাগত দিক থেকে খুবই গভীর ও গম্ভীর।
শব্দ-চয়ন মাহাত্ম্যপূর্ণ ও শানদার।	আইনি শব্দের ব্যাপক প্রয়োগ।
উপদেশ, আহ্বান, একত্ববাদ, স্মরণ, পরকাল, হাশর-নশর ইত্যাদি সংবলিত।	ধর্মীয় অনুশাসন ও বিধি-নিষেধ সংবলিত।
চরণান্তিক মিলপ্রধান ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শ্লোক।	চরণান্তিক মিল তেমন রক্ষিত হয়নি; বৃহৎ শ্লোক-পরিসর।
ইহুদি-নাসারার সঙ্গে বিতর্ক নেই; সাবলীল বক্তব্য লক্ষণীয়।	ইহুদি-নাসারার সঙ্গে বিতর্ক লক্ষণীয়।
আমল ও ইবাদতের কথা কম; আকীদা ও বিশ্বাসের কথা বেশি।	আমল ও ইবাদত-সংক্রান্ত আলোচনাই বেশি।
জিহাদ প্রসঙ্গ নেই; শুধু দাওয়াত, তাবলীগ ও নম্র বাক্য।	দাওয়াত ও তাবলীগের সঙ্গে সঙ্গে জিহাদেরও নির্দেশ।

আশ্চর্যের বিষয়, এই পার্থক্য-বৈশিষ্ট্যগুলো উল্লেখ করে ইউরোপীয় াচ্যবিদগণ গর্বে ফেটে পড়েন। মনে হয় তারাই এর আবিষ্কারক। কিন্তু খবরটুকুও তাদের নেই যে, নবী-পরিবারের অন্তঃপুরবাসিনী াযি. হাজার বছর আগেই এই রহস্য ভেদ করে দিয়েছেন। *সহীহ খারী*তে আছে :

إِنَّمَا نَزَلَ أَوَّلُ مَا نَزَلَ مِنْهُ سُوْرَةٌ مِنَ الْمُفَصَّلِ فِيْهَا ذِكْرُ الْجَنَّةِ وَ النَّارِ حَتَّى إِ
تَابَ النَّاسُ إِلَى الْإِسْلَامِ ثُمَّ نَزَلَ الْحَلَالُ وَ الْحَرَامُ وَ لَوْ نَزَلَ أَوَّلُ شَيْءٍ

تَشْرَبُوا الْخَمْرَ لَقَالُوْا لَا نَدَعُ الْخَمْرُ أَبَدًا وَ لَوْ نَزَلَ لَا تَزْنُوْا لَقَالُوْا لَا نَدَعُ الزِّنَى أَبَدًا لَقَدْ نَزَلَ بِمَكَّةَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ إِنِّيْ جَارِيَةٌ أَلْعَبُ (بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَى وَ أَمَرُّ) وَ مَا نَزَلَتْ سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ وَ النِّسَاءِ إِلَّا وَ أَنَا عِنْدَهُ

অর্থ : প্রথমে দীর্ঘকায় বিবরণধর্মী সূরাগুলো নাজিল হয়েছে। এগুলোতে জান্নাত-জাহান্নামের কথা ছিল। এভাবে লোকেরা যখন ইসলামমুখী হয়ে গেল, তখন হালাল-হারামের বিধান নাজিল হতে লাগল। যদি প্রথমেই নাজিল হতো 'তোমরা মদ পান ছেড়ে দাও', তা হলে লোকেরা বলত, আমরা কখনোই মদ ছাড়তে পারব না। অনুরূপ যদি প্রথমেই হুকুম আসত, তোমরা ব্যাভিচার ছেড়ে দাও, তা হলে লোকেরা বলত, আমরা কখনোই ব্যাভিচার ছাড়তে পারব না। মক্কায় আমি খেলাধুলায় রত থাকতে এই আয়াতটি নাজিল হয়েছিল : বরং কেয়ামতই তাদের প্রতিশ্রুত সময়, কেয়ামত বড় বিষাদ ও বিভীষিকাময়। যখন সূরা বাকারা ও সূরা নিসা অবতীর্ণ হয়, তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়সাল্লামের খেদমতে ছিলাম।[১]

অর্থাৎ, ইসলাম যে প্রাজ্ঞ নীতিটি অনুসরণ করে উন্নতির পথে ধাবিত হয়েছিল, তা এই যে, সে তার সংস্কার-পরিধিকে একটু একটু করে প্রশস্ত করেছে। ইসলাম একটি বর্বর জাতির মাঝে এসে প্রথমে বক্তার ভূমিকায় হৃদয়গ্রাহী ভাষায় জান্নাত-জাহান্নামের কথা শুনিয়েছে; লোকেরা প্রভাবিত হলে এরপর বিভিন্ন বিধি-নিষেধ আরোপ করেছে, বিভিন্ন আইন ও অনুশাসন দিয়েছে।

মদ ও যিনা বর্বর মানুষদের নিত্যদিনের অভ্যাসে পরিণত হয়েছিল; যদি শুরুতেই এগুলোকে ছাড়তে বলা হতো, তা হলে কে শুনত? মূলত ভাব ও ভাষার পার্থক্যে অর্থ ও মর্মেরও পার্থক্য ঘটে। একটি উপদেশমূলক গ্রন্থের ভাব ও ভাষা আর একটি আইনি গ্রন্থের ভাব ও ভাষা কি এক হতে পারে?

সূরা নিসা ও সূরা বাকারা—হযরত আয়েশা রাযি.-এর ভাষ্যমতে—

---

১. *সহীহ বুখারী* : কিতাবুত তাফসীর, বাবু তালিফিল কুরআন।

মদীনায় নাজিল হয়েছিল। যেহেতু মদীনায় ইহুদি-নাসারা ছিল, সেহেতু কিছুটা বিতর্কের ভাব অবলম্বিত হয়েছে। আবার যেহেতু ইসলাম এখানে সাড়া পেয়ে গিয়েছিল, সেহেতু বিভিন্ন অনুশাসন প্রদত্ত হয়েছে। আইনি আলোচনা হওয়ায় এগুলোর শ্লোক-পরিধি বড় বড়। পক্ষান্তরে সূরা কমার অবতীর্ণ হয়েছে মক্কায়। এখানে কেয়ামতের আলোচনা-সহ ইসলামের প্রারম্ভিক বিষয়গুলো উঠে এসেছে। সংখ্যাগরিষ্ঠতার কারণে মুশরিকদের প্রসঙ্গ বিবৃত হয়েছে। ভাব ও ভাষা হৃদয়গ্রাহী, শ্লোকাবয়ব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র।

মোটকথা, মাক্কী ও মাদানী সূরাগুলোর পার্থক্য পরিস্থিতির ভিন্নতার কারণে হয়েছে। পরিস্থিতির ভিন্নতা কুরআনের ভাব ও ভাষায়ও প্রভাবকের কাজ করেছে।

মদীনায় ইসলামের সফলতার প্রকৃত কারণ

মদীনায় ইসলামের এই অভাবনীয় সফলতা লাভের প্রকৃত কারণ কী ছিল? এ এমন একটি প্রশ্ন, বিংশ শতাব্দীর পূর্ব পর্যন্ত ইতিহাসে এত উন্নতি ঘটেনি যে, একই মহিমায় এর পুনরাবৃত্তি হতে পারে। আজকের লেখক-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবীগণ যখন এ বিষয়ে কলম ধরেন, তখন সামান্য সময়ের জন্য হলেও ধরে নেন যে, তারা কোনো অসম্ভবকে সম্ভব করছেন। কিন্তু বাস্তবতা এই যে, যাঁর ইঙ্গিতে সব কিছু ঘটছিল, তাঁর কৃপা-দৃষ্টিই নিয়ন্ত্রণ করছিল সবকিছু। প্রকৃত প্রস্তাবে, শত-সহস্র বাধা-বিরোধের বিপরীতে ইসলামের অভাবনীয় সাফল্য লাভ মহান আল্লাহর অসীম ক্ষমতারই বহিঃপ্রকাশ—একটি মুজিযা মাত্র। আসলে এমনটা জরুরি নয় যে, মুজিযা হতে হলে সাধারণ নিয়মের বাইরে অতিপ্রাকৃতিক কিছু হতে হবে। আল্লাহ তাআলা আপন অনুগ্রহে কোনো কিছু ঘটার যাবতীয় উপকরণ যথাসময়ে একত্রিত করে দেওয়াও মুজিযা—যা পৃথিবীর সব কাজে সম্ভব হয় না। তা ছাড়া, অনেক দুর্বল উদ্যোগও সফল হয়; আবার অফুরন্ত সম্ভাবনা সত্ত্বেও অনেক আন্দোলন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে মদীনার গোত্রগুলো ভয়ঙ্কর গৃহযুদ্ধে লিপ্ত ছিল। এইসব রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে অধিকাংশ গোত্রেরই পালের গোদাদের বধ

হয়ে যায়। আর এরাই ছিল যত বিগ্রহের মূল হোতা। গর্বে-অহঙ্কারে যে কোনো বিপ্লবে এদের জাত্যাভিমানে আঘাত লাগত। তাই হয়তো বাধা হতো, নয়তো যুদ্ধ বাধাত।

আনসার গোত্রগুলো একের পর এক অবাঞ্ছিত যুদ্ধের দাবানলে বিধ্বস্ত হয়ে গিয়েছিল। তারা এতটাই বিপর্যয় বোধ করেছিল যে, ইসলামের আবির্ভাবকে মোক্ষ লাভের উপায় জ্ঞান করেই এর ছায়াতলে আশ্রয় নিয়েছিল। আর হোমরাচোমরার দল মরে সাফ হওয়ায় ইসলামের বিপ্লবকে বাধাগ্রস্ত করার কার্যকরী কোনো শক্তি ছিল না। এই ছিল মহান আল্লাহর সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা। এভাবেই তিনি ইসলামের উন্নতির পথকে সুগম করেছিলেন অনেক আগ থেকেই। হযরত আয়েশা রাযি. বলেন,

كَانَ يَوْمُ بُعَاث يَوْمًا قَدَّمَهُ اللهُ لِرَسُوْلِهِ فَقَدِمَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدِ افْتَرَقَ مَلَأُهُمْ وَقُتِلَتْ سَرَوَاتُهُمْ وَ جُرِّحُوْا قَدَّمَهُ اللهُ لِرَسُوْلِهِ فِيْ دُخُوْلِهِمْ فِي الْإِسْلَامِ

অর্থ : বুআস যুদ্ধের দিনটিই সেই যুগান্তকারী ঘটনা ছিল, যাতে মহান আল্লাহ তাঁর রাসূলের অনুকূলে ক্ষেত্র প্রস্তুত করে দিয়েছিলেন। এ যুদ্ধে গোত্রগুলোর শক্তি-সামর্থ্য ভেঙে গিয়েছিল। নেতা-নেত্রী নিহত হয়েছিল। তারা ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গিয়েছিল। এমন সময় রাসূলের আগমন হলো। এভাবেই আল্লাহ তাঁর রাসূলের অনুকূলে তাদের ইসলাম গ্রহণের ক্ষেত্রকে প্রস্তুত করে দিয়েছিলেন।[১]

জুমআর দিন গোসল করা

জুমআর দিন গোসল করাকে আবশ্যক করা হয়েছিল। কেন করা হয়েছিল তার কারণ হযরত আয়েশা রাযি. বলে দিয়েছিলেন :

قَالَتْ كَانَ النَّاسُ يَنْتَابُوْنَ مِنْ مَنَازِلِهِمْ وَ الْعَوَالِيْ فَيَأْتُوْنَ فِي الْغُبَارِ تُصِيْبُهُمْ

---

১. *সহীহ বুখারী* : كتاب مناقب الأنصار، باب القسامة في الجاهلية হাদীস নং ৩৮৪৬।

الْغُبَارُ وَالْعَرَقِ فَيَخْرُجُ مِنْهُمُ الْعَرَقُ فَأَتَى رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْسَانٌ مِنْهُمْ وَ هُوَ عِنْدِيْ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ أَنَّكُمْ تَطَهَّرْتُمْ لِيَوْمِكُمْ هَذَا.

অর্থ : লোকেরা নিজ নিজ বাড়ি থেকে এবং মদীনার বিভিন্ন বসতি থেকে আসত। তারা ধুলা ও ঘামে একাকার হয়ে থাকত। এভাবে একদিন একজন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এল। তিনি আমার কাছেই বসা ছিলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, যদি তোমরা আজকে গোসল করে আসতে, তা হলে ভালো হতো।[১]

সফরে দু'রাকাত নামায

সফরে চার রাকাতবিশিষ্ট নামাযগুলো 'কসর' হিসেবে দু'রাকাত করা হয়েছে। স্বাভাবিকভাবে মনে হয়, হয়তো সহজতা করার জন্য এমনটা করা হয়েছে। কিন্তু প্রকৃত রহস্যটি প্রকাশ করেছেন হযরত আয়েশা রাযি. :

فُرِضَتِ الصَّلَوةُ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ هَاجَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَفُرِضَتْ أَرْبَعًا وَ تُرِكَتْ صَلَوةُ السَّفَرِ عَلَى الْأُوْلَى

অর্থ : মক্কায় নামায মূলত দু'রাকাতই ফরজ করা হয়েছিল। পরে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিজরত করে মদীনায় চলে এলেন। তখন চার রাকাত ফরজ করা হলো। কিন্তু সফরের নামায আগের অবস্থায়ই বহাল রাখা হলো।

ফজর ও আসরের পর নামায পড়ার নিষেধাজ্ঞা

বিভিন্ন হাদীসে হযরত উমর রাযি. থেকে বর্ণিত আছে, ফজর ও আসরের নামায পড়ে ফেলার পর সুন্নত নফল আর কোনো নামায পড়া

---

১. *সহীহ বুখারী* : كتاب الغسل ।

যাবে না। স্বাভাবিকভাবে এই নিষেধাজ্ঞার কোনো কারণ বুঝে আসে না। আল্লাহ তো সবসময়ই ইবাদত করতে বলেছেন। এই আশ্চর্যবোধ হযরত আয়েশা রাযি. দূর করেছেন :

وَهَمَ عُمَرُ إِنَّمَا نَهَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّلَوةِ أَنْ يَّتَحَرَّى طُلُوْعَ الشَّمْسِ وَغُرُوْبَهَا

অর্থ : হযরত উমর রাযি. ভুল বুঝেছেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ সময় নামায পড়তে নিষেধ করেছেন যেন লোকে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত দেখে নামায পড়ে।[১]

অর্থাৎ যেন সূর্যপূজার ভ্রম না হয়। অথবা সূর্যপূজারীদের উপাসনার সময় আর আমাদের ইবাদতের সময় একই—এমন ধারণার সুযোগ না থাকে। এই ধরনের আরও কিছু বর্ণনা অন্যান্য সাহাবী রাযি. থেকে সহীহ বুখারীতে বিবৃত হয়েছে।

বসে নামায পড়া

হাদীস থেকে বোঝা যায়, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নফল নামায বসে থেকেও পড়েছেন। এজন্য অনেকে বসে নফল নামায আদায় করাকেই মুস্তাহাব মনে করত। অথচ বসে নামায পড়ার সওয়াব দাঁড়িয়ে পড়ার অর্ধেক। একজন হযরত আয়েশা রাযি.-কে জিজ্ঞেস করল, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি বসে নামায পড়তেন? হযরত আয়েশা রাযি. উত্তর দিলেন,

حِيْنَ حَطَمَهُ النَّاسُ

অর্থ : যখন লোকেরা তাঁকে ভেঙে দিয়েছিল (অর্থাৎ তিনি যখন দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন)।

আর একটি বর্ণনায় আছে,

مَا رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِيْ شَيْءٍ مِّنْ صَلَوةِ اللَّيْلِ

---

১. *মুসনাদে আহমাদ* : ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা : ১২৪।

جَالِسًا قَطُّ حَتَّى دَخَلَ فِي السِّنِّ

অর্থ : আমি কখনোই তাঁকে তাহাজ্জুদ নামায বসে পড়তে দেখিনি। কিন্তু যখন বয়স হয়ে গিয়েছিল, তখন পড়তেন।

দুটো বর্ণনাই *আবু দাউদের* বাবু সালাতিল কায়িদ অংশে আছে। *সহীহ মুসলিমেও* এ ধরনের কয়েকটি বর্ণনা আছে। একটি বর্ণনায় আছে :

قَالَتْ لَمَّا بَدَّنَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ ثَقُلَ كَانَ أَكْثَرُ صَلَاتِهِ جَالِسًا

অর্থ : যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শরীর ভারী হয়ে গিয়েছিল, তখন অধিকাংশ নফল নামাযই বসে পড়তেন।

আলোচ্য বর্ণনাগুলো থেকে বোঝা যায়, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অপারগতায় অর্ধেক সওয়াবেই খুশি থেকেছেন। যারা সওয়াবের বিষয়টিকে প্রাধান্য দেন, তারা তো দাঁড়িয়েই পড়বেন। কিন্তু যারা প্রেমের পতঙ্গ, তাঁরা প্রিয়তমের নকল করাকেই শ্রেয় মনে করেন, করতে পারেন। যদি হৃদয়ের আবেগ এমনই হয়, তা হলে আশা করা যায়, বসে পড়ার কারণে সওয়াব কম হলেও, প্রেমের প্রতিদান সে ঘাটতি পূরণ করে দেবে। ইনশাআল্লাহ।

মাগরিবের ফরজ তিন রাকাত কেন?

হিজরতের পর যখন দু'রাকাতবিশিষ্ট নামাযকে চার রাকাত করা হলো, তখন মাগরিবের নামায তিন রাকাত করা হলো কেন? হযরত আয়েশা রাযি. এর উত্তর দিয়েছেন :

إِلَّا الْمَغْرِب فَإِنَّهَا وِتْرُ النَّهَارِ

অর্থ : কিন্তু মাগরিবের নামাযকে ব্যতিক্রম রাখা হলো। কেননা সেটা দিনের বিতর।[১]

---

১. *মুসনাদে আহমাদ* : ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা : ২৪১।

রাতের নামাযগুলোর জন্য যেমন বিতর নামায তিন রাকাত, তেমনই দিনের নামাযগুলোর জন্যও এটাকে বিতর হিসেবে বিবেচনা করা হলো।

ফজর নামাযকে দুই রাকাত রাখা হলো কেন?

ফজরের নামাযে বেশি মনোযোগী হওয়া যায়, সেহেতু ফজরের নামাযের রাকাত-সংখ্যা আরও বেশি করতে হতো। কিন্তু হযরত আয়েশা রাযি. বললেন :

وَصَلَاةُ الْفَجْرِ لِطُوْلِ قِرَأَتِهِمَا

অর্থ : এবং ব্যতিক্রম রাখা হলো ফজরের নামায, কেননা এ নামাযে কেরাত লম্বা করা কাম্য।[১]

অর্থাৎ ফজরের নামাযে শরীয়ত খুশু-খুযুর বিষয়টি আরও বিশেষভাবে দেখেছে। বারবার ওঠা-বসায় এতে বিঘ্ন ঘটতে পারে, তাই এ নামাযে পরিমাণের চাহিদা বাড়ানো হলো না; কিন্তু মানের চাহিদা বাড়ানো হলো। অর্থাৎ, রাকাতের বিবেচনায় কম হলেও কেরাতের বিবেচনায় বেশি হলো।

আশুরার রোযার কারণ

আশুরা অর্থাৎ দশই মহররম জাহেলি যুগের লোকেরা রোযা রাখত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও জাহেলি যুগে এ দিনে রোযা রেখেছেন। ইসলাম আগমনের পরও এ রোযাকে আবশ্যক রাখা হয়।[২]

---

১. *মুসনাদে আহমাদ* : ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা : ২৪১।

২. *সহীহ বুখারী*, *মুসলিম*, *আবু দাউদ* ও *ইবনে মাজা*-য় হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি. *থেকে* অন্য একটি বর্ণনা আছে। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় তাশরীফ আনলেন। তিনি ইহুদিদেরকে দেখলেন তারা এই দিনে রোযা রাখে। কারণ জানতে চাইলে তারা বলল, এই দিনে আল্লাহ মুসা আ.-কে ফেরাউনের ওপর বিজয় দান করেছিলেন। এর স্মরণেই আমরা আজকে রোযা রাখি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তা হলে এ রোযা রাখার অধিকার আমারই বেশি। এরপর তিনি নিজেও রোযা রাখলেন এবং সাহাবীগণকেও রোযা রাখার নির্দেশ দিলেন। আবু মুসা আশআরি রাযি. *থেকে* *সহীহ বুখারীতে* এরকমই একটি বর্ণনা পাওয়া যায়। হযরত আয়েশা রাযি.-এর হাদীস *মুয়াত্তা*, *বুখারী*, *মুসলিম*, *আবু দাউদ*, *তিরমিযী* ও *মুসনাদে আহমাদ*-এ আছে। *আবু দাউদ* ও *ইবনে মাজা*-য় হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাযি.-এর একটি বর্ণনা হযরত আয়েশা রাযি.-এর বর্ণনাকে সমর্থন করে। *তাবারানি* মুজামে কাবীর-এ

রমযানের রোযা ফরজ হওয়ার পর আশুরার রোযার আবশ্যকতা রহিত হয়। হযরত আব্বাস রাযি. থেকেও এ ধরনের বর্ণনা হাদীস গ্রন্থগুলোতে আছে। কিন্তু তিনি এটা বর্ণনা করেননি যে, জাহেলি যুগে এই দিন কেন রোযা রাখা হতো? হযরত আয়েশা রাযি. এর উত্তর দিয়েছেন :

كَانَ يَصُوْمُوْنَ يَوْمَ عَاشُوْرَاء قَبْلَ أَنْ يُّفْرَضَ رَمَضَانُ وَ كَانَ يَوْمٌ تُسْتَرُ فِيْهِ الْكَعْبَةُ

অর্থ : রমযানের রোযা ফরজ হওয়ার পূর্বে কুরাইশরা আশুরার রোযা রাখত। কেননা এই দিনে তারা কাবাকে গেলাফ পড়াত।[১]

রাসূল পুরো রমযান তারাবীহ পড়েননি কেন?

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতে যে নামাযগুলো পড়তেন,

---

হযরত যায়েদ রাযি. থেকে যে হাদীসটি এসেছে, তাও হযরত আয়েশা রাযি.-এর বর্ণনাকে সমর্থন করে। *আবু দাউদ* ও *ইবনে মাজায়* আছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ইহুদিদের সঙ্গে আমরা মিল রাখব না, তারা দশ তারিখে রোযা রাখে, আমরা সামনে থেকে নয় তারিখে রোযা রাখব। হযরত আয়েশা রাযি.-এর বর্ণনাটি হযরত ইবনে আব্বাস রাযি.-এর বর্ণনা থেকে তিনটি দিক থেকে অগ্রাধিকার পেতে পারে : বর্ণনার আধিক্য, ইবনে উমর রাযি.-এর সমর্থন ও বিবেচনার দাবি; অর্থাৎ যদি আশুরা বা দশ মহররমের রোযা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহুদিদের অনুসরণেই রাখেন তা হলে বিরোধ প্রকাশের দরকার কী ছিল? যাই হোক, বর্ণনা দুটোর সমন্বয় করা যেতে পারে এভাবে যে, মক্কায় জাহেলি যুগের লোকেরা এই দিন রোযা রাখত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-ও রেখে থাকবেন; এদিকে মদীনার ইহুদিরাও এই দিনে রোযা রাখে; ঘটনাক্রমে উভয় পক্ষেরই অনেক ইতিহাস ছিল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মদীনায় এলেন, তখন ইহুদিদেরকেও এদিনে রোযা রাখতে দেখলেন এবং নিজ রীতি অনুসারে রোযা রাখা অব্যাহত রাখলেন। কিন্তু ইহুদিদের অনুসরণ যেহেতু কাম্য নয়, এজন্য *মুসলিম* ও *আবু দাউদে* ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত আছে, যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু এই দিন রোযা রাখার নির্দেশ দিলেন তখন সাহাবা কেরাম রাযি. আরয করলেন, হে আল্লাহর রাসূল, ইহুদি নাসারা এই দিনটিকে বড় সম্মানের সঙ্গে পালন করে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তা হলে সামনে থেকে আমরা নয় তারিখে রোযা রাখব। কিন্তু পরের বছর আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জীবিত ছিলেন না। এই শেষোক্ত বাক্যটি থেকে বোঝা যায়, এটা হিজরী দশম বছরের কথা। অথচ অধিকাংশ বর্ণনা থেকে প্রমাণিত যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথম হিজরীতেই আশুরার রোযা রাখার নির্দেশ দিয়েছিলেন। সুতরাং নয় তারিখে রোযার নির্দেশের অর্থ এই যে, সামনে থেকে এর সঙ্গে নয় তারিখেও রোযা রাখব। অর্থাৎ নয় এবং দশ দুই দিনই রোযা রাখব।

১. *মুসনাদে আহমাদ* : ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা : ২৪৪।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি. বলতেন, সে সম্পর্কে হযরত আয়েশা রাযি.-ই সবচেয়ে নিশ্চিত জ্ঞান রাখতেন।[১] তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমযান এবং রমযানের বাইরে তেরো রাকাতের বেশি পড়তেন না। তিনি রমযান মাসে একদিন মসজিদে নববীতে তারাবীহ পড়লেন। তাঁকে নামায পড়তে দেখে আরও কিছু লোক এসে নামাযে শরীক হলো। দ্বিতীয় দিন আরও বেশি লোক হলো। তৃতীয় দিন আরও বেশি লোক হলো। চতুর্থ দিন এত বেশি লোক হলো যে, মসজিদে নববীতে জায়গা হচ্ছিল না। কিন্তু সেদিন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আর বাইরে গেলেন না। সাহাবা কেরাম অপেক্ষা করতে করতে অবশেষে ফিরে গেলেন। সকালবেলা তিনি সাহাবা কেরামকে বললেন,

أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّهُ لَمْ يَخْفَ عَلَيَّ مَكَانُكُمْ لَكِنِّيْ خَشِيْتُ أَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ صَلَاةُ اللَّيْلِ فَتَعْجِزُوْا

অর্থ : রাতে তোমাদের অবস্থানের কথা আমার জানা ছিল; কিন্তু আমার ভয় হলো যে, তোমাদের ওপর এটাকে ফরজ করে দেওয়া হতে পারে, কিন্তু তখন তোমরা পারবে না।[২]

কিন্তু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মৃত্যুর পর যেহেতু ফরজ হওয়ার আশঙ্কা কেটে গেল, তখন সাহাবা কেরাম নিয়মিতভাবে নামাযটি শুরু করলেন। যাদের ভ্রুক্ষেপ শুধু মূল হাদীসের প্রতি, তারা এটাকে মুস্তাহাব মনে করেন। আর যারা সাহাবা কেরামের অনুসরণ করতে চান, তারা এটাকে সুন্নতে মুআক্কাদা মনে করেন।

হজের হাকীকত

অনেক অজ্ঞ মনে করে, হজের কার্যাবলি যেমন তাওয়াফ করা, কিছু

---

১. *সহীহ মুসলিম* : বাবু সালাতুল লাইল।

২. *সহীহ বুখারী* : كتاب الجمعة ، باب من قال في الخطبة : أما بعد... : হাদীস নং ৯২৪।

কিছু জায়গায় দৌড়ানো, কিছু কিছু জায়গায় অবস্থান করা, পাথর নিক্ষেপ করা এক-একটা নিরর্থক ও উদ্দেশ্যহীন কাজ। অথচ হযরত আয়েশা রাযি. বলেন,

إِنَّمَا جُعِلَ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ وَ بِا لصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ رَمْيُ الْجِمَارِ لِإِقَامَةِ ذِكْرِ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ

অর্থ : বাইতুল্লাহর তাওয়াফ, সাফা-মারওয়ার সাঈ, কঙ্কর নিক্ষেপ ইত্যাদি আমলগুলো দেওয়া হয়েছে আল্লাহর আলোচনা ও স্মরণকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য।

অর্থাৎ প্রকৃত উদ্দেশ্য এই আমলগুলো নয়; বরং আল্লাহর স্মরণ প্রতিষ্ঠিত রাখা। কুরআনে ইঙ্গিত আছে, হযরত ইবরাহীম আ.-এর যুগেও এক ধরনের ইবাদত-পদ্ধতি ছিল। ইবরাহীম আ.-এর স্মরণে উদযাপিত হজে সেই ইবাদত-পদ্ধতিই অনুসৃত হয়ে এসেছে। যে কোনো সক্ষম ব্যক্তিকে জীবনে অন্তত একবার তা পালন করতেই হবে।

ওয়াদিয়ে মাহসাবে অবস্থান

মক্কা মুকাররামার কাছে মাহসাব নামক একটি উপত্যকা ছিল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হজ পালনকালে এখানে অবস্থান করেছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর খোলাফায়ে রাশেদীনও এখানে অবস্থান করেছেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাযি. এখানে অবস্থান করাকেও হজের রীতি গণ্য করতেন। কিন্তু হযরত আয়েশা রাযি. এটাকে হজের সুন্নাত মনে করতেন না এবং এখানে অবস্থানও করতেন না। তিনি বলতেন,

إِنَّمَا نَزَلَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَنَّهُ كَانَ مَنْزِلًا أَسْمَحَ لِخُرُوْجِهِ

অর্থ : রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এখানে অবতরণ করতেন। কেননা এখান থেকে বের হওয়া সহজ হতো।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি. এবং হযরত আবু রাফে রাযি.-ও এই মাসআলায় হযরত আয়েশা রাযি.-এর সঙ্গে একমত ছিলেন।[১]

কোরবানির গোশত তিন দিনের বেশি রাখা

একবার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নির্দেশ দিয়েছিলেন, কোরবানির গোশত যেন তিন দিনের বেশি রাখা না হয়। হযরত আলী রাযি., হযরত ইবনে উমর রাযি. প্রমুখ মনে করতেন, এটা স্থায়ী নির্দেশই ছিল। কিন্তু হযরত আয়েশা রাযি., হযরত জাবের রাযি., হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাযি., হযরত সালামা ইবনে আকওয়া রাযি., হযরত সওবান রাযি. এবং হযরত বুরায়দা রাযি. বর্ণনা করেছেন যে, এটা সাময়িক নির্দেশ ছিল। কিন্তু এই সাময়িক নির্দেশের কারণটি হযরত আয়েশা রাযি.-ই আমাদের জানিয়েছেন। এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল, তিন দিন পর কোরবানির গোশত খাওয়া আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি হারাম করে দিয়েছিলেন? হযরত আয়েশা রাযি. বললেন,

لَا وَ لَكِنْ قَلَّ مَنْ كَانَ يُضَحِّيْ مِنَ النَّاسِ فَأَحَبَّ أَنْ يُّطْعَمَ مَنْ لَّمْ يَكُنْ يُضَحِّي

অর্থ : না, নিষেধ নয়; আসলে তখন কোরবানি-করা লোকের সংখ্যা খুব কম ছিল। এজন্য তিনি চাইতেন, যেই লোকগুলো কোরবানি দিতে পারেনি, তাদেরও খাওয়ানো হোক।[২]

হযরত আয়েশা রাযি.-এর হাদীসটিকে ইমাম মুসলিম রহ. সাময়িক ব্যবস্থা হিসেবে বর্ণনা করেছেন; অর্থাৎ কোনো এক বছর মদীনায় দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিল। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই নির্দেশ দিয়েছিলেন। এর পরের বছর দুর্ভিক্ষ কেটে গেলে নির্দেশটি রহিত হয়।

---

১. চারটি বর্ণনাই *সহীহ মুসলিম* كتاب النزول بالمحصب অংশে আছে। হযরত আয়েশা রাযি.-এর বর্ণনাটি আছে *মুসনাদে আহমাদ*, ষষ্ঠ খণ্ডের ১৯০ পৃষ্ঠায়।

২. *মুসনাদে আহমাদ* : ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা : ১০২।

হযরত সালামা ইবনে আকওয়া রাযি. থেকেও এ ধরনের একটি বর্ণনা পাওয়া যায়।[১]

কাবা-নির্মাণ

কাবার এক পাশের দেয়ালের পর কিছু জায়গা ছাড়া পড়েছে। এটিকে হাতিম বলা হয়। তাওয়াফে হাতিমও ভেতরে গণ্য করা হয়। যে কারও মনে প্রশ্ন জাগতে পারে, যা কাবার অন্তর্ভুক্ত নয়, তা কেন তাওয়াফের মধ্যে শামিল করতে হবে? হতে পারে, অন্যান্য সাহাবীও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এ প্রশ্নটি করেছিলেন; কিন্তু বর্তমানে হাদীসের বিদ্যমান নীরব দরস-মজলিসগুলোতে হযরত আয়েশা রাযি. ছাড়া আর কাউকেই এ ব্যাপারে বলতে শোনা যায় না। তিনি বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, হে আল্লাহর রাসূল, এই দেয়ালগুলোও কি কাবা শরীফের অন্তর্ভুক্ত? তিনি বলেছিলেন, হাঁ। আমি আরজ করলাম, তা হলে নির্মাণকালে লোকেরা এটাকে বাইরে রেখেছে কেন? তিনি বললেন, তোমার কওমের কাছে এত সম্পদ ছিল না, তাই এটুকু কম পড়েছে। তিনি বলেন, এরপর আমি জিজ্ঞেস করলাম, দরজাটি এত উঁচু করা হয়েছে কেন? তিনি বললেন, এজন্য যে, তা যাকে ইচ্ছা—ঢুকতে দেবে, যাকে ইচ্ছা—ঢুকতে দেবে না।

হযরত ইবনে উমর রাযি. বলেন, যদি হযরত আয়েশা রাযি.-এর বর্ণনাটি সহীহ হয়, তা হলে হয়তো এজন্যই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওই পাশের রুকন দুটোতে চুমু দেননি।

কিন্তু প্রশ্ন হলো, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেহেতু জানতেন যে কাবা মূল কাঠামোর ওপরে নেই, সেহেতু ইবরাহিমি ধর্মের সংস্কারক হিসেবে তাঁর কর্তব্য ছিল—কাবা শরীফকে মূল কাঠামোর ওপর পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা। আমরা এ প্রশ্নের উত্তরটিও পাই রাসূল সাল্লাল্লাহু

---

১. পূর্বোক্ত হাদীসটি-সহ উভয় বর্ণনা দেখুন *সহীহ মুসলিম*, কিতাবুয যাবাইহ।

আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভাষ্যে। তিনি বলেন, আয়েশা, যদি সময়টা কুফরিকালের অতি নিকটবর্তী না হতো, তা হলে অবশ্যই কাবা শরীফকে ইবরাহিমি ভিতের ওপর পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতাম।[১] অর্থাৎ, সাধারণ আরবরা সদ্য মুসলমান হয়েছে, ভয় হয়, এতে তারা ভড়কে যাবে।

এই হাদীসটি থেকে বোঝা যায়, বিশেষ কোনো কল্যাণের দিকে দৃষ্টি রেখে, যদি কোনো ধর্মীয় কাজের বাস্তবায়নে বিলম্ব হয় এবং শরীয়ত তার তৎক্ষণাৎ বাস্তবায়ন দাবি না করে, তা হলে তা তিরস্কারযোগ্য হবে না।

হযরত আয়েশা রাযি.-এর হাদীসটির ওপর ভিত্তি করে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের রাযি. স্বীয় খেলাফত-আমলে কাবা শরীফের সংস্কার করে মূল ইবরাহিমি ভিত্তির ওপর পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন। উমাইয়া শাসক আবদুল মালিক ভেবেছিলেন, ইবনে যুবায়ের রাযি. নিজের খেয়াল-খুশি মোতাবেক এ কাজ করেছেন; তাই স্বীয় শাসনামলে কাবা শরীফকে পুনঃসংস্কার করে আবার আগের অবস্থায় ফিরিয়ে দেন। কিন্তু যখন একাধিক বিশ্বস্ত সূত্রে উম্মুল মুমিনীন রাযি.-এর হাদীসটি নিশ্চিত হন, তখন আক্ষেপ ও অনুশোচনায় ভেঙে পড়েন।[২]

সওয়ার হয়ে তাওয়াফ করা

বিদায় হজে সওয়ারিতে আরোহণ করে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাওয়াফ করেছিলেন। এজন্য অনেকে ভেবেছেন, সওয়ার হয়ে তাওয়াফ করা সুন্নাত। এমনকি, কিছু মুজতাহিদও এমনটা ভেবেছেন। কিন্তু বাস্তবতা এমন নয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো বিশেষ কারণে সওয়ার হয়ে তাওয়াফ করেছিলেন। তিনজন সাহাবী রাযি. এ ব্যাপারে বিবৃতিও দিয়েছেন।[৩] হযরত আবদুল্লাহ

---

১. এই বর্ণনাটি অধিকাংশ হাদীসের কিতাবেই আছে। কিন্তু আমি এখানে *সহীহ মুসলিম* : বাবু নাকযিল কাবা সামনে রেখেছি।

২. *সহীহ মুসলিম* : বাবু নাকযিল কাবা। *মুসনাদে আহমাদ* : ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা : ২৫৩, ২৫৭।

৩. *সহীহ মুসলিম* : কিতাবুল হজ। হযরত আয়েশা রাযি. এবং হযরত জাবের রাযি.-এর বর্ণনা আছে; আর *আবু দাউদ*-এ হযরত ইবনে আব্বাস রাযি.-এর বর্ণনা আছে।

ইবনে আব্বাস রাযি. বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অসুস্থ ছিলেন বলে এমনটি করেছিলেন। হযরত জাবের রাযি. বলেন, যেন লোকেরা তাঁকে দেখতে পারে এবং জিজ্ঞেস করতে পারে, সেজন্য সওয়ারিতে আরোহণ করেছিলেন; কেননা ভিড়ের কারণে তাঁকে দেখা যাচ্ছিল না। হযরত আয়েশা রাযি. বলেন—তখন খুবই ভিড় ছিল, প্রত্যেকেই চাইছিল যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে থাকবে, এজন্য ভারি টানাপোড়েন শুরু হয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকদের জোর করে সরিয়ে দেওয়াও পছন্দ করলেন না; তাই সওয়ারিতে আরোহণ করলেন।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি.-এর বিবৃতিটি মেনে নিতে এজন্যই দ্বিধা হয় যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদি অসুস্থ থাকতেন, তা হলে এটা এত সাধারণ বিষয় নয় যে শুধু তিনিই জানবেন; বরং এটা লোকসম্মুখে ঘোষণা করার দাবি রাখে। তাই মনে করা হয়, ঘটনার কারণ প্রত্যেকে নিজ নিজ বুঝ অনুযায়ী ব্যক্ত করেছিলেন।

হিজরত

আজকাল হিজরতের ব্যাপারে অনেকে মনে করছেন, নিজ ঘর-বাড়ি ছেড়ে মক্কা বা মদীনায় পার হয়ে গেলেই হিজরত হয়ে যাবে। যদিও নিজ এলাকা শান্ত ও নিরাপদ আশ্রয় হয়। আতা ইবনে আবী রাবাহ রহ.-কে তাবেঈগণের মধ্যে শীর্ষস্থানীয় মনে করা হয়। তিনি একবার উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা রাযি.-এর খেদমতে হাজির হলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, হিজরতের স্বরূপ কী? তিনি বললেন,

لَا هِجْرَةَ الْيَوْمَ، كَانَ الْمُؤْمِنُوْنَ يَفِرُّ أَحَدُهُمْ بِدِيْنِهِ إِلَى اللهِ وَ إِلَى رَسُولِهِ مَخَافَةَ أَنْ يُفْتَنَ عَلَيْهِ فَأَمَّا الْيَوْمَ فَقَدْ أَظْهَرَ اللهُ الْإِسْلَامَ وَ الْيَوْمَ يَعْبُدُ رَبَّهُ حَيْثُ شَاءَ وَ لَكِنْ جِهَادٌ وَ نِيَّةٌ

অর্থ : এখন আর হিজরত নেই। একটা সময় ছিল যখন মানুষ ধর্ম

নিয়ে ভীত ছিল, তারা বিপদের হাত থেকে বাঁচার জন্য আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের কাছে পালিয়ে বেড়াত। কিন্তু আজ আল্লাহ ইসলামকে বিজয়ী করেছেন। মানুষ সর্বত্র নির্বিবাদে আল্লাহর ইবাদত করতে পারে। তবে এখন জিহাদ আছে। নিয়ত আছে।[১]

হযরত আয়েশা রাযি.-এর সুস্পষ্ট ভাষ্যের পর এই রহস্যেরও ভেদ হয় যে, হযরত ইবনে উমর রাযি. কেন বলতেন, لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ (অর্থ : মক্কা বিজয়ের পর হিজরত নেই[২])! প্রকৃতপক্ষেই মক্কা বিজয়ের পর হিজরতের প্রয়োজন ছিল না; কেননা সারা দেশে তখন ধর্মীয় শান্তি বিরাজ করছিল। তবে এখনো যদি কেউ আল্লাহর ঘরের প্রতিবেশিত্ব কামনা করে, অথবা আল্লাহর নবীর রওযার প্রতিবেশিত্ব কামনা করে এবং সেই নিয়তে মাতৃভূমি ছেড়ে সেখানে চলে যায় তা হলে নিয়তের সওয়াবটুকু অবশ্যই পাবে।

রাসূলকে ঘরে সমাহিত করা হলো কেন?

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ইন্তেকাল করলেন, তখন সাহাবা কেরাম রাযি.-এর মধ্যে এ নিয়ে মতভেদ হলো যে তাঁকে কোথায় দাফন করা হবে। একটি বর্ণনায় আছে, হযরত আবু বকর রাযি. বললেন, নবী-রাসূলগণ যেখানে মৃত্যুবরণ করেন সেখানেই সমাহিত হন। এজন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হযরত আয়েশা রাযি.-এর ঘরে সমাহিত করা হলো। কেননা তিনি সেখানেই মৃত্যুবরণ করেছিলেন।

হতে পারে, হযরত আবু বকর রাযি. কথাটি বলেছিলেন। কিন্তু এটি একটি ঐতিহাসিক বিষয়। মজবুত প্রমাণের প্রয়োজন আছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কেন কোনো ঘরের ভেতর সমাহিত করা হয়েছিল এর প্রকৃত কারণটি ব্যাখ্যা করেছিলেন হযরত আয়েশা রাযি.। তিনি বলেন,

---

১. *সহীহ বুখারী* : বাবু হিজরাতিন নাবিয়্যি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, কিতাবু মানাকিবিল আনসার। হাদীস নং ৩৯০০।

২. এই হাদীসের আরও একটি অর্থ হতে পারে, মক্কা বিজয়ের পর মক্কা থেকে হিজরত নেই।

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ مَرَضِهِ الَّذِيْ لَمْ يَقُمْ مِنْهُ لَعَنَ اللهُ الْيَهُوْدَ وَ النَّصَارَى اتَّخَذُوْا قُبُوْرَ أَنْبِيَاءِهِمْ مَسَاجِدَ، لَوْلاَ ذَلِكَ أَبْرَزَ قَبْرَهُ غَيْرَ أَنَّهُ خَشِيَ أَنْ يُتَّخَذَ مَسْجِدًا

অর্থ : রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়সাল্লাম মৃত্যুশয্যায় শায়িত হয়ে বলেছিলেন, আল্লাহ ইহুদি ও নাসারাদের অভিশপ্ত করুন, এরা এদের নবী-রাসূলের সমাধিগুলোকে সেজদার জায়গা বানিয়ে ছেড়েছিল। (হযরত আয়েশা রাযি. বলেন,) যদি এমনটা না হতো তা হলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়সাল্লামের সমাধি খোলা ময়দানে হতে পারত। কিন্তু তিনি ভয় পেয়েছিলেন যে, তাঁর সমাধিও হয়তো মসজিদে পরিণত হবে[১] (এজন্যই তাঁকে কোনো ঘরে সুরক্ষিত স্থানে সমাহিত করা হয়)।

এই হাদীসটি থেকেই প্রতীয়মান হয় যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রওযা মোবারক এখনো ছাদ ও দেয়ালের সুরক্ষিত ক্ষেত্রেই থাকতে হবে।

---

১. *সহীহ বুখারী* : কিতাবুল জানাইয, হাদীস নং ১৩৯০। *মুসনাদে আহমাদ* : ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা : ১২১।

বিশেষ কিছু গুণ ও প্রতিভা

হযরত আয়েশা রাযি.-এর শিষ্যগণ বর্ণনা করেছেন যে, ইতিহাস ও সাহিত্য এবং বক্তৃতা ও কাব্য ইত্যাদি বুদ্ধিবৃত্তিক ক্ষেত্রে উম্মুল মুমিনীন রাযি.-এর ভালো দখল ছিল। শুধু তাই নয়, চিকিৎসাবিদ্যায়ও তাঁর একরকম অভিজ্ঞতা ছিল। হিশাম ইবনে উরওয়াহ বলেন,[১]

مَا رَأَيْتُ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ أَعْلَمَ بِالْقُرْآنِ وَ لَا بِفَرِيْضَةٍ وَ لَا بِحَلَالٍ وَ لَا حَرَامٍ وَ لَا بِشِعْرٍ وَ لَا بِحَدِيْثِ الْعَرَبِ وَ النَّسَبِ مِنْ عَائِشَةَ

অর্থ : আমি কুরআন, ফারায়েয, হালাল-হারাম (অর্থাৎ ফিকহ), কাব্যিকতা, আরবের ইতিহাস ও বংশবিদ্যায় হযরত আয়েশা রাযি.-এর চেয়ে অধিক জ্ঞাত আর কাউকে দেখিনি।

চিকিৎসা

উরওয়াহ বলেন, আমি হযরত আয়েশা রাযি.-এর চেয়ে চিকিৎসাবিদ্যায় অভিজ্ঞ কাউকে দেখিনি। এ কথা সুস্পষ্ট, ওই সময় আরবে চিকিৎসাচর্চার নিয়মতান্ত্রিক রেওয়াজ ছিল না। তখন আরবের সবচেয়ে বড় হেকিম ছিলেন হারেস ইবনে কিলদাহ নামক জনৈক বৃদ্ধ। তিনি ছাড়া আরও ছোট ছোট অনেক হেকিম ও চিকিৎসক ছিলেন। চিকিৎসাবিদ্যা বলতে তখন সেটুকুই ছিল, যেটুকু একটি অশিক্ষিত-সমাজে থাকতে পারে : কিছু লতা-পাতার গুণাগুণ, কিছু ছোটখাটো রোগের পরীক্ষিত ওষুধপথ্য।

---

১. *তাযকিরাতুল হুফফাজ*, *যাহাবি*, তরজমাতু আয়েশা রাযি.।

এক ব্যক্তি হযরত আয়েশা রাযি.-কে জিজ্ঞেস করল, আপনি কাব্য বোঝেন, কবিতা বলেন; মেনে নিলাম, কারণ আপনি আবু বকর রাযি.-এর মেয়ে; কিন্তু চিকিৎসাবিদ্যায় এত জ্ঞান লাভ করলেন কোত্থেকে? তিনি বললেন, আসলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শেষ বয়সে প্রায় সবসময়ই অসুস্থ থাকতেন। আরবের বিজ্ঞ হেকিম ও চিকিৎসকগণ আসতেন। তারা চিকিৎসা-বিষয়ক অনেক কিছু বলতেন, আমি সেগুলো হৃদয়ে গেঁথে নিতাম।[১]

আমরা মনে করি, হযরত আয়েশা রাযি.-এর চিকিৎসা-জ্ঞান বলতে আহামরি কিছু ছিল না। আমাদের কয়েক প্রজন্ম আগের বুড়ো-বুড়িরা যেমন বাচ্চাকাচ্চার ছোটখাটো রোগের চিকিৎসা করত, দু-একটা হেকিমি পুঁথি ও নকশা মুখস্থ রাখত—সেরকমই কিছু। তবে আজকের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যুগে এগুলো মূল্যহীন হলেও, ওই সময় ও সমাজের কাছে এও কম ছিল না।

যাই হোক, মুসলিম নারীগণ সাধারণত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে বিভিন্ন যুদ্ধাভিযানে অংশগ্রহণ করতেন এবং আহত সৈনিকদের চিকিৎসা ও সেবা-শুশ্রূষা করতেন।[২] স্বয়ং হযরত আয়েশা রাযি.-ও উহুদের যুদ্ধে এ দায়িত্ব পালনে নিয়োজিত ছিলেন।

মোটকথা, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মোবারক যুগে মুসলিম নারীগণ প্রয়োজনীয় চিকিৎসা-জ্ঞান রাখতেন এবং অনেকে এর চর্চাও করতেন।

ইতিহাস

আরবদের বিভিন্ন সময়ের বিভিন্ন কথা, জাহেলি যুগের রীতি-প্রথা, আন্তঃগোত্রীয় বংশসূত্র—ইত্যাদি জ্ঞানে হযরত আবু বকর রাযি. একজন বড় পণ্ডিত ছিলেন।[৩] হযরত আয়েশা রাযি. তাঁর সুযোগ্য কন্যা ছিলেন।

---

১. *মুসতাদরাকে হাকেম* : ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা : ৬৭।
২. *আবু দাউদ* : কিতাবুল জিহাদ।
৩. ইসাবা ও ইসতিআবে হযরত আবু বকর রাযি. এবং হযরত হাস্সান রাযি.-এর জীবনী দেখুন। আরও দেখুন *মুসনাদে আহমাদ* : ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা : ৬৭।

তাই এই জ্ঞানগুলো তাঁর উত্তরাধিকারের মতোই ছিল।[১] উরওয়াহ বলতেন, আমি আরবদের ইতিহাস ও বংশবিদ্যায় হযরত আয়েশা রাযি.-এর চেয়ে অধিক জ্ঞানী কাউকে দেখিনি।[২]

জাহেলি আরবের রীতি-প্রথা ও সামাজিক জীবন-বৈচিত্র বিষয়ে হাদীসগ্রন্থগুলোতে অনেক অমূল্য তথ্য উঠে এসেছে হযরত আয়েশা রাযি.-এর ভাষ্যে। আরবে কত ধরনের বিবাহের প্রচলন ছিল,[৩] বিবাহ-বিচ্ছেদের কী কী পদ্ধতি ছিল,[৪] বিবাহে কোন গীতগুলো গাওয়া হতো;[৫] রোযা কেমন ও কখন ছিল,[৬] হজ কিভাবে পালিত হতো,[৭] কেউ মারা গেলে কি করতে ও বলতে হতো[৮]—ইত্যাকার প্রাচীন আরবের অনেক ধারণাই পাই তাঁর বিবৃতিতে।

হাদীসের সভায় বুআস যুদ্ধের আলোচনা আমরা হযরত আয়েশা রাযি.-এর জবানিতে পাই।[৯] আনসারীদের পূর্ব ধর্ম-জীবন এবং জীবন-ধর্ম জানি তাঁর ভাষ্যে। মুশালালের অবস্থান নিয়ে তাদের যে জিজ্ঞাসা ছিল, সেটাও আমাদের শুনিয়েছেন তিনি।[১০] ইসলামের আবির্ভাবের ঘটনাগুলোর—নবুওয়াতপ্রাপ্তি, ওহী অবতরণের সূচনা,[১১] হিজরতের প্রেক্ষাপট[১২]—বিস্তারিত ইতিহাস রচিত হয়েছে তাঁরই বর্ণনার ওপর ভিত্তি করে। ইফকের ঘটনার আগাগোড়া ইতিহাস শুনিয়েছেন তিনি নিজে।[১৩]

আশ্চর্যের বিষয়, বিশুদ্ধ গ্রন্থগুলোতে এক একটি হাদীস যেখানে দুই

---

১. *মুসনাদে আহমাদ*, ৬ষ্ঠ খণ্ড।
২. *তাযকিরাতুল হুফফাজ* : তরজমাতু আয়েশা রাযি.।
৩. *সহীহ বুখারী* : কিতাবুন নিকাহ।
৪. তিরমিযী : কিতাবুত তালাক।
৫. *মুজামে সগীর, তাবরানি* : باب الحاء।
৬. *মুসনাদে আহমাদ* : ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা : ২৪৪।
৭. *সহীহ বুখারী* : তাফসীর : .... ثم أفيضوا من ।
৮. *সহীহ বুখারী* : বাবু আইয়ামিল জাহিলিয়্যাহ।
৯. *সহীহ বুখারী* : বাবু আইয়ামিল জাহিলিয়্যাহ।
১০. *সহীহ বুখারী* : কিতাবুল হজ।
১১. *সহীহ বুখারী* : بدء الوحي।
১২. *সহীহ বুখারী* : باب الحجرة।
১৩. *সহীহ বুখারী* : হাদীসুল ইফক।

লাইন-তিন লাইন, সেখানে তাঁর এক একটি বিবৃতি দুই পৃষ্ঠা-তিন পৃষ্ঠা লাগাতার। কুরআন কীভাবে, কোন পদ্ধতিতে অবতীর্ণ হলো,[১] নামাযের কী কী পদ্ধতি ইসলামে প্রদত্ত হলো তিনিই বলেছেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মৃত্যুরোগের আদ্যোপান্ত সারা পৃথিবী জেনেছে তাঁর কাছেই।[২]

শুধু ঘরোয়া বিষয়গুলোই নয়; অসংখ্য যুদ্ধের ঘটনাও তিনিই আমাদের শুনিয়েছেন। বদর যুদ্ধের কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য,[৩] উহুদ যুদ্ধের পরিস্থিতি,[৪] পরিখার যুদ্ধের বেশ কিছু বিবরণ,[৫] বনু কুরায়যা অভিযানের কিছু অনুষঙ্গ,[৬] যাতুর রিকা যুদ্ধে 'ভীতির নামায'-এর পদ্ধতি,[৭] মক্কা বিজয়ের পর নারীদের বাইয়াত প্রসঙ্গ[৮]—ইত্যাদি বিষয়গুলো তাঁর কল্যাণেই মুসলিম ঐতিহাসিকগণ হাতে পেয়েছেন।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবন-চরিত সম্পর্কে সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য তথ্যগুলো দিয়েছেন তিনিই। ওহী, নবুওয়াত, হিজরত ইত্যাদি ছাড়াও তাঁর ইবাদত-বন্দেগী,[৯] পারিবারিক জীবন,[১০] চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য[১১] ইত্যাদির একটি সুস্পষ্ট চিত্র তিনিই আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনের সবচেয়ে কঠিন দিনগুলোর বিবরণও দিয়েছেন তিনিই।[১২]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মৃত্যুর পর হযরত আবু বকর

---

১. *সহীহ বুখারী* : বাবু তালিফিল কুরআন।
২. *সহীহ বুখারী* : বাবু ওয়াফাতিন নাবিয়্যি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।
৩. *মুসনাদে আহমাদ* : ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা : ১৫০, ২৭২।
৪. *মুসনাদে আহমাদ* : ৬ষ্ঠ খণ্ড।
৫. *মুসনাদে আহমাদ* : ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা : ১৪১।
৬. *সহীহ বুখারী* : যিকরু কুরাইযাহ।
৭. *মুসনাদে আহমাদ* : ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা : ২৭৫।
৮. *সহীহ বুখারী* : কিতাবুল হজ।
৯. *সহীহ বুখারী*, *মুসলিম*, *আবু দাউদ* ও অন্যান্য : কিতাবু সালাতিন নাবিয়্যি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।
১০. *মুসনাদে আহমাদ* : ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা : ১৮২। *সহীহ বুখারী* : باب كيف يكون الرجل في أهله।
১১. সহীহ বুখারী, *আবু দাউদ* ও অন্যান্য : কিতাবুল আদব।
১২. *সহীহ বুখারী* : باب أشد ما لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم।

রাযি.-এর খেলাফত, হযরত ফাতেমা রাযি.-সহ উম্মাহাতুল মুমিনীনের দাবি, হযরত আলী রাযি.-এর খেলাফত, বাইয়াত ইত্যাদি বিষয়গুলোর সুবিশদ বর্ণনা বিশুদ্ধ সূত্রে তিনিই আমাদের দান করেছেন।[১]

ইসলামের ইতিহাসের তিনি ছিলেন প্রত্যক্ষদর্শী। তাই এ বিষয়ে তাঁর অগাধ জ্ঞান থাকাই স্বাভাবিক। কিন্তু প্রাচীন আরবের ইতিকথা জানলেন কোথায়? এর উত্তরে হাদীসে যা পাই—তিনি এগুলো শিখেছিলেন সম্মানিত পিতা হযরত আবু বকর রাযি.-এর কাছ থেকে। তাঁর একজন শিষ্য তাঁকে উদ্দেশ্য করে বলছেন,

لَا أَعْجَبُ مِنْ عِلْمِكِ ..... أَيَّامَ الْعَرَبِ أَقُوْلُ ابْنَةُ أَبِيْ بَكْرٍ

অর্থ : আপনি আরব ইতিহাস যা জানেন, তাতে আমার আশ্চর্যবোধ নেই, কারণ আপনি হযরত আবু বকর রাযি.-এর মেয়ে।

সাহিত্য

সাহিত্য বলতে আমরা সাধারণ কথোপকথনের সৌন্দর্য ও বাক্যালাপের রুচিশীলতাকে বোঝাচ্ছি। অসংখ্য বর্ণনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, হযরত আয়েশা রাযি. কথাসৌন্দর্যে খুবই পারঙ্গম ছিলেন। তাঁর মিষ্টভাষিতা ও শুদ্ধভাষিতা ছিল অবাক করার মতো। তাঁর একজন শিষ্য হযরত মুসা ইবনে তালহা বলেন,

مَا رَأَيْتُ أَفْصَحُ مِنْ عَائِشَةَ

অর্থ : আমার দেখা হযরত আয়েশা রাযি.-এর চেয়ে বিশুদ্ধভাষী আর কেউ ছিল না।[২]

আহনাফ ইবনে কায়স লিখেন,

---

১. *সহীহ বুখারী* : ওয়াফাতুন নাবিয়্যি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, কিতাবুল ফারায়েয, গাযওয়াতু খাইরাব। *মুসলিম* : باب قوله صلى الله عليه وسلم : ما تركنا صدقة। *মুসনাদে আহমাদ* : ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা : ৬৭। *মুসতাদরাকে হাকেম*।

২. *মুসতাদরাকে হাকেম*। *তিরমিযী* : কিতাবুল মানাকিব।

তালহা থেকেও বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন, আমি হযরত আয়েশা রাযি.-এর চেয়ে বিশুদ্ধভাষী কাউকে দেখিনি।[১]

একজন ভালো বক্তার জন্য সুন্দর বাচনভঙ্গি ও বিশুদ্ধ ভাষাপ্রয়োগ-সহ সুউচ্চ কণ্ঠস্বর, ওজস্বী শব্দচয়ন ও তেজস্বী উচ্চারণেরও প্রয়োজন আছে। হযরত আয়েশা রাযি.-এর বক্তৃতায় সবগুলো গুণই বিদ্যমান। *তারীখে তাবারী*তে আছে :

فَتَكَلَّمَتْ عَائِشَةُ وَ كَانَتْ جَهْوَرِيَّةً يَعْلُوْ صَوْتُهَا كَثِيْرَةً كَأَنَّهُ صَوْتُ امْرَأَةٍ جَلِيْلَةٍ

অর্থ : তারপর হযরত আয়েশা রাযি. বক্তৃতা শুরু করলেন, তাঁর সুউচ্চ কণ্ঠস্বর সমবেত জনসমুদ্রের তরঙ্গবিক্ষুব্ধ শব্দঢেউকে ছাপিয়ে উঠল; সত্যিই এ ছিল এক ওজস্বিনী নারীর তেজোদীপ্ত ভাষণ।

জঙ্গে জামালের আলোচনায় আমরা তাঁর অল্প কয়েকটি বক্তৃতা উল্লেখ করেছি। যদিও অনুবাদে সেই প্রকৃত মহিমাটি প্রকাশ পায় না; কিন্তু ভাব ও ভাষার তেজ ও শক্তি কিছুটা অনুভব করা যায়।

কাব্যজ্ঞান

ইসলামের আগমনের পূর্বে আরবে জ্ঞানের উপাদান যা ছিল, তা এই কাব্যজ্ঞান। একজন আরব কাব্যপ্রতিভার চমক দেখাতে শুরু করলে হয়তো যুদ্ধের অনল বর্ষণ শুরু হতো; নয়ত শান্তির ঝর্ণাধারা বয়ে যেত। আরবদের এ অফুরন্ত যাদুশক্তি ছিল নারী-পুরুষ নির্বিশেষে। ইসলামের পূর্বে এবং ইসলামের পরও প্রায় একশো বছর—যখন আরবত্বের চমক ছিল—হাজার হাজার নারী কাব্য ও কাব্যিকতায় মুন্সিয়ানা দেখিয়েছেন। তাদের কামাল আজও আরবী-সাহিত্যকে করে রেখেছে মালামাল; এক অভাবনীয় অনির্বচনীয় সৌন্দর্যে ভাস্বর।

হযরত আয়েশা রাযি. ওই সময়েরই এক ক্ষণজন্মা নারীমূর্তি। তাঁর

১. *যুরকানী* : ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা : ২৬৭ (*তাবরানির* উদ্ধৃতিতে)।

জন্মদাতা পিতা কাব্যালঙ্কারের জওহরি ছিলেন।[১] তাই এ জগতে তাঁর প্রবেশ ঘটেছে বাল্যকালেই। তাঁর শিষ্যদের ভাষ্য : আমরা তাঁর কাব্যজ্ঞানে আশ্চর্যান্বিত নই; কারণ তিনি হযরত আবু বকর রাযি.-এর কন্যা।[২] ইমাম বুখারী রহ. *আল আদাবুল মুফরাদ* গ্রন্থে উরওয়াহর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, হযরত আয়েশা রাযি. কাব ইবনে আশরাফের পুরো কাসিদা মুখস্থ রেখেছিলেন। এক-একটি কাসিদায় কম-বেশি চল্লিশটি পঙ্ক্তি থাকে।[৩] জনৈক ব্যক্তি হযরত আয়েশা রাযি.-কে জিজ্ঞেস করল, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি কবিতা আবৃত্তি করতেন? তিনি বললেন, আবদুল্লাহ ইবনে রাবাহার কিছু কবিতা আবৃত্তি করতেন।[৪] যেমন :

وَيَأْتِيْكَ بِالْأَخْبَارِ مَنْ لَّمْ تُزَوِّدِ

অর্থ : যাকে পথের পাথেয় দিয়ে পাঠাওনি, সেই সংবাদ সংগ্রহ করে এনে দেবে।[৫]

আবু কাবীর হাযলী একজন জাহেলি কবি ছিলেন। তিনি তার সৎ পুত্রের প্রশংসায় বলেন,

وَ مُبَرَّأٌ مِّنْ كُلِّ غُبَّرِ حَيْضَةٍ * وَ فَسَادِ مُرْضِعَةٍ وَ دَاءٍ مُغِيْلٍ

অর্থ : সে মাতৃগর্ভের ময়লাগুলো থেকে, দুগ্ধদানকারিণীর ব্যাধিগুলো থেকে পবিত্র।

وَ إِذَا نَظَرْتَ إِلَى أَسِرَّةِ وَجْهِهِ * بَرَقَتْ كَبَرْقِ الْعَارِضِ الْمُتَهَلِّلِ

অর্থ : মুখাবয়বের রেখাগুলো দ্যাখো, ঘন বর্ষার বৃষ্টিতে মনে হবে বিদ্যুতের চমক।

---

১. *মুসনাদে আহমাদ* : ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা : ৬৭। *মুসতাদরাকে হাকেম* : যিকরু আয়েশা রাযি.। *ইসাবা* ও *ইসতিআব* : যিকরু হাস্‌সান রাযি.।

২. *মুসনাদে আহমাদ* : ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা : ৬৭। *মুসতাদরাকে হাকেম* : যিকরু আয়েশা রাযি.।

৩. *আদাবুল মুফরাদ* : বাবুশ শের।

৪. *আদাবুল মুফরাদ* : বাবুশ শের।

৫. ঝুলন্ত গীতিসপ্তকে কবিতাটি তরাফার নামে আছে।

হযরত আয়েশা রাযি. এই কবিতাপঙ্ক্তি দুটো হুযুর আনওয়ার সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে আবৃত্তি করলেন, এরপর বললেন, হে আল্লাহর রাসূল, এই কথাগুলো আপনাকেই বেশি মানায়। এ কথা শুনে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রীত হয়েছিলেন।[১]

হাদীসগ্রন্থগুলো হযরত আয়েশা রাযি.-এর জবানিতে অনেক কবিতার উল্লেখ করেছে। ভ্রাতা হযরত আবদুর রহমান ইবনে আবু বকর রাযি. জন্মভূমির বাইরে মৃত্যুবরণ করেছিলেন। তাঁর মৃতদেহ মক্কায় এনে সমাহিত করা হয়। যখন লাশ মক্কায় আনার সিদ্ধান্ত হয়ে যায়, তখন কবরের পাশে গিয়ে জাহেলি আরব কবির কবিতাটি আবৃত্তি করেন[২] :

وَكُنَّا كَنَدْمَانَيْ جُذَيْمَةَ حِقْبَةً * مِنَ الدَّهْرِ حَتَّى قِيْلَ لَنْ يَتَصَدَّعَا

অর্থ : আমরা অনেকটা কাল ছিলাম বাদশাহ জুযায়মার দুই তোষামোদের মতো। লোকে বলত, আমরা কখনো আলাদা হব না।

فَلَمَّا تَفَرَّقْنَا كَأَنِّيْ وَ مَالِكًا * لِطُوْلِ اجْتِمَاعٍ لَمْ نَبِتْ لَيْلَةً مَّعًا

অর্থ : কিন্তু আমরা আলাদা হলাম, চিরদিনের অটুট বন্ধন সত্ত্বেও আজ মনে হয় আমরা দুজন একটি রাতও একসঙ্গে থাকিনি।

মুহাজিরগণ মদীনায় এসে প্রথমে নতুন আবহাওয়া মানিয়ে নিতে পারছিলেন না। হযরত আবু বকর রাযি., হযরত আমের ইবনে ফুহায়ের রাযি. এবং হযরত বেলাল রাযি. মদীনায় এসে ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়েন। একাকিত্ব আর রোগের তীব্রতায় দেশের কথা মনে পড়ে হৃদয় ব্যাকুল হয়ে উঠছিল। হযরত আয়েশা রাযি. বলেন, তাঁরা দুজন মাতৃভূমির কথা স্মরণ করে কাঁদতেন আর কবিতা আবৃত্তি করতেন। হযরত আবু বকর রাযি.-এর জ্বর বেশি হয়ে গেলে তিনি এই কবিতা বলছিলেন,

كُلُّ امْرِإٍ مُّصَبَّحٌ فِيْ أَهْلِهِ * وَالْمَوْتُ أَدْنَى مِنْ شِرَاكِ نَعْلِهِ

---

১. হাফেয ইবনে কাইয়ুম রহ. *মাদারিজুস সালিকীন* গ্রন্থে এই ঘটনা ও কবিতাটি উল্লেখ করেছেন।
২. *তিরমিযী* : কিতাবুল জানাইয, বাবু যিয়ারাতিল কুবুর। হাদীস নং ১০৫৫।

অর্থ : মানুষ মরে নিজ ঘরে, নিজ পরিবারে; আর মরণ থাকে জুতার ফিতার চেয়ে কাছে।[১]

হযরত বেলাল রাযি. যখন একটু স্বস্তি পাচ্ছিলেন, তখন এই কবিতাটি বলছিলেন,

أَلَا لَيْتَ شِعْرِيْ هَلْ أَبِيْتَنَّ لَيْلَةً * بِوَادٍ وَ حَوْلِيْ إِذْخِرٌ وَ جَلِيْلُ

অর্থ : হায়, যদি জানতাম, আবার একদিন নিঝুম রাতে প্রিয় মক্কার সবুজ উপত্যকায় শুয়ে থাকব; আবার আমার চারপাশে ইযখির ও জালিল ঘাসগুলো শীতলতা দেবে।

وَ هَلْ أَرِدَنَّ يَوْمًا مِيَاهَ مُجَنَّةٍ * وَ هَلْ يَبْدُوْنَ لِيْ شَامَةٌ وَ طَفِيْلُ

অর্থ : আবার একদিন মুজান্নার ঝরনাগুলোয় অবগাহন করব, আবার একদিন শামা-তাফিল পাহাড়গুলো দেখে চোখ জুড়াব।

হযরত আমের ইবনে ফুহায়ের রাযি.-কে শরীরের অবস্থা জিজ্ঞেস করলে তিনি এই কবিতাটি আবৃত্তি করেন :[২]

إِنِّيْ وَجَدْتُ الْمَوْتَ قَبْلَ ذَوْقِهِ * إِنَّ الْجَبَانَ حَتْفُهُ مِنْ فَوْقِهِ

অর্থ : আমার এই স্বাদগুলো হয়তো মিটবে না, মৃত্যুর স্বাদ সব আস্বাদ কেড়ে নেবে আগেই। ভীরু কাপুরুষের ঘৃণ্য মৃত্যু দেখি ধেয়ে আসে।

বদর যুদ্ধে বড় বড় কুরাইশ নেতার মৃত্যু ঘটেছিল। কুরাইশ কবিরা তাদের শোকে মর্সিয়া লিখেছিল। এর মধ্যে কয়েকটি পঙক্তি হযরত আয়েশা রাযি.-এর জবানিতে সংরক্ষিত হয়েছে :[৩]

وَ مَاذَا بِالْقَلِيْبِ بَدْرٍ * مِنَ الْقَيْنَاتِ وَالشُّرْبِ الْكِرَامِ

---

১. *সহীহ বুখারী* : কিতাবু মানাকিবিল আনসার, বাবু হিজরাতিন নাবিয়্যি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

২. *মুসনাদে আহমাদ* : ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা : ৬৫।

৩. *সহীহ বুখারী* : কিতাবু মানাকিবিল আনসার, হাদীস নং ৩৯২১।

অর্থ : বদরের জলাশয়ে দ্যাখো, নৃত্যবাজেরা কী নিথর হয়ে আছে। দ্যাখো, সম্মানের মূর্তিগুলো কেমন নীরব।

تُحَيِّيْنَا السَّلَامَةَ أُمَّ بَكْرٍ * فَهَلْ لِيْ بَعْدَ قَوْمٍ مِّنْ سَلَامٍ

অর্থ : হে উম্মে বকর, আমাদের সালাম গ্রহণ করো; আমাদের নেতাদের বিনাশের পর কী আর সালামতি থাকে!

يُحَدِّثُنَا الرَّسُوْلُ بِأَنْ سَنَحْيَا * وَكَيْفَ حَيَاةُ أَصْدَاءٍ وَ حَامٍ

অর্থ : দূত আমাদের বলে, অচিরেই জীবিত হব, কিন্তু নিছক কলতানে জীবনের কী মূল্য আছে![১]

হযরত আয়েশা রাযি. বলেন, আমার কাছে এক কালো মহিলা আসত। সে প্রায়ই এই কবিতাটি বলত :

وَ يَوْمُ الْوِحَاشِ مِنْ تَعَاجِيْبِ رَبِّنَا * أَلَا إِنَّهُ مِنْ بَلْدَةِ الْكُفْرِ أَنْجَانِيْ

অর্থ : আমাদের পরাজয়ের দিনটি ছিল আমাদের প্রভুর অদ্ভুত লীলা, কিন্তু তা আমাদের কুফরের ভূমি থেকে মুক্তি দিয়েছে।[২]

হযরত সাদ ইবনে মুআয রাযি. পরিখার যুদ্ধে কবিতা আবৃত্তি করতেন। হযরত আয়েশা রাযি. সেগুলো মনে রেখেছিলেন :

لَيْتَ قَلِيْلًا يُدْرِكُ الْهَيْجَا جَمَلْ * مَا أَحْسَنَ الْمَوْت إِذَا حَانَ الْأَجَلْ

অর্থ : যদি শীঘ্রই আমার উটটি রণাঙ্গণে পৌছয়, তা হলে কত ভালো হবে। আহ, মৃত্যু কত না সুন্দর, যদি মৃত্যু আসে।[৩]

হযরত আয়েশা রাযি. বর্ণনা করেন, আনসারি মেয়েরা বিবাহে এই জাতীয় বিভিন্ন গীত গাইত :[৪]

---

১. জাহেলি আরবরা বিশ্বাস করত, মানুষ মরে গেলে চড়ুই জাতীয় একপ্রকার পাখির রূপ ধারণ করে উড়ে বেড়ায়, কিচিরমিচির করে।

২. *সহীহ বুখারী* : মানাকিবুল আনসার, আইয়ামুল জাহিলিয়্যাহ।

৩. *মুসনাদে আহমাদ* : ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা : ১৪১।

৪. *মুজামে তাবরানি* : باب الحاء।

وَ أَهْدَى لَهَا أَكْبُشاً تَبْحَجُ فِي الْمِرْبَدِ

وَ زَوَّجَكِ فِي النَّادِيْ وَ يَعْلَمُ مَا فِيْ غَدِ

কুরাইশ মুশরিকরা যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামে নিন্দা-কবিতা রচনা করতে লাগল, তখন মুসলিম কবিগণ তাদের দাঁতভাঙা জবাব দিতেন। কিন্তু কীভাবে, কী ভাষায় জবাব দিতেন, সেটি আমরা জানতে পেরেছি হযরত আয়েশা রাযি.-এর কল্যাণে।

উম্মুল মুমিনীন বর্ণনা করেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমরাও কুরাইশের নিন্দা-কবিতা লেখো, তোমাদের এই হামলা তিরের ফলার চেয়েও তাদের বেশি বিদ্ধ করবে। হযরত ইবনে রাওয়াহা একজন কবি ছিলেন। প্রথমে তাকেই ডাকা হলো। তিনি স্বরচিত কয়েকটি পঙ্‌ক্তি শোনালেন। কিন্তু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুব একটা পছন্দ করলেন না। এরপর কাব ইবনে মালিককে নির্দেশ দেওয়া হলো। এভাবে সর্বশেষ হযরত হাস্‌সান রাযি.-এর পালা এল। তিনি খেদমতে হাজির হলেন এবং আরজ করলেন, হে আল্লাহর রাসূল, কসম আল্লাহর- যিনি আপনাকে সত্য নবী করে পাঠিয়েছেন, আমি ওদেরকে এমনভাবে ছিলব, যেভাবে লোকে চামড়া ছিলে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তাড়াহুড়া কোরো না। আবু বকর রাযি. কুরাইশের বংশবিদ্যায় সবচেয়ে পারদর্শী। ওদের সঙ্গে আমারও সম্পর্ক আছে। আমার সম্পর্কটা আগে ভালো করে বুঝে নাও, তারপর...। তখন হযরত হাস্‌সান রাযি. হযরত আবু বকর রাযি.-এর কাছে গেলেন এবং সম্পর্কের খুঁটিনাটি বুঝে এলেন। তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল, আমি ভালো করে বুঝে নিয়েছি। কসম ওই সত্তার, যিনি আপনাকে সত্য নবী করে পাঠিয়েছেন, আমি আপনাকে ওদের মধ্য থেকে এমনভাবে বের করে আনব, যেভাবে লোকে আটার খামির থেকে চুল বের করে আনে। এরপর হযরত হাস্‌সান ইবনে সাবেত রাযি. ওই কাব্যটি রচনা করেছিলেন, যার প্রথম কবিতাটি ছিল :

وَ إِنَّ سَنَامَ الْمَجْدِ مِنْ آلِ هَاشِمٍ * بَنُوْ بِنْتِ مَخْزُوْمٍ وَ وَالِدُكَ الْعَبْدُ...

হাশেমিদের বংশগৌরবের মূল—মাখযুমের দৌহিত্ররা; আর তোর বাবা তো ছিল এক গোলাম।...

হযরত আয়েশা রাযি. বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, হে হাস্‌সান, তুমি যতক্ষণ আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের পক্ষ থেকে প্রতিউত্তরে লড়ে যাবে, ততক্ষণ পর্যন্ত রুহুল কুদুস তোমাকে সমর্থন যোগাতে থাকবেন। তিনি আরও বর্ণনা করেন, আমি তাঁকে বলতে শুনেছি, হাস্‌সান ওদের প্রতিউত্তর রচনা করে আমাকে নিশ্চিন্ত করেছে। এরপর উম্মুল মুমিনীন রাযি. একটি কবিতা শোনালেন,

هَجَوْتَ مُحَمَّدًا فَأَجَبْتُ عَنْهُ * وَ عِنْدَ اللهِ فِيْكَ الْجَزَاءُ

অর্থ : তুমি মুহাম্মাদের নিন্দা করেছ; দ্যাখো, এসেছি তার জবাব দিতে, আল্লাহর কাছে পাওনা আমার বরাদ্দ হলো।

هَجَوْتَ مُحَمَّدًا بَرًّا حَنِيْفًا * رَسُوْلَ اللهِ شِيْمَتُهُ الْوَفَاءُ

অর্থ : তুমি মুহাম্মাদের নিন্দা করেছ, অথচ কি সৎ আর সুন্দর তিনি, তিনি আল্লাহর দূত; তাঁর স্বভাব হলো সদাচার।

فَإِنَّ أَبِيْ وَ وَالِدَهُ وَ عِرْضِيْ * لِعِرْضِ مُحَمَّدٍ مِّنْكُمْ وِقَاءُ

অর্থ : আমার পিতা-পিতামহ, আমার সম্মান-সম্ভ্রম তোমাদের মতো নীচ লোকদের থেকে মুহাম্মাদের সম্মান রক্ষায় উৎসর্গিত।

ثَكِلْتُ بُنَيَّتِيْ إِنْ لَمْ تَرَوْهَا * تُثِيْرُ النَّقْعَ مِنْ كَنَفَيْ كَدَاءِ

অর্থ : আমি আমার সন্তানদের ভুলে যাব, যদি তাদেরকে না দ্যাখো—ভয়ঙ্কর যোদ্ধাবেশে কাদার দুই ধারের ধুলি উড়িয়ে ধেয়ে আসতে,

يُبَارِيْنَ الْأَعِنَّةَ مُصْعِدَاتٍ * عَلَى أَكْتَافِهَا الْأَسَلُ الظِّمَاءُ

অর্থ : সোনার নকিল পরানো, উৎকৃষ্ট ভূমি-চড়ানো তোমাদের উটনীদের বক্ষদেশে পিয়াসার বর্শা হানতে।

تَظَلُّ جِيَادُ نَا مُتَمَطِّرَاتٍ * تُلَطِّمُنَّ بِالْخُمُرِ النِّسَاءُ

অর্থ : আমাদের ঘোড়াগুলো বিদ্যুতের মতো দ্রুতগামী; আমাদের নারীরা ওড়না দিয়ে তাদের মুখ মুছে দেয়।

فَإِنْ أَعْرَضْتُمُوا عَنَّا اعْتَمَرْنَا * وَكَانَ الْفَتْحُ وَ انْكَشَفَ الْغِطَاءُ

অর্থ : হে কুরাইশ, যদি বিরত থাক, তা হলে শুধু উমরা করে ফিরে আসব; একদিন বিজয় হবে, তোমাদের চোখের পর্দা উঠে যাবে।

وَ إِلَّا فَاصْبِرُوْا لِضِرَابِ يَوْمٍ * يُعِزُّ اللهُ فِيْهِ مَنْ يَّشَاءُ

অর্থ : নয়তো ধৈর্য ধরো এমন দিনের আক্রমণের, যেদিন আল্লাহ যাকে চান, সম্মানিত করবেন।

وَ قَالَ اللهُ قَدْ يَسَّرْتُ جُنْدًا * هُمُ الْأَنْصَارُ عُرْضَتُهَا اللِّقَاءُ

অর্থ : আল্লাহ বলে দিয়েছেন, আমি সাহায্যকারী বাহিনী প্রস্তুত করে রেখেছি, যাদের দেখা পাবে সম্মুখ সমরে।

لَنَا فِيْ كُلِّ يَوْمٍ مِّنْ مَّعْدٍ * سِبَابٌ أَوْ قِتَالٌ أَوْ هِجَاءٌ

অর্থ : প্রতিদিন মাআদের কবিলার সঙ্গে আমাদের বিবাদ থাকে, লড়াই থাকে, নিন্দা-প্রতিনিন্দা থাকে।

فَمَنْ يَّهْجُوْ رَسُوْلَ اللهِ مِنْكُمْ * وَيَمْدَحُهُ وَيَنْصُرُهُ سَوَاءُ

অর্থ : তোমরা আল্লাহর রাসূলের নিন্দা কর, বন্দনা কর, সাহায্য কর—সবই সমান।

وَ جِبْرِيْلُ رَسُوْلُ اللهِ فِيْنَا * وَ رُوْحُ الْقُدْسِ لَيْسَ لَهُ كِفَاءُ

অর্থ : জিবরীল আমাদের বার্তাবাহক, তোমাদের মধ্যে তাঁর নেই কোনো প্রমাণ।[১]

১. আলোচ্য ঘটনা ও কবিতাগুলো *সহীহ মুসলিম* : মানাকিবু হাস্‌সান রাযি. অংশে আছে।

হযরত উসমান রাযি.-এর শাহাদতের পর যখন মদীনার অশান্তির কথা জানতে পারলেন, তখন তাঁর মুখে উচ্চারিত হলো এই আক্ষেপের বাণী :[1]

وَ لَوْ أَنَّ قَوْمِيْ طَاوَعَتْنِيْ سُرَاتُهُمْ لَأَنْقَذْتُهُمْ مِّنَ الْحِبَالِ أَوِ الْخَبَلِ

অর্থ : যদি আমার গোত্রের মাথাগুলো আমার কথাগুলো মানত, তবে আজ এ বিনাশ দেখতে হতো না।

সবুজ-শ্যামল জনবসতির পথ মাড়িয়ে যখন বসরায় পৌছলেন, তখন তাঁর কাব্যে এ সাবধান বাণী :[2]

دَعِيْ بِلَادَ جُمُوْعِ الظُّلْمِ إِذْ صَلُحَتْ * فِيْهَا الْمِيَاهُ وَ سِيْرِيْ سَيْرَ مَذْعُوْرِ

অর্থ : অত্যাচারীদের ভূমি ছেড়ে, যেখানে সরোবরের স্বচ্ছ পানি, চলো, দুরুদুরু বুকে।

تَخَيَّرِيْ النَّبْتَ فَارْعِيْ ثُمَّ ظَاهِرَةً وَبَطْنُ وَادٍ مِّنَ الضَّمَادِ مَمْطُوْرُ

অর্থ : বেছে নাও সবুজ ঘাসগুলো, ওখানে সূর্যকিরণ, দমাদের শ্যামল প্রান্তরে।

জঙ্গে জামালে যোদ্ধারা যে রণসঙ্গীতে উজ্জীবিত হয়ে প্রাণপণে লড়ে যাচ্ছিল, তা তাঁর স্মৃতি থেকে মুছত না। একবার সেগুলো আবৃত্তি করে করে অঝোরে অশ্রুপাত করেছিলেন অনেকক্ষণ।[3] সেগুলোর একটি উল্লেখযোগ্য পঙ্ক্তি হলো :

يَا أُمَّنَا يَا خَيْرَ أُمٍّ نَعْلَمْ

أَمَا تَرَيْنَ كَمْ شُجَاعٍ يُّكْلَمْ

تَخْتَلِيْ هَامَتُهُ وَ الْمُعْصَمْ

---

১. *তাবরানি* : ৩০৯৯।

২. *তাবরানি* : ৩১০৫।

৩. *তাবরানি* : ৩২০১।

হে আমাদের মাতা,
হে আমাদের শ্রেষ্ঠ মাতা,
আমরা জানি, আপনি কি দেখছেন না,
আপনার বীর সন্তানেরা লড়ে যাচ্ছে—ক্ষতবিক্ষত দেহে!

আপনার তরে, ঘাস আর পাতার মতো, আপন হাত আর মাথা কাটতে দেওয়া, আপনার বীর সন্তানদের জন্য যে কিছুই নহে।

হযরত আয়েশা রাযি.-এর কাব্যরুচিতে প্রীত হয়ে আরব-কবিরা স্বরচিত কাব্যগুলো তাঁকে শোনাতেন।[১] হযরত হাস্‌সান ইবনে সাবেত রাযি. আনসারিদের মধ্যে সর্বজনস্বীকৃত কবিগুরু ছিলেন। ইফকের ঘটনায় জড়িত থাকায় তাঁর প্রতি উম্মুল মুমিনীনের অসন্তুষ্টি থাকার কথা ছিল; তারপরও তিনি সম্মানিতা মাতার খেদমতে হাজির হতেন এবং নিজের লেখা কাব্যগুলো শোনাতেন। হযরত আয়েশা রাযি. তাঁর কবিতার প্রশংসা করতেন, কবির মর্যাদা ও মাহাত্ম্যের কথা বলতেন।[২] এছাড়াও কবি কাব ইবনে মালিক রাযি. এবং কবি আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা রাযি.-এর নামও তাঁর আলোচনায় উঠে আসত বারবার।[৩]

হাদীসে এসেছে, যদি কারও পেট পুঁজে ভরে যায়, তা হলে তাও ভালো—কবিতায় পেট ভরানোর চেয়ে।[৪] হাদীসটির রাবী হিসেবে হযরত আবু হুরায়রা রাযি.-এর নাম আছে। যেহেতু হাদীসটি থেকে কাব্যিকতার নিন্দা হয়, সেহেতু কেউ কেউ বলেছেন, হাদীসটি যখন হযরত আয়েশা রাযি. জানলেন, তখন বললেন, আবু হুরায়রা রাযি.-এর বর্ণনাটি সুরক্ষিত থাকেনি। আসলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন, যদি কারও পেট পুঁজে ভরে যায়, তা হলে তাও ভালো ওই সব কবিতায় ভরা থেকে যেগুলো আমার নিন্দায় রচিত হয়েছিল।[৫]

---

১. *সহীহ বুখারী* : মানাকিবু হাস্‌সান রাযি.।
২. *সহীহ বুখারী* : মানাকিবু হাস্‌সান রাযি.।
৩. *সহীহ বুখারী* : মানাকিবু হাস্‌সান রাযি.।
৪. *আদাবুল মুফরাদ* : বাবুশ শের।
৫. *আইনুল ইসাবা*, সুয়ূতি রহ. (আবূ মানসুর বাগদাদির উদ্ধৃতি অনুসারে)।

কিন্তু বাস্তবতা হলো, হাদীসটি এসেছে কালবির সূত্রে, যিনি একজন পরিচিত মিথ্যাবাদী। ধুরন্ধর ও অসৎ। যেহেতু তিনি জানতেন যে, হযরত আয়েশা রাযি. সাহাবীগণের হাদীসের ইসতিদরাক বা সংশোধন করতেন, আবার কাব্যিকতা তাঁর শখের বস্তু ছিল; সেহেতু এই নামটিই তার ঘটে ধরে। কিন্তু মুহাদ্দিসগণ সুস্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, কালবির হাদীসটি বানোয়াট, ভিত্তিহীন, মাওযু।[১]

প্রকৃতপক্ষে, কাব্যিকতা মৌলিকভাবে না ভালো, না মন্দ। এটি ভাষার একটি বিশেষ নান্দনিক রূপ। ভাষার ভালো-মন্দ যাচাই ভাষার রূপ ও ছন্দ অনুযায়ী হয় না; বরং মর্ম ও বিষয়বস্তু অনুযায়ী হয়। বিষয়বস্তু যদি খোদাভীতি ও আনুগত্যের পরিপন্থী না হয়, সভ্যতাবর্জিত না হয়, তা হলে কোনো সমস্যা নেই; অন্যথায় তা ভাষার মুখের কালো দাগ ও চরিত্রের কলঙ্ক হয়ে থাকে। এ কথাগুলো শুধু পদ্যে নয়, গদ্যেও প্রযোজ্য। ইমাম বুখারী রহ. কাব্যিকতার ভালো-মন্দ বিচারে হুবহু এই সিদ্ধান্তটিই বিবৃত করেছেন হযরত আয়েশা রাযি.-এর জবানিতে :

الشِّعْرُ مِنْهُ الْحَسَنُ وَ الْقَبِيْحُ خُذْ بِالْحَسَنِ وَ دَعِ الْقَبَائِحَ

অর্থ : কবিতা ভালোও আছে, মন্দও আছে; যেগুলো ভালো সেগুলোই গ্রহণ করো, যেগুলো মন্দ সেগুলো বর্জন করো।

হযরত আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন, বড় গুনাহগার ওই সব কবি যারা পুরো গোত্রের নিন্দা করে।[২] অর্থাৎ শুধু দু-একজন মানুষের দোষের কারণে পুরো বংশ তুলে গালিগালাজ করা একটি চারিত্রিক খুঁত এবং কবিপ্রতিভার অপব্যবহার।

---

১. *মাওযূআতে শাওকানি রহ.* : ৪০১ পৃষ্ঠা।

২. *আদাবুল মুফরাদ*, বাবুশ শের। *আবূ ইয়ালা* : মুসনাদে আয়েশা রাযি.।

তালীম, ইফতা, ইরশাদ

তালীম

ইলমের খেদমত বলতে যা বোঝায় তার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো ইলমের আলো অন্যের কাছে পৌঁছে দেওয়া এবং এর মাধ্যমে আত্মসংশোধন ও জাতিগঠনে নিয়োজিত থাকা। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলে গেছেন, فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ—উপস্থিত ব্যক্তি যেন অনুপস্থিত ব্যক্তির কাছে পৌঁছে দেয়। প্রশ্ন হলো, উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা রাযি. কি এই দায়িত্বটি পালন করেছিলেন? আমরা এই প্রশ্নটির উত্তর 'তালীম, ইফতা ও ইরশাদ' শীর্ষক তিনটি অধ্যায়ে আলোচনা করার প্রয়াস পাব।

হযরত আয়েশা রাযি.-এর দরসগাহ

ইলমের প্রচার-প্রসার ও জ্ঞান-বিতরণ—যারা মনে করেন শুধু পুরুষরাই পারে, তারা দেখে যান, নববী-নীড়ের এই প্রদীপ্ত শিখাটি জ্ঞানের আলো ছড়াতে কেমন অনির্বাণ।

সাহাবা কেরাম রাযি. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তিরোধানের পর ইলমের প্রচার ও ইসলামের প্রসারের নিমিত্তে সারা ইসলামী জাহানে ছড়িয়ে পড়েন। মক্কা, তায়েফ, বাহরাইন, ইয়ামান, দামেশক, মিশর, কুফাসহ বড় বড় কেন্দ্রীয় শহরগুলোতে সাহাবা-কাফেলার মহিমান্বিত শিক্ষকবৃন্দের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জামাত আবাস গাড়েন। দীর্ঘ সাতাশ বছর পর মুসলিম খেলাফতের প্রশাসনিক রাজধানী প্রথমে কুফায় এবং পরে দামেশকে স্থানান্তরিত হয়।

এত সব বৈপ্লবিক পরিবর্তন সত্ত্বেও মদীনা মুনাওওয়ারার রুহানী আজমত, আত্মিক মাহাত্ম্য এতটুকু ক্ষুণ্ন হয়নি। বরং তখনো ইসলামী জ্ঞানচর্চার মূল কেন্দ্র হিসেবে আপন মহিমাকে ধরে রেখেছিল। হযরত ইবনে উমর রাযি., হযরত আবু হুরায়রা রাযি., হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. এবং হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত রাযি. কায়মনোবাক্যে ইলমে নববীর আলো বিতরণ করে চলেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে তাঁরা প্রত্যেকেই ছিলেন এক একটি জীবন্ত মাদরাসা। মদীনার বিভিন্ন জায়গায় তাঁদের নুরানী দরস-মজলিসগুলো এক একটি আলোর আকর হিসেবে কাজ করে যাচ্ছিল। কিন্তু শ্রেষ্ঠ দরসগাহ হিসেবে পরিগণিত ছিল মসজিদে নববীসংলগ্ন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও হযরত আয়েশা রাযি.-এর বাসগৃহের পাশে অবস্থিত ছাউনিটি।

দরসদানের পদ্ধতি

শিশু, নারী এবং যেসব পুরুষের সঙ্গে হযরত আয়েশা রাযি.-এর পর্দা ছিল না, তারা ঘরের ভেতরে বসতেন। অন্যরা কামরার সামনে মসজিদে নববীতে বসতেন। দরজায় পর্দা ঝোলানো থাকত। পর্দার আড়ালে তিনি বসতেন।[১] শিষ্যরা জিজ্ঞেস করত, তিনি উত্তর দিতেন। কখনো কোনো নির্দিষ্ট বিষয়ের আলোচনা উঠত, গুরু-শিষ্যের মধ্যে কথোপকথন চলত।[২] কখনো নিজেই কোনো মাসআলার চুলচেরা বিশ্লেষণ করতেন, লোকেরা নীরবে শুনতে থাকত।

বিশুদ্ধ ভাষায় কথা বলার ব্যাপারে কঠোরতা

শিষ্যদের ভাষা, বাচনভঙ্গি ও বিশুদ্ধ উচ্চারণেরও কঠোর তত্ত্বাবধান করতেন। একবার তাঁর দুই ভাতিজা কাসেম ও ইবনে আবি আতিক তাঁর খেদমতে এলেন। তাঁরা দুজন বৈমাত্রেয় ভাই ছিলেন। কাসেমের ভাষা পরিচ্ছন্ন ছিল না। ব্যাকরণগত ত্রুটি ছিল। হযরত আয়েশা রাযি. বললেন, তুমি এভাবে বল না কেন, যেভাবে ইবনে আবি আতিক বলছে? বুঝেছি,

---

১. *মুসনাদে আহমাদ* : ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা : ১৭২। *ইবনে সাদ* : ২/২/২৯।

২. *মুসনাদে আহমাদ* : ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা : ৭৫।

তাকে তার মা এবং তোমাকে তোমার মা শিখিয়েছেন। কাসেমের মা একজন দাসী ছিলেন। তাই তার ভাষাজ্ঞান তেমন ছিল না। ...

শিক্ষার্থী, এতিম ও পালক-পালিকা

অনিয়মিত শিক্ষার্থীরা ছাড়াও, তিনি আত্মীয়স্বজন ও পাড়াপ্রতিবেশীর ছেলে-মেয়ের, এবং শহরের বিভিন্ন এতিম শিশুর তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব গ্রহণ করতেন এবং নিজে তাদের শিক্ষা-দীক্ষা ও তালীম-তরবিয়াতের ব্যবস্থা করতেন। অনেক সময় এমনও হতো, যে ছেলেগুলোকে সম্ভাবনাময় মনে করতেন, একটু বড় হলেও, নিজের বোন বা ভাতিজি কাউকে দিয়ে দুধ পান করাতেন এবং তাদের দুধফুফু অথবা দুধনানী হয়ে যেতেন, তারপর তাদের ভেতরে আসার অনুমতি দিতেন।[১] যারা ভেতরে আসার অনুমতি লাভ করতেন না, অর্থাৎ যারা মাহরাম ছিলেন না, তাদের খুব আক্ষেপ হতো যে, আমরা ভালোভাবে ইলম হাসিলের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছি। তাবেঈ কুবাইসা রহ. আক্ষেপ করে বলতেন, উরওয়াহ আমার চেয়ে এগিয়ে গিয়েছিল শুধু এ কারণে যে, সে ভেতরে যাওয়ার সুযোগ পেত।[২] ইমাম নাখঈ রহ. ইরাকের সর্বজনস্বীকৃত ইমাম ছিলেন।[৩] তিনি হযরত আয়েশা রাযি.-এর খেদমতে হাজির হতে পেরেছিলেন বলে সমসাময়িক সকলে তাঁকে ঈর্ষা করতেন।[৪]

সাধারণ মানুষের জ্ঞান অর্জন

হযরত আয়েশা রাযি.-এর নীতি ছিল, তিনি প্রতি বছর হজে যেতেন। সমগ্র ইসলামী জাহানের মুসলিমগণ বছরে একবার হজের ময়দানে এসে এককাতারে দাঁড়াবার সুযোগ পেতেন। হেরা ও সাবির পর্বতের মাঝামাঝি

---

১. *সহীহ মুসলিম* : باب رضاع الكبر। *মুসনাদে আহমাদ* : ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা : ২৭১। এই মাসআলায়—যেমনটি পূর্বে আলোচিত হয়েছে—হযরত আয়েশা রাযি.-এর এটি একক মত। অন্য কেউ তাঁকে সমর্থন করেননি।

২. *তাহযিব*, ইবনে হাজার : তরজমায়ে আয়েশা রাযি.।

৩. *তাযকিরা*, ইমাম যাহাবি : তরজমায়ে ইমাম নাখঈ।

৪. *মুসনাদে আহমাদ* : ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা : ২।

জায়গায় হযরত আয়েশা রাযি.-এর তাঁবু ফেলা হতো।[১] সারা দুনিয়ার ইলমে নববীর পিপাসুরা দূরদূরান্ত থেকে দলে দলে এসে জড়ো হতেন।[২] তারা অসংখ্য মাসায়েল পেশ করতেন, উত্তর চাইতেন। বিভিন্ন সংশয় ও সন্দেহের নিরসন চাইতেন। কিছু কিছু বিষয়ে জিজ্ঞেস করতে অনেকে ইতস্তত করতেন। তিনি আশ্বস্ত করতেন এবং নিঃসঙ্কোচে প্রশ্ন করার উৎসাহ দিতেন। একবার এক ব্যক্তি কিছু জিজ্ঞেস করতে চাইছিল। কিন্তু লজ্জা পাচ্ছিল। তিনি বললেন, তুমি তোমার মাকে যা জিজ্ঞেস করতে পারতে, আমাকেও তা জিজ্ঞেস করতে পারো।[৩] একই ঘটনা একবার হযরত আবু মুসা আশআরি রাযি.-এর সঙ্গে ঘটেছিল। তাঁকেও এ কথাই বলেছিলেন।[৪] বাস্তবেও তিনি ছাত্রদের একজন মমতাময়ী মায়ের মতোই দেখতেন। উরওয়াহ, কাসেম, আবু সালামা, মাসরুক, উমরাহ, সাফিয়্যা প্রমুখের তালীম-তারবিয়াত এ রকম মাতৃসুলভ স্নেহ নিয়েই করেছিলেন। বরং অনেককে পালক-পালিকারূপেও গ্রহণ করতেন। শুধু তা-ই নয়, তাদের খরচপাতির দায়ও নিজে ঘাড়ে নিতেন। কিছু কিছু শিক্ষার্থীর প্রতি তাঁর এত মমতা ছিল যে, তাঁর আপনজনেরাও তাদের প্রতি ঈর্ষান্বিত হয়ে পড়তেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের রাযি. তাঁর খুবই প্রিয় ছিলেন। তিনি তাঁকে আপন সন্তানের মতো বড় করেছিলেন। তিনিও বড় হয়ে সম্মানিতা খালার এক খুদে শিক্ষার্থী আসওয়াদকে ঈর্ষা করতেন। তিনি আসওয়াদকে বলেছিলেন, উম্মুল মুমিনীন তোমাকে যা যা শেখাবে, সব আমাকে জানাবে।[৫] শিক্ষার্থীরাও তাঁর আপনজনদেরকে সেরকম সম্মানই করতেন। উমরাহ এক আনসারি মেয়ে ছিলেন। কিন্তু উম্মুল মুমিনীনকে খালা বলতেন।[৬] তাবেঈ মাসরুক ইবনে আজদাকে তিনি

---

১. *ইবনে সাদ* : جزء المدينين ২১৮ পৃষ্ঠায় কোহে হেরা ও ওয়াদি সাবিরের মাঝামাঝি জায়গার উল্লেখ এসেছে; কিন্তু *সহীহ বুখারী* ১ম খণ্ড ২১৯ পৃষ্ঠায় ওয়াদি সাবিরের মধ্যস্থলের কথা এসেছে।

২. *ইবনে সাদ* : জুযউ আহলিল মাদীনা, ২১৮ পৃষ্ঠা। *মুসনাদে আহমাদ* : ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা : ৪০। *সহীহ বুখারী* : /২১৯।

৩. *মুসনাদে আহমাদ* : ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা : ৯০।

৪. *মুয়াত্তা*, ইমাম মালেক : باب الغسل।

৫. *মুসনাদে আবু দাউদ, তয়ালিসি* : /১৯৭।

৬. *তাযকিরা*, ইমাম যাহাবি।

পোষ্যরূপে গ্রহণ করেছিলেন।[১] তিনি হযরত আয়েশা রাযি.-এর নাম নিতেন বড় আজমত আর মহব্বতের সঙ্গে। তিনি বলতেন, اَلصِّدِّيْقَة ، بِنْتُ الصِّدِّيْقِ ، حَبِيْبَةُ حَبِيْبِ اللهِ ، اَلْمُبَرَّأَةُ مِنَ السَّمَاءِ—সিদ্দীকা (সত্যবাদিনী), বিনতুস-সিদ্দীক (সিদ্দীকের কন্যা), হাবিবাতু হাবিবিল্লাহ (আল্লাহর প্রিয়তমের প্রিয়তমা), আল-মুবাররআ মিনাস-সামা (আসমান হতে যার পবিত্রতা ঘোষিত হয়েছে)।

বিভিন্ন ধরনের শিষ্য

তাঁর দীর্ঘ সাহচর্যে ধন্য হয়েছেন এমন শিক্ষার্থীর সংখ্যা কম নয়। হযরত আয়েশা রাযি.-এর সবচেয়ে বেশি হাদীস এসেছে *মুসনাদে আহমাদে*। যেই শিষ্যগণ এই হাদীসগুলো বর্ণনা করেছেন তাদের সংখ্যা, যতদূর গুনতে পেরেছি, প্রায় দুইশো জন। এতে নারী-পুরুষ, সাহাবী-তাবেঈ, স্বাধীন-গোলাম, আত্মীয়-অনাত্মীয় সব ধরনের মানুষই আছেন। আবু দাউদ তয়ালিসি (মৃত্যু : ২০৪ হি.), যিনি ইমাম বুখারী রহ.-এর পূর্ববর্তী ছিলেন, *মুসনাদে* হযরত আয়েশা রাযি.-এর প্রত্যেকটি শিষ্যের বর্ণনা আলাদা-আলাদাভাবে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু তা খুব ছোট্ট পরিসরের ছিল, তাই হাদীস সংখ্যাও কম। ইবনে সাদ *তাবাকায়ে আহলে মদীনা*-য় তাঁর শিষ্যদের পরিসংখ্যান দিয়েছেন এবং তাদের জীবন-বৃত্তান্ত তুলে ধরেছেন।

সাহাবী, তাবেঈ, আত্মীয়, গোলাম

ইবনে হাজার আসকালানী রহ. *তাহযীবুত তাহযীব*-এ আত্মীয়, গোলাম, সাহাবী ও তাবেঈ—এই ক্রমানুসারে একটি তালিকা দিয়েছেন। এতে সাহাবীগণের তালিকায় নিম্নোক্ত ব্যক্তিবর্গের নাম আছে :

হযরত আবু মুসা আশআরি, হযরত আবু হুরায়রা, হযরত ইবনে উমর, হযরত ইবনে আব্বাস, হযরত আমর ইবনুল আস, হযরত যায়েদ

---

১. *তাযকিরা*, ইমাম যাহাবি। *তাহযিব*, ইবনে হাজার : তরজমায়ে মাসরুক।

ইবনে খালেদ জুহানী, হযরত রবিআহ ইবনে আমর জারশি, সাইব ইবনে ইয়াযিদ, হারেস ইবনে আবদুল্লাহ প্রমুখ রাযি.।

গোলামদের মধ্যে আবু ইউনুস, যাকওয়ান, আবু আমর, ইবনে ফারাখ প্রমুখের নাম *তাহযীবেই* এসেছে। এছাড়া আবু মুদাল্লাহ মাওলা আয়েশা রাযি.-এর নাম এসেছে *তিরমিযীতে*।[১] আবু লুবাবাহ মারওয়ানের নাম এসেছে *ইবনে সাদে*।[২] আবু ইয়াহয়া[৩] ও আবু ইউসুফের নাম এসেছে *মুসনাদে*।[৪] আলোচ্য ব্যক্তিদের মধ্যে যাকওয়ান ও আবু ইউনুস সবচেয়ে প্রসিদ্ধ।

মুসনাদে আবদুল্লাহ ইবনে ইয়াযিদ রাযিয়ে আয়েশা (আয়েশার দুগ্ধপোষ্য[৫])-এর নাম এসেছে। রিজাল গ্রন্থগুলোতেও এটুকুই আলোচিত হওয়ায় আলোচ্য ব্যক্তি সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য মেলেনি।

আত্মীয়দের মধ্যে উম্মে কুলসুম বিনতে আবু বকর (বোন); আওফ ইবনে হারেস (দুধভাই); কাসেম ইবনে মুহাম্মাদ, আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ (ভাতিজা); হাফসা বিনতে আবদুর রহমান, আসমা বিনতে আবদুর রহমান (ভাতিজি); আবদুল্লাহ ইবনে আতিক ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আবদুর রহমান (প্রপৌত্র); আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের, কাসেম ইবনে যুবায়ের (ভাগ্নে); আয়েশা বিনতে তালহা (ভাগ্নি); এবং আব্বাদ ইবনে হাবিব ও আব্বাদ হামযা (ভাগ্নের পুত্র) বিশেষভাবে উল্লেখ্য। এছাড়াও বেশ কিছু নিকটাত্মীয় ও কাছের মানুষের ছেলে-মেয়ের লালন-পালন করেছেন বলে পাওয়া যায়। *তাবাকাতে ইবনে সাদ* গ্রন্থে তাদের তালিকা আছে।

---

১. *তিরমিযী* : বাবু আইয়ু কালামিন আহাব্বু ইলাল্লাহ, ৫৯৭ পৃষ্ঠা।

২. *ইবনে সাদ* : আহলুল মাদীনা, যিকরুল মাওয়ালি।

৩. *মুসনাদে আহমাদ* : ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা : ২৫৮।

৪. *মুসনাদে আহমাদ* : ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা : ৬৭।

৫. *মুসনাদে আহমাদ* : ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা : ৩২। উল্লেখ্য : রিজালগ্রন্থগুলোতে আবদুল্লাহ ইবনে ইয়াযিদের নামের সঙ্গে সবসময় রাযিয়ে আয়েশা (আয়েশা রাযি.-এর দুগ্ধপোষ্য) কথাটি লেখা থাকে। তিনি কি স্বয়ং হযরত আয়েশা রাযি.-এরই দুগ্ধপোষ্য ছিলেন, না তাঁর নির্দেশে তাঁর কোনো মাহরাম আত্মীয়ার দুগ্ধপোষ্য ছিলেন?—এ ব্যাপারে কোথাও কোনো ব্যাখ্যা বা টীকা আমরা পাইনি।

তাবেঈগণের মধ্যে যারা হাদীস-শাস্ত্রে স্মরণীয় হয়ে আছেন, তাদের মধ্যে ওই সময়কার সকলেই তাঁর ছাত্রত্ব গ্রহণ করেছিলেন। মুসনাদ-গ্রন্থগুলোতে এরকম দেড় শতাধিক ব্যক্তির নাম আছে। শুধু তাদের তালিকা দিতে গেলেও কয়েক পৃষ্ঠার প্রয়োজন হবে। তাই কলম সংযত করতে হচ্ছে।

নারী শিষ্যবৃন্দ

তবে তাদের মধ্যে নারী শিষ্যগণের একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা দেওয়ার প্রয়োজন অনুভব করছি। কেননা পুরুষ শিক্ষার্থীগণ অনেকে অন্য সাহাবী থেকেও উপকৃত হতে পারতেন। কিন্তু নারী শিষ্যগণ সাধারণত অন্য কারও দরস থেকে ইস্তিফাদা করার সুযোগ পাননি বললেই চলে; তাই তারা যে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখে গেছেন তা কেবল হযরত আয়েশা রাযি.-এরই অবদানে। তারা হলেন :

১. আসমা বিনতে আবদুর রহমান।

২. বারীরাহ মাওলা আয়েশা রাযি. (হযরত আয়েশা রাযি.-এর আজাদকৃত বাঁদি)।

৩. বানানাহ বিনতে ইয়াযিদ।

৪. বানানাহ মাওলা আবদুর রহমান (আবদুর রহমানের আজাদকৃত বাঁদি)।

৫. বুহায়না।

৬. তাবালাহ বিনতে ইয়াদি আল বাশমিয়াহ।

৭. জাসারাহ।

৮. হাফসা বিনতে আবদুর রহমান।

৯. খাইরাহ (হযরত হাসান বসরি রহ.-এর মা)।

১০. যুফরাহ।

১১. দামিসাহ।

১২. যায়নাব বিনতে আবি সালামা।

১৩. যায়নাব বিনতে মুহাম্মাদ।

১৪. যায়নাব বিনতে নসর।

১৫. সায়েবা।

১৬. সালমা আল বিকরিয়াহ।
১৭. সুমাইয়া আল বসরিয়াহ।
১৮. শামসিয়াহ।
১৯. সাফিয়া বিনতে হারেস।
২০. সাফিয়্যা বিনতে শাইবা সাহেবায়ে আয়েশা রাযি.।
২১. সাফিয়্যা বিনতে উবায়েদ।
২২. সাফিয়্যা বিনতে আতিয়া।
২৩. আয়েশা বিনতে তালহা।
২৪. উমরা বিনতে আবদুর রহমান।
২৫. উমরা বিনতে কায়স আদাবিয়া।
২৬. ফাতেমা বিনতে আবি জাইশ।
২৭. কারিমা বিনতে হুমাম।
২৮. কুলসুম বিনতে আমর সাহেবায়ে আয়েশা রাযি.।
২৯. কুমায়ের বিনতে উমায়ের।
৩০. মুআযাহ।
৩১. মাইমুনা বিনতে আবদুর রহমান।
৩২. হানিদ।
৩৩. হুনাইদা।

যারা কুনিয়ত বা উপনামে পরিচিত

১. উম্মে বকর।
২. উম্মে জামদার।
৩. উম্মে হামিদা।
৪. উম্মে দারদা।
৫. উম্মে যারাহ (আয়েশা রাযি.-এর আজাদকৃত বাঁদি)।
৬. উম্মে সালেম।
৭. উম্মে সাঈদা।
৮. উম্মে আসেম।
৯. উম্মে আলকামা।
১০. উম্মে কুলসুম (বিনতে আবু বকর সিদ্দীক রাযি.)।

১১. উম্মে কুলসুম বিনতে সামামা।

১২. উম্মে কুলসুম আল লাইসিয়া।

১৩. উম্মে মুহাম্মাদ।

১৪. উম্মে আবদুল্লাহ।

১৫. উম্মে বেলাল।

বিশিষ্ট শিষ্যবৃন্দ

হযরত আয়েশা রাযি.-এর শিষ্যত্বগ্রহণকারী নারী-পুরুষের মধ্যে যারা তাঁর একান্ত সাহচর্যে লালিত-পালিত হয়ে বড় হয়েছিলেন, এবং হাদীস-শাস্ত্রে অগাধ পাণ্ডিত্য দেখিয়ে হযরত আয়েশা রাযি.-এর জ্ঞানভাণ্ডারের চাবি বলে অভিহিত হয়েছিলেন তারা হলেন :

উরওয়াহ ইবনে যুবায়ের

উরওয়াহ—হযরত যুবায়ের রাযি.-এর ছেলে, হযরত আবু বকর রাযি.-এর নাতী, হযরত আসমা বিনতে আবু বকর রাযি.-এর পুত্র, হযরত আয়েশা রাযি.-এর ভাগ্নে। তিনি সম্মানিতা খালার অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন। একেবারে ছোট্টবেলা থেকে হযরত আয়েশা রাযি.-এর প্রতিপালনে বড় হন। মদীনায় জ্ঞানে-গুণে ছিলেন সবচেয়ে এগিয়ে। ইমাম যুহরী রহ.-এর মতো বিশাল ব্যক্তিগুলো ছিলেন তাঁর ছাত্র। সীরাতশাস্ত্রের ইমাম বলে গণ্য। হযরত আয়েশা রাযি.-এর রেওয়ায়েত, ফিকহ, ফতোয়ার আলেম তাঁর চেয়ে বড় আর কেউ ছিলেন না। তিনি চুরানব্বই হিজরীতে ওফাতপ্রাপ্ত হন।

কাসেম ইবনে মুহাম্মাদ

কাসেম ইবনে মুহাম্মাদ—মুহাম্মাদ ইবনে আবু বকর রাযি.-এর ছেলে, হযরত আবু বকর রাযি.-এর নাতী, হযরত আয়েশা রাযি.-এর ভাতিজা। তিনিও ফুফির কোলেই প্রতিপালিত হন। ছোট্টবেলা থেকেই ধর্মীয় দীক্ষালাভে ব্রতী হন। বড় হয়ে মদীনার ফিকহের ইমাম হন। মদীনায় ফুকাহায়ে সাবআ (ফকীহ-সপ্তক)-এর গুরুত্বপূর্ণ সদস্য ছিলেন। হাদীস বর্ণনায় ছিলেন খুবই সচেতন। এক একটা অক্ষরও

অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে উল্লেখ করতেন। একশো আট হিজরীতে তাঁর ইন্তেকাল হয়।

আবু সালামাহ

আবু সালামাহ—হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ রাযি.-এর ছেলে ছিলেন। অত্যন্ত অল্প বয়সেই পিতার স্নেহ-ছায়া থেকে বঞ্চিত হন। হযরত আয়েশা রাযি. তাঁর লালন-পালন করেন। তাঁকে উরওয়াহর সমকক্ষ মনে করা হতো। মদীনার ইলমী অঙ্গনের বিশেষ আসনটি ছিল তাঁর দখলে। বড় বড় মুহাদ্দিস ও হাদীসবিশারদ তাঁর হাদীস বর্ণনা করেছেন। মৃত্যু চুরানব্বই হিজরীতে।

মাসরুক কুফি

মাসরুক ছিলেন কুফা নগরীর সন্তান। কিন্তু তিনি মুসলিম গৃহযুদ্ধে ছিলেন না। ইমাম যাহাবি রহ. *তাযকিরা*-য় লিখেছেন, ইনি হযরত আয়েশা রাযি.-এর পালকপুত্র ছিলেন। *ইবনে সাদে* আছে, একবার তিনি হযরত আয়েশা রাযি.-এর সঙ্গে দেখা করতে এলেন, তখন উম্মুল মুমিনীন তাঁর জন্য শরবত বানাতে বানাতে বললেন, আমার ছেলের জন্য শরবত বানাচ্ছি। হযরত আয়েশা রাযি.-এর যখন ইন্তেকাল হলো, তখন তিনি বলেছিলেন, যদি মাতার কিছু কিছু উপদেশ আমার মনে না থাকত, তা হলে আজকে শোকের মাতম করতাম। ইমাম ইবনে হাম্বল *মুসনাদে* এবং ইমাম বুখারী *সহীহে* তাঁর অধিকাংশ বর্ণনাই উল্লেখ করেছেন। ইনি ইরাকের শ্রেষ্ঠ ফকীহ হিসেবে পরিগণিত হতেন। অত্যন্ত যাহেদ ও ইবাদতগুজার ছিলেন। কুফায় বিচারকের পদে ছিলেন; কিন্তু কোনো সম্মানী গ্রহণ করতেন না। তেষট্টি হিজরীতেই তাঁর মৃত্যু হয়।

উমরাহ বিনতে আবদুর রহমান

নারীদের মধ্যে সর্বাগ্রে উমরাহ বিনতে আবদুর রহমানের নাম আসে। ইনি বিখ্যাত সাহাবী আসআদ আনসারি রাযি.-এর পুত্রী ছিলেন। নারীদের মধ্যে হযরত আয়েশা রাযি.-এর প্রতিপালনের সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ মেছাল। হাদীসবিশারদগণ তাঁর নাম নেন অত্যন্ত সম্মানের সঙ্গে। ইমাম মাদিনির একটি উক্তি তাহযীবে উদ্ধৃত হয়েছে :

عُمْرَةُ أَحَدُ الثِّقَاتِ الْعُلَمَاءِ بِعَائِشَةَ الْأَثْبَاتِ فِيْهَا

অর্থ : হযরত আয়েশা রাযি.-এর সবচেয়ে প্রামাণ্য ও নির্ভরযোগ্য বর্ণনাগুলো যাঁরা জানতেন, উমরাহ হলেন তাঁদের অন্যতম।

একই গ্রন্থে ইবনে হিব্বানের একটি উক্তি আছে :

كَانَتْ مِنْ أَعْلَمِ النَّاسِ بِحَدِيْثِ عَائِشَةَ

অর্থ : হযরত আয়েশা রাযি.-এর হাদীসগুলো ইনিই সবচেয়ে ভালো জানতেন ও বুঝতেন।

সুফিয়ান রহ. বলতেন :

أَثْبَتُ حَدِيْثِ عَائِشَةَ عُمْرَةُ وَ الْقَاسِمُ وَ عُرْوَةُ

অর্থ : হযরত আয়েশা রাযি.-এর হাদীসের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য উৎস হলেন উমরাহ, উরওয়াহ, কাসেম।

উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা রাযি. তাকে অত্যন্ত ভালোবাসতেন।[১] এর সুবাদে মানুষও তাকে ভালোবাসত। ইমাম বুখারী রহ.-এর ভাষ্য অনুযায়ী তিনি ছিলেন হযরত আয়েশা রাযি.-এর 'প্রধান কেরানি'। লোকে তাঁর মাধ্যমেই হযরত আয়েশা রাযি.-এর দরবারে হাদিয়া-তোহফা ও চিঠি-পত্র প্রেরণ করতেন।[২]

প্রথম হাদীস সংকলক যাঁরা ছিলেন, তাঁদের অন্যতম হলেন আবু বকর ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আমর ইবনে হাযম আনসারি। তিনি ছিলেন হযরত উমরাহর ভাতিজা। খলীফা উমর ইবনে আবদুল আজিজ রহ. তাঁকে হাদীস সংকলনের জন্য মনোনীত করেছিলেন। খলীফার শাহি ফরমান ছিল : ...উমরাহর সবগুলো হাদীস লিপিবদ্ধ করে খেলাফত-সভায় প্রেরণ করা হোক...।[৩] ফুফি আপন ভাতিজার ফিকহী সমালোচনা

---

১. *আল আদাবুল মুফরাদ* : বাবুল মুরাসালাতি ইলান নিসা।

২. *আল আদাবুল মুফরাদ* : ঐ।

৩. *তাহযিব, ইবনে হাজার* : তরজমায়ে উমরা।

করতেন, ইজতিহাদগত ত্রুটি তুলে ধরতেন এবং সংশোধন করতেন।[১]

ইমাম যুহরী রহ. যখন হাদীস-সংকলনের কাজে হাত দিলেন তখন কেউ তাঁকে বললেন, যদি তোমার জ্ঞানার্জনের স্পৃহা থাকে তবে ভাণ্ডারের সন্ধান আমি জানি; উমরাহর কাছে যাও, তিনি হযরত আয়েশা রাযি.-এর কোলে বড় হয়েছিলেন। ইমাম যুহরী রহ. বলেন, আমি তাঁর কাছে পৌঁছেছিলাম, তিনি ছিলেন জ্ঞানের অথৈ সাগর।[২]

সাফিয়া বিনতে শাইবা

সাফিয়া বিনতে শাইবা মশহুর তাবেঈয়া ছিলেন। শাইবা ছিলেন খানায়ে কাবার চাবি-রক্ষকের পুত্রী। প্রায় সকল হাদীসগ্রন্থেই তাঁর বর্ণনা এসেছে। হাদীসের জগতে তাঁর পরিচিতি সাফিয়া বিনতে শাইবা ও সাহেবায়ে আয়েশা নামে। সাহেবায়ে আয়েশা রাযি. বলতে বোঝানো হয়, তিনি হযরত আয়েশা রাযি.-এর বিশেষ বিদ্যার্থিনী ছিলেন, অথবা তাঁর বিশেষ সোহবত ও সাহচর্য লাভ করেছিলেন। লোকেরা তাঁর কাছে ফিকহী মাসায়েল ও হযরত আয়েশা রাযি.-এর হাদীস জানার জন্য ভিড় জমাত। *আবু দাউদ* শরীফে আছে :

خَرَجْتُ مَعَ عَدِيِّ بْنِ عَدِيٍّ الْكِنْدِيِّ حَتَّى قَدِمْنَا مَكَّةَ فَبَعَثَنِيْ إِلَى صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ وَ كَانَتْ حفظَتْ مِنْ عَائِشَةَ

অর্থ : আমি আদি ইবনে আল কিনদির সঙ্গে রওনা হলাম। আমরা যখন মক্কায় পৌঁছলাম, তখন সে আমাকে সাফিয়া বিনতে শাইবার নিকট পাঠাল। ইনি হযরত আয়েশা রাযি.-এর হাদীসের হাফেজা ছিলেন।

কুলসুম বিনতে আমর কুরাশিয়া

কুলসুম বিনতে আমর কুরাশিয়া। রিজালগ্রন্থগুলোতে তাঁর নামের সঙ্গেও সাহেবায়ে আয়েশা রাযি. কথাটি পাওয়া যায়। তিনিও অনেক হাদীস বর্ণনা করেছেন।

---

১. *মুয়াত্তা*, ইমাম মালেক : ما لا قطع فيه।

২. *তাযকিরা, ইমাম যাহাবি* : ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা : ৯৯।

আয়েশা বিনতে তালহা

আয়েশা বিনতে তালহা। হযরত তালহা রাযি.-এর মেয়ে, সিদ্দীকে আকবর রাযি.-এর নাতনী এবং হযরত আয়েশা রাযি.-এর ভাতিজি ছিলেন। খালার কোলেই বড় হয়েছিলেন। ইবনে মাঈন তাঁর সম্পর্কে বলতেন—ثِقَةٌ ছিকাহ (নির্ভরযোগ্য), حُجَّةٌ হুজ্জাত (প্রামাণ্য)। আজালির মূল্যায়ন—ثِقَةٌ ، تَابِعِيَّةٌ ، مَدَنِيَّةٌ মদীনাবাসিনী, তাবেঈয়া, নির্ভরযোগ্যা। আবু যুরা দিমাশকির মন্তব্য : حَدَّث عَنْهَا النَّاسُ لِفَضْلِهَا وَ أَدَبِهَ—অর্থ : মানুষ তাঁর মহত্ত্ব ও শিষ্টাচার দেখে তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করতেন।[১]

মুআযা বিনতে আবদুল্লাহ আদাবিয়া

মুআযা বিনতে আবদুল্লাহ আদাবিয়া। মাতৃভূমি ছিল বসরা। হযরত আয়েশা রাযি.-এর ঘনিষ্ঠ শিক্ষার্থিনী ছিলেন। উম্মুল মুমিনীন রাযি.-এর অনেক হাদীস তাঁর থেকেও বিবৃত হয়েছে। বড় ইবাদতগুজার ছিলেন। স্বামীর মৃত্যুর পর কখনো বিছানায় যাননি। একবার তিনি অসুস্থ হলে হেকিম নাবিযে মিশ্রিত ঔষধ দেন। ঔষধ প্রস্তুত হলে পেয়ালা হাতে নিয়ে বলেন, আল্লাহ, আপনি জানেন, হযরত আয়েশা রাযি. আমাকে বলেছিলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নাবিয খেতে নিষেধ করেছেন। হঠাৎ পেয়ালাটি হাত থেকে পড়ে যায়। কিন্তু আল্লাহর রহমতে তিনি সুস্থ হয়ে ওঠেন।

---

১. আলোচ্য রাবীগণের জীবনবৃত্তান্ত সম্পর্কে যেটুকু আলোকপাত করা হয়েছে, সবই রিজালগ্রন্থগুলো থেকে গৃহীত। বিশেষ করে *তাবাকাত*, *ইবনে সাদ* ও *তাহযিব*, *ইবনে হাজার* দ্রষ্টব্য।

ইফতা

ফতোয়াপ্রদানে তাঁর অবস্থান

পূর্বের অধ্যায়গুলোতে হযরত আয়েশা রাযি.-এর মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের এবং ভূমিকা ও অবদানের যত প্রমাণ ও নিদর্শন গিয়েছে, তা থেকেই অনুমান করা যায়, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তিরোধানের পর জীবনের বাকি চল্লিশটি বছর তিনি এমনভাবে অতিবাহিত করেছিলেন যে, তিনি ছিলেন সর্বসাধারণের জিজ্ঞাসার মূল কেন্দ্র এবং প্রায় সর্বজনের অনুকরণীয় ও অনুসরণীয় ব্যক্তিত্ব। আনন্দের বিষয়, সৌভাগ্যবশত আমাদের কাছে, এ ব্যাপারে আশ্বস্ত করার মতো যথেষ্ট লিখিত প্রমাণাদিও রয়েছে। খোলাফায়ে ইসলাম, উলামায়ে সাহাবা এবং সাধারণ মুসলমানগণ যে কোনো সঙ্কটে ও সমস্যায় এবং যে কোনো নতুন নতুন জিজ্ঞাসায় মসজিদে নববীর ছোট্ট কিন্তু মহৎ প্রাঙ্গনেরই শরণাপন্ন হতেন।

হাদীস-বিশারদগণ ফতোয়ার আধিক্য ও স্বল্পতার ভিত্তিতে উলামায়ে সাহাবাকে তিনটি স্তরে বিভক্ত করেছেন। যাদের ফতোয়াসমগ্রকে স্বতন্ত্র ও আলাদা করে সাজালে একটি বৃহৎ সংকলনের রূপ পরিগ্রহ করে, তারা আছেন প্রথম স্তরে। দ্বিতীয় স্তরে আছেন যাদের এক-একটি ফতোয়া এক একটি নিবন্ধের সমান। তৃতীয় স্তরে আছেন যাদের সমগ্র ফতোয়াকে একত্রিত করলে একটি নিবন্ধের সমান হয়।

হযরত উমর রাযি., হযরত আলী রাযি., হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি., হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত রাযি., হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি. এবং সবশেষে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লামের পবিত্র স্ত্রী, সিদ্দীকে আকবর রাযি.-এর নয়নমণি হযরত আয়েশা রাযি. আছেন প্রথম স্তরে। তাঁদের ফতোয়া হাদীসগ্রন্থগুলোতে এত বেশি পরিমাণে এসেছে যে, এগুলোকে একত্রিত করলে একটি আলাদা দফতর ও বৃহৎ সংকলন প্রস্তুত হবে।[১]

খোলাফায়ে ইসলামের ফতোয়া চাওয়া

হযরত আয়েশা রাযি. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মৃত্যুর পরই আপন পিতার জীবদ্দশায় সর্বসাধারণের জিজ্ঞাসার কেন্দ্রস্থলে পরিণত হন। ধর্মীয় ফতোয়া প্রদানের পদমর্যাদাও অর্জিত হয়েছিল তাঁর। জীবনের শেষ পর্যন্ত অপরাপর খলীফা ও শাসক-প্রশাসকের সময়ও সদাসর্বদা এ মর্যাদায় বিশিষ্ট ছিলেন তিনি। হযরত কাসেম রহ., যিনি সাহাবীগণের পর মদীনার বিশিষ্ট ফকীহ-সপ্তকের গুরুত্বপূর্ণ সদস্য ছিলেন, বলেন—

كَانَتْ عَائِشَةُ قَدِ اسْتَقَلَّتْ بِالْفَتْوٰى فِيْ خِلَافَةِ أَبِيْ بَكْرٍ وَ عُمَرَ وَ عُثْمَانَ وَهَلُمَّ جَرًّا إِلَى أَنْ مَّاتَتْ رَحِمَهَا اللهُ

অর্থ : হযরত আয়েশা রাযি. হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাযি.-এর সময়ই স্বয়ংসম্পূর্ণভাবে ফতোয়া প্রদানের মর্যাদা লাভ করেছিলেন। হযরত উমর রাযি. ও হযরত উসমান রাযি.-এর পরও শেষ জীবন পর্যন্ত ফতোয়া প্রদানের দায়িত্ব পালন করে গেছেন।[২]

হযরত উমর রাযি. নিজেও একজন স্বয়ংসম্পূর্ণ মুজতাহিদ ছিলেন। তিনিও এই মেশকাতুন নবীর প্রতি ছিলেন মুখাপেক্ষী।

كَانَتْ عَائِشَةُ تُفْتِيْ فِيْ عَهْدِ عُمَرَ وَ عُثْمَانَ بَعْدَهُ يُرْسِلَانِ إِلَيْهَا فَيَسْأَلَا بِهَا عَنِ السُّنَنِ

অর্থ : হযরত আয়েশা রাযি. হযরত উমর ও উসমান রাযি.-এর

---

১. *আলামুল মুকিঈন* : ইবনে কাইয়ুম (মুকাদ্দিমা)।

২. *ইবনে সাদ* : ২/২/১২৬।

জামানায়ও ফতোয়া প্রদান করতেন। হযরত উমর ও হযরত উসমান রাযি. তাঁর কাছে বিভিন্ন বিষয়ে হাদীস জানার জন্য লোক পাঠাতেন।[1]

হযরত উমর রাযি.-এর শাসনামলে নির্দিষ্ট কয়েকজন ছাড়া আর কারও ফতোয়াপ্রদানের অনুমতি ছিল না। সুতরাং বোঝা যায়, হযরত উমর রাযি. হযরত আয়েশা রাযি.-এর জ্ঞান ও যোগ্যতার প্রতি কতখানি আশ্বস্ত ছিলেন।

আমীর মুআবিয়া রাযি. দামেশক থেকে খেলাফত পরিচালনা করতেন। কিন্তু প্রয়োজন হলে সিরিয়া থেকে দূত এসে বাবে আয়েশা রাযি.-এর সামনে দাঁড়িয়ে থাকতেন এবং অনুমতি পেলে মহান শাসকের পক্ষ থেকে মাসআলা জানতে চাইতেন[2], বিভিন্ন বিষয়ে আজ্ঞা ও উপদেশ আবদার করতেন।[3]

আকাবিরে সাহাবার ফতোয়া চাওয়া

পবিত্র মদীনা ছিল আকাবিরে সাহাবার মূল কেন্দ্র। হযরত আবু বকর রাযি. ও হযরত উমর রাযি.-এর খেলাফত পর্যন্ত হযরত আলী রাযি., হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি., হযরত আবু মুসা আশআরি রাযি., হযরত মুআয ইবনে জাবাল রাযি., হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ রাযি., হযরত উবাই ইবনে কাব রাযি., হযরত আবু দারদা রাযি., হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত রাযি. প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ ইসলামী জাহানে ইলম ও ফতোয়ার স্তম্ভ ছিলেন। হযরত উসমান রাযি.-এর শাসনামলে তাঁদের অধিকাংশই ওফাতপ্রাপ্ত হন। তাঁদের পর আসে সাহাবা কেরামের নতুন প্রজন্মের পালা। তাঁদের শিরোমণি ছিলেন হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি., হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাযি., আবু সাঈদ খুদরী রাযি., জাবের ইবনে আবদুল্লাহ রাযি., আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের রাযি., আবু হুরায়রা রাযি.। হযরত আয়েশা রাযি.-এর বয়স যদিও কম ছিল; তথাপি, যেমনটি পূর্বে আলোচিত হয়েছে, তিনি প্রথম যুগ থেকে

---

১. *ইবনে সাদ* : ২/২/১২৬।
২. *মুসনাদে আহমাদ* : ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা : ৮৭।
৩. *জামে তিরমিযী* : باب ما جاء في حفظ اللسان।

আকাবিরে সাহাবার জীবদ্দশায়ই ফতোয়ার আসনে সমাসীন ছিলেন। বড় বড় সাহাবা কেরাম কঠিন ও জটিল বিষয়গুলোতে তাঁরই শরণাপন্ন হতেন। *জামে তিরমিযী*তে আছে :

مَا أَشْكَلَ عَلَيْنَا أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيْثٌ قَطُّ فَسَأَلْنَا عَائِشَةُ إِلَّا وَجَدْنَا عِنْدَهَا عِلْمًا

অর্থ : আসহাবে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখনই কোনো হাদীস বুঝতে অসুবিধা বোধ করেছেন, হযরত আয়েশা রাযি.-কে জিজ্ঞেস করে এ সম্পর্কে কোনো না কোনো ধারণা অবশ্যই পেয়েছেন।

ইবনে সাদ গ্রন্থে আছে :

يَسْأَلُهَا الْأَكَابِرُ مِنْ أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

অর্থ : বড় বড় সাহাবা কেরাম রাযি. তাঁর কাছে এসে মাসআলা জানতে চাইতেন।[১]

তাবেঈ মাসরুক কসম খেয়ে বলতেন,

لَقَدْ رَأَيْتُ مَشْيَخَةَ أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُوْنَهَا عَنِ الْفَرَائِضِ

অর্থ : আমি প্রবীণ সাহাবা কেরামকেও তাঁর কাছে ফারায়েয সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে দেখেছি।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি., হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাযি.-সহ অনেক সাহাবী, যাঁরা হাদীস, ফিকহ ও ইজতিহাদে তাঁর সমপর্যায়ের ছিলেন, তাঁরাও অনেকসময় অনেক কিছু জিজ্ঞেস করে নিতেন।[২] হযরত আবু মুসা আশআরি রাযি. উলামায়ে আসহাবের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন; তবু হযরত আয়েশা রাযি.-এর দরসে নববী থেকে অমুখাপেক্ষী ছিলেন না।[৩]

---

১. *ইবনে সাদ* ও *হাকেম*।

২. *সহীহ বুখারী* : আল-বিত্‌র, আল-জানাইয। *নাসাঈ* : باب لبس الحرير।

৩. *মুয়াত্তা*, ইমাম মালেক : باب الغسل।

সমগ্র ইসলামী জাহান থেকে ফতোয়া চাওয়া

মদীনা সমগ্র ইসলামী জাহানের প্রাণকেন্দ্র ছিল। মানুষ যিয়ারত ও বরকতের উদ্দেশ্যে যে কোনো স্থান থেকে এখানে আসত। তারা মদীনায় এসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র জীবনসঙ্গিনীর খেদমতে অবশ্যই হাজির হতো। দূরদূরান্ত থেকে যে মানুষগুলো আসত, তারা অনেকে সাধারণ শিষ্টাচার ও সৌজন্য সম্পর্কে জ্ঞাত থাকত না; তাই প্রথমে ভালো করে শুনে-জেনে নিত, এরপর উম্মুল মুমিনীন রাযি.-এর দরবারে অনুমতিপ্রার্থনার সালাম পেশ করত।[১] হযরত আয়েশা রাযি. তাদের সঙ্গে অত্যন্ত মার্জিত ও শ্রদ্ধাপূর্ণ আচরণ করতেন।[২] মাঝখানে পর্দার আড়াল থাকত।[৩] লোকেরা তাদের বিভিন্ন জিজ্ঞাসা পেশ করত, মনে কোনো খটকা থাকলে সমাধান চাইত। উম্মুল মুমিনীন রাযি. তাদের জিজ্ঞাসার জবাব দিতেন, সন্দেহের নিরসন করতেন। তারা সান্ত্বনা পেত, কৃতজ্ঞ হতো। অনেকে অনেক সময় কিছু জিজ্ঞেস করতে সঙ্কোচ করলে إِنَّ اللهَ لَا يَسْتَحْيِيْ مِنَ الْحَقِّ (আল্লাহ সত্যপ্রসঙ্গে লজ্জা করেন না) এই আয়াতে কারীমার ভিত্তিতে নিঃসঙ্কোচে কথা বলতে উৎসাহিত করতেন, বলতেন—আমি তোমাদের মা, মায়ের কাছে সঙ্কোচ কিসের?[৪]

হযরত আয়েশা রাযি.-এর বার্ষিক হজ পালন কখনো বিঘ্নিত হতো না। প্রতি বছর হজের মৌসুমে সাবির পর্বতের পাদদেশে[৫] টানানো হযরত আয়েশা রাযি.-এর তাঁবুকে ঘিরে জ্ঞান-পিপাসুদের ভিড় জমে যেত।[৬] অনেক সময় তিনি খানায়ে কাবায় জমজমের ছাদের নিচে আসন গ্রহণ করতেন এবং ইলমে ওহীর জ্ঞানার্থীদের জ্ঞান বিতরণ করতেন।[৭] মানুষ বিভিন্নমুখী সাওয়াল পেশ করত, আর তিনি কুরআন ও হাদীসের ভিত্তিতে সকল সাওয়ালেরই জবাব দিতেন।

---

১. *মুসনাদে আহমাদ* : ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা : ১২৬।
২. *মুসনাদে আহমাদ* : ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা : ২১৯।
৩. *মুসনাদে আহমাদ* : ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা : ২১৯। *সহীহ বুখারী* : বাবু তাওয়াফিন নিসা।
৪. *মুসনাদে আহমাদ* : ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা : ২৬৫, ৭৫৭।
৫. *সহীহ বুখারী* : বাবু তাওয়াফিন নিসা।
৬. *মুসনাদে আহমাদ* : ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা : ৪০, ৯৫, ২১৯, ২২৫, ২৫৯, ২৬১।
৭. *সহীহ বুখারী* : বাবু তাওয়াফিন নিসা। *মুসনাদে আহমাদ* : ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা : ২৪২।

মতভেদে সিদ্ধান্ত দেওয়ার গ্রহণযোগ্যতা

যেসব মাসআলায় সাহাবা কেরামেরও মতভেদ ছিল, সেসব ক্ষেত্রে চূড়ান্ত ফায়সালার জন্যও অনেকে আসতেন তাঁরই কাছে। একবার হযরত আবু মুসা আশআরি রাযি.-এর মতো বিশাল ব্যক্তিত্ব এলেন হযরত আয়েশা রাযি.-এর দরবারে; বললেন, একটি বিষয়ে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণ মতভেদ করছেন, আমিও দ্বিধাগ্রস্ত; এ বিষয়ে আপনার মতামত জানতে চাই। হযরত আয়েশা রাযি. তাঁর মতটি প্রকাশ করলেন। হযরত আবু মুসা আশআরি রাযি.-এর দ্বিধা দূর হলো। তিনি বললেন, আজকের পর থেকে এই মাসআলাটি আর কখনো কাউকে জিজ্ঞেস করব না।[১] হযরত আবু দারদা রাযি. ফতোয়া দিতেন, যদি ঘটনাক্রমে কারও বিতর নামায পড়া না হয়, আর সকাল হয়ে যায়, তা হলে বিতর পড়া যাবে না। লোকেরা হযরত আয়েশা রাযি.-কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকাল হয়ে গেলেও বিতর পড়ে নিতেন।[২]

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. এবং হযরত আবু মুসা আশআরি রাযি. দুজনেই বিজ্ঞ আলেম ও ফকীহ ছিলেন। তাদের মধ্যে ইফতারের বিষয়ে ইখতিলাফ হলো। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ বললেন, ইফতার করে অবিলম্বে মাগরিব পড়ে নিতে হবে। কিন্তু আবু মুসা আশআরি রাযি. বললেন—না, ইফতার করে একটু বিশ্রাম করতে হবে; এরপর মাগরিব পড়তে হবে। লোকেরা সুরাহার জন্য গেল হযরত আয়েশা রাযি.-এর কাছে। তিনি বললেন, অবিলম্বে মাগরিব পড়ার কথা যে বলেছে, সেই ঠিক বলছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র অভ্যাসও এটাই ছিল।[৩]

যদি কেউ হজ করতে না যায়, কিন্তু কোরবানির জন্তু মক্কায় পাঠিয়ে দেয়, তা হলে লোকটির হুকুম কী হবে? হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. ফতোয়া দিতেন, সে হাজি সাহেবের মতোই হবে, অর্থাৎ হজের অবস্থায়

---

১. *মুয়াত্তা*, ইমাম মালেক : باب الغسل।

২. *মুসনাদে আহমাদ* : ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা : ২৪২।

৩. *মুসনাদে আহমাদ* : ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা : ৪৮। *সুনানে নাসাঈ* : বাবুস সাজদাহ।

তার ওপর যেসব বিধান আরোপিত হতো, এখনো সেগুলো আরোপিত হবে; কোরবানি হওয়া পর্যন্ত তাকে মুহরিমের মতো থাকতে হবে। যিয়াদ ইবনে আবিহি আমীর মুআবিয়া রাযি.-এর পক্ষ থেকে তখন হেজাজের গভর্নর ছিলেন। তিনি এ বিষয়ে ফতোয়া চেয়ে হযরত আয়েশা রাযি.-এর খেদমতে দূত পাঠালেন। তিনি জবাব দিলেন, ইবনে আব্বাস রাযি.-এর ফতোয়া ঠিক নয়। কেননা, আমি নিজ হাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোরবানিকে কিলাদাহ পড়িয়েছি, আমার পিতা স্বয়ং সেগুলো মক্কায় নিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু তখনো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হালাল কোনো কিছু থেকেই বিরত থাকেননি।[১]

বাইহাকী শরীফে আছে, ইমাম যুহরী রহ. বলেছেন, এই মাসআলায় সর্বপ্রথম উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা রাযি.-ই সত্যিকার বাস্তবতাটি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় প্রকাশ করে দিয়েছিলেন। মানুষ যখন এই ফতোয়াটি জানতে পারেন, তখন থেকে এর ওপরই আমল শুরু করেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস রাযি.-এর ফতোয়াটির আমল সেদিন থেকেই বাতিল হয়ে যায়।[২]

হযরত আবু হুরায়রা রাযি. ফতোয়া দিতেন, রমযানে যদি সকাল হয়ে যায় এমতাবস্থায় যে কারও ওপর গোসল ফরজ হয়েছে, তা হলে তার সেদিনের রোযাটি হবে না। এক ব্যক্তি প্রথমে হযরত আয়েশা রাযি.-এর কাছে এবং পরে হযরত উম্মে সালামা রাযি.-এর কাছে গিয়ে ফতোয়া চাইল। তাঁরা উভয়েই বললেন, কথাটি ঠিক নয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আমল এমন ছিল না। ওই সময় মদীনার প্রশাসক ছিলেন মারওয়ান। তিনি লোকটিকে পুনরায় হযরত আবু হুরায়রা রাযি.-এর কাছে পাঠালেন। লোকটি গিয়ে উম্মুল মুমিনীনের ফতোয়াটি শোনালে তিনি আপন ফতোয়া প্রত্যাহার করে নেন।[৩]

ইহরাম অবস্থায় মোজা পরা ঠিক নয়। কিন্তু যদি কারও শুধু মোজা থাকে, জুতা না থাকে, তা হলে সে মোজার উপরের অংশ কেটে ফেলবে

---

১. *সহীহ মুসলিম* ও বুখারী : কিতাবুল হজ।
২. *আইনুল ইসাবা*, সুয়ূতি রহ. (*সুনানে বাইহাকী*র উদ্ধৃতি)।
৩. *সহীহ মুসলিম* : কিতাবুস সিয়াম।

এবং সেটা দিয়েই জুতা বানাবে। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাযি. ফতোয়া দিতেন, নারীরাও মোজা কেটে জুতা বানাবে। একবার জনৈকা তাবেঈয়া তাঁকে বললেন, হযরত আয়েশা রাযি.-এর ফতোয়া তো এমন নয়। হযরত আয়েশা রাযি.-এর ফতোয়া শুনে ইবনে উমর রাযি. আপন ফতোয়া প্রত্যাহার করলেন।[১]

কোনো এক মজলিসে হযরত আবু হুরায়রা রাযি. এবং হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. দুজনই উপস্থিত ছিলেন। হঠাৎ একটি মাসআলা উঠল : যদি কোনো মহিলা বিধবাও হয়, আবার গর্ভবতীও হয় তা হলে তার ইদ্দতকাল কোনটি হবে? কুরআন মাজীদে বিধবা ও গর্ভবতী দুজনের আলাদা আলাদা ইদ্দতকাল বর্ণিত হয়েছে। বিধবার ইদ্দতকাল হলো চার মাস দশ দিন, আর গর্ভবতীর ইদ্দতকাল হলো গর্ভপাত পর্যন্ত। হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. বললেন, দুই ইদ্দতের মধ্যে যেটির সময়কাল বেশি হবে, সেটিই পালন করবে। পক্ষান্তরে হযরত আবু হুরায়রা রাযি. বললেন, গর্ভপাত পর্যন্তই তার ইদ্দতকাল ধরা হবে। তাদের মধ্যে মতৈক্য না পাওয়ায় লোকেরা হযরত আয়েশা রাযি. এবং হযরত উম্মে সালামা রাযি.-এর কাছে গেল। তারা বললেন, গর্ভপাত পর্যন্তই তাকে ইদ্দত পালন করতে হবে। তাঁরা হযরত সুবাইতার ঘটনাটি প্রমাণ হিসেবে পেশ করলেন। হযরত সুবাইতা যেদিন বিধবা হয়েছিলেন, তার তিন দিন পরই সন্তান প্রসব করেন; আর সেদিনই নতুন বিবাহের অনুমতিপ্রাপ্ত হন।[২] উম্মুল মুমিনীনের ফতোয়াটি এত অকাট্য ছিল যে, আজ পর্যন্ত এর ওপরই আমল হয়ে আসছে।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি. এবং আবু হুরায়রা রাযি.-এর মধ্যে একটি মাসআলায় মতভেদ হলো। জানাযার পেছনে চলায় কোনো সওয়াব আছে কি নেই? প্রথমজন ফতোয়া দিলেন, সওয়াব আছে। দ্বিতীয়জন ফতোয়া দিলেন, সওয়াব নেই। মীমাংসা চাওয়া হলো হযরত আয়েশা রাযি.-এর কাছে। তিনি হযরত আবু হুরায়রা রাযি.-এর সমর্থন করলেন।[৩]

---

১. *আইনুল ইসাবা*, সুয়ূতি (শাফেঈ, বাইহাকী, আবু দাউদ ও ইবনে খুযাইমার উদ্ধৃতিতে)।

২. *তয়ালিসি* ও মুসনাদে আয়েশা রাযি. ও উম্মে সালামা রাযি.।

৩. *সহীহ বুখারী* : কিতাবুল জানাইয।

যদিও হযরত আয়েশা রাযি.-এর ফতোয়াসমগ্রে অন্যান্য বিষয়েও সমাধান আছে; কিন্তু দাম্পত্যজীবন, স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনবৃত্তান্ত, ইবাদত-বন্দেগী, ব্যক্তিগত বিষয়—ইত্যাদি বিষয়ে তাঁর গ্রহণযোগ্যতা সবচেয়ে বেশি। ইমাম ইবনে হাযাম রহ. এবং ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম রহ.-এর ভাষ্যমতে যদি হযরত আয়েশা রাযি.-এর ফতোয়াসমগ্র একত্র করা যায় তা হলে তা একটি বিশাল সংকলন হিসেবে উপস্থাপিত হবে।

ইরাক,[১] সিরিয়া[২] ও মিশর[৩] থেকে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে ফতোয়ার জন্য তাঁর কাছে আসতেন। তাঁর উত্তরে জিজ্ঞাসুদের অন্তর আশ্বস্ত হতো। শিক্ষার্থীগণ যারা খেদমতে থাকতেন, লোকেরা প্রয়োজনের খাতিরে তাদের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার চেষ্টা করতেন। আয়েশা বিনতে তালহা হযরত আয়েশা রাযি.-এর অধিকাংশ খেদমতগুজারিরই সুযোগ পেতেন। তিনি বলতেন,

كَانَ النَّاسُ يَأْتُوْنَهَا مِنْ كُلِّ مِصْرٍ فَكَانَ الشُّيُوْخُ يَنْتَابُوْنِيْ لِمَكَانِيْ مِنْهَا وَ كَانَ الشَّبَابُ يَتَأَخَّوْنِيْ فَيُهْدُوْنَ إِلَيَّ وَ يَكْتُبُوْنَ إِلَيَّ مِنَ الْأَمْصَارِ فَأَقُوْلُ لِعَائِشَةَ يَا خَالَةُ هَذَا كِتَابُ فُلَانٍ وَ هَدِيَّتُهُ فَتَقُوْلُ لِيْ عَائِشَةُ بُنَيَّةِ فَأَجِيْبِيْهِ وَ أَثِيْبِيْهِ

অর্থ : প্রতিটি শহর থেকে মানুষ হযরত আয়েশা রাযি.-এর কাছে আসত। যেহেতু আমি তাঁর নৈকট্যপ্রাপ্ত ছিলাম, সেহেতু বয়স্ক মানুষরা আমার সঙ্গে দেখা করতে আসত, আর কমবয়সীরাও আমার সঙ্গে পরিচিত হয়ে আমার কাছে হাদিয়া পাঠাত এবং বিভিন্ন শহর থেকে আমার নামে চিঠি লিখত। আমি উম্মুল মুমিনীনকে বলতাম, খালাজান, অমুক আপনার জন্য এই চিঠি ও এই হাদিয়া পাঠিয়েছে। হযরত আয়েশা রাযি. বলতেন, চিঠির উত্তর লিখে দাও এবং হাদিয়া হিসেবে তুমিও কিছু পাঠিয়ে দাও।[৪]

---

১. *মুসনাদে আহমাদ* : ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা : ৯৩, ৯৫।
২. *মুসনাদে আহমাদ* : ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা : ১৭৩।
৩. *মুসনাদে আহমাদ* : ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা : ২৫৮।
৪. *আল আদাবুল মুফরাদ* : বাবুল কিতাবাতি ইলান নিসা।

কিন্তু এত জ্ঞান ও যোগ্যতা সত্ত্বেও যদি কখনো এমন কোনো প্রশ্ন আসত যার সম্পর্কে তাঁর কোনো প্রামাণ্য জ্ঞান নেই, অথবা এমন কেউ আছেন যিনি বিষয়টি আরও ভালো বলতে পারবেন, তা হলে নিজে উত্তর না দিয়ে জিজ্ঞাসুকে সেখানেই পাঠিয়ে দিতেন। একবার এক লোক সফরে মোজার ওপর মাসেহ করা সম্পর্কে ফতোয়া জানতে চাইল। তিনি বললেন, হযরত আলী রাযি.-এর কাছে যাও, অধিকাংশ সফরেই তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে থেকেছেন।[১] একবার কেউ আসরের পরে নামায পড়ার বিষয়টি জানতে চাইল। তিনি বললেন, হযরত উম্মে সালামা রাযি.-এর কাছে গিয়ে বিষয়টি জিজ্ঞেস করো। একবার এক জিজ্ঞাসু রেশমের কাপড় পরা সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি তাকে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাযি.-এর কাছে পাঠিয়ে দিলেন।[২]

---

১. *মুসনাদে আহমাদ* : ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা : ১৫৫।

২. *সুনানে বাইহাকী* : باب التشديد في لبس الحرير।

ইরশাদ

ধর্মের সংস্কারের প্রয়োজন পড়ে কখন? যখন ধর্মের মূল কথাটি কালের অতল গহ্বরে তলিয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়, যখন ধর্মের মূল বস্তুটি বিস্মৃতির ঘন অন্ধকারে হারিয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়। কিন্তু তারও আগে যা করণীয় তা হলো—ধর্মের সুরকে, স্বরকে, ধ্বনি-প্রতিধ্বনিকে এক মুহূর্তের জন্যও থেমে যেতে না দেওয়া; ধর্মের মূল কথাটিকে দমে-দমে জপতে থাকা, এর অনবরত অনুরণন অব্যাহত রাখা; ধর্মের মূল বস্তুটি যেন কখনো মন থেকে না নড়ে, না সরে, না পড়ে সেজন্য সদাসর্বদা সজাগ-সতর্ক থাকা এবং সে উদ্দেশ্যে মানুষকে বলতে থাকা। এরই নাম—ইরশাদ।

উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা রাযি. এই দায়িত্বটিও পালন করেছিলেন জীবনের শেষ মুহূর্ত অবধি। তিনি এই দায়িত্বটি পালন করতে গিয়ে যা কিছু করেছিলেন, যত কিছু করেছিলেন—তা অন্য কোনো সাহাবীর চাইতে কোনো অংশে কম নয়। ঘরে, বাইরে, সফরে কোথাও এক মুহূর্তের জন্যও এ দায়িত্বটি বিস্মৃত হননি তিনি।

হযরত উসমান রাযি.-এর খেলাফত-আমলে পুরো ইসলামী জাহানে ষড়যন্ত্রের যে বিষাক্ত বীজ ছড়ানো হয়েছিল, তাতে ইসলামের অঙ্কুর ও চারাগুলো বিনষ্ট হচ্ছিল। সাহাবীদের রক্তসিঞ্চিত স্বর্গোদ্যানের আশু বিনাশ মমতাময়ী মায়ের কোমল হৃদয়কে দুঃখে, কষ্টে ভারাক্রান্ত করেছিল। দীর্ঘদিনের লালিত ঘরবাস ভেঙে বের হয়েছিলেন সংশোধনের আন্দোলনে। জাতি ও ধর্মের প্রতি মায়া-মমতারই জ্বালাময়ী প্রকাশ ছিল এটি।

পুরুষদের প্রতি বিভিন্ন উপদেশ

মিশরি ও আজমিদের উসকানিতে সাধারণ মানুষের মধ্যে হযরত উসমান রাযি.-এর প্রতি এত ক্ষোভ জন্মে গিয়েছিল যে, কিছু লোক অভিশম্পাত করা শুরু করেছিল। তখন মুখারিক ইবনে শামামা বসরার একজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ছিলেন। তিনি আপন ভগ্নিকে পাঠালেন উম্মুল মুমিনীনের খেদমতে। আবদার—সর্বময় গোলযোগের ব্যাপারে তাঁর মতটি কী তা যদি ব্যক্ত করতেন। উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা রাযি. বললেন, আমার সন্তানদেরকে আমার পক্ষ থেকে সালাম বলবে, অতঃপর বলবে, আমি আমার এই ঘরটিতেই এই দৃশ্য দেখেছি যে, জিবরীল আ. ওহী নিয়ে অবতরণ করতেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাশরীফ আনতেন, হযরত উসমান রাযি. সঙ্গে বসে থাকতেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার কাঁধের ওপর হাত রেখে বলতেন, এটা লেখো। আল্লাহ পাক এই সম্মান, এই মর্যাদা কোনো যেনতেন লোককে দিতে পারেন না। সুতরাং যারা উসমান রাযি.-এর ওপর অভিশাপ করছে, তাদের অভিশাপ তাদের ওপরই বর্তাবে।[১]

ইমাম আহমাদ রহ. তাঁর বিখ্যাত *মুসনাদ* গ্রন্থে এই বর্ণনাটিই এনেছেন অন্য শব্দে : হযরত আয়েশা রাযি. উত্তর দিলেন, যারা তাঁকে লানত করে, তাদের ওপরই আল্লাহর লানত। আমি দেখেছি, ওহী অবতীর্ণ হতো, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর গায়ের সঙ্গে গা লাগিয়ে বসে থাকতেন। তিনি পরপর দুই-দুইটি মেয়েকে হযরত উসমান রাযি.-এর সঙ্গে বিবাহ দিয়েছিলেন। ওহী লেখার মতো মহাসম্মানটিও লাভ করেছিলেন তিনি। যদি কেউ আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের নিকট মনোনীত না হন, তা হলে কখনোই এত সম্মান, এত মর্যাদা, এত নৈকট্য লাভ করতে পারেন না।[২]

আবু সালামা রাযি. হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ রাযি.-এর পুত্র ছিলেন। একটি জমি নিয়ে কিছু মানুষের সঙ্গে তাঁর বিবাদ ছিল। হযরত আয়েশা রাযি. বিষয়টি জানতে পেরে আবু সালামাহকে ডেকে

---

১. *আল আদাবুল মুফরাদ* : باب نقص شيء من الاسم

২. *মুসনাদে আহমাদ* : ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা : ২৬, ২৫০।

পাঠালেন এবং তাকে বোঝালেন—আবু সালামাহ, এই জমিটুকু নিয়ে আর বিবাদ কোরো না। আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, এক বিঘত জমির জন্যও যদি কেউ জুলুম করে, তবে তার গলায় সাত-সাতটি শেকল ঝুলিয়ে দেওয়া হবে।'[১]

মদীনায় যখন কোনো শিশু জন্মগ্রহণ করত, তখন হযরত আয়েশা রাযি.-এর কাছে আনা হতো। তিনি দুআ করে দিতেন। একবার একটি শিশুকে আনা হলো। শিশুটির মাথার নিচে লোহার ক্ষুর জাতীয় একটি বস্তু ছিল। তিনি বললেন, এটা কী? মহিলারা বলল, এটা থাকলে ভুতেরা পালাবে। তিনি তখন ওই লোহাটি খুলে ফেলে দিলেন। এরপর বললেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো কিছুকে অশুভ জ্ঞান করতে নিষেধ করেছেন। তোমরা এরকম করবে না।[২]

মুসলমান ও পারসিকদের মধ্যে মেলামেশা হযরত উমর রাযি.-এর যুগেই শুরু হয়। কিন্তু ফারুকে আযম রাযি.-এর কঠোর নিয়ন্ত্রণের কারণে অনারব জীবাণুগুলো আরবদের মধ্যে সংক্রমিত হতে পারেনি। হযরত উসমান রাযি.-এর যুগে আরবের আবহাওয়া অনারব সভ্যতায় বিষাক্ত হয়ে পড়ে। কবুতর ওড়ানো, দাবা খেলা, পাশা খেলা ইত্যাদি খেলাধুলা ও অনর্থক ক্রিয়াকলাপ ছড়াতে শুরু করে। সাহাবা কেরাম রাযি. যেহেতু জীবিত ছিলেন, সেহেতু এগুলো কঠোরভাবে প্রত্যাখ্যাত হতো। হযরত আয়েশা রাযি.-এর মালিকানাধীন একটি ঘরে এক ভাড়াটিয়া ছিল। তিনি জানতে পারলেন, লোকটি পাশা খেলায় অভ্যস্ত; তাই খুবই ক্রুদ্ধ হলেন এবং বলে পাঠালেন, যদি পাশার গুটি চিরতরে ঘর থেকে না বের করেছ, তা হলে তোমাকেই ঘর থেকে বের করে দেব।[৩]

তাবেঈ ইবনে আবি সাইব রহ. মদীনার একজন সুবিখ্যাত বক্তা ছিলেন। বক্তাগণ মজলিস গরম করার জন্য ছন্দোবদ্ধ দুআ-মুনাজাত প্রস্তুত করে রাখতেন। সমাজে নিজেদের দাম বাড়ানোর জন্য যেখানে-

---

১. *সহীহ বুখারী* : باب إثم من ظلم شيئا من الأرض।

২. *আল আদাবুল মুফরাদ* : باب الطيرة من الجن।

৩. *আল আদাবুল মুফরাদ* : باب الأدب و إخراج أهل الباطل।

সেখানে যখন-তখন ওয়াজ করা শুরু করতেন। একদিন হযরত আয়েশা রাযি. ইবনে আবি সাইবকে ডেকে বললেন, তোমরা বক্তারা যদি আমাকে তিনটি প্রতিশ্রুতি না দাও, তা হলে তোমাদের বিরুদ্ধে বিচারের ব্যবস্থা করব। ইবনে আবি সাইব বললেন, হে উম্মুল মুমিনীন, বলুন, প্রতিশ্রুতিগুলো কী কী? তিনি বললেন, দুআ-মুনাজাতে ছন্দোবদ্ধ বাক্য পরিহার করো। কেননা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং সাহাবা কেরাম এগুলো করতেন না। সপ্তাহে মাত্র একদিন, যদি মানতে না পার তবে দুই দিন, খুব বেশি হলে তিন দিন ওয়াজ করবে। মানুষকে আল্লাহর কিতাবের প্রতি অনীহা প্রকাশে বাধ্য করবে না। কখনোই এমন কোরো না যে, যত্র-তত্র মানুষের ভিড়ে ঢুকে পড়লে আর ওয়াজ করা শুরু করলে। মানুষ যদি আবদার করে তবেই করো।[১]

ইসলামের বিধান হলো, তালাকপ্রাপ্তা নারী ইদ্দতের দিনগুলোতে স্বামীর ঘরেই অবস্থান করবে। এই বিধানটির বিপরীতে শুধুমাত্র ফাতেমা বিনতে কায়স নাম্নী জনৈকা সাহাবীয়া সাক্ষ্য দিতেন। তিনি বলতেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে তালাকের পরই স্বামীর ঘর ছেড়ে চলে যাওয়ার অনুমতি দিয়েছিলেন। তিনি এই ঘটনাটিকে ইদ্দতের স্থান পরিবর্তনের বৈধতার ওপর প্রমাণ হিসেবে পেশ করতেন। হযরত আয়েশা রাযি.-এর জীবদ্দশায়ই ফাতেমার দেওয়া বিবৃতির ভিত্তিতে জনৈক সম্ভ্রান্ত পিতা সদ্য তালাকপ্রাপ্তা মেয়েকে স্বামীর ঘর থেকে বের করে নিয়ে চলে আসেন। হযরত আয়েশা রাযি. এতে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হলেন এবং কঠোর আপত্তি জানালেন। কেননা এতে ইসলামের একটি সুবিদিত বিধানের প্রতি চরম উপেক্ষা প্রদর্শিত হয়। ওই সময় মদীনার গভর্নর ছিলেন মারওয়ান। তিনি মারওয়ানকে সংবাদ পাঠালেন, তুমি প্রশাসনিকভাবে এই বিষয়ে হস্তক্ষেপ করো। তিনি মাসআলাটির বিষয়েও স্পষ্ট বলে দিলেন, ফাতেমার ঘটনাকে কেন্দ্র করে সবার ওপর বিধান আরোপ করা যাবে না। কেননা ফাতেমার স্বামীর বাড়ি ছিল আশঙ্কাজনক জায়গায়। রাতে জন্তু জানোয়ারের হানা দেওয়ার ভয় ছিল। তাই রাসূল

---

১. *মুসনাদে আহমাদ* : ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা : ২১৭।

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বিশেষভাবে এই অনুমতি দিয়েছিলেন।[১]

অনারব দেশগুলো বিজিত হওয়ার পর তাদের প্রভাবে আরবরাও বিভিন্ন রকম নেশা জাতীয় পানীয়ে মজে গিয়েছিল। এগুলোর ভিন্ন-ভিন্ন নামই মূলত আত্মপ্রতারণার সুযোগ করে দিয়েছিল। এ জাতীয় পানীয়গুলোর মধ্যে একটি ছিল 'বাযিক'। আমাদের পরিচিত শব্দে মদ বা এরকমই কিছু বলা চলে। আরবী ভাষায় এসব নিষিদ্ধ পানীয়কে বলা হতো 'খমর'। নামের গরমিলে অনেকের সন্দেহ হলো। এগুলোও কি খমরের মতো হারাম হবে কি না। হযরত আয়েশা রাযি. মজলিসের মধ্যে প্রকাশ্যে ঘোষণা করে দিলেন, এসব পানীয়ে শুকনো খেজুরও ভেজানো নিষেধ। এরপর তিনি বিশেষ কিছু নারীকে বললেন, যদি তোমাদের ঘরের সাধারণ পাত্রের পানিতেও নেশার বস্তুর মিশ্রণ ঘটে তা হলেও তা হারাম। কেননা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে কোনো নেশাজাতীয় বস্তুকেই নিষিদ্ধ করেছেন।[২]

স্বাভাবিকভাবেই পুরুষের তুলনায় হযরত আয়েশা রাযি.-এর দরস-মজলিসগুলোতে নারীর অংশগ্রহণ ছিল বেশি। নারীসংক্রান্ত সাধারণ মাসায়েল আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে স্বামীদের উদ্দেশ্যেও বিভিন্ন হেদায়েত ও দিক-নির্দেশনা দিয়ে দিতেন। একবার বসরার কিছু মহিলা তাঁর খেদমতে হাজির হলে কথাপ্রসঙ্গে বললেন, আমি পুরুষদের সরাসরি সমালোচনা করতে লজ্জাবোধ করি, তোমরা তোমাদের স্বামীদেরকে বলে দেবে, তারা যেন পবিত্র হতে পানি ব্যবহার করে। আসলে এটাই সুন্নাত।[৩]

নারীদের সংশোধন

একবার কুফার কয়েকজন মহিলা হযরত আয়েশা রাযি.-এর খেদমতে হাজির হলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কোত্থেকে এসেছ? তারা আরজ করলেন, কুফা থেকে। কুফার নাম শোনামাত্রই তাঁর চোখে মুখে

---

১. *সহীহ বুখারী* : বাবু কিসসাতি ফাতিমাহ বিনতি কায়স।

২. সুনানে নাসাঈ : কিতাবুল খমর।

৩. *মুসনাদে আহমাদ* : ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা : ৯৩, ৯৪।

বিষাদ অনুভব করা গেল। এরপর তাদের মধ্য থেকে একজন একটি মাসআলা পেশ করলেন। মাসআলার ঘটনায় জড়িত মূল ব্যক্তিটি ছিলেন বিখ্যাত সাহাবী হযরত যায়েদ ইবনে আরকাম রাযি.। তিনি বললেন, তোমরা দুজনই ভারি অন্যায় করেছ। যায়েদ রাযি.-কে বলে দিয়ো, তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে জিহাদে থেকে যেই সওয়াব অর্জন করেছিলেন, যদি তওবা না করেন, তা হলে সবই বরবাদ হয়ে যাবে।[১]

একবার সিরিয়ার কিছু মহিলা উম্মুল মুমিনীন রাযি.-এর সঙ্গে দেখা করতে এলেন। সিরিয়া এলাকার কিছু মহিলা বাইরে গোসল করতে যেত এবং বিবস্ত্র হয়ে গোসল করত। উম্মুল মুমিনীন রাযি. আগন্তুক মহিলাদের লক্ষ্য করে বললেন, তোমরা সিরিয়ার মেয়েরাই তো বাইরে গোসল করতে যাও, তাই না? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে মেয়ে বেপর্দা হয় সে তার ও আল্লাহর মধ্যকার সম্পর্ককে ছিন্ন করে ফেলে।[২]

হজের মওসুমে হযরত আয়েশা রাযি.-এর অবস্থান-ক্ষেত্রটি লাখো মুসলমানের হৃদয়ের অবস্থান-ক্ষেত্র হয়ে থাকত। মুসলিম নারীগণ দিগ্‌দিগন্ত থেকে উম্মুল মুমিনীন রাযি.-এর অবস্থানকে কেন্দ্র করে এসে জমায়েত হতেন। হজ-কাফেলার নেত্রী হয়ে তিনি চলতেন সামনে সামনে, আর সমবেত মুসলিম নারীগণ চলতেন পেছনে পেছনে।[৩] এভাবে পথ চলতে চলতেও ইরশাদ ও হেদায়েতের দায়িত্ব পালন করতে ভুলতেন না। একবার এক মহিলার কাপড়ে ক্রুশের নকশা দেখে একটু বকলেন, এরপর বললেন, এই কাপড় পরিত্যাগ করো। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদি এমন কাপড় দেখতেন তা হলে খুবই মনঃক্ষুণ্ন হতেন।[৪]

যেসব অলঙ্কারে শব্দ হয়, সেসব অলঙ্কার নারীদের জন্য নিষিদ্ধ। এমনকি, ঘণ্টার শব্দও নিষিদ্ধ। একবার একটি মেয়ে নূপুর পরে উম্মুল

---

১. *সুনানে বাইহাকী* : কিতাবুল বুয়ু।
২. *মুসনাদে আহমাদ* : ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা : ১৭৩।
৩. *মুসনাদে আহমাদ* : ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা : ২২৫। *মুয়াত্তা*, বাবুল ইফতা, কিতাবুল হজ-এর আলোচনাও দ্রষ্টব্য।
৪. *মুসনাদে আহমাদ* : ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা : ২২৫, ২৪০।

মুমিনীন রাযি.-এর খেদমতে এল। তিনি বললেন, মা, এটা পরে আর কখনো আমার কাছে এসো না। এর শব্দ করা অংশগুলো কেটে ফেলো। জনৈকা মহিলা এর কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ঘরে বা সফরে ঘণ্টা বাজে বা অলঙ্কারের শব্দ হয়, তাতে রহমতের ফেরেশতা আসে না।[১]

হাফসা বিনতে আবদুর রহমান তাঁর ভাতিজি ছিলেন। তিনি একদিন খুবই পাতলা ওড়না পরে ফুফির কাছে এলেন। উম্মুল মুমিনীন ক্রুদ্ধ হয়ে ওড়নাটা ছিঁড়ে ফেললেন। বললেন, তুমি জানো না, সূরা নূরের মধ্যে আল্লাহ কী বলেছেন? এরপর তিনি ভাতিজিকে অন্য একটি মোটা কাপড়ের ওড়নার ব্যবস্থা করে দিলেন।[২]

সাধারণ উপদেশ

হযরত আয়েশা রাযি. একটি মুকাতাব গোলাম আজাদ করলেন। বিদায় বেলায় বললেন—যাও, আল্লাহর পথে জিহাদ করতে থাকো। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে মুসলমানের শরীরে আল্লাহর পথের ধুলা-বালি লাগে, তাকে জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করতে পারে না।[৩]

একবার হযরত আয়েশা রাযি.-এর ভাই আবদুর রহমান ইবনে আবু বকর রাযি. তাঁর কাছে এলেন। তিনি খুবই সাধারণভাবে তাড়াহুড়া করে ওযু করে চলে যেতে লাগলেন। হযরত আয়েশা রাযি. ডাক দিয়ে বললেন, ভ্রাতা আবদুর রহমান, ভালো করে ওযু করে নাও। আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, ওযুর যে অঙ্গটি শুকনো থাকে তা জাহান্নামের আগুনে দগ্ধ হবে।[৪]

তিনি একবার এক বাড়িতে মেহমান হলেন। বাড়িটিতে উঠতি বয়সী দুটো মেয়ে ছিল। তারা কোনো বড় কাপড় বা চাদর শরীরে না জড়িয়ে নামায পড়ছিল। হযরত আয়েশা রাযি. বললেন, আর কেউ যেন বড়

---

১. *মুসনাদে আহমাদ* : ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা : ২৪২।
২. *মুয়াত্তা*, ইমাম মালেক : কিতাবুল লিবাস।
৩. *মুসনাদে আহমাদ* : ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা : ৮৫।
৪. *মুসনাদে আহমাদ* : ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা : ২৮৫।

কাপড় বা চাদর ছাড়া নামায না পড়ে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমনটিই নির্দেশ দিয়েছিলেন।[১]

ইহুদিদের একটি প্রথা ছিল, যদি কোনো মেয়ের চুল ছোট হতো, তা হলে কৃত্রিম চুল লাগিয়ে সৌন্দর্যের ঘাটতি দূর করতে চাইত। ইহুদিদের দেখাদেখি আরব নারীদের মধ্যেও এর রেওয়াজ শুরু হয়। একবার এক মহিলা এসে জিজ্ঞেস করল, আমার মেয়ের বিয়ে হতে যাচ্ছে। অসুস্থতার কারণে ওর চুলগুলো ঝরে গিয়েছিল। হে উম্মুল মুমিনীন, কৃত্রিম চুল লাগানো যাবে কি? তিনি বললেন, যারা কৃত্রিম চুল লাগিয়ে নেয়, আর যারা কৃত্রিম চুল লাগিয়ে দেয় উভয়কেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অভিশম্পাত করেছেন।[২]

মানুষ মনে করে, কুরআন মাজীদ যত দ্রুত পড়া যাবে সওয়াবও তত দ্রুত হতে থাকবে। এক ব্যক্তি এসে জিজ্ঞেস করল, হে উম্মুল মুমিনীন, কিছু লোক এক রাতে দুই খতম, তিন খতম করে কুরআন পড়ে ফেলেন। তিনি বললেন, ওদের পড়া আর না পড়া সমান। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সারা রাত নামাযে দাঁড়িয়ে কুরআন তেলাওয়াত করতেন। তিনি সূরা বাকারা, সূরা আ-লি ইমরান, সূরা নিসাই অতিক্রম করতে পারতেন না (মাত্র তিনটি সূরা পড়তে পড়তেই রাত শেষ হয়ে যেত)। যখন সুসংবাদের আয়াত আসত তখন প্রার্থনা করতেন, আর যখন সাবধানবাণী আসত তখন পানাহ চাইতেন।[৩]

---

১. *মুসনাদে আহমাদ* : ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা : ৯৬।

২. *মুসনাদে আহমাদ* : ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা : ১১১। হাদীসটি আরও অনেক কিতাবে এসেছে। সনদও সহীহ। অনেক দিন পর্যন্ত এই নিষেধাজ্ঞা এবং এত কঠোরতা আরোপ ও অভিশম্পাতের কারণ আমার বুঝে আসেনি। ঘটনাক্রমে একটি প্রবন্ধে ইউরোপের বর্তমান প্রেক্ষাপট সম্পর্কে বেশ কিছু তথ্য জানার সুযোগ হলো। একটা অদ্ভুত তথ্য পেলাম : ইউরোপে যে মেয়েদের চুল সুন্দর হয় তারা মারা গেলে প্রসাধনী কোম্পানিগুলো নাকি তাদের চুল কিনে প্রক্রিয়াকরণ করে, এরপর বাজারে বিক্রি করে। মেয়েরা নিজেদের চুলের শ্রীবৃদ্ধির জন্য কৃত্রিম চুল হিসেবে সেগুলো কিনে নেয় এবং ব্যবহার করে। আমার মনে হয়, যেহেতু এটা যৎপরনাস্তি ঘৃণ্য ও মানবতাবিরোধী কাজ, সেহেতু হাদীসে এই শাস্তি ও অভিশম্পাতের কথা এসেছে। আরব ইহুদিদের মধ্যেও হয়তো এই প্রথাই ছিল। কারণ এরা খুবই অর্থলোভী ও স্বার্থপর ছিল। এরা যে এটা করত না, সেটা ভাবার তুলনায় এরা যে এটা করত, সেটা ভাবাই বেশি সঙ্গত। তা ছাড়া, কোনো নারী বেঁচে থাকতে কী করে নিজের চুল বিক্রি করে নিজের শ্রীহানি ঘটিয়ে অন্যের শ্রীবৃদ্ধির ব্যবস্থা করতে পারে?

৩. *মুসনাদে আহমাদ* : ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা : ১১।

হযরত উসায়েদ ইবনে হুযায়ের রাযি. অত্যন্ত বড় মাপের সাহাবী ছিলেন। হজের কাফেলার সঙ্গে মদীনায় প্রত্যাবর্তন করছিলেন। মদীনার কাছাকাছি এসে সংবাদ পেলেন, তাঁর স্ত্রী মারা গেছেন। দীর্ঘদিনের সফর শেষে ঘরে ফিরছেন, এমন সময় প্রিয়তমা স্ত্রীর আকস্মিক মৃত্যু-সংবাদ তাঁকে মুহ্যমান করল। তিনি মুখে কাপড় চেপে ধরে কাঁদতে লাগলেন। হৃদয়ের আবেগকে কে-ইবা অস্বীকার করতে পারে? কিন্তু তারপরও, এভাবে সাহাবা-কাফেলার ভরা মজলিসে—মুখ চেপে ধরে—অন্তত একজন সাহাবীর কেঁদে ফেলা সম্পূর্ণ শোভন মনে হয়নি। উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা রাযি.-ও উপস্থিত ছিলেন। তিনি হযরত উসায়েদ রাযি.-কে সম্বোধন করে বললেন, আপনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একজন সাহাবী; ইসলামে অগ্রবর্তিতার সম্মানপ্রাপ্ত হয়েছেন; অথচ স্ত্রীর মৃত্যুশোক আপনাকে এমন মুহ্যমান করে ফেলছে ?[১]

কাবা শরীফে প্রতি বছর নতুন গিলাফ চড়ানো হয় এবং পুরনোটি নামিয়ে ফেলা হয়। হযরত আয়েশা রাযি.-এর যামানায় যিনি কাবা শরীফের তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন, তিনি পুরাতন গিলাফটি মাটিতে দাফন করে দিতেন। তার অনুভূতি ছিল, পবিত্র গিলাফ অপবিত্র মানুষের সংস্পর্শে রাখব না। শাইবা ইবনে উসমান ছিলেন কাবার চাবি-রক্ষক। তিনি বলেন, আমরা গভীর গর্ত খনন করতাম, তারপর পুরনো গিলাফের সবগুলো কাপড় সেখানে দাফন করতাম। কেননা আমরা মনে করতাম, মানুষের সংস্পর্শে থাকলে এগুলোর অসম্মান হবে। অনেকে এগুলো পরিধান করা শুরু করবে। হতে পারে কেউ নাপাক অবস্থায়ও পরোয়া করবে না। কিন্তু যিনি শরীয়ত সম্পর্কে সম্যক অবগত ছিলেন, তিনি ধরে ফেললেন—এই সম্মানপ্রদর্শন অবশ্যই শরীয়তসম্মত নয়। তিনি উপলব্ধি করলেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল এ ধরনের নির্দেশ দেননি। খুব সম্ভব, আজকের এই অতি অনুভূতি অদূর ভবিষ্যতে কোনো ভ্রান্ত বিশ্বাসের আবর্ত সৃষ্টি করবে, যাতে সরলপ্রাণ মুসলমানেরা ফেঁসে যাবে। উম্মুল মুমিনীন শাইবাকে ডেকে পাঠালেন, বললেন, এটা ঠিক নয়, তোমরা যা

---

১. *মুসনাদে আহমাদ* : ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা : ৩৫২।

করছ ভালো করছ না। গিলাফটি যখন কাবা শরীফ থেকে নামানো হয়ে গেছে, তখন যদি কেউ তা নাপাক অবস্থায় পরিধান করেও, তবু ক্ষতি নেই। তোমরা বরং একে বেচে ফ্যালো এবং এর পয়সা দিয়ে গরিব-দুঃখীদের সহায়তা করো।[১] যতদূর ধারণা করা হয়, এর পর থেকেই কাবা শরীফের পুরনো গিলাফ সাধারণ মুসলমানদের হাতে আসে এবং আগ্রহী মানুষেরা বরকত-স্বরূপ কিনে নিয়ে কাছে রাখে। এই অনুগ্রহটির জন্যও সকল মুসলমানকে উম্মুল মুমিনীন রাযি.-এর প্রতি কৃতজ্ঞ থাকা উচিত।

একবার এক ব্যক্তি (ধারণা করা হয়, হযরত আবু হুরায়রা রাযি. হবেন) মসজিদে নববীতে এলেন এবং হযরত আয়েশা রাযি.-এর হুজরার কাছে বসে পড়লেন। এরপর শুনিয়ে শুনিয়ে খুব দ্রুত ও উচ্চস্বরে হাদীস বলতে লাগলেন। হযরত আয়েশা রাযি. তখন নামায পড়ছিলেন। নামায শেষ হতে না হতেই লোকটি গায়েব হয়ে গেলেন। এমন সময় উরওয়াহ এলেন উম্মুল মুমিনীনের খেদমতে। তিনি বললেন, কি আশ্চর্য, অমুক আমার ঘরের পাশে বসে আমাকে শুনিয়ে শুনিয়ে দ্রুত হাদীস বলতে লাগল। আমি নামাযে ছিলাম। নামায শেষ হতে না হতেই সে গায়েব। থাকলে বলতাম, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমার মতো এত দ্রুত কথা বলতেন না।[২] হযরত আয়েশা রাযি.-এর কথার অর্থ হলো, যে ব্যক্তি হাদীসচর্চা করবে তার কথা ও কাজে সঙ্গতি থাকতে হবে। নয়তো নিছক হাদীস বলায় উপকার নেই।

হজের মওসুমে তিনি একটি তাঁবুতে ছিলেন। মানুষেরা তাঁর সাক্ষাতের জন্য আসছিল। কয়েকটি কুরাইশি যুবক হাসতে হাসতে এল। তিনি হাসার কারণ জিজ্ঞেস করলেন। তারা বলল, মাতা, আপনার তাঁবুর দিকে আসতে লেগে অমুক এমনভাবে পড়ে গিয়েছিল যে, হয়তো চোখ যেত, নয়তো ঘাড় ভাঙত। তিনি বললেন, হেসো না। সাধারণ কোনো কাঁটা-ফাটা বা এর চেয়েও কোনো ছোট বিপদ যদি মুমিনকে আক্রান্ত করে তাতেও তার মর্যাদা বৃদ্ধি পায় এবং গোনাহ মাফ হয়।[৩]

---

১. *আইনুল ইসাবা*, সুয়ূতি রহ. (বাইহাকীর উদ্ধৃতি)।

২. *সহীহ বুখারী* : সিফাতুন নাবিয়্যি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

৩. *সহীহ মুসলিম* : باب ثواب المؤمن فيما يصيب।

নারী জাতির প্রতি অবদান

আমরা আলোচনার শেষ পর্যায়ে পৌঁছে গেছি। এ অধ্যায়েই আমাদের এই জ্ঞানমূলক যাত্রার সমাপ্তি ঘটবে। উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা রাযি.-এর জীবন-কর্ম আলোচনার যবনিকা হিসেবে সেই মহত্তম ভূমিকাটিই উপস্থাপিত হওয়া উচিত যা তিনি একজন নারী হিসেবে নারী জাতির প্রতি পালন করে গেছেন।

নারীর শ্রেণিগত মর্যাদা বৃদ্ধি

নারী জাতির প্রতি তাঁর সবচেয়ে বড় অবদান এই যে, তিনি পৃথিবীকে দেখিয়ে দিয়েছেন, একজন মুসলিম নারী—ধর্মীয় অনুশাসন মেনেও, আজীবন পর্দার ভেতরে থেকেও—জ্ঞানের জগতে, ধর্মের জগতে অবদান রাখতে পারেন; সমাজ-জীবনে, রাজনৈতিক অঙ্গনে অংশগ্রহণ করতে পারেন; সংস্কার ও সংশোধনের এবং হিতোপদেশ ও পথপ্রদর্শনের মশাল ধারণ করতে পারেন; সর্বোপরি, দেশ ও জাতির কল্যাণে নিবেদিতপ্রাণ আত্মোৎসর্গকারিণীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে পারেন।

এককথায়, ইসলাম সত্যিকার অর্থেই নারীদের যে সম্মান ও মাহাত্ম্য প্রদান করেছে; জীবন ও জগতের বাস্তবতায় তাদের অবস্থানকে যত উঁচুতে উঠিয়ে দিয়েছে; উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা রাযি.-এর জীবনালেখ্য তার জীবন্ত বিশ্লেষণ।

বলতে দ্বিধা নেই, সাহাবা কেরামের মধ্যে যদি এমন কেউ অতিবাহিত হন যিনি মাসীহে ইসলাম[১] আখ্যা পেতে পারেন, কিংবা

---

১. হযরত আবু যর রাযি. মাসিহে ইসলাম ছিলেন। ইসতিআব ও ইসাবা-য় তাঁর জীবনী দ্রষ্টব্য।

আহদে মুহাম্মাদীর হারুন[১] অভিহিত হতে পারেন; তা হলে—আল্লাহর শোকর—সাহাবীয়াগণের মধ্যেও এমন একটি নারীসত্তা ছিলেন যিনি মারইয়ামে ইসলামের[২] মর্যাদা পেতে পারেন।

নারীদের দাবি ও আবেদন উত্থাপন

সাহাবীয়াগণ তাদের আবেদন, অভিযোগ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত পৌঁছাতেন পবিত্র স্ত্রীগণের সাহায্যে। উসমান ইবনে মাযউন রাযি. একজন বড় মাপের সাহাবী ছিলেন। তিনি সন্ন্যাস-জীবন যাপন করতে আরম্ভ করেন। একদিন তার স্ত্রী হযরত আয়েশা রাযি.-এর কাছে আসেন। তাকে খুবই মলিন ও ফ্যাকাশে দেখাচ্ছিল। সাজগোছ তো দূর, সাধারণ পারিপাট্যও ছিল না। কারণ জিজ্ঞেস করলে আমতা-আমতা করতে করতে একসময় বলে ফেললেন, আমার স্বামী সারা দিন রোযা রাখে, সারা রাত নামায পড়ে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘরে তাশরীফ আনলে কথা বলতে বলতে হযরত আয়েশা রাযি. বিষয়টা জানালেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উসমান ইবনে মাযউন রাযি.-এর কাছে গেলেন এবং বললেন—উসমান, আমাদের তো সন্ন্যাস ধারণ করার নির্দেশ দেওয়া হয়নি, আমার জীবন তোমার জন্য আদর্শ নয়? আমিই তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি আল্লাহকে ভয় করি, আমিই তোমাদের মধ্যে তাঁর নির্দেশ পালনে সবচেয়ে যত্নশীল।[৩] অর্থাৎ এরপরও আমি স্ত্রী-সন্তানের হক আদায় করি।

হাওলা রাযি. একজন সাহাবীয়া ছিলেন। তিনি রাতভর ঘুমাতেন না। শুধু নামায পড়তে থাকতেন। ঘটনাক্রমে তিনি একবার সামনে দিয়ে পথ

---

১. হাদীসে আছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আলী রাযি.-কে বলেছিলেন, أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي অর্থ : মুসা আ.-এর কাছে হারুন আ.-এর যে অবস্থান, আমার কাছে তোমার সেই অবস্থান। কিন্তু আমার পরে কোনো নবী নেই (*সুনানে ইবনে মাজাহ* : ১/৪৫/১২১)।

২. হাদীসে হযরত মারইয়াম আ.-এর কামাল বর্ণনা করার পর হযরত আয়েশা রাযি.-এর শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করা হয়েছে (*সহীহ বুখারী* : কিতাবু ফাযাইলি আসহাবিন নাবিয়্যি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)।

৩. *মুসনাদে আহমাদ* : ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা : ২২৬।

অতিক্রম করছিলেন। হযরত আয়েশা রাযি. তাকে দেখে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল, ওই যে উনি হযরত হাওলা রাযি.। লোকে বলে, তিনি নাকি রাতভর একটুও ঘুমান না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিস্ময়ের স্বরে বললেন, রাতভর ঘুমান না? এরপর বললেন, ওই পরিমাণ আমলই করো, যা শেষ পর্যন্ত ধরে রাখা যায়।[১]

জনৈকা মহিলা চুরির অপরাধে দণ্ডিত হয়েছিল। পরবর্তীতে সে তওবা করে ভালো হয়ে যায়। তারপরও নারীরা তাকে এড়িয়ে চলত। কিন্তু হযরত আয়েশা রাযি. তাকে এড়িয়ে চলতেন না। মহিলাটি তাঁর কাছে আসত এবং তাঁর সঙ্গে মেলামেশা করত। অনেক সময় তিনি মহিলাটির পক্ষে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে দরখাস্ত ও সুপারিশ পেশ করতেন।[২]

জনৈকা সাহাবীয়াকে তার স্বামী প্রহার করেছিলেন। প্রহারের কারণে শরীরের বিভিন্ন জায়গায় দাগ উঠে যায়। সাহাবীয়া সরাসরি উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা রাযি.-এর কাছে চলে আসেন এবং নিজের দুরবস্থা তুলে ধরেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ঘরে তাশরীফ আনলেন, তখন হযরত আয়েশা রাযি. আরজ করলেন,

مَا رَأَيْتُ مِثْلَ مَا يُلْقِي الْمُؤْمِنَاتُ لِجِلْدِهَا أَشَدَّ خَضْرَةً مِّنْ ثَوْبِهَا

অর্থ : কোনো মুমিনা নারীকে এমন বিপদের সম্মুখীন হতে আমি আর দেখিনি। এই বেচারির গায়ের চামড়া তার গায়ের কাপড়ের চেয়েও সবুজ হয়ে গিয়েছে।

স্বামী যখন জানতে পারলেন যে, স্ত্রী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে পৌছে গিয়েছে, তখন তিনিও ছুটে এলেন। দুজন মুখোমুখি হওয়ার পর দেখা গেল ত্রুটি দুজনেরই।[৩] আপন সাহাবী-সাহাবীয়ার বিষয়টি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মীমাংসা করলেন।

---

১. *মুসনাদে আহমাদ* : ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা : ২২৪।

২. *সহীহ বুখারী* : باب شهادة القاذف।

৩. *সহীহ বুখারী* : বাবুস সিয়াবিল খাযর।

নারীকে তুচ্ছজ্ঞান করার প্রতিবাদ

নারীদের কেউ ছোট করে দেখলে উম্মুল মুমিনীন রাযি. তাদের প্রতি ক্রুদ্ধ হতেন। কোনো মাসআলায় যদি নারীদের প্রতি অবজ্ঞা-ভাব প্রকাশ পেত, তা হলে তার তল দেখে ছাড়তেন। দু-একজন সাহাবী মাসআলা দিতেন, যদি নামাযরত অবস্থায় নামাযীর সামনে দিয়ে কুকুর, গাধা বা নারী অতিক্রম করে তা হলে তার নামায নষ্ট হয়ে যাবে। হযরত আয়েশা রাযি. মাসআলাটি শুনতে পেয়ে ক্রুদ্ধ হয়ে গেলেন, এবং বললেন—

إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذاً دَابَّةُ سُوْءٍ بِئْسَ مَا عَدَلْتُمُوْنَا بِالْحِمَارِ وَ الْكَلْبِ

অর্থ : তা হলে নারীও একটা ইতর প্রাণী! এ কেমন ইনসাফ তোমাদের যে, আমরা কুকুর আর গাধার সমতুল্য হয়ে গেলাম? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায পড়তেন, আর আমি তাঁর সামনে শুয়ে থাকতাম।' এটা *তয়ালিসির* বর্ণনা।[১] অন্য একটি বর্ণনায় আছে, তিনি বলেন, রাসূল যখন সেজদায় যেতে চাইতেন, আমার পায়ে দাবা দিতেন, আর আমি পা সরিয়ে নিতাম।[২] কোনো কোনো ফকীহ মনে করেন, নারীকে স্পর্শ করলে ওযু নষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু উম্মুল মুমিনীন রাযি.-এর বর্ণনাটি এসব ভুল বোঝাবুঝির নিরসন করে না কি?

হযরত আবু হুরায়রা রাযি. বর্ণনা করেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তিনটি কুলক্ষণ আছে তিনটি বস্তুতে : ঘর, ঘোড়া, নারী। বর্ণনাটি শুনে হযরত আয়েশা রাযি. রেগে যান। তিনি বলেন— কসম ওই সত্তার, যিনি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর কুরআন অবতীর্ণ করেছেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনোই এমন কথা বলেননি; তবে তিনি বলেছিলেন, ইহুদি ও জাহেলরা এই তিনটি বস্তু থেকে অশুভ পূর্বাভাস গ্রহণ করত।

মাসআলায় নারীদের সুবিধা-অসুবিধা বোঝা

কিছু কিছু মাসআলায় সাহাবা কেরামের মতভেদ ছিল। এসব মাসআলায় তিনি ওই দিকগুলোকেই প্রাধান্য দিতেন যেগুলোতে নারী

---

১. *মুসনাদে তয়ালিসি* : ২০৫ পৃষ্ঠা (হায়দারাবাদের ছাপা)।

২. *আবু দাউদ* : বাবুল মারআতি লা ইয়াকতাউস সালাহ।

জাতির জন্য সুবিধা হয়। কেননা তিনিই নারীর সুবিধা-অসুবিধা ভালো বুঝতেন। তাই বলে খেয়াল-খুশির আশ্রয় নিতেন না। বরং কুরআন ও সুন্নাহর আলোকেই এগুলোর প্রমাণ পেশ করতেন। এ কারণেই দেখা যায়, এ ধরনের অধিকাংশ বিষয়েই ফকীহগণ তাঁর মতটিকেই প্রাধান্য দিয়েছেন, এবং অধিকাংশ রাষ্ট্রে এ অনুযায়ীই ফতোয়া প্রদত্ত হয়।

গোসলে খোঁপা-খোলা প্রসঙ্গ

হযরত ইবনে উমর রাযি. ফতোয়া দিতেন, নারীদের শরঈ পবিত্রতা অর্জনের জন্য খোঁপা খুলে গোসল করতে হবে। হযরত আয়েশা রাযি. এ কথা শুনে বললেন—সে এ ফতোয়াই দিয়ে দিত যে, নারীদের মাথার চুলমুল কেটে ফেলে দিতে হবে। আরে, আমি তো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে গোসল করতাম, আমি শুধুমাত্র তিন বার পানি ঢালতাম;[১] একটি চুলও খুলতাম না।[২]

হজে চুল কাটানো প্রসঙ্গ

হজে হাজীদের মাথা চাঁছাতে বা ছাঁটাতে হয়। কিন্তু নারীরা কী করবে? এ ব্যাপারে হযরত ইবনে উমর রাযি. ফতোয়া দিতেন, নারীদেরও মেপে চার আঙ্গুল পরিমাণ ছাঁটাতে হবে। ফতোয়াটি শুনে হযরত আয়েশা রাযি. বললেন, ইবনে উমরের কথা শুনে কি তোমাদের অবাক লাগে না? সে মুহরিম নারীদের নাকি মেপে চার আঙ্গুল পরিমাণ চুল কাটাতে বলে! অথচ মাথার যে কোনো জায়গা থেকে সামান্য পরিমাণ চুল কাটানোও যথেষ্ট।[৩]

ইহরাম অবস্থায় মোজা পরা প্রসঙ্গ

ইহরাম অবস্থায় পুরুষরা মোজা পরতে পারে না। কিন্তু যদি কেউ অপারগ হয়ে পরতে চায়, তা হলে টাখনুর ওপর থেকে কেটে ফেলতে

---

১. *সহীহ মুসলিম* : باب الغسل ।

২. *সুনানে নাসাঈ* : باب الغسل।

৩. *আইনুল ইসাবা*, সুয়ূতি (ইমাম ইবনে হাম্বল রহ.-এর *মানাসিকে কাবির*-এর উদ্ধৃতিতে)।

হবে। হযরত ইবনে উমর রাযি. নারীদের ব্যাপারেও একই কথা বলতেন। পক্ষান্তরে হযরত আয়েশা রাযি. বললেন, এই বিধান শুধুমাত্র পুরুষের জন্য। নারীদের মোজা কাটতে হবে না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-ই এই অনুমতি দিয়েছেন। উম্মুল মুমিনীনের ফতোয়া শুনে ইবনে উমর রাযি. আপন ফতোয়া প্রত্যাহার করে নেন।[১]

ইহরামের অবস্থায় খুশবু ব্যবহার প্রসঙ্গ

ইহরামের অবস্থায় খুশবু ব্যবহার নিষিদ্ধ। এ কারণে অনেকে মনে করতেন, ইহরাম বাঁধার সময়ও খুশবু লাগানো যাবে না। কিন্তু হযরত আয়েশা রাযি. বলেন, আমরা (পবিত্র স্ত্রীগণ) ইহরামের সময় কপালে খুশবু লাগিয়ে নিতাম, ঘামের কারণে অনেকের কপাল থেকে খুশবু গলে চেহারায় চলে আসত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দেখতেন; কিন্তু নিষেধ করতেন না।[২]

ইহরাম অবস্থায় পোশাক ও নেকাব প্রসঙ্গ

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাযি. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করতেন, ইহরাম অবস্থায় চেহারায় নেকাব ব্যবহার করা যাবে না (আরবে পুরুষরাও মরুভূমির রোদের তাপ থেকে আত্মরক্ষার জন্য চেহারায় নেকাব ব্যবহার করত)। কিন্তু নারীদের জন্য পর্দার বিধানের কারণে সবসময় এটা করা সম্ভব হতো না। এজন্য হযরত আয়েশা রাযি. বলেন, আমরা যখন বিদায় হজে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে ছিলাম তখন কাফেলা সামনে থাকত, আমরা পেছনে থাকতাম; কিন্তু সামনের দিক থেকে কেউ এলে মাথার ওপর থেকে চাদর নামিয়ে দিতাম। তারা চলে গেলে আবার চেহারা অনাবৃত করতাম।[৩] হিজরী প্রথম শতক পর্যন্ত হযরত আয়েশা রাযি.-এর ফতোয়ার ওপরই আমল ছিল।

---

১. *আবু দাউদ* : باب ما يلبس المحرم।

২. *আবু দাউদ* : باب ما يلبس المحرم।

৩. *আবু দাউদ* : باب ما يلبس المحرم।

জনৈকা তাবেঈয়া বর্ণনা করেন, আমরা হযরত আয়েশা রাযি.-এর ভগ্নি হযরত আসমা রাযি.-এর সঙ্গে হজের সফর করতাম। আমরা ইহরাম অবস্থায়ও মুখ ঢেকে রাখতাম; কিন্তু তিনি আমাদের নিষেধ করতেন না।[১]

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাযি. বর্ণনা করেন, জনৈক সাহাবীর প্রশ্নের উত্তরে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন, ইহরামের অবস্থায় জামা, পাজামা, টুপি, পাগড়ি পরা যাবে না। কাপড়ে জাফরান বা কুসুমের রঙ লাগানো যাবে না।[২]

এই হাদীসের আলোকে অনেকে নারীদের জন্যও জাফরান বা জাফরানের রঙ মিশ্রিত কাপড় ব্যবহার করা নিষিদ্ধ বিবেচনা করেছেন। কিন্তু একটু চিন্তা করলেই বোঝা যায়, হাদীসটি শুধুমাত্র পুরুষকে কেন্দ্র করে। তা ছাড়া, কথাটি বলাও হয়েছে একজন পুরুষেরই প্রশ্নের উত্তরে। এজন্যই হযরত আয়েশা রাযি. নিজেও ইহরাম অবস্থায় জাফরানের রঙ লাগানো কাপড় পরিধান করতেন। এমনকি তিনি মনে করতেন, নারীরা ইহরামের অবস্থায়ও অলঙ্কার পরতে পারবে; সাদা গোলাপি ইত্যাদি বিভিন্ন রঙের কাপড়ও পরিধান করতে পারবে।[৩]

ব্যাবহারিক অলঙ্কারের যাকাত প্রসঙ্গ

ব্যবহারের জন্য বানানো সোনা-চাঁদির গয়নায় যাকাত আসবে কি না—সাহাবা কেরাম রাযি. এ ব্যাপারে মতভেদ করেছেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি.-সহ কতিপয় সাহাবী, তাবেঈ এবং ইমামের দৃষ্টিতে, এতে যাকাত আসবে। হানাফি আলেমগণ এ মতেরই সমর্থক। পক্ষান্তরে হযরত ইবনে উমর রাযি., আনাস ইবনে মালেক রাযি. এবং জাবের ইবনে আবদুল্লাহ রাযি. মনে করতেন, এতে যাকাত আসবে না। শাফেঈ, মালেকি ও হাম্বলি আলেমগণ এ মতটিকে সমর্থন করেছেন।

---

১. *মুয়াত্তা*, ইমাম মালেক রহ. : باب تخمير المحرم وجهه।

২. *সহীহ বুখারী* : باب ما يلبس المحرم من الثياب।

৩. *সহীহ বুখারী* : باب ما يلبس المحرم من الثياب।

অলঙ্কারাদি যেহেতু নারীদের বিষয় সেহেতু এ ব্যাপারে হযরত আয়েশা রাযি.-এর মতটি মীমাংসাকারী হতে পারত। কিন্তু তাঁর দৃষ্টিভঙ্গিটিও স্পষ্ট নয়। একদিকে *মুআত্তা*-য় আছে, তিনি তাঁর অধীনস্থ এতিম শিশুদের অলঙ্কারের যাকাত আদায় করতেন না।[১] অন্যদিকে *আবু দাউদ* ও *দারাকুতনী*তে আছে, হযরত আয়েশা রাযি.-এর হাতে চাঁদির অলঙ্কার ছিল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, এগুলোর যাকাত দাও? তিনি বললেন, জি না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, আয়েশা, জাহান্নামের আগুন থেকে বেঁচে থাকো।[২]

---

১. *তিরমিযী* এবং *মুয়াত্তা মালেক* : باب زكوة الحلى।

২. *দারাকুতনী*র এই রেওয়ায়েতের একজন রাবী হলেন মুহাম্মাদ ইবনে আতা। ইমাম দারাকুতনী এই রেওয়ায়াতটি উল্লেখ করার পর লিখেছেন, মুহাম্মাদ ইবনে আতা মাজহুল রাবী। কিন্তু *আবু দাউদ*-এ স্পষ্টত আছে যে, ইনি মুহাম্মাদ ইবনে আমর ইবনে আতা। যিনি একজন মাশহুর রাবী। সুতরাং হাদীসবিশারদগণ মনে করেন, ইমাম দারাকুতনীর এই জারাহ বা সমালোচনা সহীহ নয়। ইমাম তিরমিযী বলেন, অলঙ্কারের ব্যাপারে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা পাওয়া যায় না। তার আরবী ভাষ্যটি হলো : لا يصح في هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء; কিন্তু দারাকুতনীতে ফাতেমা বিনতে কায়স রাযি.-এর বর্ণনা আছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, অলঙ্কারে যাকাত আছে। আমর ইবনে শুআইবের সূত্রে ইবনে লাবিআহর রিওয়ায়েত আছে, দুজন স্ত্রী রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হলেন, তাদের হাতে সোনার চুরি ছিল, তিনি বললেন, তোমরা এগুলোর যাকাত দাও? তারা বললেন, জ্বি না, হে আল্লাহর রাসূল। তিনি বললেন, তোমরা কি আগুনের চুরি পরা পছন্দ করবে? তারা বললেন, জ্বি না, হে আল্লাহর রাসূল। তিনি বললেন, তা হলে এর যাকাত আদায় করো (তিরমিযী)। ইমাম তিরমিযী রহ. রেওয়ায়েতটিকে যঈফ বলেছেন। এর কাছাকাছি অর্থের আরও কয়েকটি রেওয়ায়েত আছে। মোটকথা, এ বিষয়ে সাহাবী, তাবেঈগণের রেওয়ায়েত ও আকওয়াল ভিন্ন ভিন্ন। উভয় মতের দলিল-প্রমাণ উভয় পক্ষের কিতাবগুলোতে আছে। তবে অলঙ্কারের যাকাত ওয়াজিব হওয়ার সবচে বড় দলিল এই যে, সোনা-রুপার কানয বা যাকাত আদায় না করে সঞ্চিত করে রাখার ব্যাপারে কুরআনে হুমকি এসেছে :...والذين يكنزون الذهب و الفضة—অর্থ : আর যারা সোনা ও রুপা কানয (সঞ্চিত) করে রাখে... [সূরা তাওবা : ৩৪] এবং সুনানে *আবু দাউদ*-এ উম্মুল মুমিনীন উম্মে সালামা রাযি. থেকে বর্ণিত আছে, তিনি সোনার কিছু অলঙ্কার পরে ছিলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল, এও কি কানয বলে গণ্য হবে? ইরশাদ করলেন, যদি যাকাত পরিমাণ হয়ে যায় এবং যাকাত আদায় করা হয় তা হলে কানয বলে গণ্য হবে না। এই হাদীস থেকে কানয-এর ব্যাখ্যা নির্দিষ্ট হয়ে যায় এবং এও স্পষ্ট হয় যে, যদি কোনো অলঙ্কারের যাকাত আদায় না করা হয়—চাই সেটা ব্যবহারের হোক বা না হোক—তা হলে তা কানয-এর পর্যায়ভুক্ত হয়ে যাবে। যার ওপর কুরআনে কারীমে কঠোর হুমকি এসেছে।

এ কথা সুস্পষ্ট যে, হযরত আয়েশা রাযি. এত বড় সাবধান-বাণী শোনার পরও অলঙ্কারের যাকাত আদায় করেননি—এমনটা হতেই পারে না। এমনকি, *দারাকুতনী*তে হযরত আয়েশা রাযি.-এরই বর্ণনা আছে, যেই অলঙ্কারের যাকাত আদায় করা হয় তাই কেবল ব্যবহার করা জায়েয। এ থেকে প্রতীয়মান হয়, হযরত আয়েশা রাযি. অলঙ্কারের যাকাত আদায় করতে হবে এ মতই পোষণ করতেন।

মুয়াত্তায় যে হাদীসটি এসেছে—তিনি এতিম শিশুদের অলঙ্কারের যাকাত আদায় করতেন না—তার উত্তর হতে পারে, তিনি মনে করতেন, শিশুদের ওপর যাকাত ওয়াজিব হয় না; যেমনটি অনেক সাহাবা ও ফুকাহা মনে করেন। এই উত্তরটির ওপর আর একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হয় : যদি তিনি শিশুদের ওপর যাকাত ওয়াজিব হয় না মনে করতেন, তা হলে আপন ভাতিজিদের মালিকানাধীন সম্পত্তির যাকাত—যেমনটি *মুআত্তায়* এসেছে, আদায় করতেন কেন? এর উত্তর হলো, তিনি শিশুদের সম্পদে যাকাত আদায় করা ওয়াজিব মনে করতেন না; কিন্তু মুস্তাহাব মনে করতেন।

বিষয়টি আর একটু ব্যাখ্যা করে বলা যায়, তিনি যেহেতু মূল অলঙ্কারটাই হেফাজতে রাখতেন, বিক্রি বা বদল করে ব্যবসায় খাটাতেন না; তাই এতে কোনো প্রবৃদ্ধি সাধিত হতো না। উপরন্তু, শিশুকন্যাদের অলঙ্কারের সবসময়ই প্রয়োজন আছে। এজন্য তাদের সার্বিক কল্যাণের কথা বিবেচনা করে তাদের অলঙ্কারের যাকাত আদায় না করাকেই ভালো মনে করেছেন। পক্ষান্তরে আপন ভাতিজিদের সম্পদ, যেমনটি *মুয়াত্তায়* এসেছে, যেহেতু তিনি ব্যবসায় খাটাতেন, তাই এক্ষেত্রে তাদের সম্পদের যাকাত আদায় করাকেই তাদের জন্য কল্যাণকর জ্ঞান করেছেন।

নিহতের দিয়ত বা রক্তমূল্যে নারীর অংশ

যদি কেউ কারও হাতে নিহত হয়, আর হত্যাকারী দিয়ত (রক্তমূল্য) আদায় করতে চায়, তা হলে এক-এক করে সকল উত্তরাধিকারীর সম্মতি গ্রহণ করতে হবে। হযরত আয়েশা রাযি. বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন, وَإِنْ كَانَتِ امْرَأَةً—অর্থ : উত্তরাধিকারীদের মধ্যে যদিও কোনো মেয়ে মানুষ থাকে[১]; অর্থাৎ যদি ওয়ারিশদের মধ্যে নারীও থাকে তা হলে তারও সম্মতি নিতে হবে; শুধু পুরুষের সম্মতি যথেষ্ট হবে না। কেননা, উত্তরাধিকার শুধু পুরুষেরই হয় না; বরং নারীরও হয়।

উত্তরাধিকারে নারীর অংশ

ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে আরবে মেয়েদের উত্তরাধিকার ছিল না। ইসলাম এসে তাদেরও উত্তরাধিকার প্রদান করে। উত্তরাধিকার-সংক্রান্ত অধিকাংশ মাসআলাই কুরআন মাজীদে বিবৃত হয়েছে। নারীদের অংশও সবিস্তারে উঠে এসেছে। কিন্তু কিছু কিছু ব্যাপার এমনও রয়ে গেছে, যেগুলোর সমাধানে কুরআন-হাদীসের আলোকে কিয়াস বা বিবেচনার আশ্রয় নিতে হয়েছে। এ ধরনের ক্ষেত্রগুলোতে অন্যান্য মূলনীতির সঙ্গে সঙ্গে নারীদের অধিকারের বিষয়টিও হযরত আয়েশা রাযি.-এর মাথায় ছিল। উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা যেতে পারে : যদি মাইয়েতের কোনো ছেলে না থাকে, শুধু দুই বা ততোধিক মেয়ে, নাতী ও নাতনী থাকে; তা হলে ফারায়েযের বিধান কী হবে? হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি.-এর বিবেচনায় নাতনীদের কোনো অংশ নেই; কিন্তু হযরত আয়েশা রাযি.-এর বিবেচনায় নাতনীদেরও অংশ সাব্যস্ত।[২]

নারীদের একান্ত মাসায়েলের ব্যাখ্যা

নারীরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বিভিন্ন মাসআলা-মাসায়েল জিজ্ঞেস করতেন। উত্তরে অনেক সময় মেয়েলি ব্যাপার থাকত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খোলা ভাষা ব্যবহার করতে লজ্জা বোধ করতেন। তাই অল্প কথায় মার্জিত বাক্যে

---

১. *আবু দাউদ* : كتاب الديات، باب عفو النساء।

২. *মুসনাদে দারিমি* : كتاب الفرائض।

বোঝানোর চেষ্টা করতেন। কিন্তু যাদের বুঝ-শক্তি কম, তাদের কাছে স্পষ্ট হতে চাইত না। এ ধরনের ক্ষেত্রগুলোতে হযরত আয়েশা রাযি.-ই ভগ্নিগণের সাহায্যে এগিয়ে আসতেন। তিনি তাদের কাছে নিয়ে গিয়ে ভালোভাবে বুঝিয়ে দিতেন এবং তাদের পরবর্তী জিজ্ঞাসাগুলো নিজে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে পেশ করতেন এবং উত্তর এনে দিতেন।[১]

কাপড় বা চাদরের ঝুল লম্বা রাখা প্রসঙ্গ

আরবরা কাপড় বা চাদরের ঝুল খুব লম্বা রাখত এবং চলতে গিয়ে মাটিতে ঝুলিয়ে-হেঁচড়িয়ে হাঁটত। তারা এটা করত অহংকারবশত। তাই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যারা অহংকারবশত কাপড়ের ঝুল মাটিতে বিছিয়ে চলবে, আল্লাহ তাদের প্রতি করুণার দৃষ্টিতে তাকাবেন না। এ কথা শুনে হযরত আয়েশা রাযি. বললেন, হে আল্লাহর রাসূল, নারীদের বিষয়ে কী বিধান? তিনি বললেন, এক বিঘত পরিমাণ ঝুলিয়ে দেবে। আরজ করলেন, তা হলে তো পায়ের গোছায় কাপড় থাকবে না। তিনি বললেন, তা হলে এক হাত।[২]

বিবাহে নারীর সম্মতি প্রসঙ্গ

ইসলামে বিবাহ বৈধ হওয়ার জন্য মেয়েদের সম্মতি নেওয়া আবশ্যক। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, কুমারী মেয়েদের কাছ থেকে সম্মতি নিতে হবে, আর বিধবাদের কাছ থেকে অনুমতি চাইতে হবে। কিন্তু আল্লাহ নারীপ্রকৃতিতে যে লাজুকতা দান করেছেন তাতে—কুমারী মেয়ে—মুখ ফুটে সম্মতি ব্যক্ত করা কঠিন। উম্মুল মুমিনীন রাযি. এটা ভালো করেই বুঝতেন, তাই আপত্তি করতে দ্বিধা করলেন না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, নীরবতাই তার সম্মতি নির্দেশ করবে।[৩]

---

১. *সহীহ বুখারী* : باب الأحكام اللتي تعرف بالدلائل।

২. *মুসনাদে আহমাদ* : ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা : ৭৫, ১২৩। কিছু হাদীসে ঘটনাটি উম্মে সালামা রাযি. -এর বলে উল্লেখ করা হয়েছে। হতে পারে উভয়ই নিজ নিজ জায়গায় আরজ করেছিলেন।

৩. *সহীহ বুখারী* : كتاب النكاح।

জোরপূর্বক চাপিয়ে দেওয়া প্রসঙ্গ

অনেক অভিভাবক মেয়েদের সম্মতি ছাড়াই নিজেদের ইচ্ছে অনুযায়ী বিয়ে দিয়ে দেয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগেও এরকম একটা ঘটনা ঘটেছিল। ওই সময় হুজরায়ে আয়েশা রাযি.-ই ছিল নারীদের সর্বোচ্চ আদালত। মেয়েটি এই আদালতেই বিচার নিয়ে এল। কিছুক্ষণ পরই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাশরীফ আনার কথা। হযরত আয়েশা রাযি. মেয়েটিকে বসিয়ে রাখলেন। তিনি যখন এলেন, তখন ঘটনাটি তুলে ধরলেন। তিনি মেয়েটির পিতাকে ডেকে পাঠালেন এবং বিবাহ রাখা না-রাখার হক মেয়েটিকেই দিলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা শুনে মেয়েটি বলল, হে আল্লাহর রাসূল, আমার পিতার সিদ্ধান্তে আমার কোনো আপত্তি নেই। আমি মূলত মেয়েদের অধিকারের সীমারেখা নিশ্চিত হতে চাইছিলাম।[১]

ইদ্দতকালীন খোরপোশ

যদি কোনো নারীকে তার স্বামী এক বা দুই তালাক দেয় তা হলে তার ইদ্দতকালীন ভরণ-পোষণ স্বামীর ওপরই বর্তাবে, এ ব্যাপারে দ্বিমত নেই; কিন্তু যদি তিন তালাক দেয়, তা হলে স্বামীর ওপর দায়িত্ব থাকবে কি থাকবে না, এ নিয়ে মতভেদ আছে। কেউ কেউ বলেছেন, এমতাবস্থায় তার ওপর খোরপোশ আবশ্যক হবে না। প্রমাণ হিসেবে তারা বলেন, কুরআনে যে আয়াতটিতে এ আলোচনা করা হয়েছে, তাতে বলা হয়েছে, স্ত্রী না স্বামীর ঘর থেকে বের হবে, না স্বামী তাকে বের করে দেবে। এরপর বলা হয়েছে :

لَعَلَّ اللّٰهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذٰلِكَ أَمْرًا

অর্থ : আশা করা যায়, এরপর আল্লাহ কিছু ঘটাবেন।

তারা বলতে চান, এই আয়াতটি থেকে বোঝা যায়, স্ত্রী স্বামীর ঘরেই থাকবে, অন্য কোথাও যাবে না এর কারণ হলো, এ দীর্ঘ সময়ে হতে

---

১. *নাসাঈ* : আল বিকরু ইযাওবিযুহা আবুহা ওয়া হিয়া কারিহা। *দারাকুতনী* : কিতাবুন নিকাহ (من مراسيل ابن بريدة)।

পারে তাদের মাঝে নতুন করে সম্পর্ক তৈরি হয়ে যাবে; কিন্তু তিন তালাক হয়ে গেলে তো আর এই সুযোগ থাকে না; সুতরাং কুরআন মাজীদের বিধানটি তালাকে রজঈর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে, তালাকে বাইনের ক্ষেত্রে নয়।[১]

কিন্তু আমরা মনে করি, এই প্রমাণ উপস্থাপন যথার্থ নয়। ইদ্দতের সময় স্বামীর ঘরে থাকতে বলার এটাও একটা কারণ, আমরাও তা মানি; কিন্তু এটাই একমাত্র কারণ, তা মানা সম্ভব নয়। আমরা মনে করি, এছাড়াও আরও অনেক কারণ ও কল্যাণ আছে এই নির্দেশটিতে। যেমন : তালাকের পর এও নিশ্চিত হতে হয় যে, স্ত্রী গর্ভবতী কি না? এজন্য স্ত্রীকে কয়েক মাস অপেক্ষা করতে হয়, সঙ্গে সঙ্গে নতুন বিবাহ করতে পারে না; তাকে যে অপেক্ষা করতে হচ্ছে, সেটা তো প্রথম স্বামীর কারণেই হচ্ছে; তাই অপেক্ষার সময়টাতে খোরপোশ স্বামীকেই বহন করতে হবে। এ কারণেই হযরত আয়েশা রাযি. ফাতেমা বিনতে কায়সের প্রমাণ উপস্থাপনের কঠোর সমালোচনা করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, ফাতেমার জন্য এতে কল্যাণ নেই যে, সে তার ঘটনাটি যেখানে-সেখানে প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপন করতে থাকবে। তার প্রথম স্বামীর ঘরটি অরক্ষিত ছিল বলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে অন্য ঘরে থাকার অনুমতি দিয়েছিলেন। মারওয়ানের শাসনামলে হুবহু এরকমই একটি ঘটনা ঘটে গেল। মারওয়ান ফাতেমা বিনতে কায়সের ঘটনা অনুযায়ী ফায়সালা দিতে যাচ্ছিলেন। এমন সময় হযরত আয়েশা রাযি. সংবাদ পাঠালেন, তোমরা এটা ঠিক করছ না। ফাতেমার ঘটনা এই ছিল যে, তাদের স্বামী স্ত্রীর মধ্যে বনিবনা ভালো ছিল না। আর কিছু বর্ণনায় আছে, ফাতেমা কঠোরভাষী ছিল। তাই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে অনুমতি দিয়েছিলেন।[২]

ইদ্দতের সময় সফর থেকে ঘরে ফেরা

স্বামীর মৃত্যুর পর নারীকে চার মাস দশ দিন ইদ্দত পালন করতে

---

১. *আবূ দাউদ* : কিতাবুত তালাক।
২. *সহীহ বুখারী*, *আবূ দাউদ*, *মুয়াত্তা* : কিতাবুত তালাক।

হয়। এ সময় আপন ঘরে অবস্থান করা নারীর কর্তব্য, অন্য কোথাও যাওয়া অনুচিত। এই মাসআলা থেকে অনেকে ভেবেছেন, স্ত্রী যদি স্বামীর সঙ্গে থাকে, তা হলে স্বামীর যেখানে মৃত্যু হবে সেখানে ইদ্দত পালন করতে হবে; আর যদি সঙ্গে না থাকে তা হলে যেখানে মৃত্যুসংবাদ জানতে পারবে সেখানে ইদ্দত পালন করতে হবে। অন্য কোথাও যাওয়া চলবে না।[১] অর্থাৎ স্বামীর মৃত্যুর পর কোনোরকম সফর করা নারীর ওপর হারাম। তারা তাদের বুঝের পক্ষে সর্বোচ্চ যে যুক্তিটি উপস্থাপন করেন তা এই যে হাদীসে আছে, এ সময় অন্য কোথাও যাওয়া চলবে না। অথচ তাদের প্রমাণ করতে হবে যে, এ সময় বাইরে থাকলে ঘরেও আসা যাবে না, আবার সফরে থাকলে নগরেও আসা যাবে না। কিন্তু এ ধরনের কোনো প্রমাণ তাদের কাছে নেই। এজন্যই দেখা যায়, উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা রাযি. যে আমল করেছিলেন, তাতে তাদের প্রত্যাখ্যান হয়। তাঁর ভগ্নি উম্মে কুলসুম রাযি. হযরত তালহা রাযি.-এর পত্নী ছিলেন। জঙ্গে জামালের সফরে তিনি স্বামীর সঙ্গেই ছিলেন। হযরত তালহা রাযি. এখানে শহীদ হন। সাধারণ ধারণা অনুযায়ী উম্মে কুলসুম রাযি.-কে সেখানেই ইদ্দত পালন করতে হতো। কিন্তু হযরত আয়েশা রাযি. তাঁকে সঙ্গে নিয়ে মদীনায় চলে আসেন। পথে বেশ কিছু দিন মক্কা মুআযযামায়ও অবস্থান করেছিলেন। সাধারণ মানুষের মধ্যে এ নিয়ে কথা উঠল। তাবেঈ আইয়ুব রহ. মানুষের প্রশ্নের উত্তরে বললেন, এটা ঘর থেকে বের হওয়া নয়; এটা ঘরে ফিরে আসা। হযরত আয়েশা রাযি. তাঁকে সফর থেকে নগরে ফিরিয়ে এনেছেন মাত্র।[২] তাবেঈ আইয়ুবের উত্তরটি সম্পূর্ণ সঠিক ছিল। বাস্তবতার নিরিখে বিচার করুন, যদি হযরত আয়েশা রাযি. মাসআলাটি স্পষ্ট করে না দিতেন, তা হলে কত নারীকে এ দুর্ভোগ পোহাতে হতো।

ইচ্ছাধিকার দেওয়ায় তালাক হওয়া-না হওয়া

তালাক যত বৈধ বস্তু আছে তার মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট এবং পরিবার-

---

১. *আবু দাউদ* ও *মুয়াত্তায়* ফারিয়া বিনতে মালেকের একটি রেওয়ায়েত আছে। তারা সেটিকে প্রমাণ হিসেবে পেশ করেন।

২. *ইবনে সাদ* : جزء النساء, ৩৩৯।

জীবনের অশান্তিরও সর্বশেষ পরিণতি। এজন্য যতদূর সম্ভব, একে সীমাবদ্ধ, লাগামবদ্ধ করা উচিত। অথচ স্বামী যদি স্ত্রীকে তালাক গ্রহণের ইচ্ছাধিকার দান করে, আর স্ত্রী সেই অধিকার প্রয়োগ না করে স্বামীকেই বরণ করে নেয়; তা হলেও কতিপয় সাহাবী বলতেন, স্ত্রীর ওপর এক তালাক পতিত হবে। হযরত আয়েশা রাযি. অত্যন্ত কঠোরভাবে এই ফতোয়ার অগ্রহণযোগ্যতা তুলে ধরেন এবং প্রমাণ হিসেবে স্বয়ং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তাখঈরের ঘটনাটি পেশ করেন। তাখঈরের আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়ার পর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পবিত্র স্ত্রীগণের প্রত্যেকের কাছে যান এবং আলাদা হওয়ার ইচ্ছাধিকার প্রদান করেন। কিন্তু কেউই আলাদা হননি এবং কারও ওপরই কোনো তালাক পতিত হয়নি। তা ছাড়া, এটা পারস্পরিক সদাচার ও কৃতার্থতারও পরিপন্থী। একজন নারী এই স্বামীভক্তি ও কৃতার্থতা দেখানোর বিনিময়ে শরীয়ত তার দাম্পত্যজীবনে ব্যর্থতার কালি এঁকে দেবে? সকল ফকীহ ও মুহাদ্দিস উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা রাযি.-এর মতটিকেই গ্রহণ করেছেন।

জোরপূর্বক তালাক দেওয়ানো হলে

এমনিভাবে যদি কেউ কাউকে বাধ্য করে বলে যে, তোমার স্ত্রীকে তালাক দাও, নইলে তোমাকে হত্যা করা হবে বা দণ্ড প্রদান করা হবে স্বামী ভীত হয়ে স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দিল, তা হলে হযরত আয়েশা রাযি. বলেন, এই তালাক শরীয়তের দৃষ্টিতে তালাক বলে গৃহীত হবে না।[১] ইমাম আবু হানীফা রহ. ছাড়া সকল ফকীহ ও মুহাদ্দিস উম্মুল মুমিনীনের এই মূলনীতিটিকে গ্রহণ করেছেন। সত্যিই, যদি ইসলামী বিধানে এই ধারাটি না আসত, তা হলে অনেক অভিজাত ও সম্ভ্রান্ত নারী অত্যাচারী শাসক ও স্বেচ্ছাচারী আমীর-ওমরার কুদৃষ্টি থেকে রক্ষা পাওয়া কঠিন হয়ে যেত।

---

১. *সহীহ বুখারী* ও *মুসলিম*, হাদীস : طلاق في إغلاق।

তালাক ও রজআতের সংখ্যা ও সীমা

জাহেলি যুগে যত কুপ্রথা ও কুসংস্কার অবলা নারীদের আষ্টেপৃষ্ঠে ঠেসে ফেলেছিল তার মধ্যে একটি এই ছিল যে, তখন না তালাকের নির্দিষ্ট সংখ্যা ছিল, না রজআতের (তালাক প্রত্যাহারের) সীমা-পরিসীমা ছিল। পাষণ্ড পুরুষেরা কথায় কথায় তালাক দিত, ইদ্দত শেষ হতে না হতেই তালাক প্রত্যাহার করে নিত; এভাবে একের পর এক তালাক আর রজআত চলতে থাকত। না নারীর মুক্তি হতো, না অত্যাচারীর মৃত্যু হতো। কিন্তু এটুকুতেও ওই সব 'স্বামী'দের তৃপ্তি হতো না; তারা নারীকে শুধু কষ্ট আর যন্ত্রণা দেওয়ার জন্যই এই কুপ্রথার সুব্যবহার করত : না স্ত্রীকে স্ত্রীত্বের সামান্য সুখটুকু দিত, না বিষময় জীবন থেকে মুক্তি পাওয়ার সুযোগটুকু দিত। নারী এই জীবনব্যাপী ঘুর্ণাবর্তে ঘুরতে থাকত আজীবন; যেন মৃত্যুই মুক্তি।

কিন্তু উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা রাযি. মুসলিম নারী-সমাজকে এই অভিশপ্ত জীবন থেকে মুক্ত করার ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছিলেন। ইসলাম আসার পর মুসলিম সমাজেও একবার এরকম একটা ঘটনার অবতারণা হলো। অত্যাচারিতা নারী ছুটে এলেন উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা রাযি.-এর কাছে। তিনি তার দুরবস্থার কথা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে তুলে ধরলেন। অবতীর্ণ হলো পবিত্র কুরআনের এই যুগান্তকারী দিক নির্দেশনা :[১]

اَلطَّلَاقُ مَرَّتَانِ ۖ فَاِمْسَاكٌۢ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ تَسْرِيْحٌۢ بِاِحْسَانٍ

অর্থ : তালাক সর্বোচ্চ দুই বার। এরপর হয় ন্যায়সঙ্গতভাবে ফিরিয়ে নিতে হবে, নয় সদাচারের সঙ্গে চিরতরে মুক্ত করে দিতে হবে। (সূরা বাকারা, আয়াত : ২২৯)

হজে মেয়েলি মাজুরি

হজের সময় হয় চন্দ্র-মাসের শুরুর দিকেই পতিত। এই দিনগুলোতে অধিকাংশ মেয়েরই শারীরিক অপারগতা থাকে। এখন যদি অপবিত্র

---

১. পুরো ঘটনা *তিরমিযী* : কিতাবুত তালাক-এ আছে।

অবস্থায় হজের কাজগুলো তাদের জন্য সবই নিষিদ্ধ হয়ে যায়, তা হলে হজ-উমরার ময়দান তো কেয়ামতের ময়দানে পরিণত হবে। হাজার হাজার মেয়েকে প্রতীক্ষার প্রহর গুণতে হবে, তাদের সঙ্গে তাদের স্বজনরাও আটকে যাবে; অথবা হজ-উমরা না করেই এক বুক জ্বালা নিয়ে ফিরে আসতে হবে। উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা রাযি. নিজের জীবনের ঘটনা থেকে এর সমাধান দিয়েছেন। তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এ ব্যাপারে ফতোয়া জিজ্ঞেস করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, হে আয়েশা, তাওয়াফ ছাড়া হজের সকল কাজ এ অবস্থায়ও করতে পারবে। যদি ইয়াওমুন নাহরের (দশই জিলহজ) কাছাকাছি সময়ে অপারগতা আসে, তা হলে আখেরি তাওয়াফ করতে হবে না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিক-নির্দেশনার ভিত্তিতে হযরত আয়েশা রাযি. মুসলিম নারীদের সঙ্গে নিয়ে হজ করতেন। যাদের ব্যাপারে সন্দেহ থাকত, তাদের আখেরি তাওয়াফের পূর্বেই রোখসত করে দিতেন। আর যদি আখেরি তাওয়াফের পর সমস্যা হতো, তা হলে হজের সকল আমলই আদায় করাতেন। হযরত যায়েদ রাযি., হযরত ইবনে উমর রাযি. এবং উমর রাযি. এ ব্যাপারে উম্মুল মুমিনীনের সঙ্গে মতভেদ করেছিলেন। পরবর্তীতে হযরত ইবনে উমর ও যায়েদ রাযি. নিজ নিজ ফতোয়া প্রত্যাহার করেছিলেন। হযরত উমর রাযি. তাঁর ফতোয়া বহাল রেখেছিলেন। হযরত আয়েশা রাযি. বরং এরকম সমস্যা হলে নারীদের মক্কায়ই পবিত্রতা পর্যন্ত থেকে যেতে বলতেন। একবার কিছু লোক হযরত আয়েশা রাযি.-এর কাছে এই মাসআলাটি তুলল। তিনি বললেন, যদি এরকম না করা হয়, তা হলে হজের ময়দানে কমপক্ষে কয়েক হাজার নারীকে আটকে রাখতে হবে। এরপর তিনি অধিকাংশ সাহাবীর আমল দ্বারাও তাঁর মতটিকে সমর্থিত করলেন।[১] এই মাসআলায় কার কথাটি অধিক যুক্তিযুক্ত ও প্রমাণসিদ্ধ তা যে কেউই বিচার করতে পারেন।

---

১. *মুয়াত্তা ও যুরকানী* : باب إفاضة الحائض ।

হযরত আয়েশা রাযি.

পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ নারী

আমরা সিদ্দীকায়ে কুবরা হযরত আয়েশা রাযি.-এর পবিত্র জীবন-চরিত অক্ষরে অক্ষরে পড়লাম। তাঁর পবিত্র জীবনের এক একটি ঘটনা আমাদের চোখে ভেসে উঠেছে। আমরা হয়তো পৃথিবীর অনেক বড় বড় নারী-ব্যক্তিত্বের কথা জেনেছি। ইতিহাস সেই জগৎ-খ্যাত নারীদের জীবনালেখ্য আমাদের সামনে তুলে ধরেছে। অনেক সময় তাদের তুলনামূলক পর্যালোচনাও করেছি।

হযরত আয়েশা রাযি. এবং বিখ্যাত অমুসলিম নারীগণ

পৃথিবীর ইতিহাসে যে বিখ্যাত অমুসলিম নারীদের নাম আসে, খুব বেশি হলে তারা হুট করে কিছু অসাধারণ কাজ করে ফেলেছেন, যা শ্রেণিপর্যায়কে—নারীত্বকে—ছাপিয়ে আরও উচ্চাসনে সমাসীন; এটাই তাদের খ্যাতি ও জ্যোতির রহস্য। কেউ জ্বালাময়ী বক্তৃতায় জনসমুদ্রে ঢেউ তুলেছেন, কেউ তীক্ষ্ণ চাতুর্যে শত্রুজালকে ভেদ করেছেন; কেউ বাহুবলেই পদানত করেছেন শত্রুশির, ভেঙে দিয়েছেন শত্রুশিবির—এ ধরনের ক্ষণকালীণ কিছু কারণই তাদের মহিমার মূল। কিন্তু, একটু গভীরভাবে ভাবুন তো—একটি বিরামহীন, ছন্দপতনহীন, অনিন্দ্যসুন্দর জীবনের সর্বতোমুখী কল্যাণকর কীর্তিমালার বিপরীতে এসব ছন্দহীন, ক্ষণকালীন, সাময়িক কিছু উদ্দীপনার কি তুলনা হতে পারে?

আমরা অনেক স্বর্গীয় রূপ-লাবণ্যের অলৌকিক জাদুময়তার অধিকারিণীকে দেখেছি; দেখেছি পুত্রসন্তানহীন রাজবংশের স্বর্ণমুকুটধারিণীকেও তেজোদীপ্ত মহিমায় আবির্ভূত হতে; কিন্তু অন্তর্দৃষ্টিকে প্রসারিত করুন, একটু দেখে নিন, ইতিহাস তাদের ইতি টেনেছে আক্ষেপ আর অনুশোচনায়, ব্যর্থতা আর বেদনায়।

ঐতিহাসিক মিশর, ইরান, আফ্রিকা, ও রোমের রোমাঞ্চভরা নারী-নামও আমাদের সামনে আছে; কিন্তু বিবেক কী বলে? একটি সর্বাঙ্গীন সফল, পূত-পবিত্র, পুণ্যময় জীবনকে ওইসব নীচ, নিকৃষ্ট জীবনের সঙ্গে তুলনা করতে চাওয়া-ও কি চরম অবমূল্যায়ন নয়?

আপাতমধুর, অতি নগণ্য, পার্থিব মূল্যায়নগুলোকে বাদ দিয়ে, চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, পাবিত্রিক আভিজাত্য ও ধর্মীয় মাহাত্ম্যের দিকটি বিবেচনায় আনুন; দেখবেন, সারা পৃথিবীর নারী-জগতের একটি তারাও এই সুউচ্চ দিগন্তে উদিত হওয়ার যোগ্য নয়। হাঁ, ভারতবর্ষের অনেক নিষ্পাপ, নিষ্কলঙ্ক, আলোকিত মুখ আমাদের বীতশ্রদ্ধ করবে; কিন্তু যথার্থ বিচারে—চরিত্রের পবিত্রতা, অগাধ স্বামীভক্তির অনুপম দৃষ্টান্ত ছাড়া আর কী আছে, যা তাদেরকে এমন মহিমায় মহিমান্বিত করতে পারে?

হযরত আয়েশা রাযি. এবং বিখ্যাত মুসলিম নারীগণ

সিদ্দীকায়ে কুবরা রাযি. ছাড়া পৃথিবীর আর কোন নারী আছেন? যিনি আপন চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, নৈতিক আভিজাত্য ও ধর্মীয় মাহাত্ম্য-সহ ধর্মের জগতে, জ্ঞানের জগতে, সমাজ-জীবনে, রাজনৈতিক অঙ্গনে এত বিচিত্র দায়িত্ব পালন করেছেন এবং এত অবদান রেখে গেছেন? আর কোন নারী কীর্তিময় জীবনের মহিমায়, প্রভু-ভক্তি ও উপাসনায়, চারিত্রিক শিক্ষার প্রচারে, আত্মিক দীক্ষার প্রসারে, সুগভীর ধর্মীয় জ্ঞানে, ধর্মীয় বিধি-নিষেধের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে সারা পৃথিবীর কোটি কোটি নারীর[১] জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনাদর্শ হয়ে আছেন? এমন সর্বতোমুখী জীবনের জীবন্ত

---

১. মুসলিম নারীর আনুমানিক সংখ্যা।

উদাহরণ হয়ে আছেন? আর কোন নারী এত বৃহৎ একটি সমাজকে ধর্মীয়, সামাজিক ও জ্ঞানগত অবদানে এত ঋণী করে রেখেছেন?

মুসলিম রমণীকুলের ইতিহাসে পবিত্র স্ত্রীগণ রাযি. এবং পবিত্র কন্যাগণ রাযি. ছাড়া আর কার সঙ্গে উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা রাযি.-এর তুলনা করা যেতে পারে?

হযরত খাদীজা রাযি. এবং হযরত ফাতেমা রাযি.

মুসলিম-ইতিহাসে সকল পণ্ডিত একমত যে, মুসলিম নারীসমাজে হযরত খাদীজা রাযি., হযরত ফাতেমা রাযি. এবং হযরত আয়েশা রাযি.-ই শ্রেষ্ঠ। অধিকাংশ পণ্ডিত সর্বাগ্রে রেখেছেন হযরত খাদীজা রাযি.-কে, এরপর হযরত ফাতেমা রাযি.-কে, তারপর হযরত আয়েশা রাযি.-কে। কিন্তু এ স্তরবিন্যাস কোনো শরঈ নস বা সহীহ হাদীসের ভিত্তিতে নয়; বরং পণ্ডিতবর্গের ব্যক্তিগত মূল্যায়ন, বিবেচনা ও গবেষণার আলোকে প্রদত্ত। প্রকৃতপক্ষে, এই তিন মহীয়সী আলাদা আলাদা মর্যাদা ও মহিমায় মূল্যায়িত হয়েছেন বিভিন্ন হাদীসে। তাই অনেক পণ্ডিত স্তরবিন্যাসে না যাওয়াই শ্রেয় জ্ঞান করেছেন। অপর দিকে আল্লামা ইবনে হাযাম রহ. সকল পণ্ডিতের বিপরীতে স্পষ্টত হযরত আয়েশা রাযি.-এর শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করেছেন। তাঁর মতে, হযরত আয়েশা রাযি. শুধু আহলে বাইতের মধ্যেই নয়, শুধু পৃথিবীর নারী-জগতেই নয়; বরং সাহাবীগণের মধ্যেও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর সর্বশ্রেষ্ঠ। তিনি তাঁর দাবির স্বপক্ষে অসংখ্য প্রমাণ ও যুক্তি উপস্থাপন করেছেন। যদি কারও আগ্রহ থাকে তা হলে الملل والنحل গ্রন্থটি দেখতে পারেন।

এক্ষেত্রে আমরা আল্লামা ইবনে তাইমিয়া রহ. এবং তাঁর শিষ্য আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম রহ.-এর সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করি। তাঁরা লিখেছেন—শ্রেষ্ঠত্বের অর্থ যদি হয় পরকালীন মর্যাদা তা হলে তার প্রকৃত স্বরূপ একমাত্র আল্লাহই জ্ঞাত আছেন। কিন্তু পার্থিব বিচারে তাঁদের মূল্যায়ন বিভিন্ন আঙ্গিকে হতে পারে। যদি ইসলামের প্রাথমিক পর্যায়ে সর্বমুখী বিপদের মোকাবেলা করে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লামের সহযোগিতায় এগিয়ে আসা, ছায়ার মতো তাঁর সঙ্গে থাকা, সুখে-দুঃখে সর্বাবস্থায় তাঁকে সাহস ও শক্তি যোগানোর বিষয়টি বিবেচনায় আনা হয়, তা হলে হযরত খাদীজা রাযি. সবার চেয়ে এগিয়ে। কিন্তু যদি জ্ঞান ও প্রজ্ঞার পূর্ণতা, ব্যাপক পরিসরে ধর্মীয় কার্যক্রম এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রেখে যাওয়া শিক্ষা-দীক্ষা ও জীবনাদর্শের প্রচার-প্রসারের দিকটি সামনে আনা হয়, তা হলে হযরত আয়েশা রাযি.-এর সমকক্ষতার দাবিদার কেউ হতে পারেন না।[১]

হযরত মারইয়াম আ. ও হযরত আসিয়া আ.

হযরত মারইয়াম আ.-এর মাহাত্ম্য আমরা ইসলামের কল্যাণেই জেনেছি। মহাগ্রন্থ ইনজিলের একটি বাক্যও তাঁকে মহিমান্বিত করেনি। ফেরাউন-পত্নী হযরত আসিয়া আ.-ও ইসলাম ধর্মে সম্মানিত হয়েছেন। কিন্তু মহাগ্রন্থ তাওরাত তাঁর সম্মানে একটি বাক্যও উচ্চারণ করেনি। যেহেতু ইসলাম তাঁদেরকে সর্বোচ্চ সম্মানে ভূষিত করেছেন, তাই বিশ্বাসগতভাবে তাঁদের মর্যাদা ও মাহাত্ম্যকে আমরা মেনে নিতে বাধ্য। কিন্তু ইতিহাস ও বাস্তবতার ভাষায় এর প্রতিক্রিয়া ও অভিব্যক্তি শুধুই দ্বিধাহীন বিশ্বাস ও আশ্বস্ত নীরবতা।

ওহীর নিখাদ প্রত্যাদেশ যে সিদ্ধান্ত দিয়েছে সেটিই সবচেয়ে শুদ্ধ, সবচেয়ে খাঁটি, সবচেয়ে সত্য, সবচেয়ে সাচ্চা :

عَنْ أَبِيْ مُوْسَى الْأَشْعَرِيِّ رض قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمُلَ مِنَ الرِّجَالِ كَثِيْرٌ وَ لَمْ يَكْمُلْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ وَ آسِيَةُ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ وَ فَضْلُ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضْلِ الثَّرِيْدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ

অর্থ : হযরত আবু মুসা আশআরি রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, পুরুষের মধ্যে অনেকেই কামেল হয়েছেন; কিন্তু নারীদের মধ্যে কামেল হয়েছেন শুধুমাত্র ইমরান-

---

১. *যুরকানি* : ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা : ২৬৯।

তনয়া মারইয়াম আ. এবং ফেরাউন-পত্নী আসিয়া আ.। নিঃসন্দেহে আয়েশা রাযি.-ই শ্রেষ্ঠ সকল নারীর ওপর, যেমন সারিদ[১] শ্রেষ্ঠ সকল খাদ্যের ওপর।[২]

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَ عَلٰى آلِهِ الْأَطْهَارِ وَ أَصْحَابِهِ الْكِرَامِ وَ أَزْوَاجِهِ الْمُطَهَّرَاتِ

দারুল মুসাননিফীন

আযমগড়

৫ জিলকদ, ১৩৩৫ হি./ ২৪ আগস্ট, ১৯১৭ ঈ.

---

১. সারিদ হলো তৎকালীন আরবের শ্রেষ্ঠ খাবার। এটি রুটির ব্যাঞ্জনের সঙ্গে ভিজিয়ে খাওয়া হতো।

২. *সহীহ বুখারী*, হাদীস নং ৩৭৬৯, كتاب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم।

হযরত আয়েশা রাযি.-এর বয়স
একটি পর্যালোচনা

বিবাহের সময় বয়স কত ছিল?

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন হযরত আয়েশা রাযি.-কে বিবাহ করেন, তখন—ইসলামী বর্ণনাসমূহের ভিত্তিতে—তাঁর বয়স হয়েছিল প্রায় পঞ্চাশ বছর; পক্ষান্তরে হযরত আয়েশা রাযি. তখন সবেমাত্র ছয় বছর পূর্ণ করেছেন, অথবা সাত বছরে পা দিয়েছেন।

ইসলামবিদ্বেষীদের আপত্তি, এত পরিণত বয়সে এত ছোট্ট একটা মেয়েকে বিবাহ করা তাঁর পক্ষে অশোভন।

উত্তরে মুসলিম লেখকগণ একেকজন একেক পন্থা অবলম্বন করেছেন। একজন অসম ও বাল্যবিবাহের অসঙ্গতিকেই অস্বীকার করেছেন। আর একজন বিবাহ ও রোখসতের তারিখটিকে মেনে নিয়েছেন ঠিকই; কিন্তু রোখসত হয়েছে বলেই যে পতি-পত্নীর সম্পর্ক স্থাপিত হবে তা অস্বীকার করেছেন।

কিন্তু তৃতীয়জন ঘটিয়েছেন সাংঘাতিক কাণ্ড। আধুনিক ধর্মতত্ত্ব অবলম্বনে মাথাব্যথা সারাতে মাথাকাটার অবস্থা। যেন ইতিহাসের পাতা থেকে পুরনো তারিখগুলো মুছে ফেলে সুবিধেমতো নতুন নতুন তারিখ বসিয়ে দেবেন।

তিনি পূর্বাপরের মিলহীন অসংলগ্ন একটি প্রবন্ধ লিখে পত্রিকায়

ছাপিয়েছেন। প্যাম্ফলেট আকারে বিতরণ করিয়েছেন। ডাকযোগেও পাঠিয়েছেন অনেকের কাছে। স্বয়ং আমার কাছেও একাধিকবার পাঠানো হয়েছে। বারবারই আমি নীরব থেকেছি; ভেবেছি, প্রাবন্ধিক যা করছেন, সৎ উদ্দেশ্যেই করছেন।

কিন্তু আজ দুটো কারণে এই নীরবতা ভাঙতে হচ্ছে :

এক. দিন দিন দেখছি, পদস্খলনটি ইতিহাসে পদাসন লাভ করতে চাচ্ছে। এমনকি, সীরাতে-নববীর তুর্কি সহকারী-অনুবাদক যাফর আহমদ সাহেব কনস্টান্টিনোপল থেকে পত্র মারফত লিখেছেন, যদি এটি আপনার দৃষ্টিতে সঠিক মনে হয়, তা হলে সীরাতের তুর্কি অনুবাদের অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

দুই. বিষয়টি এখানেই শেষ হয়ে যায় না; আরও অনেক দূর গড়ায়। একটি ফিকহী মাসআলায়ও প্রমাণ হিসেবে পেশ করার পাঁয়তারা চলছে। তাই বাধ্য হয়েই দায়িত্বজ্ঞানহীন লেখাটিকে সমালোচনায় আনতে হচ্ছে।

আলোচ্য প্রবন্ধটির মূল ভিত্তি হলো *মেশকাতের* মুসান্নিফ শাহ ওয়ালিউদ্দিন খতিব রহ. কর্তৃক *মেশকাতের* রাবীদের পরিচিতির ওপর রচিত একটি সংক্ষিপ্ত রিসালা : *আল-ইকমালু ফী আসমাইর রিজাল*। রিসালাটি *মেশকাতের* শেষে অন্তর্ভুক্তি হিসেবে সংযোজিত হয়েছে।

প্রাবন্ধিক বলতে চান, *মেশকাতের* মুসান্নিফ উপর্যুক্ত রিসালায় যে তথ্য দিয়েছেন, তাতে বোঝা যায়, হযরত আসমা রাযি. বয়সে হযরত আয়েশা রাযি.-এর চেয়ে দশ বছরের বড় ছিলেন। হযরত আসমা রাযি.-এর বয়স যখন সাতাশ বছর, তখন হযরত আয়েশা রাযি.-এর বয়স সতেরো বছর। সুতরাং বিবাহের সময় তাঁর বয়সের অবস্থা হয়ে থাকবে—পনেরো বছর শেষ, অথবা ষোলো বছর শুরু।

বিষয়টির সমালোচনার জন্য কয়েকটি পদক্ষেপে এগুতে হবে : প্রথমত প্রবন্ধটির অবস্থানগত মূল্যায়ন করতে হবে, এরপর যেই তথ্যটির ওপর ভিত্তি করে এত কিছু সেই তথ্যটির গ্রহণযোগ্যতা যাচাই করতে হবে; এবং এরপর প্রামাণ্য বর্ণনাসমূহের আলোকে তুলনামূলক পর্যালোচনায় আসতে হবে। সর্বপ্রথম এ বিষয়টি মাথায় রাখতে হবে যে,

শাহ ওয়ালিউদ্দিন খতিব রহ.-রচিত রিসালাটি প্রামাণ্য পর্যায়ের নয়। এটি লিখিত হয়েছে শুধুমাত্র *মেশকাতে*র ছাত্রদের রাবী-সম্পর্কিত একটা সাধারণ ধারণা দেওয়ার জন্য। খতিব রহ. ছিলেন অষ্টম শতাব্দীর মানুষ। সাতশো সাঁইত্রিশ হিজরীর পর, অর্থাৎ *মেশকাতে*র তালিফ শেষ করে তিনি রিসালাটি লিখেছিলেন। এরকম একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে অষ্টম শতকের একজন মুআল্লিফের সাধারণ বক্তব্যের ওপর ভিত্তি করে পূর্ববর্তী সকল প্রামাণ্য উৎসগ্রন্থ ও বিশুদ্ধ সূত্রে প্রাপ্ত বর্ণনাকে বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রদর্শন করাটা কতটা যুক্তিযুক্ত?

এরচেয়েও আশ্চর্যের বিষয় হলো, প্রাবন্ধিক শাহ ওয়ালিউদ্দিন রহ.-এর মূল বক্তব্যটি উদ্ধৃত করার প্রয়োজন বোধ করেননি; শুধু লিখেছেন—এ রকম একজন বিশ্বস্ত, নির্ভরযোগ্য, প্রামাণ্য মুআল্লিফ এ কথা লিখেছেন। এরপর উপর্যুক্ত বক্তব্যটি নিজের ভাষ্যে অত্যন্ত আস্থা ও আত্মবিশ্বাস নিয়ে উপস্থাপন করেছেন। অথচ বেচারা খতিব রহ. যেই শব্দ ও শৈলীতে তথ্যটি উপস্থাপন করেছেন—যে কেউই বুঝতে পারেন—তা তথ্যগত দুর্বলতারই পরিচায়ক। তাঁর মূল বক্তব্যটি এই :

قِيْلَ أَسْلَمَتْ بَعْدَ سَبْعَةَ عَشَرَ إِنْسَاناً وَ هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا عَائِشَةَ بِعَشْرِ سِنِيْنَ وَ مَاتَتْ بَعْدَ قَتْلِ ابْنِهَا بِعَشَرَةِ أَيَّامٍ وَ قِيْلَ بِعِشْرِيْنَ يَوْماً وَ لَهَا مِائَةُ سَنَةٍ وَ ذَلِكَ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَ سَبْعِيْنَ

অর্থ : কথিত আছে—তিনি (হযরত আসমা রাযি.) সতেরো জনের পর ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তিনি হযরত আয়েশা রাযি.-এর চেয়ে দশ বছরের বড় ছিলেন। তাঁর পুত্র (আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের রাযি.) নিহত হওয়ার দশ দিন পরে, মতান্তরে বিশ দিন পরে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। তখন তাঁর বয়স হয়েছিল একশো বছর। এটি ছিল তেয়াত্তর হিজরীর ঘটনা।

লক্ষ করুন, প্রাবন্ধিক যতটা আস্থার সঙ্গে তথ্যটি গ্রহণ করেছেন; স্বয়ং তথ্যদাতাই তথ্যপ্রদানে ততটা আস্থাপোষণ করেননি। তাই তথ্যটা

দিয়েছেন قِيْلَ (কথিত আছে) কথাটাকে আশ্রয় করে। তা হলে, কোথায় তথ্যগ্রহীতার আস্থা, আর কোথায় তথ্যদাতার অনাস্থা!

قِيْلَ (কথিত আছে)-এর অধীনে প্রদত্ত তথ্য যদি কখনো প্রমাণ হিসেবে মেনেও নেওয়া হয়; তবু ভুলে গেলে চলবে না যে, স্বয়ং লেখকও ভুল করতে পারেন। তিনি তো ভুলের ঊর্ধ্বে নন। অকপটে বলছি, সত্যি সত্যিই তিনি আলোচ্য বিষয়ে ভ্রান্তির শিকার হয়েছেন। কেননা এই একই কিতাবে তিনি হযরত আয়েশা রাযি. সম্পর্কে লিখেছেন :

تَزَوَّجَهَا بِمَكَّةَ فِيْ شَوَّالٍ سَنَةَ عَشْرٍ مِّنَ النُّبُوَّةِ قَبْلَ الْهِجْرَةِ بِثَلَاثِ سِنِيْنَ وَ قِيْلَ غَيْرُ ذٰلِكَ وَ أَعْرَسَ بِهَا بِالْمَدِيْنَةِ فِيْ شَوَّالٍ سَنَةَ اثْنَيْنِ مِنَ الْهِجْرَةِ عَلَى رَأْسِ ثَمَانِيْ عَشَرَ شَهْرًا وَ لَهَا تِسْعُ سِنِيْنَ وَ قِيْلَ دَخَلَ بِهَا بِالْمَدِيْنَةِ بَعْدَ سَبْعَةِ أَشْهُرٍ مِّنْ مَّقْدَمِهِ بَقِيَتْ مَعَهُ تِسْعَ سِنِيْنَ وَ مَاتَ عَنْهَا وَ لَهَا ثَمَانِيَ عَشَرَةَ سَنَةً

অর্থ : রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বিবাহ করেন নবুওয়াতের দশম বর্ষে শাওয়াল মাসে হিজরতের তিন বছর পূর্বে; এ নিয়ে অবশ্য কম-বেশি মতও আছে। এরপর হিজরতের দ্বিতীয় বর্ষে মদীনায় শাওয়াল মাসে আঠারো মাসের মাথায় তাদের বাসর হয়। কেউ কেউ বলেছেন, এটা হিজরতের সাত মাস পরের কথা। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে তিনি নয় বছর ঘর করেছিলেন। আঠারো বছর বয়সে তিনি বিধবা হন।

গবেষক প্রাবন্ধিক কি একই মুসান্নিফের একই রিসালার এই স্ববিরোধী তথ্য দুটোর সমন্বয় দেখাতে পারবেন? এমনটাও কি সম্ভব যে, হযরত আয়েশা রাযি. সম্পর্কে জানতে তিনি হযরত আসমা রাযি.-এর পরিচিতিটা পড়েছেন; অথচ স্বয়ং হযরত আয়েশা রাযি.-এর পরিচিতিটাই পড়েননি? তবে কি এটা জ্ঞানপাপ নয়?

হযরত আয়েশা রাযি.-এর পরিচয় দিতে গিয়ে শাহ ওয়ালিউদ্দিন খতিব রহ. স্বরচিত রিসালায় যে তথ্য দিয়েছেন, ইসলামের ইতিহাসের উৎসমূলের একটি বর্ণ ও বর্ণনাও এর ব্যতিক্রম নয়। *সহীহ বুখারী* :

মানাকিবু আয়িশা রাযি., তাযবিজুস সিগার ইত্যাদি অধ্যায়; *সহীহ মুসলিম* : বিবাহ অধ্যায়; *মুসতাদরাকে হাকেম* : চতুর্থ খণ্ড; *মুসনাদে আহমাদ* : ৬/১১৮; *তাবাকাতে ইবনে সাদ* : অষ্টম খণ্ড; *ইসতিআব*, *উসদুল গাবাহ*, *ইসাবা*-সহ সকল হাদীসগ্রন্থে এই একই বাণী ধ্বনিত হয়েছে। হযরত আয়েশা রাযি. বলেন, আমার বিবাহ ছয় বছর বয়সে এবং রোখসত নয় বছর বয়সে হয়েছে। (*সহীহ বুখারী* : ফাযলু খাদীজা রাযি.)

পক্ষান্তরে *মুসনাদে আহমাদ* : ষষ্ঠ খণ্ডের আটান্ন নম্বর পৃষ্ঠায় যে হাদীসটি এসেছে—তিনি বলেন, হযরত খাদীজা রাযি.-এর ওফাতের তিন বছর পর আমার বিবাহ হয়েছে—তাতে বিবাহ বলতে রোখসতের কথা বলা হয়েছে। অথবা হতে পারে, রাবী ভুলবশত রোখসত বলতে বিবাহ বলে ফেলেছেন। তা না হলে, এই বর্ণনাটি অন্য বিশুদ্ধ বর্ণনাগুলোর সঙ্গে মেলে না।

এখন অষ্টম শতকের খতিবের একটি ভুল বর্ণনার ওপর একের পর এক কিয়াস বা বিবেচনা করা সঙ্গত হবে, নাকি ইমাম বুখারী, ইমাম মুসলিম, ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল, ইবনে সাদ, ইবনে আবদুল বার, ইবনে আসির, ইবনে হাজার প্রমুখ হাদীসবিশারদ ও ইতিহাসবেত্তার ঐকমত্যপোষণকৃত বর্ণনা ও সিদ্ধান্তকে মেনে নেওয়া সঙ্গত হবে?

তা ছাড়া এ বিষয়টিও মনে রাখতে হবে যে—*বুখারী*, *মুসলিম*, *মুসনাদ* ও *তাবাকাতে* যে বর্ণনাগুলো এসেছে সেগুলো হযরত আয়েশা রাযি.-এর নিজ জবানিতে বিবৃত; এবং তাঁর একান্ত আপনজনদেরই সূত্রে বর্ণিত। তা হলে, এই বর্ণনাগুলোর চেয়ে নির্ভরযোগ্য তথ্য আর কী হতে পারে?

এই মূল ভাষ্যগুলোর সঙ্গে সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ কিছু পারিপার্শ্বিক বিষয়ও মাথায় রাখা দরকার। হযরত আয়েশা রাযি. বিবাহের সময় এত ছোট ছিলেন যে, তিনি দোলনায় দোল খেতেন, পুতুল খেলতেন (*আবু দাউদ* : কিতাবুল আদাব; *ইবনে মাজাহ* : বাবু মুদারাতিন নিসা; *সহীহ মুসলিম* : বাবু ফাযলি আয়িশা রাযি.)। তিনি বলেন, যখন সূরা কমারের আয়াতগুলো নাজিল হয় তখন আমি খেলছিলাম (*সহীহ বুখারী* :

তাফসীর—সূরা কমার)। তিনি আরও বলেন, যখন আমার বিবাহ হয় তখন আমার খবরও ছিল না (*ইবনে সাদ : ৮/৪৩*)। ইফকের ঘটনার প্রেক্ষাপটে বলা হয়েছে তিনি 'জারিয়াতুন হাদীসাতুস সিন' অর্থাৎ অল্পবয়সী বালিকা ছিলেন। অথচ প্রাবন্ধিকের দাবি অনুসারে ইফকের ঘটনার সময় হযরত আয়েশা রাযি.-এর বয়স বিশ-একুশ বছর হয়ে যাওয়ার কথা। বিশ-একুশ বছর বয়সের মেয়েকে উঠতি বয়সী বালিকা বলে নাকি?

এরকম সুনির্দিষ্ট, নির্ভরযোগ্য, অসংখ্য সূত্রে বর্ণিত তথ্যের বিপরীতে একটি 'কথিত আছে' কথার ওপর দাঁড় করানো দাবি কার কাছে, কতক্ষণ ধোপে টেকে? তবে এ কি স্বতঃস্ফূর্ত ভুল? আমরা জানি, মানুষের কেন এত 'স্বেচ্ছাভ্রান্তি'র শখ হয়। কিন্তু আমরা দুঃখিত, আমরা আমাদের ধর্ম ও ধর্মতত্ত্বে আশ্বস্ত; কোনো 'আপাতমধুর মিথ্যা কল্যাণ'-এর 'জয়ধ্বনি'তে ভড়কে যেতে নারাজ।

রইল আসল আপত্তিটি, যা অনেক ধর্মপ্রাণ কিন্তু অবিবেচক মুসলমানের মস্তিষ্কেও বিপত্তি ঘটিয়েছে। আসলে যারা আপত্তিটি করেছেন, তারা ইউরোপ-আমেরিকার শীতল জলবায়ু ও আবহাওয়াকে মরু-আরবের তপ্ত জলবায়ু ও আবহাওয়ার সঙ্গে গুলিয়ে ফেলেছেন। শীতপ্রধান দেশগুলোতে শিশুদের স্বাস্থ্যগত সক্ষমতা ও শারীরিক উপযুক্ততা তৈরি হয় ধীরগতিতে। কিন্তু গ্রীষ্মমণ্ডলের শিশুরা, বিশেষ করে শিশুকন্যারা, এদিক থেকে আলাদা (তা ছাড়া, তখনকার খোলা আকাশের নিচে সর্বাঙ্গসুস্থ-সুন্দর প্রাকৃতিক পরিবেশ ও জনজীবন আদৌ এখনকার মতো আলো-বাতাসহীন, যান্ত্রিক ও দূষিত ছিল না)। অথচ, এখনো—ভারতের মতো নাতিশীতোষ্ণ দেশে ইউরোপের তুলনায় অল্প বয়সেই মেয়েরা বয়ঃপ্রাপ্ত হয়।

তদুপরি, আলোচ্য বিবাহের উদ্দেশ্য নিছক দাম্পত্যজীবন ছিল না; বরং অন্য কিছু ছিল। ইতিহাসের সোনালি পাতায় তা সমুজ্জ্বলও হয়ে আছে। প্রথম উদ্দেশ্য ছিল নবুওয়াত ও খেলাফতের মধ্যে সুদৃঢ় বন্ধন তৈরি করা। দ্বিতীয় উদ্দেশ্য ছিল হযরত আয়েশা রাযি.-এর সহজাত মেধা-প্রতিভা ও সক্ষমতাকে কাজে লাগিয়ে ইসলামের খেদমত গ্রহণ করা

এবং মুসলিম নারী সমাজের মধ্যে ইসলামী শিক্ষা-দীক্ষার ব্যাপক প্রচার-প্রসার ঘটানো। আল্লাহর প্রশংসা, এই মহত্তম উদ্দেশ্যগুলো অক্ষরে-অক্ষরে বাস্তবায়িত হয়েছে। হযরত আয়েশা রাযি.-এর পুরো জীবনচরিত এর সাক্ষ্য বহন করে। সবচেয়ে বড় কথা, এটা ছিল নবুওয়াতের ব্যতিক্রমতা ও বিশিষ্টতার মেছাল। এগুলোর মূল্যায়ন ব্যতিক্রমতানুসারেই করা উচিত।

যাই হোক, বিভিন্ন হাদীসে স্বয়ং হযরত আয়েশা রাযি. থেকে তাঁর বিবাহ ও রোখসত সম্পর্কে যে বর্ণনাগুলো এসেছে, বিষয়টিকে সুপ্রমাণিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য উল্লেখযোগ্য কয়েকটি বর্ণনা তুলে ধরা হচ্ছে :

সহীহ বুখারী বাবু নিকাহির রজুল-এ আছে :

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَهَا وَ هِيَ بِنْتُ سِتٍّ سِنِيْنَ وَ أُدْخِلَتْ عَلَيْهِ وَ هِيَ بِنْتُ تِسْعٍ وَ مَكَثَتْ عِنْدَهُ تِسْعاً

অর্থ : হযরত আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বিবাহ করেছেন যখন তাঁর বয়স সাত বছর এবং তাঁর কাছে গিয়েছেন যখন তাঁর বয়স নয় বছর। তিনি তাঁর কাছে থেকেছেন নয় বছর। [১/৭৭১]

এই একই বিবরণ আছে বিভিন্ন অধ্যায়ে, বিভিন্ন পরিচ্ছেদে; বিশেষ করে *সহীহ বুখারী*র চার-পাঁচ জায়গায়। *সহীহ বুখারী* : বাবু তাযবিজি আয়িশা রাযি.-তে আছে :

قَالَ تُوُفِّيَتْ خَدِيْجَةُ قَبْلَ مَخْرَجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمَدِيْنَةِ بِثَلَاثٍ فَلَبِثَ سَنَتَيْنِ أَوْ قَرِيْباً مِّنْ ذٰلِكَ وَ نَكَحَ عَائِشَةَ وَ هِيَ بِنْتُ سِتٍّ سِنِيْنَ وَ بَنَى بِهَا وَ هِيَ بِنْتُ تِسْعِ سِنِيْنَ

অর্থ : উরওয়াহ বলেন, হিজরতের তিন বছর পূর্বে হযরত খাদীজা রাযি. ইন্তেকাল করেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুই বছর বা এর কাছাকাছি সময় অপেক্ষা করেন। তিনি হযরত আয়েশা রাযি.-কে ছয় বছর বয়সে বিবাহ করেন এবং নয় বছর বয়সে কাছে নেন। [১/৫৫১]

فَلَبِثَ سَنَتَيْنِ أَوْ قَرِيباً مِّنْ ذَلِكَ (দুই বছর বা এর কাছাকাছি সময় অপেক্ষা করেছেন) এ থেকে এমন ভুল বোঝার অবকাশ নেই যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এতদিন অবিবাহিত থেকেছেন; বরং এর অর্থ হলো, হযরত খাদীজা রাযি.-এর মৃত্যুর পর প্রায় দুই বছর বা এর কাছাকাছি সময়—হযরত সাওদা রাযি. এবং হযরত আয়েশা রাযি.-কে বিবাহ করা সত্ত্বেও—কোনো স্ত্রীর কাছেই যাননি। নয়তো প্রথম হিজরীতে হযরত আয়েশা রাযি.-এর বয়স নয় বছর হয় কী করে?

একই পৃষ্ঠার আর একটি হাদীসে আছে, হযরত আয়েশা রাযি. বলেন,

تَزَوَّجَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ أَنَا بِنْتُ سِتِّ سِنِيْنَ أَسْلَمْنَنِيْ إِلَيْهِ وَ أَنَا بِنْتُ تِسْعِ سِنِيْنَ

অর্থ : নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বিবাহ করেছেন ছয় বছর বয়সে। আর নারীরা আমাকে তাঁর কাছে অর্পণ করেছেন নয় বছর বয়সে ।

হযরত খাদীজা রাযি.-এর মৃত্যু-সাল এবং সে অনুযায়ী হযরত আয়েশা রাযি.-এর বিবাহ ও জন্ম-সাল নিয়ে হাদীস ও ইতিহাসে যত কথাই থাকুক, এ ব্যাপারে কোনো দ্বিমত নেই যে, বিবাহের সময় তাঁর বয়স ছিল ছয় বছর; আর রোখসতের সময় ছিল নয় বছর। এই বর্ণনাটিই সমস্ত হাদীসগ্রন্থে রয়েছে। এ বিষয়টি হযরত আয়েশা রাযি. নিজেই স্পষ্ট করেছেন। তাঁর কাছে শুনেই উরওয়াহ বর্ণনা করেছেন। উরওয়াহ থেকে শুনে তাঁর ছেলে হিশাম বর্ণনা করেছেন। এই উরওয়াহ কে? ইনি হযরত আসমা রাযি.-এর পুত্র, যেই আসমা রাযি.-এর অনিশ্চিত বয়স ও বছরের 'ধুলো দিয়ে' হযরত আয়েশা রাযি.-এর সুনিশ্চিত বয়স ও বছরকে 'ঢেকে দেওয়া'র অপচেষ্টা চালানো হচ্ছে। [মাআরিফ : শুমারা নং : ১ জিলদ : ২২]

***

[পাঠকবৃন্দের মনে থাকার কথা, মাওলানা মুহাম্মাদ আলী লাহোরি একটি নতুন ফতোয়া প্রদান করেছিলেন। যার মূল কথা ছিল—ইসলামে বাল্যবিবাহ বৈধ নয়। এরই ধারাবাহিকতায় তিনি দাবি করেছিলেন,

হযরত আয়েশা রাযি.-এর বাল্যবিবাহের যে কথাটি প্রচলিত আছে তা ঠিক নয়। আমরা *মাআরিফ* : জুলাই, ১৯২৮ সংখ্যার খোলা কলামে তার দাবির বিপক্ষে বেশ কিছু আপত্তি উত্থাপন করেছিলাম। কয়েক মাস পর মাওলানা সাহেব বন্ধুমহলের তাগাদায় নিজস্ব পত্রিকায় আমাদের উত্থাপিত আপত্তিগুলোর নিরসন করার চেষ্টা করেছেন। সত্য অন্বেষণ ও প্রতিষ্ঠার স্বার্থে তার প্রতি-উত্তর পর্যালোচনা ও ভ্রান্তিগুলো সুস্পষ্ট করা সমীচীন মনে করছি।] [*মাআরিফ*, শাযারাত : জানুয়ারি, ১৯২৯]

হযরত আয়েশা রাযি.-এর বয়স সাইয়্যেদ সুলাইমান নদভীর আপত্তি এবং কিছু কথা

[লেখক : মাওলানা মুহাম্মাদ আলী লাহোরি]

বাল্যবিবাহ এবং হযরত আয়েশা রাযি.

বিবাহের সময় হযরত আয়েশা রাযি.-এর বয়স ঠিক কত বছর ছিল এ বিষয়ে দীর্ঘদিন যাবৎ একটা খটকার মধ্যে ছিলাম। তবে আমার এ খটকার কারণ কখনোই এটা নয় যে, নয় বছর বয়সে কোনো মেয়ের বালেগ হওয়া এবং বিবাহের উপযুক্ত হওয়াকে আমি অসম্ভব মনে করি; বরং এর মূল কারণ হলো—পরস্পরবিরোধী বিভিন্ন হাদীস।

একদিকে এমন কিছু হাদীস আছে, যেগুলো প্রমাণ করে যে, হযরত আয়েশা রাযি.-এর বয়স বিবাহের সময় ছিল ছয় বছর, আবার রোখসতের সময় ছিল নয় বছর; অন্যদিকে এমন কিছু হাদীসও আছে, যেগুলো ভাবিয়ে তোলে যে, আদৌ বিবাহ ও রোখসত এত কম বয়সে হয়েছিল কি না? নাকি আরও বেশি বয়সে হয়েছিল? তবে সত্য বলতে কি, এ নিয়ে যে খুব একটা ঘাঁটাঘাঁটি করেছি, তা নয়।

এরই মধ্যে বাল্যবিবাহ-সংক্রান্ত একটি বিল অ্যাসেম্বলিতে পাশ হলো। আমিও নিজের মত প্রকাশের প্রয়োজন অনুভব করলাম। আমার মধ্যে মৌলিকভাবে যে চিন্তাটা কাজ করেছে তা হচ্ছে, বর্তমান প্রেক্ষাপটে বাল্যবিবাহের আইনি নিষেধাজ্ঞা শরীয়তের খেলাফ হবে কি না? দীর্ঘ চিন্তা-ভাবনার পর আমার মনে হলো, এটা শরীয়তের মানশার খেলাফ হবে না। কারণ বালেগ হওয়ার পরই বিবাহ-শাদির মুয়ামালা করা

শরীয়তের পছন্দ। পরে বিষয়টি আমার পরিচিত কয়েকজন আলেমের সঙ্গে আলোচনা করে তাদের মতামত যাচাই করলাম; দেখলাম তারাও আমার সঙ্গে একমত। তখন বিষয়টি প্রবন্ধাকারে ছেপে *লাইট* পত্রিকায় প্রচার করলাম।

পত্রিকায় লেখাটি প্রকাশের পর থেকেই বাল্যবিবাহের পক্ষাবলম্বীদের হৈচৈ শুরু হয়ে গেল। তাদের বক্তব্য হলো, হযরত আয়েশা রাযি.-কে আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিবাহ করেছিলেন খুবই ছোট্ট বয়সে। সুতরাং স্বয়ং আল্লাহর নবী যেটাকে জায়েয করেছেন সেটাকে অবৈধ বলার অধিকার কারও নেই। আখের, এই সাওয়ালের জবাব দেওয়াটাও জরুরি হয়ে পড়ল।

মূল আলোচনা

পয়গামে সুলহ-এর স্বনামধন্য সম্পাদক বন্ধুবর মুহাম্মাদ সাহেব নিজেই আমার প্রবন্ধটি উর্দুতে তরজমা করে পত্রিকায় ছেপে দিয়েছিলেন। পাঠকের প্রতি সবিনয় অনুরোধ, প্রবন্ধে প্রদত্ত আমার শব্দগুলো লক্ষ্য করুন—

‘বিপরীতে বলা হয় যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন হযরত আয়েশা রাযি.-কে বিবাহ করেন তখন তাঁর বয়স ছিল ছয় বছর বা সাত বছর। এসব হাদীসকে যদি গ্রহণযোগ্য ধরে নেয়াও হয় তবুও এটা তো সর্বস্বীকৃত বিষয় যে, শাদি-তালাকের বিধান নাজিল হয়েছে মদীনায় আর আয়েশা রাযি.-এর বিবাহ হয়েছিল মক্কায়। সুতরাং মক্কার ঘটনাকে মদীনায় নাজিল হওয়া হুকুমের মোকাবেলায় দলিল হিসেবে পেশ করা যুক্তিসঙ্গত নয়।’

‘তা ছাড়া, বিবাহের সময় হযরত আয়েশা রাযি.-এর বয়স এতটা কম ছিল না; বরং আরেকটু বেশি ছিল। কারণ সহীহ হাদীস দ্বারা এটা প্রমাণিত হয় যে, হযরত আয়েশা রাযি. তাঁর বোন আসমা রাযি.-এর চেয়ে দশ বছরের ছোট ছিলেন। আর হিজরতের সময় আসমা রাযি.-এর বয়স ছিল সাতাশ বছর। সুতরাং হিজরতের সময় আয়েশা রাযি.-এর

বয়স সতেরো বছর ছিল, আর হিজরতের এক বছর আগে যখন বিবাহ হয় তখন তাঁর বয়স ছিল ষোলো বছর।'

আশা করি, উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে এটা ফুটে উঠেছে যে, আমার প্রবন্ধের মূল আলোচ্য বিষয় ছিল বাল্যবিবাহ; হযরত আয়শো রাযি.-এর বয়স নয়। আমার মূল জবাব এটুকুই ছিল যে, হযরত আয়েশা রাযি.-এর বিবাহ মক্কায় হয়েছিল, যা মদীনায় নাজিল হওয়া শাদি-তালাকের হুকুমের মোকাবেলায় দলিল হিসেবে আসতে পারে না, অর্থাৎ এটা মেনে নিয়েই জবাব দেওয়া হয়েছে যে, আয়েশা রাযি.-এর শাদি অল্প বয়সেই হয়েছে; তবে প্রসঙ্গক্রমে এটাও বলে দেওয়া হয়েছে যে, শাদির সময় বয়স কিছুটা বেশি হওয়ার বিষয়টিও মেনে নেওয়ার সুযোগ আছে।

দালিলিক ভিত্তি

আমার প্রবন্ধ এবং অব্যবহিত পরেই সাইয়্যেদ সুলাইমান নদভীর সমালোচনা প্রকাশিত হওয়ার পর একাধিক পত্রযোগে আমাকে অনুরোধ করা হয়েছে যেন আমি হযরত আয়েশা রাযি.-এর বিবাহের বয়স সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য প্রকাশ করি। অবশ্য সাইয়্যেদ রিয়াসত আলি নদভী কিছুটা কঠোরতার সঙ্গে পীড়াপীড়ি করেছেন যেন আমি ঐ সকল রেওয়ায়েতের 'ঠিকানা' উল্লেখ করি কিংবা নিজের ভুল স্বীকার করি।

এটা তো ঠিক যে, আমার প্রবন্ধে আমি যখন হযরত আসমা রাযি.-এর চেয়ে হযরত আয়েশা রাযি. দশ বছরের ছোট হওয়ার হাওয়ালা দিই, তখন আমার মাথায় আল-ইকমাল-এর নামও ছিল। ঐ প্রবন্ধটি কিছুদিন আগে লিফলেট-প্যাম্ফলেট আকারে বিতরণ করা হয়েছিল এবং সাইয়্যেদ সুলায়মান নদভী তার ওপর পর্যালোচনা পেশ করেছিলেন। আল-ইকমাল-এর হাওয়ালা ছাড়াও আমার খুবই আস্থাভাজন এক মাওলানা অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে বলেছিলেন, *উসদুল গাবা*-র এক জায়গায় আছে—বিবাহের সময় হযরত আয়েশা রাযি.-এর বয়স বারো বছর ছিল। দুর্ঘটনাক্রমে তখন আমার হাতের নাগালে কিতাবটি না থাকায় তাহকীক করাও সম্ভব হয়নি; বরং তার স্মৃতিশক্তির ওপর আস্থা রেখেই আমাকে ক্ষান্ত থাকতে হয়েছে। পরে অবশ্য কিতাবটিতে হযরত আসমা রাযি., আবু বকর রাযি.

এবং হযরত আয়েশা রাযি.-এর আলোচনায় তালাশ করেও বারো বছরের তথ্যটি খুঁজে পাইনি। কিন্তু আমার সেই মাওলানা এখনো বলছেন, *উসদুল গাবায়* অবশ্যই তিনি পড়েছেন। সুযোগ পেলে আমাকে বের করে দেখাবেন। তবে এ সবকিছুর পরও নির্ভরযোগ্য কিছু হাদীসের ভিত্তিতে সবসময় আমার এটাই মনে হয়েছে যে, বারো বছর না হলেও বয়স এতটা কম ছিল না।

গুরুত্ব না দেওয়ার কারণ

আমি এটা নিঃসঙ্কোচে স্বীকার করছি যে, হযরত আয়েশা রাযি.-এর বিবাহের বয়স আমার মূল আলোচ্য বিষয় না হওয়ার কারণে বিষয়টির প্রতি যথাযথ গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। প্রাসঙ্গিক বিষয় হওয়ার কারণে তাৎক্ষণিকভাবে জেহেনে যা ছিল তাই লিখে দেওয়া হয়েছে। আলোচ্য প্রবন্ধে হযরত আয়েশা রাযি.-এর বিবাহের বয়স কিছুটা বেশি উল্লেখ করার পাশাপাশি এটাও বলা হয়েছে যে, হিজরতের এক বছর পূর্বে হযরত আয়েশা রাযি.-এর বিবাহ হয়েছে। অথচ এ তথ্যটি ঠিক নয়; বরং বিবাহ হয়েছিল হিজরতের তিন বছর পূর্বে। আসল কথা হলো, দুই ধরনের রেওয়ায়েতই আছে। কোনো রেওয়ায়েতে এক বছর, কোনো রেওয়ায়েতে তিন বছর পূর্বে বিবাহের কথা উল্লেখ আছে।

নয় বছর বয়সে বিবাহের রেওয়ায়েত

অধিকাংশ রেওয়ায়েত এ বিষয়ে একমত যে, বিবাহের সময় হযরত আয়েশা রাযি.-এর বয়স ছয় বছর, আর রোখসতের সময় নয় বছর ছিল এবং নবীজীর ইন্তেকালের সময় ছিল আঠারো বছর। কিন্তু *তাবাকাতে ইবনে সাদ*-এর এই রেওয়ায়েত দুটো দেখুন—

تَزَوَّجَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ هِيَ بِنْتُ تِسْعِ سِنِيْنَ .

অর্থ : নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আয়েশা রাযি.-কে যখন বিবাহ করেন তখন তাঁর বয়স ছিল নয় বছর। [৮/৪১]

نَكَحَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَائِشَةَ وَ هِيَ ابْنَةُ تِسْعِ سِنِيْنَ أَوْ سَبْعٍ

অর্থ : নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আয়েশা রাযি.-কে যখন বিবাহ করেন তখন তাঁর বয়স ছিল নয় বছর, অথবা সাত বছর। [৮/৪২]

এখন স্বভাবত সবাই চাইবে, কোনো একটা ব্যাখ্যাট্যাখ্যা করে ভিন্ন বর্ণনার তথ্যটিকে অধিকাংশ বর্ণনার তথ্যের সঙ্গে মিলিয়ে ফেলি। কিন্তু কী করে? অধিকাংশ বর্ণনার তথ্যও যে হিসাব অনুযায়ী মেলে না। আবার বর্ণনাকারীরা এত উচ্চ পর্যায়ের যে, তাদের বর্ণনার শুদ্ধ্যশুদ্ধি নিয়ে কথা বলার সাহসও কেউ করে না।

বিবাহের তারিখ-সংক্রান্ত বর্ণনা

হযরত আয়েশা রাযি.-এর বিবাহের তারিখ নিয়ে যথেষ্ট মতভিন্নতা থাকলেও এ বিষয়ে নির্ভরযোগ্য কারও দ্বিমত নেই যে, নবুওয়াতের দশম বছর হযরত খাদীজা রাযি.-এর ইন্তেকালের কিছুদিন পরই হযরত আয়েশা রাযি.-এর বিবাহ হয়েছিল এবং তার অনতিবিলম্ব পরই হযরত সাওদা রাযি.-এর বিবাহ হয়েছিল। অর্থাৎ নবীজী প্রথমে হযরত আয়েশা রাযি.-কে, তারপর হযরত সাওদা রাযি.-কে বিবাহ করেন। আর এটা যেহেতু সর্বস্বীকৃত বিষয় যে, হযরত সাওদা রাযি.-এর বিবাহ নবুওয়াতের দশম বছর হিজরতের তিন বছর পূর্বে হয়েছিল; সুতরাং হযরত আয়েশা রাযি.-এর বিবাহও যে নবুওয়াতের দশম বছর হয়েছিল এটা অনস্বীকার্য।

হযরত আয়েশা রাযি.-এর বিবাহের তারিখ-সংক্রান্ত মতভিন্নতা সম্ভবত হযরত খাদীজা রাযি.-এর ইন্তেকালের সন-তারিখের মতভিন্নতা থেকেই সৃষ্ট হয়েছে। কারণ কোনো কোনো ঐতিহাসিকের মতে খাদীজা রাযি.-এর ইন্তেকাল হয়েছে হিজরতের চার বছর বা পাঁচ বছর আগে। তাদের মতে, হযরত খাদীজা রাযি.-এর ইন্তেকাল এবং হযরত আয়েশা রাযি.-এর বিবাহের মাঝে এক অথবা দুই বছরের ব্যবধান আছে। যদিও বিশুদ্ধ মত হচ্ছে, নবুওয়াতের দশম বছর তাঁর ইন্তেকাল হয়েছে। যাই হোক, ইন্তেকাল ও বিবাহের এই ব্যবধানের ভিত্তিতেই সম্ভবত এটা ধরে

নেওয়া হয়েছে যে, আয়েশা রাযি.-এর বিবাহ হিজরতের এক অথবা দুই বছর আগে হয়েছে। মোটকথা, বর্ণনাগুলোর মধ্যে যথেষ্ট বিরোধ আছে। এমনকি—খোদ *বুখারী*তেই দুই ধরনের রেওয়ায়েত আছে। আর বলাবাহুল্য যে, যে কোনো একটি বর্ণনা ঠিক, অপরটি ভুল। আর বিচার-পর্যালোচনার ক্ষেত্রে আবেগের বশবর্তী হয়ে কাউকে সমালোচনার ঊর্ধ্বে রাখা ন্যায়পরিপন্থী। সুতরাং *বুখারী-মুসলিম* সন্দেহাতীতভাবে অতিনির্ভরযোগ্য ও সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও ভুলের ঊর্ধ্বে নয়, ভুলের ঊর্ধ্বে শুধু কুরআন। সারকথা হলো, বিবাহের সন-তারিখ নিয়ে যে মতভিন্নতা রয়েছে তাতে অধিকাংশ আলেমের মত (অর্থাৎ নবুওয়াতের দশম বছরের মত)-ই বিশুদ্ধ। যেমনটি সাইয়্যেদ সাহেবও লিখেছেন—

বিশ্লেষকদের মতে—এবং বেশিরভাগ গ্রহণযোগ্য বর্ণনা এ মতেরই সমর্থন করে—হযরত খাদীজা রাযি. নবুওয়াতের দশম বর্ষে হিজরতের তিন বছর পূর্বে রমযান মাসে মৃত্যুবরণ করেন। এক মাস পর সে বছরই শাওয়াল মাসে হযরত আয়েশা রাযি.-এর বিবাহ হয়। *–সীরাতে আয়েশা রাযি.*

নবীজীর সংসারে কখন এসেছিলেন?

দ্বিতীয় পর্যায়ে আমাদের দেখতে হবে তাঁর রোখসতের তারিখ। এখানেও দু-ধরনের বর্ণনা পাওয়া যায়। কোনো বর্ণনায় হিজরতের আট মাস পর, কোনো বর্ণনায় আঠারো মাস পর। সাইয়্যেদ সাহেব *সীরাতে আয়েশা রাযি.* গ্রন্থে আল্লামা আইনীর মতকে (অর্থাৎ বদর যুদ্ধের পর ২য় হিজরীতে রোখসতের মতকে) প্রত্যাখ্যান করেছেন। অপরদিকে হাজি মুঈনুদ্দীন নদভী *খোলাফায়ে রাশেদা* গ্রন্থে দ্বিতীয় হিজরীর মতকে বিশুদ্ধ বলেছেন। সম্ভবত সাঈয়েদ সাহেব মতটি শুধু এ কারণে গ্রহণ করেননি যে, এটা মেনে নিলে বিবাহের সময় হযরত আয়েশা রাযি.-এর বয়স দশ বছর হয়ে যায়। মনে হয়, সাঈয়েদ সাহেবের মাথায় এটা ছিল না যে, হিজরতের প্রথম বছর তার রোখসত মেনে নিলেও বিবাহের সময় এগারো বছর প্রমাণিত হয়ে যায়। কারণ বলা হয়েছে, নবুওয়াতের দশম বছর শাওয়ালে তার বিবাহ হয়েছিল এবং বিবাহের সময় তার বয়স সাত বা

আট বছর ছিল। এ হিসাব অনুযায়ী তেরোতম শাওয়ালে অর্থাৎ হিজরতের ছয়-সাত মাস আগে হযরত আয়েশা রাযি.-এর বয়স নয় কি দশ বছর হয়েছিল। আর হিজরতের প্রথম বছর শাওয়ালেও যদি রোখসত হয়ে থাকে তবুও হযরত আয়েশা রাযি.-বর্ণিত হাদীসগুলোর হিসাব অনুযায়ীই তখন তাঁর বয়স দশ বছর পূর্ণ হয়ে এগারো বছর কিংবা এগারো বছর পূর্ণ হয়ে বারো বছরে পড়েছিল। কোনো অবস্থাতেই নয় বছরের হিসাব মেলে না। কিন্তু বিশুদ্ধ মত সেটাই, যেটা *বুখারী শরীফের* বিশ্বনন্দিত ব্যাখ্যাগ্রন্থ *উমদাতুল কারীতে* আল্লামা বদরুদ্দিন আল আইনী উল্লেখ করেছেন—২য় হিজরীতে বদর যুদ্ধের পর রোখসত হয়েছিল। এই মতের সমর্থনেই আল্লামা ইবনে আবদুল বার *ইসতিআব* গ্রন্থে লিখেছেন, হযরত আয়েশা রাযি.-এর রোখসত হিজরতের আঠারো মাস পর হয়েছিল। তা হলে, এই হিসাব অনুযায়ী আয়েশা রাযি.-বর্ণিত হাদীস দ্বারা এটা প্রমাণিত হয় যে, রোখসতের সময় তাঁর বয়স এগারো বছর পূর্ণ হয়ে বারোতে পড়েছিল কিংবা বারো বছর পূর্ণ হয়ে তেরো বছরে পড়েছিল।

মোটকথা, এ সকল রেওয়ায়েত যদি সহীহ হয় তা হলে নিশ্চিতভাবেই বলা যায় যে, হযরত আয়েশা রাযি. নিজের বয়স বর্ণনা করতে গিয়ে বিস্মৃতির শিকার হয়েছেন। কারণ তাঁর বিবাহ-রোখসতের মধ্যে পাঁচ বছরের ব্যবধান আছে। কমপক্ষে চার বছর তো অবশ্যই। সুতরাং বিবাহের সময় যদি তার বয়স ছয়-সাত বছর হয়ে থাকে তা হলে রোখসতের সময় নয় বছর বয়স হওয়া কোনোভাবেই সম্ভব নয়।

অন্যান্য বর্ণনা থেকে বয়সের আন্দাজ

উপর্যুক্ত বিষয়গুলো ছাড়াও এমন আরও কিছু ঘটনা আছে যার কারণে মনে হয় যে, বিবাহের সময় তাঁর বয়স এত কম ছিল না। যেমন *বুখারীর* কিতাবুত তাফসীরে সূরাতুল কমারের بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَىٰ وَ أَمَرُّ আয়াত প্রসঙ্গে হযরত আয়েশা রাযি. বলেন—

لَقَدْ أُنْزِلَتْ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَكَّةَ وَ إِنِّيْ لَجَارِيَةٌ أَلْعَبُ "بَلِ

السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُّ"

অর্থ : মক্কায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ আয়াতটি যখন অবতীর্ণ হয় তখন আমি ছোট্ট এক বালিকা, (অন্যান্য বাচ্চাদের সঙ্গে) খেলাধুলা করছিলাম।

এখানে লক্ষণীয় বিষয় হলো, সূরায়ে কমার অবতীর্ণ হয়েছে মক্কায় ইসলামের শুরুর যুগে। কারণ এ সূরায় শাক্কুল কমার (চন্দ্র-খণ্ডন) মুজিযার আলোচনা রয়েছে, আর দুর্লভ এই নববী মুজিযা নবুওয়াতের সপ্তম বছরে শিআবে আবি তালিবে অবরুদ্ধ হওয়ারও আগের ঘটনা। তা ছাড়া, মুফাসসিরীনে কেরামের মত অনুযায়ী সূরায়ে নাজম-এর সঙ্গে এই সূরা কমারের অত্যন্ত নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে যা থেকে অনুমান করা যায়, সূরা দুটো কাছাকাছি সময়ে অবতীর্ণ। সুতরাং সূরা নাজম যেহেতু নবুওয়াতের পঞ্চম বছর অবতীর্ণ হয়েছে তাই বলা যায় সূরা কমারও পঞ্চম বছর অবতীর্ণ হয়েছে। এসব যদি ঠিক হয়ে থাকে তা হলে হযরত আয়েশা রাযি.-এর বক্তব্য অনুযায়ী পঞ্চম বছর তাঁর বয়স ছিল পাঁচ-ছয় বছর। কারণ কোনো সূরা অবতীর্ণ হওয়ার বিষয়টি অনুধাবন করা এবং তা মুখস্থ করে ফেলা পাঁচ-ছয় বছরের চেয়ে কম বয়স্ক হলে সম্ভব নয়। সুতরাং নবুওয়াতের দশম বছর তার বয়স ছয়-সাত হওয়া অসম্ভব একটা বিষয়। সারকথা, যদি এই বর্ণনাগুলো সহীহ হয় তা হলে বলতেই হবে, বয়স বর্ণনার ক্ষেত্রে হযরত আয়েশা রাযি. কোনো প্রকার বিস্মৃতির শিকার হয়েছেন।

আয়েশা রাযি.-বর্ণিত আরেকটি হাদীস

বুখারী শরীফের হিজরত-সংক্রান্ত মশহুর হাদীসটিও আমাদের মতকে সমর্থন করে। দেখুন, হযরত আয়েশা রাযি. নিজেই বর্ণনা করছেন—

قَالَتْ: لَمْ أَعْقِلْ أَبَوَيَّ قَطُّ إِلَّا وَهُمَا يَدِيْنَانِ الدِّيْنَ ، وَلَمْ يَمُرَّ عَلَيْنَا يَوْمٌ إِلَّا يَأْتِيْنَا فِيْهِ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَرَفَيِ النَّهَارِ، بُكْرَةً وَعَشِيَّةً ، فَلَمَّا

ابْتُلِيَ الْمُسْلِمُوْنَ ، خَرَجَ أَبُوْ بَكْرٍ مُهَاجِرًا قِبَلَ الْحَبَشَةِ .

অর্থ : বুদ্ধি হওয়ার সময় থেকেই আমি আমার মা-বাবাকে ইসলামের ওপর দেখছি। আর এমন কোনো দিন অতিবাহিত হতো না, যেদিন আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকাল-সন্ধ্যা আমাদের কাছে আসতেন না। এরপর যখন মুসলমানদের ওপর অত্যাচারের সীমা ছাড়িয়ে গেল, তখন আবু বকর হাবশার উদ্দেশে হিজরত করলেন।

হযরত আবু বকর রাযি. সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেন এবং তাঁর স্ত্রী উম্মে রুমান মাত্র সতেরো জনের পরেই নবুওয়াতের তৃতীয় বছর বা তারও আগে ইসলাম গ্রহণ করেছেন। কারণ চতুর্থ বছর মুসলমানদের সংখ্যা চল্লিশ জন অতিক্রম করেছিল। তা হলে, হাদীসের বক্তব্য অনুযায়ী হযরত আবু বকর রাযি.-এর হিজরত নবুওয়াতের পঞ্চম বছরে হওয়ার কথা। আর আবু বকর রাযি.-এর বাড়িতে নবীজীর সকাল-সন্ধ্যা আগমন তারও আগের ঘটনা। আর ওই সময় আয়েশা রাযি.-এর বুদ্ধির বয়সে উপনীত হওয়ার অর্থই হলো পাঁচ-ছয় বছর বয়স হওয়া। সুতরাং আয়েশা রাযি.-এর বয়স-সংক্রান্ত হাদীসগুলোকে সহীহ ধরলে নবুওয়াতের পঞ্চম বছর তার পাঁচ-ছয় বছর বয়স হওয়ার পরিবর্তে তখন তাঁর জন্ম হওয়ার কথা। এমতাবস্থায় কীভাবে তাঁর বয়স বর্ণিত হাদীসগুলোকে গ্রহণযোগ্য বলে মেনে নেওয়া যায়?

এখানে আরেকটি বিষয় উল্লেখযোগ্য। হযরত আয়েশা রাযি.-কে যখন বিবাহের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল তখন তাঁর পিতা আবু বকর রাযি. উত্তরে বলেছিলেন, আয়েশার বিষয়ে আগে আরেকজনকে বলা হয়েছে। সুতরাং তার কাছ থেকে জেনে তারপর এ বিষয়ে আগে বাড়া যাবে।

এই ঘটনাও প্রমাণ করে যে, নবীজীর সঙ্গে বিবাহের সময় তাঁর বয়স ছয়-সাত বছর নয়; বরং এর চেয়ে বেশি ছিল। কারণ পাঁচ/ছয় বছর বয়সে নিশ্চয় বিবাহের কথা আলোচনা হওয়ার প্রথা আরবেও ছিল না। অথচ এখানে দেখা যাচ্ছে, নবীজীর সঙ্গে বিবাহের আগে হযরত আয়েশা রাযি.-এর অন্য জায়গায় বিবাহের আলোচনা হয়েছিল।

সাহিবে *মেশকাতে*-এর বক্তব্য

এটা ঠিক যে, সাহিবে *মেশকাত* হযরত আয়েশা রাযি.-এর বিবাহের বয়স ছয়-সাতের চেয়ে বেশি হওয়ার বিষয়টিকে قِيْلَ এর মতো দুর্বল শব্দ দিয়ে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু আমার বিশ্বাস—তাঁর মতো বিশাল ব্যক্তিত্ব নির্ভরযোগ্য সূত্র ছাড়া নিজের একটা কথাকে قِيْلَ (অন্যের বক্তব্য) বলে চালিয়ে দিতে পারেন না। তালাশ করলে হয়তোবা কোনো রেওয়ায়েত পাওয়া যেতেই পারে। তা ছাড়া, *বুখারী শরীফের* অন্য হাদীসে সুস্পষ্ট উল্লেখ আছে যে, নবুওয়াতের ৫ম/৬ষ্ঠ বছর হযরত আয়েশা রাযি. বুদ্ধিসম্পন্ন একজন বালিকায় পরিণত হয়েছিলেন। যেমনটি بَلِ السَّاعَةُ .... আয়াত অবতীর্ণ হওয়া প্রসঙ্গে জানা গেছে। এই ঘটনাটিও সুস্পষ্ট প্রমাণ বহন করে যে, বিবাহের সময় তাঁর বারো-তেরো আর বাসরের সময় ষোলো-সতেরো বছর বয়স ছিল। পর্যাপ্ত অনুসন্ধান দ্বারা এটা আরও সুপ্রমাণিত হতে পারে।

হযরত আয়েশা রাযি.-এর বয়স
মাওলানা মুহাম্মদ আলী লাহোরির সন্দেহ-নিরসন

(লেখক : সাইয়্যেদ সুলাইমান নদভী রহ.)

প্রথমেই পাঠকদের কাছে আমার আরজি, সামনের আলোচনাটি একটু ধৈর্য ও মনোযোগের সঙ্গে পড়ুন। দীর্ঘ হলেও আশা করি অনুপকারী হবে না। দ্বিতীয়ত হযরত মাওলানা লাহোরির নীতি ও নিষ্ঠা, সততা ও সাহসিকতা আমাকে অত্যন্ত মুগ্ধ করেছে। মাওলানা সাহেব অকপটে স্বীকার করে নিয়েছেন যে, বিবাহের সময় হযরত আয়েশা রাযি.-এর বয়স ১৬/১৭ বছর হওয়ার ঐতিহাসিক কোনো প্রমাণ নেই। সঙ্গে এটাও মেনে নিয়েছেন যে, নবুওয়াতের দশম বছর শাওয়ালেই বিবাহ হয়েছিল এবং দ্বিতীয় হিজরীতে শাওয়াল মাসে রোখসত হয়েছিল। তবে তিনি (নিজের মতটাকে সাব্যস্ত করার জন্য) খুবই টানা-হেঁচড়া করে এটা প্রমাণ করার ব্যর্থ চেষ্টা করেছেন যে, বিবাহের সময় আয়েশা রাযি.-এর বয়স (তিনি নিজে যেমন বলছেন তেমন) নয় বছর নয়; বরং (লাহোরি সাহেব যেমন বলছেন তেমন) ১২/১৩ বছর। এবং ঠিক একইভাবে তাঁর বিবাহ ও রোখসতের মাঝে তিন বছর নয়; বরং পাঁচ বছরের ব্যবধান, চার বছরের কম তো কোনোভাবেই নয়। সুতরাং বিবাহের সময় তাঁর বয়স ৫/৬ বছর আর রোখসতের সময় নয় বছর হওয়া অসম্ভব একটা বিষয়। তো এ পর্যায়ে আমি কয়েকটি বিষয় তুলে ধরব, যার আলোকে এই অসম্ভব বিষয়টা ইনশাআল্লাহ সম্ভব হয়ে যাবে।

(১) প্রথমত যে বিষয়টি আমাদের স্মরণ রাখতে হবে তা এই যে, ইসলামের শুরুর যুগে এবং হিজরত পরবর্তী নববী যুগে, এমনকি হযরত

আবু বকর রাযি.-এর যুগেও হিজরী সনের প্রচলন ছিল না। সবাই তখন 'হিজরতের এত মাস আগে বা পরে' বলে হিসাব করত। হিজরী সনের প্রচলন হয়েছে হযরত ওমর রাযি.-এর খেলাফত আমলে। পরবর্তীতে মানুষ ওই মাসগুলোকেই গুনে বছরে পরিণত করেছে।

(২) দ্বিতীয় বিষয় হচ্ছে, নবুওয়াত লাভের পর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে মক্কায় তেরো বছর ছিলেন সেটা কাঁটায়-কাঁটায় তেরো বছর ছিল না; বরং কয়েক মাস কম ছিল।

(৩) তৃতীয় বিষয় এই যে, নববী সনকে হিজরী সনের সঙ্গে মেলানোর একটা প্রবণতা মানুষের মধ্যে আছে; অর্থাৎ হিজরী সনের বৈশিষ্ট্যগুলোকে মানুষ নববী সনের ক্ষেত্রেও প্রযুক্ত করতে চায়। অথচ উভয়ের বৈশিষ্ট্য এক নয়। উভয়ের মাঝে বড় একটা পার্থক্য এই যে, হিজরী বর্ষ যেমন মহররম থেকে শুরু হয়, জিলহজে গিয়ে পূর্ণ হয়; নববী বর্ষের অবস্থা এমন নয়। বছরের মাঝখানে যে কোনো এক মাস থেকে গণনা ধরে জিলহজে গিয়ে বছর পূর্ণ করা হয়। আবার কখনো মহররম থেকে শুরু করে রবিউল আওয়ালে গিয়ে বছর পূর্ণ ধরা হয়।

(৪) চতুর্থত কুরআনের আয়াত এবং ইবনে ইসহাকের রেওয়ায়েত থেকে এটা সাব্যস্ত হয় যে, প্রথম ওহী রমযানে আসার কারণে নবুওয়াতের প্রথম বছর হিসাব করা হয় রমযান থেকে। আর বছর পূর্ণ হয়েছে জিলহজে। সুতরাং চার মাসকেই এখানে এক বছর ধরা হয়েছে। একইভাবে নবীজী হিজরত করেছিলেন রবিউল আওয়ালে। সুতরাং নবুওয়াতের চৌদ্দতম বছরকে হিসাবে আনতে হলে মাত্র দুই মাস তখন মহাররম-সফরকেই পূর্ণ এক বছর ধরে নিতে হবে; কিংবা এ দুই মাসকে হিসাব থেকে বাদ দিয়ে দিতে হবে। এ হিসাব অনুযায়ী নবীজী মক্কায় সর্বমোট বারো বছর ছয় মাস অবস্থান করেছেন। জনসাধারণ-মহলে যেটা তেরো বছর হিসাবে প্রসিদ্ধ। যেমনটি বর্ণিত আছে ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে *সহীহ বুখারী*তে।

(৫) পঞ্চম বিষয় হলো—হিজরত শুরু হয়েছিল রবিউল আওয়ালে। কিন্তু যখন খাতা-কলমে হিজরী বর্ষের গণনা শুরু হলো, তখন হিসাবের

সুবিধার জন্য দুই মাস এগিয়ে এনে নববী বর্ষের বারোতম বছরের মহররম থেকে প্রথম হিজরীর সূচনা ধরা হয়। এখান থেকে এতটুকু সুস্পষ্ট হলো যে, নববী কিংবা হিজরী বর্ষের গণনার ক্ষেত্রে অত্যন্ত সূক্ষ্মতা ও সতর্কতার পরিচয় না দিলে মহররম-সফর এই দুই মাসকে একাধিকবার গণনা করা অবধারিত হয়। দেখুন আমরা সবাই বলি, নবীজীর মক্কী-জীবন তেরো বছর। কেউ বলে না, নবুওয়াতের চৌদ্দতম বছর। কারণ চৌদ্দতম বছরের দুই মাসকে প্রথম হিজরী বর্ষের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়া হয়েছে।

(৬) উপরের আলোচনা থেকে এটা সাব্যস্ত হলো যে, নববী বর্ষগুলোর প্রথমটা ছিল চার মাসের, শেষের বছরটা ছিল মাত্র দুই মাসের। বাকি মাঝের বারো বছর পূর্ণ মাসেরই ছিল।

(৭) হযরত আয়েশা রাযি.-এর ঘটনাগুলোকে মৌলভি মুহাম্মদ আলী সাহেব হিজরী বা নববী বর্ষের সঙ্গে সঙ্গে মিলিয়ে সমন্বয়সাধনের ক্ষেত্রে বর্ষগুলোকে মূল ধরেছেন। আর আয়েশা রাযি.-এর বয়সকে বানিয়েছেন শাখা বা পার্শ্ব বিষয়। এটা সন্দেহাতীতভাবে মোটা দাগের একটা ভ্রান্তি। মূল তো হলো তাঁর বয়স। হিজরী বা নববী বর্ষ হলো পার্শ্ব বিষয়। ঐতিহাসিকরা তাঁর বয়সকে মূল ধরে বর্ষগুলোর মাঝে সমন্বয়ের চেষ্টা করেছেন। সে অনুযায়ী বিবাহের সময় তাঁর বয়স ছয় বছর, রোখসতের সময় নয় বছর, আর স্বামী বিয়োগের সময় আঠারো বছর ছিল। এখন যারা বর্ষকে মূল ধরে তাঁর বয়স-নির্ণয়ের চেষ্টা করেন, তাদের মধ্যে কেউ প্রতিটা বছরকে বারো মাস করে হিসাব করার কারণে বর্ষ-সংখ্যা পূর্ণ হয় না। আবার যারা নববী প্রথম বর্ষকে চার মাস, শেষ বর্ষকে দুই মাস এবং প্রথম হিজরীকে দশ মাস ধরেন তাদের হিসাবে বর্ষ-সংখ্যা বেড়ে যায়। একই কারণে দেখা যায় কোনো রাবী একটা ঘটনাকে প্রথম হিজরীর বলছেন, অন্য রাবী সেই ঘটনাকেই দ্বিতীয় হিজরীর বলছেন। সুতরাং বর্ষকে মূল ধরা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না, বরং বয়সকে মূল ধরে বর্ষের হিসাবে সংশোধনী আনাটাই হবে মূলনীতির অনুসরণ।

বিবাহের সময় হযরত আয়েশা রাযি.-এর প্রকৃত বয়স

মৌলভি সাহেব লিখেছেন 'সিংহভাগ বর্ণনা এ বিষয়ে একমত যে, বিবাহের সময় আয়েশা রাযি.-এর বয়স ছিল ছয় অথবা সাত'—তার বক্তব্যে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এভাবেই তিনি 'অথবা সাত' লিখে গেছেন। কাজটা তিনি ঠিক করেননি। কারণ সিংহভাগ বর্ণনার ঐকমত্য ছয় বছরের ওপর; ছয় বা সাতের ওপর নয়। একটিমাত্র রেওয়ায়েতে বিবাহের বয়স 'নয় অথবা সাত' লেখা আছে, যার রাবীর স্মৃতিশক্তি প্রশ্নবিদ্ধ ছিল। তাই মৌলভি সাহেবের লেখা উচিত ছিল, 'এক দুটো ছাড়া সব রেওয়ায়েত এ বিষয়ে একমত যে, বিবাহের সময় তার বয়স ছিল ছয় বছর। রোখসতের সময় নয় বছর, স্বামী-বিয়োগের সময় আঠারো বছর।

মাওলানা সাহেব ইবনে সাদের রেওয়ায়েত تَزَوَّجَ رَسُوْلُ اللهِ وَ هِيَ بِنْتُ تِسْعِ سِنِيْنَ (নবীজী তাকে বিবাহ করেছেন যখন তিনি নয় বছরের) রেওয়ায়েতটি নকল করেছেন, কিন্তু রেওয়ায়েতের শেষাংশ وَ مَاتَ عَنْهَا وَ هِيَ بِنْتُ ثَمَانِ عَشَرَةَ سَنَةً (নবীজী তাকে রেখে ইন্তেকাল করেছেন তার আঠারো বছর বয়সে) চেপে গেছেন। কারণ এ অংশ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, বিবাহ দ্বারা এখানে রোখসত উদ্দেশ্য।

একইভাবে হিশাম ইবনে উরওয়াহ থেকে বর্ণিত অসমাপ্ত হাদীস ৪২ নং পৃষ্ঠা থেকে উঠিয়ে দিয়েছেন। কারণ এখানে সাত বছরের কথা বলা হয়েছে। অথচ (৪১ নং) পৃষ্ঠায় একই হাদীস পূর্ণাঙ্গরূপে উল্লিখিত আছে; কিন্তু সেটা তিনি আনেননি। কারণ এর শেষাংশে বলা হয়েছে, রোখসত হয়েছে নয় বছর বয়সে।

মোটকথা, দুজন মাত্র রাবী পাওয়া গেল যারা ছয় বছরের ভিন্নমত দিয়েছেন। একজন বলেছেন নয় অথবা সাত। কিন্তু তিনি স্মৃতিশক্তির বিষয়ে প্রশ্নবিদ্ধ। অপরজন বলেছেন নয় বছর বয়সে বিবাহ হয়েছে—তো এখানে তিনি ভুলক্রমে রোখসতের জায়গায় বিবাহ বলেছেন। কারণ সঙ্গে তিনি এটাও বলেছেন যে, স্বামী-বিয়োগের সময় আঠারো বছর ছিল। এখন নয় বছর বয়সে যদি বিবাহ হয় এবং তিন বছর পর যদি রোখসত

হয় তা হলে তো বিয়োগের সময় তার বয়স আঠারো না হয়ে একুশ হওয়ার কথা ছিল।

অপরদিকে হিশাম ইবনে উরওয়াহ এক জায়গায় যদিও সন্দেহের সঙ্গে ৯/৭ বলেছেন, কিন্তু *বুখারী-মুসলিমে* বহু জায়গায় দৃঢ়তার সঙ্গে বলেছেন, ছয় বছর বয়সে বিবাহ হয়েছে, নয় বছর বয়সে রোখসত হয়েছে। তো কেন আমরা দৃঢ়তাসমৃদ্ধ বহু হাদীসের পরিবর্তে সন্দেহপূর্ণ একটি মাত্র হাদীসকে গ্রহণ করব?

এবার আসুন, আমরা নববী বর্ষ ও হিজরী বর্ষের সঙ্গে বিবাহ-বর্ষের সমন্বয় সাধন করি। মৌলভি সাহেব এটা তো স্বীকার করেছেন যে, বিবাহ নববী দশম বছরে হয়েছে এবং শাওয়াল মাসেই হয়েছে। এমনকি, বাসর হয়েছিল কয়েক বছর পর শাওয়ালে। আর সর্বসম্মতভাবে বিবাহ ও বাসরের মাঝে তিন বছরের ব্যবধান ছিল। এখন কথা হলো আল্লামা আইনী ও ইবনে আবদুল বার রহ.-এর মতো যারা দ্বিতীয় হিজরীতে বাসরের কথা বলেছেন, তারা বিবাহের সময় উল্লেখ করেছেন নবুওয়াতের এগারোতম বছর। পক্ষান্তরে যারা প্রথম হিজরীতে বাসরের কথা বলেছেন, তারা বিবাহের সময় বলেছেন নবুওয়াতের দশম বছর। দু-একজন ভুলক্রমে যদিও বিবাহ দশম বছর আর বাসর প্রথম হিজরীর কথা বলেছেন, কিন্তু তারা স্পষ্ট বলেছেন যে, উভয়ের মাঝে ব্যবধান তিন বছর। চার-পাঁচ বছরের ব্যবধান কেউ বলেননি। মৌলভি সাহেব বিবাহের বয়স বাড়ানোর জন্য তার সুবিধামতো বিবাহের সন এক পক্ষ থেকে গ্রহণ করেছেন, আর বাসরের তারিখ অপর পক্ষ থেকে গ্রহণ করেছেন; এটাই কি ইনসাফের দাবি? হযরত মাওলানার উচিত ছিল বিবাহ ও বাসর উভয় ক্ষেত্রে যে কোনো এক পক্ষের মত গ্রহণ করা। যা হোক, মাওলানা সাহেব যেহেতু আল্লামা আইনী এবং হাফেজ ইবনে আবদুল বার-এর হাওয়ালা দিয়েছেন, সুতরাং আমরা এখন এই মহান ব্যক্তিদ্বয়ের বক্তব্য পর্যায়ক্রমে তুলে ধরব।

আল্লামা আইনীর বক্তব্য

আল্লামা আইনী যেমন দ্বিতীয় হিজরীতে বাসরের কথা বলেছেন

তেমনই তিনি বিবাহের কথা বলেছেন, নববী এগারোতম বর্ষে। ব্যবধান মাঝখানে সেই তিন বছরই। কিন্তু আমাদের আলোচনার মূল বিষয় তথা বিবাহের সময় হযরত আয়েশা রাযি.-এর বয়স কত ছিল? এ বিষয়ে তিনি কেমন দ্ব্যর্থহীন সুস্পষ্ট ভাষায় মন্তব্য করেছেন—তার শব্দগুলো লক্ষ্য করলেই তা পরিষ্কার হয়ে যাবে–

تَزَوَّجَهَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَكَّةَ قَبْلَ الْهِجْرَةِ بِسَنَتَيْنِ. وَ قِيْلَ بِثَلَاثٍ وَ قِيْلَ بِسَنَةٍ وَ نِصْفٍ أَوْ نَحْوِهَا فِيْ شَوَّالٍ وَ هِيَ بِنْتُ سِتٍّ سِنِيْنَ وَ قِيْلَ سَبْعٍ وَ بَنَى بِهَا فِيْ شَوَّالٍ أَيْضاً بَعْدَ وَقْعَةِ بَدْرٍ فِي السَّنَةِ الثَّانِيَةِ مِنَ الْهِجْرَةِ، أَقَامَ فِيْ صُحْبَتِهِ ثَمَانِيَةَ أَعْوَامٍ وَ خَمْسَةَ أَشْهُرٍ وَ تُوُفِّيَ عَنْهَا وَ هِيَ بِنْتُ ثَمَانِيَ عَشَرَةَ وَ عَاشَتْ خَمْساً وَّ سِتِّيْنَ سَنَةً. (عمدة القارى ج/1 ص/٤٥

অর্থ : হিজরতের দুই বছর আগে মক্কায় নবীজী তাঁকে বিবাহ করেছেন, (ভিন্নমতে তিন বছর, দেড় বছর ইত্যাদি) শাওয়াল মাসে। তখন তাঁর বয়স ছিল ছয় বছর (ভিন্নমতে সাত বছর); বাসর করেছেন সেই শাওয়ালেই দ্বিতীয় হিজরীতে, বদর যুদ্ধের পর। এরপর দীর্ঘ আট বছর পাঁচ মাস নবীজীর সোহবতে অবস্থান করেছেন। নবীজীর ইন্তেকালের সময় তাঁর বয়স ছিল আঠারো বছর। তিনি ছাপ্পান্ন বছর বেঁচে ছিলেন। (*উমদাতুল কারী*, ১ম খণ্ড : ৪৫ পৃষ্ঠা)

মোটকথা, হিজরী ও নববী বর্ষের হিসাব নিয়ে মতভিন্নতা থাকলেও বিবাহ-বাসর ও স্বামী-বিয়োগের সময় অর্থাৎ বয়স নিয়ে কোনো মতবিরোধ নেই।

আল্লামা ইবনে আবদুল বার

হযরত মাওলানা সম্ভবত ইবনে আবদুল বার রহ.-এর *আল-ইসতিআব* গ্রন্থের ৭৬৫ পৃষ্ঠা থেকে তার সুবিধাজনক এই উদ্ধৃতিটি নকল করেছেন—'হিজরতের তিন বছর পূর্বে নবুওয়াতের দশম বছর বিবাহ হয়েছে এবং হিজরতের আঠারো মাস পর বাসর হয়েছে'; অথচ এটা ইবনে আবদুল বার-এর নিজস্ব তাহকীক নয়; বরং অন্যের বক্তব্য তিনি

তুলে ধরেছেন মাত্র। একই কিতাবের (হায়দারাবাদ থেকে ছাপা নুসখার) ১ম খণ্ডে ১৯ নং পৃষ্ঠায় তিনি নিজের মত এভাবে ব্যক্ত করেছেন—

تَزَوَّجَهَا بِمَكَّةَ قَبْلَ سَوْدَةَ وَ قِيْلَ بَعْدَ سَوْدَةَ أَجْمَعُوْا عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَبْنِ بِهَا إِلَّا بِالْمَدِيْنَةِ قِيْلَ سَنَةَ هَاجَرَ وَ قِيْلَ سَنَةَ اثْنَتَيْنِ مِنَ الْهِجْرَةِ فِيْ شَوَّالٍ وَ هِيَ ابْنَةُ تِسْعِ سِنِيْنَ وَ كَانَتْ فِيْ حِيْنِ عَقَدَ عَلَيْهَا بِنْتَ سِتٍّ سِنِيْنَ وَ قِيْلَ بِنْتِ سَبْعِ سِنِيْنَ.

অর্থ : নবীজী আয়েশা রাযি.-কে বিবাহ করেছেন সাওদা রাযি.-এর আগে কিংবা পরে। এ বিষয়ে সবাই একমত যে, বাসর হয়েছে মদীনায়। কেউ বলেন হিজরতের প্রথম বছর শাওয়ালে, কেউ বলেন ২য় হিজরীর শাওয়ালে। তখন তাঁর বয়স ছিল নয় বছর। বিবাহের আকদের সময় তাঁর বয়স ছিল ছয় বছর, (ভিন্নমতে) সাত বছর।

আশা করি, বিজ্ঞ পাঠক এটা অনুধাবন করতে সক্ষম হয়েছেন যে, বর্ষ আসল নয়; বয়সই আসল। তবে বিভিন্ন বর্ষের মাস-সংখ্যা কম-বেশি হওয়ায় বর্ষনির্ধারণে নানা মতের সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু বয়সের ব্যাপারে কারও ভিন্নমত নেই।

সাহিবে *মেশকাত*-এর বক্তব্য

অত্যন্ত পরিতাপের সঙ্গে বলতে হচ্ছে যে, মৌলভি সাহেব—হযরত আয়েশা রাযি. তাঁর বোন আসমা রাযি.-এর চেয়ে দশ বছরের ছোট ছিলেন—কথাটাকে সাহিবে *মেশকাত*-এর হাওয়ালা দিয়ে লিখেছেন। অথচ পুরো *মেশকাত শরীফের* কোথাও এ ধরনের বক্তব্য পাওয়া যাবে না। হাঁ, *মেশকাত*-এর শেষে পরিশিষ্ট হিসেবে যুক্ত *আল-ইকমাল*-এর মধ্যে قِيْلَ-এর মতো দুর্বল শব্দযোগে আনা হয়েছে। দেখুন, *মেশকাত* ও *ইকমাল*-এর মুসান্নিফ যদিও একজন; কিন্তু *মেশকাত*-এর গ্রহণযোগ্যতা আর *ইকমাল*-এর গ্রহণযোগ্যতায় আসমান-জমিনের তফাত। সুতরাং *ইকমাল*-এর বক্তব্যকে সাহিবে *ইকমাল*-এর বক্তব্য বলা উচিত, সাহিবে *মেশকাত*-এর বক্তব্য বলা উচিত নয়। আসলে মৌলভি সাহেব নিজের

মতের পক্ষে কোনো দলিল *মেশকাত*-এ না পেয়ে *ইকমাল*-এর আশ্রয় নিয়েছেন। যেই সাহিবে *মেশকাত*কে মাওলানা সাহেব বিশাল ব্যক্তিত্বের তকমা দিলেন এবং যার বক্তব্যকে গ্রহণযোগ্যতা ও নির্ভরযোগ্যতার প্রতীক বানালেন তাঁর বক্তব্য দেখুন—

خَطَبَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ تَزَوَّجَهَا بِمَكَّةَ فِيْ شَوَّالٍ سَنَةَ عَشْرٍ مِّنَ النُّبُوَّةِ قَبْلَ الْهِجْرَةِ بِثَلَاثِ سِنِيْنَ وَ قِيْلَ غَيْرُ ذَلِكَ وَ أَعْرَسَ بِهَا بِالْمَدِيْنَةِ فِيْ شَوَّالٍ سَنَةَ اثْنَتَيْنِ عَلَى رَأْسِ ثَمَانِيَ عَشَرَ شَهْرًا وَ لَهَا تِسْعُ سِنِيْنَ وَ قِيْلَ دَخَلَ بِهَا بِالْمَدِيْنَةِ بَعْدَ سَبْعَةِ أَشْهُرٍ مِّنْ مَّقْدَمِهِ وَ بَقِيَتْ مَعَهُ تِسْعَ سِنِيْنَ وَ مَاتَ عَنْهَا وَ لَهَا ثَمَانِيَ عَشَرَةَ سَنَةً.

অর্থ : রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বিবাহ করেন নবুওয়াতের দশম বর্ষে, শাওয়াল মাসে, হিজরতের তিন বছর পূর্বে; এ নিয়ে অবশ্য কম-বেশি মতও আছে। এরপর হিজরতের দ্বিতীয় বর্ষে মদীনায় শাওয়াল মাসে আঠারো মাসের মাথায় তাদের বাসর হয়। কেউ কেউ বলেছেন, এটা হিজরতের সাত মাস পরের কথা। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে তিনি নয় বছর ঘর করেছিলেন। আঠারো বছর বয়সে তিনি বিধবা হন।

শুধু *মেশকাত* নয়, কুরআন ছাড়া সমস্ত সহীহ হাদীস, জাওয়ামে, মাসানীদ, সুনান, মাআজীম, মাযহাব, ফিকহ, ইতিহাস, হাদীস ও সীরাতের সকল ইমাম ও কিতাবের বর্ণনা যে বিষয়ে একমত ও ঐক্যবদ্ধ—সেখানে কিছু ভ্রান্ত ও নীতিভ্রষ্ট বিবেচনার ওপর ভর করে নতুন মত প্রকাশ করা কতটা যুক্তিসঙ্গত ও গ্রহণযোগ্য হতে পারে?

সীরাতে আয়েশা রাযি.-এর উদ্ধৃতি

মৌলভি সাহেব আমার রচিত *সীরাতে আয়েশা রাযি.* গ্রন্থ থেকেও আমার বিপক্ষে দলিল দিয়েছেন। আমি স্বীকার করি যে, এক জায়গায় বিবাহের সন উল্লেখ করে ফেলেছি নববী দশম বর্ষ। ভুলবশত আমার

লেখায়ও প্যাঁচ লেগেছে। আসলে সেখানে আরও স্পষ্ট করার দরকার ছিল। কিন্তু চিন্তার বিষয় হলো, পুরো কিতাবে সব জায়গায় যা আছে, তা কিন্তু এই প্যাঁচ এমনিতেই খুলে দেয়; অথচ তিনি পুরো কিতাবে অনেকটা চিরুনি অভিযান চালিয়ে এই জায়গাটা বের করে আমাকে ঘায়েল করার চেষ্টা করেছেন। আমার প্রশ্ন হলো, মাওলানা সাহেবের এই সূক্ষ্মদর্শিতা যদি আমার বিচ্যুতি তালাশের পরিবর্তে সত্যের সন্ধানে নিয়োজিত হতো, তা হলে আমাকে এত দীর্ঘ আলোচনা করে লেখক-পাঠক উভয়ের 'সময় নষ্ট করা'র প্রয়োজন হতো না। আমার কিতাবের অন্যান্য জায়গাগুলো সম্পর্কে বলছি :

(১) জন্মতারিখ আলোচনা করতে গিয়ে, যারা হযরত আয়েশা রাযি.-এর জন্ম চতুর্থ বছর এবং বিবাহ দশম বছর বলেছে, তাদের বক্তব্য প্রত্যাখ্যান করে আমি সাব্যস্ত করেছি যে, জন্ম পঞ্চম বছরের শেষ দিকে হিজরতের প্রায় নয় বছর আগে শাওয়াল মাসে হয়েছে (মোতাবেক ৬১৪ খৃস্টাব্দের জুলাই মাসে)। এখন নবুওয়াতের পঞ্চম বর্ষে শাওয়ালে যদি জন্ম হয় এবং তাঁর ছয় বছরে বিবাহ হয়, তা হলে এটা তো স্পষ্ট হয়ে যায় যে, বিবাহের সন আমি নবুওয়াতের এগারোতম বছরই বিশ্বাস করি। তবে লিখতে গিয়ে ভুলে দশম বছর লিখে ফেলেছি।

(২) বিবাহের তারিখ-সংক্রান্ত আলোচনায় লিখেছি—এই হিসাব অনুযায়ী হিজরতের তিন বছর আগে শাওয়াল মাসে (মোতাবেক ৬২০ খৃস্টাব্দের মে মাসে) বিবাহ হয়েছে। হিসাব মেলালে এখানেও নবুওয়াতের সেই এগারোতম নববী বর্ষই হবে বিবাহের সন।

(৩) একই জায়গায় হিজরতের আলোচনা করতে গিয়ে আমি লিখেছি—হযরত আয়েশা রাযি. বিবাহের পরও প্রায় তিন বছর পিতৃগৃহে ছিলেন। দু'বছর তিন মাস মক্কায় এবং সাত কি আট মাস মদীনায়। আমার এ বক্তব্যও এ বিষয়ের সুস্পষ্ট প্রমাণ যে, আমি বিবাহের সন এগারোতম নববী বর্ষই মনে করি। কারণ বিবাহের পর মক্কায় মাত্র দুই বছর তিন মাস অবস্থানের কথা বলেছি।

(৪) বিষয়টিকে আরও খোলাসা করার জন্য সৌরবর্ষের হিসাব মেলানো যেতে পারে। জুলাই ৬১৪ খৃস্টাব্দে জন্ম, আর ৬২০ খৃস্টাব্দের

মে মাসে বিবাহ হয়েছে। যার অর্থ হলো বিবাহের সময় তাঁর বয়স মোট পাঁচ বছর এগারো মাস হয়েছিল।

(৫) একই জায়গায় আমি আল্লামা ইবনে আবদুল বার রহ.-এর সমর্থনের কথা উল্লেখ করেছি। তাঁর মত হলো হিজরতের দুই বছর আগে বিবাহ হয়েছে (আরও নির্দিষ্ট করে বললে দুই বছর চার মাস আগে)।

তো এ সকল বিষয় থেকে মাওলানা সাহেবের খুব ভালোভাবেই বোঝার কথা যে আমি দশম বর্ষ নয়, বরং একাদশ বর্ষকেই বিবাহের সন মনে করি।

হযরত আয়েশা রাযি.-এর বিবাহের বিষয়ে হিজরতের তিন বছর আগে হওয়ার যে কথা লোকমুখে প্রচলিত আছে, তাতে শব্দগত একটা ত্রুটি আছে। কারণ—হিসাব অনুযায়ী তিন বছর নয়; বরং দুই বছর চার মাস হয়।

বছর ও বর্ষের পার্থক্য

এটা একটা মৌলিক বিষয় যে, বছর ও বর্ষ সাধারণত এক নয়। সাধারণত বছর বারো মাস ছাড়া হতে পারে না। কিন্তু বর্ষ বারো মাস ছাড়াও হতে পারে। যেমন, যদি বলা হয়—হিজরতের তিন বছর আগে, তা হলে তিন গুণ বারো সমান ছত্রিশ মাস বোঝাবে। পক্ষান্তরে যদি বলা হয় তিন বর্ষ আগে, তা হলে ছত্রিশ মাস হওয়া জরুরি নয়; বরং প্রথম বর্ষের (এগারোতম বর্ষের) চার মাস, দ্বিতীয় (বারোতম) বর্ষ পূর্ণ, আর তৃতীয় (তেরোতম) বর্ষের দুই মাস হলেই তিন বর্ষ বলা যাবে। কারণ, বর্ষ এখানে (আংশিক হলেও) তিনটিই পাওয়া গেছে। কিন্তু বছরের হিসাবে মোট আঠারো মাস বা দেড় বছর পাওয়া গেছে। এই মূলনীতি মাথায় রেখে উরওয়াহ ইবনে যুবায়েরের *বুখারী শরীফে* বর্ণিত হাদীসটি দেখুন—

قَالَ تُوُفِّيَتْ خَدِيْجَةُ قَبْلَ مَخْرَجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمَدِيْنَةِ بِثَلَاثِ فَلَبِثَ سَنَتَيْنِ أَوْ قَرِيْباً مِّنْ ذَلِكَ وَ نَكَحَ عَائِشَةَ وَ هِيَ بِنْتُ سِتِّ سِنِيْنِ وَ بَنَى بِهَا وَ هِيَ بِنْتُ تِسْعِ سِنِيْنِ

অর্থ : উরওয়াহ বলেন, হিজরতের তিন বছর পূর্বে হযরত খাদীজা রাযি. ইন্তেকাল করেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুই বছর বা এর কাছাকাছি সময় অপেক্ষা করেন। তিনি হযরত আয়েশা রাযি.-কে ছয় বছর বয়সে বিবাহ করেন এবং নয় বছর বয়সে কাছে নেন। [১/৫৫১]

উপরোক্ত হাদীসে যে হিজরতের তিন বছর পূর্বের কথা বলা হয়েছে এবং খাদীজার ইন্তেকালের পর যে দুই বছর অপেক্ষার কথা বলা হয়েছে—এখানে যদি পুরো তিন বছর এবং পূর্ণ দুই বছর বা দেড় বছর ধরা হয়, তা হলে হযরত আয়েশা রাযি.-এর জন্মসন নবুওয়াতের পঞ্চম বছর না হয়ে ষষ্ঠ বছর হয় এবং সেই হিসাবে বিবাহের সময় তার বয়স ছয় বছরও ঠিক থাকে না; অথচ এই হাদীসেই বিবাহের বয়স ছয় বছর বলা হয়েছে। এর অর্থ হলো এখানে পুরো তিন বছর উদ্দেশ্য নয়।

এই আলোচনা থেকে আরও একটি মূলনীতি সাব্যস্ত হয়, তা এই যে, সীরাত ও জীবনচরিতের ক্ষেত্রে হিসাব-নির্ণয়ের জন্য মূল হলো বয়স। হিজরী বা নববী বর্ষ নয়।

এ কারণেই সমস্ত উলামায়ে কেরাম, মুহাদ্দিসীন, মুহাক্কিকিন, মুআররিখীন এ বিষয়ে একমত যে, বিবাহের সময় হযরত আয়েশা রাযি.-এর বয়স ছয় বছর, বাসরের সময় নয় বছর, স্বামী-বিয়োগের সময় আঠারো বছর এবং ইন্তেকালের সময় ছাপ্পান্ন বছর বয়স ছিল। অথচ তাদের মাঝে নববী-বর্ষ এবং হিজরী-বর্ষ নিয়ে যথেষ্ট বরং বলা যায় ঘোর মতবিরোধ রয়েছে।

হযরত আবু বকর রাযি.-এর হিজরত প্রসঙ্গ

মৌলভি সাহেব হযরত আবু বকর রাযি.-এর হিজরত-সংক্রান্ত হাদীস দ্বারা এটা প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে, হযরত আয়েশা রাযি.-এর জন্ম নবুওয়াতের প্রথম বছর কিংবা তারও আগে। কারণ তিনি দেখাতে চেষ্টা করেছেন যে, আবু বকর রাযি.-এর ওই হিজরত (হাবশার উদ্দেশে) প্রথম হিজরত ছিল। আর তখন আয়েশা রাযি. বুদ্ধিসম্পন্ন হয়েছিলেন। আর পাঁচ-ছয় বছরের কমে তো আর মানুষের হুঁশ-বুদ্ধি হয় না। সুতরাং নবুওয়াতের পঞ্চম বর্ষে প্রথম হিজরতের সময় আয়েশা রাযি. পাঁচ-ছয়

বছর বয়স হওয়ার জন্য তাঁর জন্ম নবুওয়াতের প্রথম বছর বা তারও আগে হতে হবে।

দ্বিতীয় বিষয় হচ্ছে, হাদীসের তরজমা— لَمْ أَعْقِلْ أَبَوَيَّ قَطُّ إِلَّا وَهُمَا يَدِيْنَانِ الدِّيْنَ—এই অংশের তরজমা মাওলানা সাহেব নিজের মতলব হাসিলের জন্য এভাবে করেছেন—যখন থেকে আমার বুদ্ধি হয়েছে তখন থেকেই আমি আমার মা-বাবাকে দীন-ইসলামের ওপর দেখছি। অথচ এ অংশের বিশুদ্ধ তরজমা হলো—আমি আমার মা-বাবাকে যখন থেকে চিনতে শুরু করেছি, তখন থেকেই তাদেরকে ইসলামের ওপর দেখেছি।' অর্থাৎ لَمْ أَعْقِلْ এর আসল তরজমা এড়িয়ে তিনি তার জন্য সুবিধাজনক তরজমা করেছেন। অথচ উভয়ের মধ্যে আসমান-জমিনের তফাত। কারণ চেনার জন্য পাঁচ-ছয় বছর বয়স জরুরি নয়; কিন্তু বুদ্ধিসম্পন্ন হওয়ার জন্য সেটা অপরিহার্য।

এখন আমরা হযরত আবু বকর রাযি.-এর হিজরতের হাদীস সম্পর্কে অতিগুরুত্বপূর্ণ তবে খুবই সূক্ষ্ম একটি পর্যালোচনা পেশ করব।

প্রথমেই আমরা যে বিষয়টি পাঠকের সামনে স্পষ্ট করা জরুরি মনে করছি তা এই যে, জনাব লাহোরি সাহেব হিজরতের এই হাদীসটিকে আমাদের বিপক্ষে দলিল হিসাবে উপস্থাপনের চেষ্টা করেছেন—হাদীসের তারতীব অর্থাৎ বর্ণনার ধারাবাহিকতাকে পুঁজি করে। কারণ মূল হাদীসটি কখনোই আমাদের বিপক্ষে যাবে না। হাদীসের বক্তব্যের পরিবর্তে হাদীসের তারতীব বা ধারাবাহিকতাকেই তিনি গ্রহণ করেছেন হাতিয়ার হিসাবে। তিনি বলতে চাচ্ছেন, হাদীসটি যে তারতীবে আছে অর্থাৎ :

لَمْ أَعْقِلْ أَبَوَيَّ قَطُّ إِلَّا وَهُمَا يَدِيْنَانِ الدِّيْنَ وَ لَمْ يَمُرَّ عَلَيْنَا يَوْمٌ إِلَّا يَأْتِيْنَا فِيْهِ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَرَفَيِ النَّهَارِ بُكْرَةً وَّ عَشِيَّةً فَلَمَّا ابْتُلِيَ الْمُسْلِمُوْنَ خَرَجَ أَبُوْ بَكْرٍ نَحْوَ أَرْضِ الْحَبَشَةِ .

এই তারতীব এটা প্রমাণ করে যে, যখন নবীজী আবু বকর রাযি.-এর বাড়িতে সকাল-সন্ধ্যা আসতেন এবং যখন আবু বকর রাযি. হাবশার

উদ্দেশে হিজরত করেন, তখন আয়েশা রাযি.-এর হুঁশ-বুদ্ধি হয়েছে। অর্থাৎ পঞ্চম নববী বর্ষে আবু বকর রাযি. হিজরতের সময় আয়েশা রাযি.-এর পাঁচ-ছয় বছর বয়স হয়েছিল। এ বিষয়ে আমাদের বক্তব্য হলো, এই হাদীসের রাবী হচ্ছেন, ইবনে শিহাব যুহরী, যার অভ্যাস হলো ভিন্ন-ভিন্ন সময়ের ভিন্ন-ভিন্ন ঘটনাকে একসঙ্গে একই সূত্রে ধারাবাহিকভাবে বলে যাওয়া। এর অসংখ্য নজির রয়েছে। যেমন, ওহী সূচনার হাদীস, ইফকের ঘটনার হাদীস। এই হাদীসটিও এর ব্যতিক্রম না। কারণ এখানেও তিনি ভিন্ন-ভিন্ন চারটি ঘটনার টুকরো অংশকে জোড়া দিয়ে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। প্রথম অংশ ছোট্ট বয়স থেকেই মা-বাবাকে ইসলামের অনুসারীরূপে দেখতে ও চিনতে থাকা, দ্বিতীয় অংশ সকাল-সন্ধ্যা নবীজীর আসা-যাওয়া, তৃতীয় অংশ হযরত আবু বকর রাযি.-এর হাবশার উদ্দেশে হিজরত করা, চতুর্থ অংশ মদীনার উদ্দেশে হিজরত। তো এ চারটি ঘটনা যে বিভিন্ন সময়ের তা প্রমাণ করার প্রয়োজন নেই। তবে মৌলভি সাহেব তার স্বভাব অনুযায়ী এখানে যেহেতু পূর্ণ হাদীস না এনে তার সুবিধার অংশটুকু এনেছেন তাই বাধ্য হয়ে পুরো হাদীসটিকে সহজ-সরল তরজমা আকারে এখানে তুলে ধরছি। এতে পাঠকের সামনে অনেক কিছু স্পষ্ট হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ :

'ইবনে শিহাব যুহরী থেকে বর্ণিত, উরওয়াহ ইবনে যুবায়ের বলেছেন, হযরত আয়েশা রাযি. তাকে বলেছেন, আমি যখন থেকে আমার মা-বাবাকে চিনতে শুরু করেছি তখন থেকেই তাঁদের ইসলামের ওপর দেখছি। আর এমন কোনো দিন যেত না, যেদিন সকাল-সন্ধ্যা নবীজী আমাদের এখানে আসতেন না। এরপর যখন মুসলমানদের ওপর বিপদাপদের তুফান শুরু হলো, তখন আবু বকর হাবশায় হিজরতের উদ্দেশে বের হলেন। যখন তিনি বারাকুল গিমাদ নামক স্থানে পৌঁছলেন, তখন কারা অঞ্চলের সরদার ইবনুদ্দাগিনার সঙ্গে আবু বকরের সাক্ষাৎ হলো। সে জিজ্ঞাসা করল, কোথায় চললেন আবু বকর? আবু বকর বললেন, আমার কওম আমাকে বের করে দিয়েছে। সে বলল, আপনি তো এমন ব্যক্তি, যাকে বের করে দেওয়া যায় না; কিংবা যিনি বের হয়ে যেতে পারেন না। আপনি গরিবকে সাহায্য করেন, আত্মীয়তার সম্পর্ক

রক্ষা করে চলেন, আত্মীয়দের হক আদায় করেন, মেহমানদারি করেন, করজ দান করেন, বিপদাপদে সবাইকে সাহায্য করেন; সুতরাং আপনার মতো মহান ব্যক্তিকে বের করে দেওয়া যায় না এবং আপনার মতো ব্যক্তি বের হয়ে যেতে পারেন না। তিনি ফিরে আসতে সম্মত হলেন। তখন ইবনুদ্দাগিনা তাঁকে সঙ্গে করে নিয়ে এলেন এবং সন্ধ্যায় কুরাইশ-সরদারদের দ্বারে দ্বারে ঘুরে ঘুরে বললেন, আবু বকর এমন ব্যক্তি যাঁকে বের করা যায় না। তার (উপরোল্লিখিত) এ সকল গুণ রয়েছে। তখন কুরাইশ-সরদাররা ইবনুদ্দাগিনার আশ্রয়দানকে প্রত্যাখ্যান করতে না পেরে এই আরজি পেশ করল, আবু বকর যেন নিজের ঘরের মধ্যে তাঁর রবের বন্দেগী করে। ঘরের অভ্যন্তরে নামায-তেলাওয়াত যা ইচ্ছা করে; কোনো কিছুই যেন প্রকাশ্যে না করে। কারণ আমাদের স্ত্রী-সন্তানদের ব্যাপারে ধর্মচ্যুতির আশঙ্কা করি। ইবনুদ্দাগিনা আবু বকরকে শর্তটি শোনানোর পর তিনি সম্মত হলেন এবং শর্তমতো নামায-তেলাওয়াত সবকিছু ঘরের মধ্যে গোপনে করতেন। কিছুকাল পর হযরত আবু বকরের মনের অবস্থা পরিবর্তন হয়ে গেল। তিনি বাড়ির আঙিনায় একটি নামাযের জায়গা ঠিক করলেন এবং সেখানেই নামায-তেলাওয়াত আরম্ভ করলেন। তখন মুশরিকদের স্ত্রী-সন্তানরা তাঁর প্রতি ঝুঁকে পড়তে লাগল। তারা অবাক হয়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকত। আর আবু বকর যখন তেলাওয়াত করতেন তখন তাঁর চোখ থেকে অঝোরে অশ্রু ঝরত। তিনি কান্না সংবরণ করতে পারতেন না। এ অবস্থা দেখে কুরাইশ-সরদাররা ঘাবড়ে গিয়ে ইবনুদ্দাগিনাকে ডেকে পাঠাল এবং তাকে বলল, আমরা আপনার আশ্রয়দানকে সম্মান করে তাঁর নিজের ঘরে গোপনে বন্দেগী করার শর্তে আশ্রয় দিয়েছিলাম। কিন্তু সে তাঁর সীমা লঙ্ঘন করে বাড়ির আঙিনায় মসজিদ বানিয়েছে। সেখানে প্রকাশ্যে ইবাদত-বন্দেগী করছে। ফলে আমরা স্ত্রী-সন্তানদের ব্যাপারে শঙ্কিত। এখন আপনি তাঁকে বারণ করুন। অন্যথায় আশ্রয়দান প্রত্যাহার করুন এবং তাঁকে তাঁর নিজের জিম্মায় ছেড়ে দিন। কারণ আমরা যেমন আপনার নিরাপত্তাকে বিঘ্নিত করতে চাই না, ঠিক তেমনি আবু বকরকেও স্বাধীনতা দিতে পারি না। আয়েশা রাযি. বলেন, এরপর ইবনুদ্দাগিনা আবু বকরের কাছে এসে বললেন, আপনি

জানেন, আমি কী শর্তে আপনাকে নিরাপত্তা দিয়েছিলাম। এখন হয় আপনি শর্ত মেনে চলুন, না হয় আমার দেওয়া নিরাপত্তা ফিরিয়ে দিন। তখন আবু বকর বললেন, আপনার নিরাপত্তা ফিরিয়ে দিলাম। আমার আল্লাহর নিরাপত্তাই আমার জন্য যথেষ্ট। এ সময় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কায়ই ছিলেন। একদিন নবীজী বললেন, তোমাদের হিজরতের স্থান আমাকে স্বপ্নে দেখানো হয়েছে, বিশিষ্ট দুই পাহাড়ের মাঝখানের ভূমি; (অর্থাৎ) মদীনা। এরপর যেসব সাহাবী হাবশায় হিজরত করেছিলেন, তারা মদীনায় ফিরে এলেন। তখন হযরত আবু বকরও মদীনার উদ্দেশে হিজরতের প্রস্তুতি নিলেন। কিন্তু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, একটু অপেক্ষা করো। আশা করছি আমাকেও অনুমতি দেওয়া হবে। তখন আবু বকর রাযি. নবীজীর সোহবত অর্থাৎ হিজরতের সফরসঙ্গী হওয়ার সৌভাগ্য-লাভের উদ্দেশ্যে বিরত হলেন এবং দুটো উটনী খরিদ করে চার মাস পর্যন্ত গাছের পাতা পেড়ে খাওয়াতে থাকলেন।

ইবনে শিহাব বলেন, উরওয়াহ বলেছেন যে, হযরত আয়েশা রাযি. তাকে বলেছেন, আমরা একদিন ঠিক দুপুরে আবু বকরের ঘরে বসা ছিলাম। এমন সময় কেউ একজন বলে উঠল ওই যে আল্লাহর রাসূল চাদরে মুখ ঢেকে আসছেন। সাধারণত এমন সময় হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনোই আসতেন না। আবু বকর বললেন, আপনার প্রতি আমার মা-বাবা কোরবান হোক। আল্লাহর কসম, নিঃসন্দেহে কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ই এমন সময় আপনাকে এখানে এনেছে। নবীজী বললেন, তোমার কাছে যারা আছে, সবাইকে সরিয়ে দাও। তিনি বললেন, আমার মা-বাবা কোরবান হোক, এখানে আপনার স্ত্রী ছাড়া আর কেউ নেই। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিজরতের ইজাজতের কথা শোনালেন। হযরত আসমা ও আয়েশা রাযি. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পাথেয় প্রস্তুত করে দিলেন।...'

আশা করি, বিজ্ঞ পাঠক বুঝতে পেরেছেন, মাওলানা লাহোরি সাহেব হাদীসের যে অংশটুকু উল্লেখ করেছেন, তা বিভিন্ন সময়ে সংঘটিত খণ্ড ঘটনা। যেমন মা-বাবাকে ইসলামের অনুসারীরূপে চিনতে পারা পৃথক

একটি ঘটনা। সকাল-সন্ধ্যা নবীজীর আসা-যাওয়ার সম্পর্কে মদীনায় হিজরতের সঙ্গে—যা ভিন্ন সময়ে সংঘটিত। মাঝে হাবশায় হিজরতের আলোচনা, এটাও ভিন্ন সময়ের ঘটনা। অবশেষে মদীনায় হিজরতের বিবরণ। তো হাবশায় হিজরতের ঘটনা দুইবার ঘটেছিল, যদি এটা প্রথম হিজরতের ঘটনা হয়ে থাকে, তা হলে সেটা হবে নববী পঞ্চম বর্ষের ঘটনা। পারিপার্শ্বিক আলোচনা থেকে বোঝা যায়, এটা দ্বিতীয় বারের অর্থাৎ নবম বর্ষের ঘটনা, পক্ষান্তরে মদীনায় হিজরত নবুওয়াতের চৌদ্দতম বছরের ঘটনা। তো বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পরিবেশে সংঘটিত ঘটনাকে অভিন্ন ও ধারাবাহিক ঘটনার রূপ দিয়ে হযরত আয়েশা রাযি.-এর জন্মসন ও বিবাহের বয়স নির্ণয় করা কতটা যুক্তিসঙ্গত ও ন্যায়ানুগ? তদুপরি এটা যদি মেনে নেওয়াও হয় যে, যুহরী বর্ণিত হাদীসের সবগুলো ঘটনা পরস্পর-সংযুক্ত ধারাবাহিক ঘটনা, তা হলে এটা বলতেই হবে যে, এগুলো নবুওয়াতের নবম বর্ষের ঘটনা। এখন দুই মতের কোনো একটা গ্রহণ করতে হবে। হয় বলতে হবে এগুলো বিচ্ছিন্ন সময়ে সংঘটিত বিভিন্ন ঘটনা, না হয় বলতে হবে অভিন্ন সময়ে বা কাছাকাছি সময়ে সংঘটিত ধারাবাহিক ঘটনা। কিন্তু মৌলভি সাহেব কোনোভাবেই নিজের মত সাব্যস্ত করতে না পেরে তৃতীয় পন্থা আবিষ্কার করেছেন।

তিনি হাদীসের প্রথম ও তৃতীয় অংশকে নববী পঞ্চম বর্ষের ঘটনা আখ্যায়িত করেছেন। আর দ্বিতীয় ও চতুর্থ অংশকে নবুওয়াতের চতুর্দশ বর্ষের ঘটনা সাব্যস্ত করেছেন এবং দুই ঘটনার মাঝখানে আট-নয় বছরের ব্যবধান মেনে নিয়েছেন। যা হাদীসের শব্দ ও মর্ম কোনোটা থেকেই প্রতীয়মান হয় না। এখন দেখার বিষয় হলো, এই ঘটনাগুলোর ভিন্নতা ও অভিন্নতা সম্পর্কে (অর্থাৎ এগুলো পরস্পর-সংযুক্ত ও ধারাবাহিক ঘটনা, নাকি বিচ্ছিন্ন সময়ে ঘটা বিক্ষিপ্ত ঘটনা, এ সম্পর্কে) সীরাতের গবেষক ও ঐতিহাসিকরা কী মত পোষণ করেন?

সীরাতের অনেক বড় আলেম, *সীরাতে হালবি*র রচয়িতা আল্লামা বুরহানুদ্দীন হালবির মত হলো এগুলো পরস্পর-সংযুক্ত ধারাবাহিক ঘটনা যা নবুওয়াতের ত্রয়োদশ বর্ষে সংঘটিত হয়েছিল। তার বক্তব্য—

وَ فِي السَّنَةِ الثَّالِثَةَ عَشَرَ مِنَ النُّبُوَّةِ كَانَتْ بَيْعَةُ الْعَقَبَةِ الثَّانِيَةِ. وَ فِيْ هَذِهِ السَّنَةِ أَرَادَ أَبُوْ بَكْرٍ أَنْ يُهَاجِرَ لِلْحَبَشَةِ فَلَمَّا بَلَغَ بَرْكَ الْغِمَادِ ... (ج/٣ص/٤٠٦)

অর্থ : নবুওয়াতের ত্রয়োদশ বর্ষে দ্বিতীয় আকাবার বাইআত সংঘটিত হয়েছে। আর এ বছরই আবু বকর হাবশায় হিজরতের উদ্দেশে বের হন। যখন তিনি বারকুল গিমাদে পৌঁছলেন... (৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা : ৪০৬; মিশরি নুসখা)

তারীখে খামিছ ফি আহওয়ালি আনফাসি নাফীস গ্রন্থের প্রণেতা বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ আল্লামা হুসাইন ইবনে আহমাদ নববী ত্রয়োদশ বর্ষের ইতিহাস লিখতে গিয়ে বলেন—

وَ فِيْ هَذِهِ السَّنَةِ هَاجَرَ أَبُوْبَكْرٍ إِلَى الْحَبَشَةِ رُوِيَ لَمَّا ابْتُلِيَ الْمُسْلِمُوْنَ (ج/١ ص/٣١٩)

অর্থ : এবং এ বছরই হযরত আবু বকর হাবশায় হিজরত করেন। বর্ণিত আছে যখন মুসলমানরা মুশরিকদের নির্যাতন-নিপীড়নের শিকার হলেন... (১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা : ৩১৯)

সারকথা, যুহরী বর্ণিত হাদীসের সব ঘটনা যদি নববী ত্রয়োদশ বর্ষে বা কাছাকাছি সময়ে ঘটে, তা হলে হিসাব অনুযায়ী তখন হযরত আয়েশা রাযি.-এর বয়স ৮/৯ বছর হবে। আর এ বয়সে বুদ্ধিসম্পন্ন হওয়া খুবই স্বাভাবিক। আশা করি, এই দীর্ঘ আলোচনার পর পাঠক এ বিষয়ে স্বচ্ছ ধারণা লাভ করতে সক্ষম হয়েছেন যে, ইমাম যুহরী বর্ণিত হিজরতের হাদীস দ্বারা কোনোভাবেই এটা প্রমাণ করা সম্ভব নয় যে, হযরত আয়েশা রাযি.-এর জন্ম নবুওয়াতের প্রথম বছর বা তারও আগে এবং নবুওয়াতের পঞ্চম বর্ষে তাঁর বয়স ৬/৭ বছর হয়েছিল। আর বিবাহ ও বাসরের সময় তাঁর বয়স যথাক্রমে বারো ও ষোলো বছর ছিল; বরং সঠিক তথ্য সেটাই যা হযরত আয়েশা রাযি. নিজেই বর্ণনা করেছেন একাধিক সহীহ সনদে বর্ণিত হাদীসে যে, তাঁর বিবাহ হয়েছে ছয় বছর বয়সে, বাসর হয়েছে নয় বছর বয়সে এবং স্বামী-বিয়োগ হয়েছে আঠারো বছর বয়সে।

সূরায়ে নাজম ও সূরায়ে কমার প্রসঙ্গ

হযরত আয়েশা (রাযি.) বলেছেন—

لَقَدْ أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ إِنِّيْ لَجَارِيَةٌ أَلْعَبُ "بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ".

অর্থ : নিঃসন্দেহে যখন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর এই আয়াত অবতীর্ণ হয়—...بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ, তখন আমি ছিলাম এক বালিকা, খেলাধুলা করতাম। (*সহীহ বুখারী* : তাফসীর—সূরা কমার)

মৌলভি সাহেব বলেছেন, এই আয়াত সূরা কমারের। আর সূরা কমার মাক্কী জামানার শুরুর দিকে নাজিল হয়েছে। কারণ এই সূরায় চন্দ্র দ্বিখণ্ডিতকরণের আলোচনা রয়েছে। আর শাক্কুল কমার বা চন্দ্র দ্বিখণ্ডিতকরণের মুজিযা ইসলামের শুরুর যুগের ঘটনা। কারণ সপ্তম বর্ষে তো আল্লাহর নবী অবরোধের শিকার হয়েছিলেন। সুতরাং এটা অবরোধের আগে পঞ্চম বর্ষের ঘটনাই হবে। তা ছাড়া, সূরা নাজমের সঙ্গে সূরা কমারের অনেক মুনাসাবাত (মিল বা সাদৃশ্য) রয়েছে। তাই সূরা কমারও পঞ্চম বর্ষেই অবতীর্ণ হয়েছে। আর ওই সময় হযরত আয়েশা রাযি. ছোট বালিকা ছিলেন, খেলাধুলা করতেন, আবার বিভিন্ন আয়াত শুনে মুখস্থও রাখতেন। এই বিষয়গুলো এটাই প্রমাণ করে যে, নবুওয়াতের দশম বছর বিবাহের সময় হযরত আয়েশা রাযি.-এর বয়স ৬/৭ বছর নয়, বরং আরও বেশি (১০/১২) বছর ছিল।

কিন্তু জনাব লাহোরি সাহেব 'যদি, যেহেতু এবং তবে, সেহেতু'-র যে বিশাল সিরিয়াল লাগিয়েছেন এর পুরোটাই ভিত্তিহীন, মনগড়া। তার বক্তব্য অনেকটা মানতেকের সুগরা-কুবরার তারতীবের মতো। এই দৃষ্টিকোণ থেকে তার বক্তব্য আরেকবার লক্ষ করুন—এই আয়াত সূরা কমারের, আর সূরা কমার সূরা নাজমের সদৃশ, আর সূরা নাজম পঞ্চম বর্ষে অবতীর্ণ, আর পঞ্চম বর্ষে হযরত আয়েশা রাযি.-এর আয়াত মুখস্থ

রাখতে পারা তার ৫/৬ বছর বয়স হওয়ার প্রমাণ বহন করে। আর নববী পঞ্চম বর্ষে ৫/৬ বছর বয়স হওয়া দশম বছর বিবাহের সময় ১১/১২ বছর বয়স হওয়া প্রমাণ করে।

এখন আমাদের দেখতে হবে, যেসব 'হওয়া' বিষয় অন্যগুলোর 'হওয়া' প্রমাণ করছে সেগুলো আদৌ হয়েছিল কি না। এগুলোর কোনো একটা যদি না হয়ে থাকে তা হলে বাকিগুলোও হয়নি।

প্রথম কথা হলো, হাদীসে হযরত আয়েশা রাযি.-এর (সূরা কমারের) শুধু একটি আয়াত নাজিল হওয়া এবং তা ইয়াদ রাখার প্রসঙ্গ এসেছে, পূর্ণ সূরার আলোচনা এখানে আসেনি। আর কুরআন নাজিলের ক্ষেত্রে সাধারণত দেখা যায়, কখনো শুধু একটি আয়াত, কখনো কয়েকটি আয়াত, আবার কদাচিত পূর্ণ সূরা অবতীর্ণ; কখনো এমনও হয় একটি সূরা কয়েক বছর ধরে অল্প অল্প করে নাজিল হতে থাকে। তো এই হাদীস তখনই মৌলভি সাহেবের স্বপক্ষে দলিল হবে যখন পূর্ণ সূরা একসঙ্গে অবতীর্ণ হওয়া প্রমাণিত হবে। অথচ বাহ্যিকভাবে এটাই মনে হচ্ছে যে, পূর্ণ সূরা একসঙ্গে নাজিল হয়নি। কারণ, পূর্ণ সূরা নাজিল হলে হযরত আয়েশা রাযি. বলতেন, যখন সূরা কমার নাজিল হয় তখন আমি... অথচ তিনি বলছেন, যখন এই আয়াত নাজিল হলো...

উল্লেখ্য : হযরত আয়েশা রাযি. যে স্বভাবজাত প্রখর মেধার অধিকারী ছিলেন তাঁর জন্য একটি আয়াত ছোট্ট বয়সে ইয়াদ রাখা অসম্ভব নয়।

দ্বিতীয় কথা হলো, কোনো সূরার কিছু আয়াত এক সময় অবতীর্ণ হওয়া কিংবা কোনো সূরা অন্য সূরার সঙ্গে মুনাসাবাত থাকা এটা প্রমাণ করে না যে, ওই সূরার সব আয়াত বা উভয় সূরা একই সময় বা কাছাকাছি সময় অবতীর্ণ হয়েছে। যেমন সূরা মায়েদার اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ এই আয়াত দশম হিজরীর বিদায় হজের সময় অবতীর্ণ হয়েছে। অথচ মায়েদার সিংহভাগ আয়াত তার পাঁচ বছর আগে পঞ্চম হিজরীতে অবতীর্ণ হয়েছে, যেমন তায়াম্মুমের আয়াত। এরপর জীবজন্তুর হালাল-হারামসংক্রান্ত আয়াত দুই বছর পর খায়বার যুদ্ধের পর নাজিল হয়েছে। একইভাবে সূরা বাকারার শেষ দিকের আয়াতগুলো মক্কায় থাকা অবস্থায়

মেরাজের সময় নাজিল হয়েছে। আর অবশিষ্ট পুরা সূরা মদীনায় নাজিল হয়েছে। আবার সূরা আলাকের শুরুর কয়েকটি আয়াত প্রথম ওহীরূপে নাজিল হয়েছিল। কিন্তু সূরার শেষ দিকে নামায থেকে বিরত থাকার আয়াতগুলো বহু পরে নাজিল হয়েছে। একইভাবে লক্ষ্য করুন, সূরা নিসা ও সূরা তালাক খুবই সাদৃশ্যপূর্ণ। অথচ উভয়ের অবতরণের মধ্যে বহু বছরের ব্যবধান রয়েছে। আবার সূরা আনফাল ও সূরা তাওবার মাঝের সম্পর্ক এতটাই সুদৃঢ় যে হযরত উসমান রাযি. উভয় সূরার মাঝে بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ পর্যন্ত উঠিয়ে দিয়েছেন। অথচ সূরা আনফালে আলোচনা করা হয়েছে দ্বিতীয় হিজরীতে সংঘটিত বদর যুদ্ধের ঘটনা। আর সূরা তাওবায় আলোচনা করা হয়েছে মক্কা-বিজয়ের পরবর্তী নবম হিজরীর ঘটনা।

যাই হোক, সূরা নাজম নববী পঞ্চম বর্ষে অবতীর্ণ হয়েছে এই কথাটাও সঠিক নয়। কারণ এই সূরায় মেরাজের বিভিন্ন ঘটনা ও দৃশ্যের বিবরণ রয়েছে। আর মেরাজ হয়েছে নববী একাদশ বর্ষে। তো একাদশ বর্ষের ঘটনা পঞ্চম বর্ষে অবতীর্ণ সূরায় কীভাবে প্রবেশ করতে পারে?

তৃতীয় কথা হলো, মৌলভি সাহেব বলেছেন, এটা সূরা কমারের আয়াত, আর সূরা কমারে শাক্কুল কমারের ঘটনা বর্ণিত আছে। আর এটা সুস্পষ্ট যে, শাক্কুল কমার ইসলামের শুরুর যুগের ঘটনা। কারণ পরবর্তীতে সপ্তম বর্ষে নবীজী অবরোধের শিকার হয়েছিলেন।

এখানেও একই কথা। সূরা কমারের একটি আয়াত নির্দিষ্ট কোনো সময়ে নাজিল হওয়া পুরো সূরা ওই সময় অবতীর্ণ হওয়ার দলিল হতে পারে না। তা ছাড়া, শাক্কুল কমারের মুজিযাকে শুধু এই কারণে ইসলামের শুরুর যুগের ঘটনা বানানোও ঠিক নয় যে, আল্লাহর নবী সপ্তম বর্ষে অবরোধের শিকার হয়েছিলেন। কারণ অবরোধের পর নুবওয়াতের নবম বর্ষ থেকে একাদশ বর্ষ পর্যন্ত এই মুজিযা দেখানোর পথে কোনো বাধা ছিল না, সুতরাং ৫ম/৬ষ্ঠ বর্ষে না দেখিয়ে থাকলে আর দেখাতে পারবেন না এর তো কোনো প্রমাণ নেই। তা ছাড়া, অবরোধের সময় বের হতে কোনো বাধা ছিল না; নিষেধাজ্ঞা ছিল বেচাকেনা, লেনদেন ও সম্পর্ক স্থাপন বা উন্নয়নের ক্ষেত্রে। সুতরাং অবরোধের অবস্থায় যে কোনো সময় বের হয়ে মুজিযা দেখানোটা অসম্ভব কিছু নয়। তা ছাড়া, শাক্কুল কমারের

মুজিযার তারিখ সম্পর্কে বহু মুহাদ্দিস ও অসংখ্য ঐতিহাসিক মত দিয়েছেন যে, সেটা নবুওয়াতের দশম বছরের ঘটনা। তবে সমস্যায় পড়েছে আমাদের স্বনামধন্য লাহোরি সাহেব। কারণ ইতিহাসবিদরা বলেছেন, 'এটা হিজরতপূর্ব পঞ্চম বর্ষের ঘটনা', কিন্তু মাওলানা সাহেব সেটা বুঝে উঠতে পারেননি। তিনি হিজরতপূর্ব পঞ্চম বর্ষ আর নবুওয়াতের পঞ্চম বর্ষের মধ্যে তালগোল পাকিয়ে ফেলেছেন। অথচ উভয়ের মাঝে প্রায় ছয় বছরের বিশাল ফারাক। কারণ হিজরতপূর্ব পঞ্চম বর্ষ মানেই হলো নবুওয়াতের দশম বছর।

তো এই হিসাব অনুযায়ী হিজরতের দশম বছর হযরত আয়েশা রাযি.-এর বয়স পূর্ণ পাঁচ বছর অথবা পাঁচ বছর পূর্ণ হয়ে ছয় বছরে পড়েছিল। আর এই বয়সে এক দুই আয়াত মুখস্থ রাখা, বিশেষত স্বভাবজাত প্রখর মেধা ও আল্লাহপ্রদত্ত বিরল প্রতিভার অধিকারী হযরত আয়েশা রাযি.-এর পক্ষে এটা খুবই সাধারণ একটি ঘটনা।

খোলাসা কথা : এই হাদীস দ্বারা সূরা কমার নববী পঞ্চম বা ষষ্ঠ বর্ষে অবতীর্ণ হওয়া প্রমাণ করা কখনোই সম্ভব নয়। সুতরাং মৌলভি সাহেব 'যদি-যেহেতু ও তবে-সেহেতু'-র যে দীর্ঘ জাল বুনেছিলেন কোনোটাই আর ধোপে টিকছে না। সুতরাং এ পন্থায় হযরত আয়েশা রাযি.-এর বয়স বেশি প্রমাণিত করার সর্বশেষ চেষ্টাও ব্যর্থতায় পর্যবসিত হলো।

আরবসমাজে বাল্যবিবাহের প্রথা

মৌলভি সাহেবের সর্বশেষ দলিল এই যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে হযরত আয়েশা রাযি.-এর বিবাহের আলোচনার আগে জুবায়ের ইবনে মুতইম রাযি.-এর ঘরে তাঁর বিবাহের কথা হয়েছিল। আরবসমাজে ৪/৫ বছর বয়সের বাচ্চা মেয়েদের বিবাহের প্রচলন ছিল না। সুতরাং নবীর সঙ্গে বিবাহের আগেই অন্য জায়গায় বিবাহের আলোচনা হওয়া এটাই প্রমাণ করে যে, বিবাহের আগে তাঁর বয়স এই পরিমাণ হয়েছিল, যেই বয়সে বিবাহের আলাপ-আলোচনা শুরু হয়ে যায়।

এ বিষয়ে আমাদের বক্তব্য হলো, আরবসমাজে শুধু বাল্যবিবাহ নয়,

বরং দুগ্ধপোষ্য এমনকি গর্ভজাত সন্তানের বিবাহেরও প্রচলন ছিল। যার সুস্পষ্ট প্রমাণ হচ্ছে *আবু দাউদ শরীফের* কিতাবুন নিকাহ, বাবু তাযবিজি মান লাম ইউলাদ, তথা জন্মপূর্ব ভ্রূণের বিবাহ-প্রসঙ্গ। এখন মৌলভি সাহেব আরবসমাজ বলতে কী বুঝিয়েছেন, ইসলামপূর্ব জাহেলি যুগ, না ইসলামের যুগ তা এখানে স্পষ্ট করেননি। যদি জাহেলি যুগ বুঝিয়ে থাকেন, তা হলে সেটা হবে ভিত্তিহীন দাবি। কারণ জাহেলি যুগের কোনো ইতিহাসই বিশুদ্ধ সূত্রে সংরক্ষিত নেই; সুতরাং কীসের ভিত্তিতে তিনি এই দাবি করবেন। আর যদি ইসলামের যুগ বুঝিয়ে থাকেন, তা হলে দেখুন তার এ দাবিও কতটা বাস্তবানুগ—

(১) হযরত কুদামা ইবনে মাযউন রাযি. যুবায়ের রাযি.-এর নবজাতক কন্যার সঙ্গে তার জন্মের দিনই বিবাহ পড়ান। (মোল্লা আলী কারী প্রণীত *মিরকাত*, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা : ৪১৭)

(২) স্বয়ং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত উম্মে সালামার অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তান সালামাকে সাইয়্যেদুশ শুহাদা হযরত হামযা রাযি.-এর কন্যার সঙ্গে বিবাহ পড়িয়ে দেন।

(৩) এমনকি, খোদ মাওলানা সাহেব নিজেও এতটুকু স্বীকার করেছেন যে, বিবাহের সময় হযরত আয়েশা রাযি.-এর বয়স এগারো বছর ছিল। আর এই বয়সকে তো প্রাপ্তবয়স্কতার বয়স বলা যায় না।

(৪) *বাইহাকী শরীফের* ব্যাখ্যাগ্রন্থ *আলাল বাইহাকীর* প্রথম খণ্ডের ৭৬-৭৯ পৃষ্ঠায় দীর্ঘ আলোচনার পর মুসান্নিফ লিখেছেন–

وَ تَزْوِيْجُ غَيْرِ وَاحِدٍ مِّنَ الصَّحَابَةِ ابْنَتَهُ الصَّغِيْرَةَ

অর্থ : একাধিক সাহাবা কর্তৃক নিজ নিজ শিশুকন্যাকে বিবাহ দেওয়ার ঘটনা প্রমাণিত আছে।

সর্বসম্মতিক্রমে, কোনোরকম মতভেদ-মতপার্থক্য ছাড়া, সাহাবা, তাবেঈ, আইম্মায়ে মুজতাহিদিন, মুহাদ্দিসীন সকলের নিকট পিতা এই অধিকার রাখেন যে, তিনি চাইলে তার নাবালেগ শিশুকে বিবাহ দিতে পারেন। এরকম একটি সর্বসম্মত মাসআলায় হঠাৎ করে কেন দ্বিমত পোষণ করতে হবে, জানি না।

আলোচনার সারকথা

আমার আলোচনা ও দাবির মূলকথা এই যে, সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য ও নির্ভরযোগ্য বর্ণনাসমূহের আলোকে হযরত আয়েশা রাযি.-এর বিবাহ হয় ছয় বছর বয়সে। এই বর্ণনাগুলোর সঙ্গে একটু ভিন্নতাসহ যে দু-একটি ব্যতিক্রমী বর্ণনা এসেছে, তাও যৌক্তিকভাবেই সমন্বয়যোগ্য। আর তিনি যে নয় বছর বয়সে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র সান্নিধ্যে এসেছেন, তা নিয়ে একটিও ভিন্নমত বা ভিন্নবর্ণনা নেই। হযরত আয়েশা রাযি.-এর বয়স-সংশ্লিষ্ট সবগুলো বর্ণনাকে একত্রিত ও সমন্বিত করলে যা পাই, তাতে তাঁর জন্ম হয়েছে নবুওয়াতের পঞ্চম বর্ষের শেষের দিকে। নবুওয়াতের একাদশ বর্ষে শাওয়াল মাসে বিবাহ হয় এবং হিজরতের প্রথম বর্ষে শাওয়াল মাসে রোখসত হয়।

মাওলানা মুহাম্মাদ আলী সাহেব '*পয়গামে সুলহ* : জুলাই, ১৯২৮' সংখ্যায় লিখেছিলেন—নির্ভরযোগ্য বর্ণনাসমূহের আলোকে জানা যায়, হযরত আয়েশা রাযি. বড় বোন হযরত আসমা রাযি.-এর চেয়ে দশ বছরের ছোট ছিলেন। এই বিবেচনায়, হিজরতের এক বছর পূর্বে যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বিবাহ করেন, তখন তাঁর বয়স হয়েছিল ষোলো বছর।

আমি *মাআরিফে* মাওলানা মুহাম্মাদ আলী সাহেবের বক্তব্যের সমালোচনা করেছিলাম। বেশ কিছু আপত্তি উত্থাপনের পর জানতে চেয়েছিলাম, আপনার নির্ভরযোগ্য বর্ণনাগুলোর মধ্য থেকে একটি বর্ণনাও কি প্রমাণ করে যে :

১. তিনি হযরত আসমা রাযি.-এর চেয়ে দশ বছরের ছোট ছিলেন?

২. হিজরতের এক বছর পূর্বে তাঁর বিবাহ হয়েছিল?

৩. এবং হিজরতের এক বছর পূর্বে তাঁর বয়স ষোলো বছর ছিল (এবং রোখসতের সময় আঠারো বছর ছিল)?

প্রায় চার মাস পর 'বন্ধুমহলের খুবই জোরাজুরিতে' ২৭ নভেম্বর *পয়গামে সুলহে* মাওলানা মুহাম্মাদ আলী সাহেব প্রতিউত্তরে একটি প্রবন্ধ লেখেন। তাতে পূর্বোক্ত দাবিগুলো প্রত্যাহার করত স্পষ্টত উল্লেখ করেন যে :

- এমন কোনো হাদীস তিনি পাননি, যাতে প্রমাণিত হয় যে, হযরত আয়েশা রাযি. হযরত আসমা রাযি.-এর চেয়ে দশ বছরের ছোট ছিলেন।
- বিবাহের সময় যে তাঁর বয়স ষোলো বছর ছিল, তা সঠিক নয়।
- তিনি এও স্বীকার করেছেন যে, বিবাহ যে হিজরতের এক বছর পূর্বে হয়েছিল, এমন কথাটা ভুলবশত লেখা হয়ে গেছে।

এভাবে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বিষয়গুলো উল্লেখ করার পর তিনি পুনরায় নতুন সুরে নতুন কিছু দাবি তুলেছেন। সেগুলো এই :

১. হযরত আয়েশা রাযি. নিজের বয়স বলতে ভুল করেছেন।

২. বিবাহের সময় (নবুওয়াতের দশম বর্ষে) তাঁর বয়স এগারো বছরের কম ছিল না।

৩. রোখসতের সময় তাঁর বয়স ষোলো বছরের কম ছিল না।

ইনসাফের সঙ্গে একটু ভাবুন—একজন হযরত আয়েশা রাযি. ভুল করলেন, তাই হাদীসবিশারদগণ, ইতিহাসবেত্তাগণ সকলে ভুল করলেন! একসঙ্গে ভুল করলেন! একইভাবে ভুল করলেন! আবার যেই মানুষটির স্মৃতিশক্তির প্রখরতা এত বেশি যে, মেধা-প্রতিভায় এবং স্মৃতিশক্তির প্রখরতায় নারী-পুরুষ নির্বিশেষে বিশিষ্টতা লাভ করলেন, হাদীসের জগতে সর্বাধিক হাদীস বর্ণনাকারীর সম্মানে ভূষিত হলেন, সেই মানুষটিই স্বয়ং নিজের বয়সের ব্যাপারে এত বেশি ভুল করবেন যে, নিজের এগারো বছর বয়সের বিবাহকে ছয় বছরের; ষোলো বছরের রোখসতকে নয় বছরের; এমন কি, পঁচিশ বছরের বৈধব্যকে আঠারো বছরের বলে দেবেন? বড়ই অদ্ভুত!

রোখসতের সময় হযরত আয়েশা রাযি. দোলনায় দোল খাচ্ছিলেন। সখীদের সঙ্গে খেলা থেকে উঠিয়ে নিয়ে যাওয়া হলো তাঁকে। মা হাত-মুখ ধুয়ে দিলেন, মাথার চুল আঁচড়ে দিলেন। ছোট ছোট বাচ্চারা সঙ্গে ছিল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘরে এসেও একদম পুতুলখেলা। সবই এসেছে বিশদাকারে বিশুদ্ধ গ্রন্থসমূহে, বিশুদ্ধ সূত্র ধরে। এগুলো কি নয় বছরের কোমলমতি শিশুর আচরণ, না ষোলো বছরের ভরাযৌবনা নারীর আচরণ? স্বয়ং বিচার করুন। (*মুসনাদে তয়ালিসি*, ২০৫ পৃষ্ঠা; এবং *দারিমি* ২৯৬ পৃষ্ঠা)

ইফকের ঘটনা পঞ্চম হিজরী সনের। সে সময় তিনি, সকল মুহাদ্দিস ও মুআররীখের দৃষ্টিতে ছিলেন বারো কি তেরো বছরের মেয়ে। কিন্তু মাওলানা মুহাম্মাদ আলী সাহেবের দৃষ্টিতে তাঁর বয়স তখন উনিশ বছর হওয়ার কথা। অথচ, সহীহ বুখারীতে দেখা যায়, ইফকের ঘটনা প্রসঙ্গে একটি বর্ণনায় তাঁর আজাদকৃত দাসী হযরত বারীরাহ রাযি. এবং আরেকটি বর্ণনায় তিনি নিজে নিজের ব্যাপারে বলছেন—'জারিয়াতুন হাদীসাতুস সিন' : 'উঠতি বয়সী বালিকা'। যারা আরবী জানেন, তাদের প্রত্যেকের কাছে প্রশ্ন—'জারিয়াতুন হাদীসাতুস সিন' কথাটি কার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য? বারো-তেরো বছরের বালিকা, নাকি উনিশ বছরের যুবতী? তা ছাড়া, হযরত আয়েশা রাযি. বলেন—

وَ أَنَا جَارِيَةٌ حَدِيْثَةُ السِّنِّ ، لَا أَقْرَأُ كَثِيْرًا مِّنَ الْقُرْآنِ

অর্থ : তখন আমার বয়স ছিল অল্প; কুরআন তেমন পড়িনি।

[*সহীহ বুখারী*, ২/৯৪২/২৫১৮, باب تعديل النساء بعضهن بعضا]

এখন চিন্তা করুন, কুরআন তেমন না পড়ার অজুহাতটা সিদ্দীক ও নবীপরিবারে—বিশেষত হযরত আয়েশা রাযি.-এর মতো ব্যক্তিত্বের শানে—কোন বয়সের মেয়ের মুখে মানায়? বারো-তেরো বছরের ছোট্ট মেয়ের মুখে, না উনিশ বছরের ভরাট যুবতীর মুখে?

সবশেষে—*সহীহ বুখারী* (৫৫১ পৃষ্ঠা), *সহীহ মুসলিম* (কিতাবুন নিকাহ) ও *সুনানে দারিমী* (২৯৩ পৃষ্ঠা)-এর বর্ণনার আলোকে—হযরত আয়েশা রাযি.-এর জবানিতে তাঁর রোখসতের পুরো চিত্রটি শুনিয়ে আলোচনার ইতি টানতে চাইছি, হযরত আয়েশা রাযি. বলেন—

'রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লাম আমাকে যখন বিবাহ করেছেন তখন আমার বয়স ছিল ছয় বছর। এরপর আমরা মদীনায় আসি। বনু হারেসের মহল্লায় অবতরণ করি। কিছুকালের মধ্যেই আমি অসুস্থ হই। রোগে আমার মাথার চুল পড়ে গিয়েছিল। একটু-আধটু চুল গজাতেই একদিন মা এলেন। আমি তখন দোলনায় খেলছিলাম। আমার সঙ্গে আমার খেলার সখীরা ছিল। মা চেঁচিয়ে আমাকে ডাক দিলেন। আমি ছুটে এলাম। আমি বুঝতেই পারিনি, তিনি কী চাইছিলেন। তিনি আমার হাত

ধরলেন এবং দরজায় সোজা দাঁড় করালেন। আমার খুব জোরে জোরে নিঃশ্বাস পড়ছিল (সম্ভবত খেলতে খেলতে দৌড়ে আসার কারণে)। একটু জিরিয়ে নিতেই মা সামান্য পানি নিয়ে আমার মাথা-মুখ ধুয়ে দিলেন। এরপর ঘরের ভেতর নিয়ে গেলেন। দেখলাম, ভেতরে কয়েকজন আনসারি মহিলা বসা। তারা আমাকে দেখেই মোবারকবাদ জানালেন। মা আমাকে তাদের হাতে তুলে দিলেন। তারা আমাকে ঠিকঠাক করে নিচ্ছিলেন। এরপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আসতে দেখে আমি চমকে গেলাম। তারা আমাকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে সোপর্দ করলেন। তখন আমার বয়স ছিল নয় বছর।' ভাবুন তো, এই যে চিত্রটি ফুটে উঠেছে, এতে সিদ্দীক-পরিবারের কনের যে আচরণ ও অবস্থা দেখা যাচ্ছে, তা কি কোনো ষোলো বছরের মেয়ের হতে পারে, না নয় বছরের মেয়ের হতে পারে? আবার যে নারী নিজের রোখসত সম্পর্কে এত কিছু মনে রেখেছেন, তিনি নিজের বয়সটাই এভাবে ভুলে গেলেন? কোনোরকম দ্বিধা ছাড়া, সংশয় ছাড়া যার তার কাছে—সারা জীবন—রোখসতের সময় নিজের বয়সটা কত ছিল, সেটা বলতেই ভুল করলেন? খুবই আশ্চর্যের!

শুধু কি তাই? রোখসতের সময় তাঁর বয়স যে নয় বছর ছিল, সে ব্যাপারে তিনি এতটাই নিশ্চিত যে, আরব মেয়েদের প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার সীমানাও নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন—নয় বছর। তিনি বলেন,

إِذَا بَلَغَتِ الْجَارِيَةُ تِسْعَ سِنِيْنَ فَهِيَ امْرَأَةٌ

অর্থ : মেয়ে যখন নয় বছরে উপনীত হয়, তখন সে মহিলা হয়ে যায়। [*তিরমিযী* : كتاب النكاح]

এত কিছুর পরও কি এ কথা বলা উচিত হবে যে, বিবাহের সময় হযরত আয়েশা রাযি.-এর বয়স ছিল বারো-তেরো বছর অথবা ষোলো-সতেরো বছর? [*মাআরিফ*, জানুয়ারি, ১৯২৯]

وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ

সমাপ্ত

باسمه تعالى

عَيْنُ الْإِصَابَةِ
فِيمَا اسْتَدْرَكَتْهُ عَائِشَةُ عَلَى الصَّحَابَةِ

আইনুল ইসাবাহ

হযরত আয়েশা রাযি. কর্তৃক সাহাবীদের
ইসতিদরাক (সংশোধনী) সংবলিত

للإمام الهمام جلال الدين السيوطي
আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতি রহ. সংকলিত

بتصحيحات عديدة و تعليقات مفيدة للسيد سليمان الندوي
সাইয়্যেদ সুলাইমান নদভী রহ. সম্পাদিত

مع

ترجمة النصوص إلى البنغالية لمحمد شفيق الإسلام
মুহাম্মাদ শফিকুল ইসলাম অনূদিত

—৩০

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله و سلام على عباده الذين اصطفى

বক্ষ্যমাণ পুস্তিকাটি হাদীসভাণ্ডারের একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ। এতে ইমাম বদরুদ্দীন যারকাশী রহ.-সংকলিত الْإِجَابَةُ لِإِيْرَادِ مَا اسْتَدْرَكَتْهُ عَائِشَةُ عَلَى الصَّحَابَةِ কিতাবটি সংক্ষেপে আনা হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে যেটুকু সহজ ও সম্ভব হয়েছে সংযোজনও করা হয়েছে। নামকরণ করা হয়েছে—

عَيْنُ الْإِصَابَةِ فِيما اسْتَدْرَكَتْهُ عَائِشَةَ عَلَى الصَّحَابَةِ.

শায়খ বদরুদ্দীন রহ.-এর আগে বিখ্যাত মুহাদ্দিস ও ফকীহ—উস্তায আবু মানসূর হাসান ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আলী ইবনে তাহের আল বাগদাদী রহ. এ বিষয়ে রচনা (তালীফ) করেছিলেন। তিনি তাঁর শায়খদের থেকে বিভিন্ন সনদে পঁচিশটি হাদীস এনেছিলেন।

আবু আবদুল্লাহ ইবনে মুকবিল রহ.—সালাহ ইবনে উমর রহ. থেকে, তিনি আবুল হাসান ইবনুল বুখারী রহ. থেকে, তিনি খুশুঈ রহ. থেকে, তিনি আবু আবদুল্লাহ ইবনুল হুসাইন ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে খসরু রহ. থেকে বর্ণনা করেন—

بَابُ فَضْلِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا

হযরত আয়েশা রাযি.-এর মর্যাদা

১. أَخْبَرَنَا الْمُصَنِّفُ سَمَاعاً :

أَخْرَجَ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ[১]—

১. سكت عنه الذهبي في التلخيص، وأخرجه الطبراني بسند صحيح كما في شرح الزرقاني على المواهب ص ٢٧٧/٣

عَنْ عُرْوَةَ قَالَ: مَا رَأَيْتُ أَعْلَمَ بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ وَالْعِلْمِ وَالشِّعْرِ وَالطِّبِّ مِنْ عَائِشَةَ.

অর্থ : উরওয়াহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি হালাল ও হারামের ইলম এবং কবিতা ও চিকিৎসাবিদ্যায় হযরত আয়েশা রাযি.-এর চেয়ে অধিক বিজ্ঞ কাউকে দেখিনি। (*মুসতাদরাকে হাকেম*, বর্ণনা নং ৬৭৩৩)

২. وَ أَخْرَجَ الْحَاكِمُ وَ صَحَّحَهُ—

عَنْ عُرْوَةَ قَالَ: قلتُ لِعَائِشَةَ: قَدْ أَخَذْتِ السُّنَنَ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَالشِّعْرَ وَالْعَرَبِيَّةَ عَنِ الْعَرَبِ، فَعَمَّن أَخَذْتِ الطِّبَّ؟ فَقَالَتْ: عَنْ رَّسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ، كَانَ رَجُلًا سَقَاماً، وَ كَانَ أَطِبَّاءُ الْعَرَبِ يَأْتُوْنَهُ، فَأَتَعَلَّمُ مِنْهُمْ.

অর্থ : উরওয়াহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি হযরত আয়েশা রাযি.-কে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি সুনানের ইলম অর্জন করেছেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে; কবিতা ও আরবী ভাষাজ্ঞান লাভ করেছেন আরবদের থেকে; কিন্তু চিকিৎসাবিদ্যা রপ্ত করলেন কার কাছ থেকে? তখন হযরত আয়েশা রাযি. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে বললেন, তিনি (শেষ বয়সে) রোগ-পীড়াগ্রস্ত ছিলেন, আরবের বিজ্ঞ হেকিম ও চিকিৎসকগণ তাঁর চিকিৎসা করতে আসতেন; তাদের থেকেই শিখতাম। (*মুসতাদরাকে হাকেম*, বর্ণনা : ৭৪২৬)

৩. وَ أَخْرَجَ الْحَاكِمُ—

عَنْ مَسْرُوْقٍ قَالَ: وَاللهِ لَقَدْ رَأَيْتُ الصَّحَابَةَ يَسْأَلُوْنَ عَائِشَةَ عَنِ الْفَرَائِضِ.

অর্থ : মাসরুক থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর কসম, আমি সাহাবায়ে কেরামকে দেখেছি তাঁরা হযরত আয়েশা রাযি.-কে ফারায়েয সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতেন। (*মুসতাদরাকে হাকেম*, বর্ণনা নং ৬৭৩৬; *সুনানে দারিমী*, বর্ণনা নং ২৯০১; *মুসান্নাফে ইবনে আবি শায়বা*, বর্ণনা নং ৩১০৩৭)

৪. وَ أَخْرَجَ الْحَاكِمُ—

عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: كَانَتْ عَائِشَةُ أَفْقَهَ النَّاسِ وَأَعْلَمَ النَّاسِ، وَ أَحْسَنَ النَّاسِ رَأْيًا فِيْ الْعامَّةِ.

অর্থ : আতা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত আয়েশা রাযি. ছিলেন সবচেয়ে বড় ফকীহ, সবচেয়ে বিজ্ঞ আলেম; সাধারণ মানুষের মধ্যে তাঁর মতটিই গৃহীত হতো সুন্দরতম মত হিসেবে। (*মুসতাদরাকে হাকেম*, বর্ণনা : ৬৭৪৮)

৫. وَ أَخْرَجَ الْحَاكِمُ—

عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: لَوْ جُمِعَ عِلْمُ النَّاسِ كُلِّهِمْ ثُمَّ عِلْمُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ، لَكَانَتْ عَائِشَةُ أَوْسَعَهُمْ عِلْماً.

অর্থ : ইমাম যুহরী রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যদি সকল মানুষের জ্ঞানকে (দীনী ইলম) একত্রিত করা হয়, এরপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র স্ত্রীগণের জ্ঞানকেও একত্রিত করা হয়; তবু দেখা যাবে, হযরত আয়েশা রাযি.-এর জ্ঞান সকলের চেয়ে অধিক প্রশস্ত। (*মুসতাদরাকে হাকেম*, বর্ণনা : ৬৭৩৪)

৬. وَ أَخْرَجَ الْحَاكِمُ—

عَنْ مُوْسَى بْنِ طَلْحَةَ قَالَ مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَفْصَحَ مِنْ عَائِشَةَ.

অর্থ : মুসা ইবনে তালহা বলেন, আমি হযরত আয়েশা রাযি.-এর চেয়ে বিশুদ্ধভাষী আর কাউকে দেখিনি। (*জামে তিরমিযী*, বর্ণনা নং ৩৮৮৪; *মুসতাদরাকে হাকেম*, বর্ণনা নং ৬৭৩৫; *মুজামে কাবীর*, *তবারানী*, বর্ণনা নং ২৯৩)

৭. وَ أَخْرَجَ الْحَاكِمُ—

عَنِ الْأَحْنَفِ قَالَ: سَمِعْتُ خُطْبَةَ أَبِيْ بَكْرٍ، وَ عُمَرَ، وَ عُثْمَانَ، وَ عَلِيٍّ، وَ الْخُلَفَاءِ هَلُمَّ جَرًّا، فَمَا سَمِعْتُ الْكَلَامَ مِنْ فَمِ مَخْلُوْقٍ أَفْخَمَ، وَ لَا أَحْسَنَ مِنْ فِيْ عَائِشَةَ.

অর্থ : আহনাফ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি হযরত আবু বকর রাযি., হযরত উমর রাযি., হযরত উসমান রাযি., হযরত আলী রাযি. এবং পরবর্তী খলীফাগণের ভাষণ শুনেছি; কিন্তু হযরত আয়েশা রাযি.-এর মুখে যে মহৎ ও সুন্দর ভাষণ শুনেছি, তা আর কোনো সৃষ্ট-জীবের মুখে শুনিনি। (*মুসতাদরাকে হাকেম*, বর্ণনা : ৬৭২৩)

৮. وَ أَخْرَجَ الْحَاكِمُ عَنْ عَائِشَةَ وَ صَحَّحَهُ—

قَالَتْ: خِلَالٌ لِيْ تِسْعٌ، لَمْ تَكُنْ لِأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ قَبْلِيْ، إِلَّا مَا أَتَى اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ مَرْيَمَ بِنْتَ عِمْرَانَ، وَ اللهِ مَا أَقُوْلُ هَذَا أَنِّيْ أَفْخَرُ عَلَى أَحَدٍ مِّنْ صَوَاحِبِيْ، قِيْلَ: وَمَا هُنَّ؟ قَالَتْ: جَاءَ الْمَلَكُ بِصُوْرَتِيْ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ، فَتَزَوَّجَنِيْ وَأَنَا ابْنَةُ سَبْعِ سِنِيْنَ، وَأُهْدِيْتُ إِلَيْهِ وَأَنَا ابْنَةُ تِسْعٍ، وَتَزَوَّجَنِيْ بِكْرًا، وَكَانَ يَأْتِيْهِ الْوَحْيُ وَأَنَا وَهُوَ فِيْ لِحَافٍ وَاحِدٍ، وَكُنْتُ مِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيْهِ، وَ نَزَلَ فِيَّ آيَاتٌ مِّنَ الْقُرْآنِ، كَادَتِ الْأُمة تَهْلِكُ فِيْهَا، وَرَأَيْتُ جِبْرِيْلَ وَلَمْ يَرَهُ أَحَدٌ مِّنْ نِسَائِهِ غَيْرِيْ، وَقُبِضَ فِيْ بَيْتِي، لَمْ يَلِهِ أَحَدٌ غَيْرُ الْمَلَكِ إِلَّا أَنَا.

অর্থ : হযরত আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার এমন কিছু বৈশিষ্ট্য আছে যা আমার পূর্বে আর কোনো নারী লাভ করেনি। তবে আল্লাহ মারইয়াম বিনতে ইমরানকে যে মর্যাদা দান করেছেন তাঁর কথা আলাদা। আল্লাহর কসম, আমি এগুলো আমার ভগ্নিগণের ওপর গর্ব করার জন্য বলছি না। (তিনি এ কথা বলার পর) তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো, (উম্মুল মুমিনীন,) আপনার সে বিশেষ বৈশিষ্ট্যগুলো কী? তিনি বললেন, (আমাকে বিবাহের পূর্বে) ফেরেশতা আমার প্রতিকৃতি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখিয়েছেন। আমার সাত বছর বয়সে তিনি আমাকে বিবাহ করেছেন। আমার বয়স যখন নয় বছর, তখন আমাকে তাঁর কাছে পাঠানো হয়েছে। কুমারী মেয়ে হিসেবে একমাত্র আমাকেই তিনি বিবাহ করেছেন। তাঁর কাছে ওহী আসত আমি এবং

তিনি একই বিছানায় থাকতে। আমি তাঁর সবচেয়ে প্রিয় ছিলাম। আমার ব্যাপারে কুরআনে আয়াত নাজিল হয়েছে; অথচ (আমাকে অপবাদ আরোপের বিষয়ে) উম্মত তখন ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে গিয়েছিল। পবিত্র স্ত্রীগণের মধ্যে একমাত্র আমিই জিবরীল আলাইহিস সালামকে দেখেছি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওফাত লাভ করেছেন আমার ঘরেই; ফেরেশতা ছাড়া একমাত্র আমার দু'চোখই তখন তাঁকে দেখার সৌভাগ্য লাভ করেছে। (*মুজামে কাবীর, তবারানী*, বর্ণনা নং ৭৭; *মাজামাউয যাওয়ায়েদ*, বর্ণনা নং ১৫৩০৮)

بَابُ الطَّهَارَةِ

অধ্যায় : পবিত্রতা

১. رَوَى يَعْقُوْبُ بْنُ سُفْيَانَ الفَسَوِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُصْطَفَى، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ الْقطانِ الأَنْصَارِيّ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ—

قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ، فَقُلْتُ: يَا أُمَّاه! إِنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُوْلُ: الْمَاءُ بِالْماء. فَقَالَتْ: أَخْطَأَ جَابِرٌ، إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ قَالَ: إِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ؛ أ يُوْجِبُ الرَّجْمَ وَ لَا يُوْجِبُ الْغُسْلَ؟

অর্থ : আবু সালামা ইবনে আবদুর রাহমান থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি হযরত আয়েশা রাযি.-এর খেদমতে হাজির হলাম এবং বললাম, আম্মাজান, হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ রাযি. বলেন, পানির বদলে পানি (অর্থাৎ বির্য স্খলন হলেই শুধু গোসল ওয়াজিব হবে)। তখন হযরত আয়েশা রাযি. বললেন, জাবের [রাযি.] ভুল বলেছেন। নিঃসন্দেহে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যদি একটি অঙ্গ অপর অঙ্গকে

অতিক্রম করে তা হলেও গোসল ওয়াজিব হবে। কেন নয়? এতে রজম ওয়াজিব হয়; অথচ গোসল ওয়াজিব হবে না?

২. أَخْرَجَ أَبُوْ مَنْصُوْرٍ الْبَغْدَادِيُّ فِيْ كِتَابِهِ بِسَنَدٍ صَحِيْحٍ فِيْهِ مَنْ يجهل، عَنْ عَبْدِةَ بْنِ أَبِي لُبَابَةَ، عَنْ مُحَمَّد الْخُزَاعِيِّ —

أَنَّ أُبَيّ بْن كَعْب أَتَى عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ لَهَا: إِنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِيْ طَالِبٍ يَقُوْلُ: مَا أُبَالِيْ عَلَى ظَهْرِ حِمَارٍ مَسَحْتُ أَمْ عَلَى التَّسَاخِيْنِ. قَالَتْ عَائِشَةُ: ارْجِعْ إِلَيْهِ فَقُلْ لَهُ: إِنَّ عَائِشَةَ تَنْشُدُكَ هَلْ عَلِمْتَ مَا عَمَلُ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ تَنْزِيْل سُوْرَة الْمَائِدَة؟ فأتاه، فسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: إِنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْنِيْ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا نَزَلَتْ سُوْرَةُ الْمَائِدَةِ لَمْ يَزِدْ عَلَى الْمَسْح عَلَى التَّسَاخِيْن، فَلَمَّا أَخْبَرَه ذَلِكَ انْتَهَى إِلَى قَوْل عَائِشَة، وَعَمِلَ بِهِ.[১]

التساخين: الخفاف— قال ثعلب لا واحد لها.

---

১. التساخين الخفاف لا واحد لها مثل المناشيب، قال ثعلب ليس للتساخين واحد من لفظها كالنساء لا واحد لها، و قيل الواحد تسخان و تسخن و في الحديث أنه صلى الله عليه و سلم بعث سرية فأمرهم أن يمسحوا على المشاوذ و التساخين، المشاوذ : العمائم و التساخين : الخفاف، قال ابن الأثير و حمزة الأصبهاني في كتاب الموازنة التسخان تعريب تشكن و اسم غطاء من أغطية الرأس، كأن العلماء و الموابذة يأخذونه على رؤوسهم خاصة دون غيرهم، قال و جاء ذكر التساخين في الحديث فقال من تعاطى تفسيره هو الخف، حين لم يعرف فارسية و التاء فيه زائدة (لسان العرب : الجزء ١٧، والصفحة ٦٩، فصل السين حرف النون "سخن" انتهى.**

** فِيْ إِسْنَادِهِ مَنْ يُجْهَلُ. ... قَالَ ثَعْلَبُ: لَا وَاحِدَ لَهَا. وَهَذَا الْحَدِيْثُ لَا يَصِحُّ فَإِنَّ مُسْلِمًا رَوَى فِيْ صَحِيْحِهِ عَنْ شُرَيْحِ بْن هَانِئٍ قَالَ: أَتَيْتُ عَائِشَةَ أَسْأَلُهَا عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ فَقَالَتْ: عَلَيْكَ بِابْنِ أَبِيْ طَالِبٍ فَسَلْهُ فَإِنَّهُ كَانَ يُسَافِرُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلْنَاهُ فَقَالَ: جَعَلَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ لِلْمُسَافِرِ وَيَوْمًا وَلَيْلَة لِلْمُقِيْمِ.

ورَوَاهُ النَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيْثِ عَائِشَةَ عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ فَقَالَتْ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا أَنْ يَمْسَحَ الْمُقِيْمُ يَوْمًا وَلَيْلَةً وَالْمُسَافِرُ ثَلَاثًا. (من "الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة" للزركشي ١/٨٥)

অর্থ : উবাই ইবনে কাব হযরত আয়েশা রাযি.-এর কাছে গিয়ে বললেন, হযরত আলী রাযি. বলেন, আমি কোনো পরোয়া করি না; গাধার পিঠে মাসেহ করলাম নাকি মোজার ওপর (অর্থাৎ গাধার পিঠে মাসেহ করা আর মোজার ওপর মাসেহ করা সমান। কারণ তাতে কোনো ফায়দা নেই)? তখন হযরত আয়েশা রাযি. বললেন, তুমি আলী রাযি.-এর কাছে গিয়ে বলো, আয়েশা আপনার কাছে জানতে চেয়েছেন, সূরা মায়েদা নাজিল হওয়ার পর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আমল কী ছিল? আপনি কি তা জানেন? তখন উবাই ইবনে কাব হযরত আলী রাযি.-এর কাছে এলেন এবং বললেন, হযরত আয়েশা রাযি. আমাকে জানিয়েছেন, যখন সূরা মায়েদা নাজিল হলো তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুধুমাত্র মোজার ওপর ভাগে মাসেহ করেছেন; এর বাইরে করেননি। বিষয়টি জানতে পেরে হযরত আলী রাযি. নিজের মতটি প্রত্যাহার করে নিলেন এবং হযরত আয়েশা রাযি.-এর বক্তব্য অনুযায়ী শুধু মোজার ওপর ভাগে মাসেহের আমল গ্রহণ করলেন।

৩. وَأَخْرَجَ الدَارَقُطْنِيْ[১] فِيْ سُنَنِهِ، مِنْ طَرِيْقِ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيْهِ—

عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا بَلَغَهَا قَوْلُ ابْنِ عُمَرَ "فِيْ الْقُبْلَةِ الْوُضُوْء"، فَقَالَتْ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ، ثُمَّ لَا يَتَوَضَّأُ.

অর্থ : উবাই থেকে বর্ণিত, হযরত আয়েশা রাযি.-এর কাছে হযরত ইবনে উমর রাযি.-এর 'চুমু খেলে ওযু ওয়াজিব হবে' উক্তিটি পৌঁছে গেল। তখন তিনি বললেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রোযাদার অবস্থায়ও চুমু খেতেন। কিন্তু তিনি ওযু করতেন না। (*সুনানে দারাকুতনী*, বর্ণনা নং ৪৮৯)

---

১. سنن دارقطني : ج/ص ٥٠

৪. وَ أَخْرَجَ مُسْلِمٌ وَ النَّسَائِيُّ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ—

قَالَ: بَلَغَ عَائِشَةَ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ يَأْمُرُ النِّسَاءَ إِذَا اغْتَسَلْنَ أَنْ يَنْقُضْنَ رُؤُوْسَهُنَّ، قَالَتْ: أَفَلَا يَأْمُرُهُنَّ أَنْ يَحْلِقْنَ رُؤُوْسَهُنَّ! لَقَدْ كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ مَا أَزِيْدُ عَلَى أَنْ أُفْرِغَ عَلَى رَأْسِيْ ثَلَاثَ إِفْرَاغَاتٍ (و لفظ النسائي) وَمَا أَنْقُضُ لِيْ شَعْرًا.[১]

অর্থ : উবায়েদ ইবনে উমায়ের থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত আয়েশা রাযি.-এর কাছে সংবাদ পৌঁছল যে, হযরত ইবনে উমর রাযি. নারীদের গোসলের সময় খোঁপা খোলার নির্দেশ দেন। তখন হযরত আয়েশা রাযি. বললেন, সে একেবারে মাথা মুণ্ডানোরই নির্দেশ দিয়ে দিক! আমি এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একই পাত্রের পানি দিয়ে গোসল করতাম। মাথায় শুধু তিনবার পানি ঢালতাম। এর বেশি কিছু করতাম না। (*নাসাঈর* শব্দে) খোঁপা খুলতাম না।

(*সহীহ মুসলিম*, বর্ণনা নং ৩৩১; *সুনানে নাসাঈ*, বর্ণনা নং ৪১৬ ; *সুনানে ইবনে মাজাহ*, বর্ণনা নং ৬০৪; *সহীহ ইবনে খুযাইমা*, বর্ণনা নং ২৪৭)

৫. **وَ أَخْرَجَ أَبُوْ مَنْصُوْرٍ الْبَغْدَادِيُّ فِيْ كِتَابِهِ مِنْ طَرِيْقِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عن يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ—**

أَنَّهُ قَالَ: مَنْ غَسَلَ مَيِّتاً اغْتَسَلَ، وَمَنْ حَمَلَهُ تَوَضَّأَ، فَبَلَغَ ذَلِكَ عَائِشَةَ، فَقَالَتْ : أَوَ يُنَجَّسُ مَوْتَى الْمُسْلِمِيْنَ! وَ مَا عَلَى رَجُلٍ لَوْ حَمَلَ عُوْدًا؟

অর্থ : হযরত আবু হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বললেন, যে ব্যক্তি কোনো মাইয়েতকে গোসল করাবে, সেও যেন গোসল করে। আর যে মাইয়েতকে বহন করবে, সে যেন ওযু করে। কথাটি হযরত আয়েশা রাযি.-এর কাছে পৌঁছলে তিনি বললেন, মুসলমানের মৃতদেহ কি

---

১. مسلم، باب إفاضة الماء و نسائي، باب ترك المرأة نقض رأسها

অপরকে নাপাক করে দেয়? কেউ যদি কাঠের খড়ি বহন করে তা হলে তাকে কী করতে হবে?

بَابُ الصَّلَاةِ

অধ্যায় : সালাত

١. أَخْرَجَ الطَّبَرَانِيّ فِيْ الْأَوْسَطِ مِنْ طَرِيْقِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عن أَبِيْ سَلَمَةَ—

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَة، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ: مَنْ لَّمْ يُوْتِرْ فَلَا صَلَوةَ لَهُ، فَبَلَغَ ذَلِكَ عَائِشَةَ، فَقَالَتْ: مَنْ سَمِعَ هَذَا مِنْ أَبِيْ الْقَاسِمِ؟ مَا بَعُدَ الْعَهْدِ، وَمَا نَسِيْنَا، إنَّما قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ: مَنْ جَاءَ بِصَلَوَاتِ الْخَمْسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، حَافِظاً عَلَى وُضُوْئِهَا، ومَوَاقِيْتِهَا، وَرُكُوْعِهَا، وَسُجُوْدِهَا، لَمْ يَنْتَقِصْ مِنْهُ شَيْئاً، كَانَ لَهُ عِنْدَ اللهِ عَهْدٌ أَلّا يُعَذِّبَهُ، وَمَنْ جَاءَ، وَقَدِ انْتَقَصَ مِنْهُنَّ شَيْئاً، فَلَيْسَ لَهُ عِنْدَ اللهِ عَهْدٌ، إنْ شَاءَ رَحِمَهُ، وَإنْ شَاءَ عَذَّبَهُ.

অর্থ : মুহাম্মাদ ইবনে আমর ইবনে আবি সালামার সূত্রে বর্ণিত, হযরত আবু হুরায়রা রাযি. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করে বলেন, যে বিতর পড়ল না তার নামাযই নেই। কথাটি হযরত আয়েশা রাযি. পর্যন্ত পৌঁছে গেল। তখন তিনি বললেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছ থেকে এমন কথা কে শুনেছে? রাসূলের ওফাতের পর সময় বেশি গড়ায়নি। আর আমিও ভুলে যাইনি যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন, যে ব্যক্তি কিয়ামতের দিন পাঁচ ওয়াক্ত নামায নিয়ে আসবে এমতাবস্থায় যে, নামাযের ওযু, সময়, রুকু-সিজদার প্রতি সে যত্নশীল ছিল; কোনোটাতে কোনোরকম ঘাটতি করেনি; আল্লাহ তার সাথে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ যে, তিনি তাকে শাস্তি দেবেন না। কিন্তু যে ব্যক্তি এই নামাযগুলো নিয়ে আসবে উল্লিখিত বিষয়গুলোতে

ঘাটতিসহ, তার প্রতি আল্লাহর কোনো প্রতিশ্রুতি নেই। চাইলে তাকে রহম করবেন। চাইলে তাকে আজাব দেবেন। (*আলমুজামুল আওসাত, তবারানী*, বর্ণনা : ৪০১২)

২. وَ أَخْرَجَ أَبُو الْقَاسِمِ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَغَوِيّ مِنْ طَرِيْقِ أَبِي الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ—

بَلَغَ عَائِشَةَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ: إِنَّ الْمَرْأَةَ تَقْطَعُ الصَّلٰوةَ، فَقَالَتْ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يُصَلِّيْ فَتَقَعُ رِجْلِيْ بَيْنَ يَدَيْهِ أَوْ بِحِذَائِهِ فَيَصْرِفُهَا فَأَقْبِضُهَا.

—وَ أَصْلُهُ فِي الصَّحِيْحِ.

অর্থ : হযরত আয়েশা রাযি.-এর কাছে সংবাদ পৌছল যে, হযরত আবু হুরায়রা রাযি. বলেন, নারী নামায নষ্ট করে দেয় (অর্থাৎ নামাযীর সামনে কোনো নারী থাকলে বা সামনে দিয়ে অতিক্রম করলে নামায হবে না)। তখন হযরত আয়েশা রাযি. বললেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায পড়তেন। তাঁর সামনে অথবা পাশে আমার পা থাকত। তিনি আমার পা সরিয়ে দিতেন আর আমি পা গুটিয়ে নিতাম।

(*আততামহীদ* ২১/১৬৬; এ বর্ণনার মূল ভাষ্য সহীহ রেওয়ায়েতে পাওয়া যায়)

৩. وَ أَخْرَجَ الْبَيْهَقِيّ فِيْ سُنَنِهِ عَنْ أَبِيْ نَهِيْكٍ—

أَنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ خَطَبَ فَقَالَ: مَنْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ فَلَا وِتْرَ لَهُ، فَذُكِرَ ذٰلِكَ لِعَائِشَةَ فَقَالَتْ: كَذَبَ أَبُو الدَّرْدَاءِ، كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يُصْبِحُ فَيُوْتِرُ.

অর্থ : হযরত আবু দারদা রাযি. বয়ান করতে করতে বললেন, সকাল হয়ে গেলে বিতর পড়া যাবে না। কথাটি হযরত আয়েশা রাযি.-এর সমীপে উত্থাপিত হলো। তিনি বললেন, আবু দারদা ভুল বলেছেন, সকাল

হয়ে গেলেও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিতর পড়ে নিতেন।
(*সুনানে কুবরা, বাইহাকী*, বর্ণনা : ৪১৯৬; *মুসনাদে আহমাদ*, বর্ণনা : ২৬০৫৮; *মুসান্নাফে আবদুর রাযযাক*, বর্ণনা : ৪৬০৩)

৪. وَ أَخْرَجَ مُسْلِمٌ—

عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: كَانَ عُمَرُ يَضْرِبُ الْأَيْدِيَ عَلَى صلاة بَعْدَ الْعَصْرِ.

অর্থ : হযরত আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত উমর রাযি. আসরের পর নামায পড়তে বাধা দিতেন। (*সহীহ মুসলিম*, হাদীস নং ৮৩৬)

৫. وَ أَخْرَجَ طَاوُسٌ—

عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: وَهِمَ عُمَرُ: إِنَّمَا نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُتَحَرَّى طُلُوعُ الشَّمْسِ، وَغُرُوبُهَا.

অর্থ : হযরত আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত উমর রাযি. বুঝতে ভুল করেছেন, আসলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (ইচ্ছাকৃত) সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত পর্যন্ত দেরি করে নামায পড়তে নিষেধ করেছেন।
(*সহীহ মুসলিম*, হাদীস নং ৮৩৩; *মুসনাদে আহমাদ*, হাদীস নং ২৪৯৩১; *সুনানে কুবরা*, বাইহাকী, হাদীস নং ৪৩৮১; *সুনানে কুবরা*, *নাসাঈ*, হাদীস নং ৩৬৯)

بَابُ الْجَنَائِزِ

অধ্যায় : জানাযা

১. أَخْرَجَ مُسْلِمٌ عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ—

أَنَّ عَائِشَةَ أَمَرَتْ أَنْ يُمَرَّ بِجَنَازَةِ سَعْدِ بْنِ أَبِيْ وَقَّاصٍ فِيْ الْمَسْجِدِ فَتُصَلِّيَ عَلَيْهِ، فَأَنْكَرَ النَّاسُ ذَلِكَ عَلَيْهَا، فَقَالَتْ : ما أَسْرَعَ مَا نَسِيَ النَّاسُ! مَا

صَلَّى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَلَى سُهَيْلِ بْنِ الْبَيْضَاءِ إِلَّا فِيْ الْمَسْجِدِ.

অর্থ : হযরত আয়েশা রাযি. চাইলেন, হযরত সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রাযি.-এর জানাযা মসজিদে নেওয়া হোক; যাতে তিনিও জানাযা আদায় করতে পারেন। কিন্তু লোকেরা বিষয়টি মেনে নিতে পারল না। তখন হযরত আয়েশা রাযি. বললেন, মানুষ কত তাড়াতাড়ি ভুলে যায়! রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো হযরত সাহল ইবনে বায়যা রাযি.-এর জানাযা মসজিদেই আদায় করেছিলেন। (*সহীহ মুসলিম*, হাদীস নং ৯৭৩)

২. وَ أَخْرَجَ الشَّيْخَانِ—

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِيْ مُلَيْكَةَ قَالَ : تُوُفِّيَت ابْنَةٌ لِعُثْمَانَ بْنِ عَفَّانٍ، فَجِئْنَا لِنَشْهَدَهَا، وَحَضَرَهَا ابْنُ عُمَرَ وَ ابْنُ عَبَّاسٍ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بن عُمَرَ لِعَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ: أَلَا تَنْهَى عَنِ الْبُكَاءِ؟ فَإِنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ: إِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: قَدْ كَانَ عُمَرُ يَقُوْلُ بَعْضَ ذَلِكَ . فَذُكِرَ ذَلِكَ لِعَائِشَةَ، فَقَالَتْ: يَرْحَمُ اللهُ عُمَرَ، لَا وَاللهِ! مَا حَدَّثَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ[১] أَنَّ اللهَ يُعَذِّبُ الْمُؤْمِنَ بِبُكَاءِ أَحَدٍ عَلَيْهِ؛ وَلَكِنْ قَالَ: إِنَّ اللهَ يَزِيْدُ الْكَافِرَ عَذَاباً بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ. قَالَ: وَقَالَتْ عَائِشَةُ: حَسْبُكُمُ الْقُرْآنُ، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى (سورة الأنعام : ١٦٤) قَالَ ابْنُ مُلَيْكَةَ : فَوَاللهِ مَا قَالَ ابْنُ عُمَرَ شَيْئاً[২].

---

১. و لفظ البخاري : إن الله ليعذب المؤمن ببكاء أهله عليه

২. كما عند البخاري و عند مسلم : من شيء

অর্থ : আবদুল্লাহ ইবনে আবি মুলাইকা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উসমান ইবনে আফফান রাযি.-এর একটি মেয়ে[১] মারা গেলেন। আমরা সেখানে উপস্থিত হলাম। হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. এবং হযরত ইবনে উমর রাযি.-ও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। ইবনে উমর রাযি. আমর ইবনে উসমানকে বললেন, লোকদের কাঁদতে নিষেধ করবেন না? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো বলেছেন, পরিবারের কান্নাকাটির কারণে মাইয়েতকে আজাব দেওয়া হয়। তখন ইবনে আব্বাস রাযি. বললেন, হাঁ, হযরত উমর রাযি.-ও এমন কিছুই বলতেন। বিষয়টি হযরত আয়েশা রাযি.-এর কাছে উত্থাপন করা হলে তিনি বললেন, আল্লাহ হযরত উমর রাযি.-কে রহম করুন। অন্য কারও কান্নাকাটির কারণে আল্লাহ কোনো মুমিনকে কষ্ট দেবেন, এমন কথা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেননি। তিনি বলেছিলেন, পরিবারের লোকজনের কান্নাকাটিতে কাফেরের আজাব আল্লাহ বাড়িয়ে দেন। ইবনে আবি মুলাইকা বলেন, হযরত আয়েশা রাযি. বললেন, তোমরা কুরআন দ্যাখো,

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ أُخْرَى (سورة الأنعام : ١٦٤)

কেউ কারও পাপের বোঝা বহন করবে না। (আনআম, ১৬৪)

ইবনে আবি মুলাইকা বলেন, আল্লাহর কসম, হযরত ইবনে উমর রাযি. প্রতিউত্তরে কিছু বলেননি। (*সহীহ বুখারী*, হাদীস নং ১২৮৮; *সহীহ মুসলিম*, হাদীস নং ৯২৯)

৩. وَ أَخْرَجَ الشَّيْخَانِ—

عَنْ عَمْرَةَ أَنَّ عَائِشَةَ ذُكِرَ لَهَا أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ يَقُوْلُ: إِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبُكَاءِ الْحَيِّ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: يَغْفِرُ اللهُ لِأَبِيْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَمَا إِنَّهُ لَمْ يَكْذِبْ؛ وَلَكِنَّهُ نَسِيَ أَوْ أَخْطَأَ؛ إِنَّمَا مَرَّ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَلَى يَهُوْدِيَّةٍ يَبْكِيْ عَلَيْهَا أَهْلُهَا فَقَالَ: إِنَّهُمْ يَبْكُوْنَ عَلَيْهَا وَ إِنَّهَا لَتُعَذَّبُ فِيْ قَبْرِهَا.

---

১. *সহীহ মুসলিমের* তথ্যানুসারে—মেয়েটির নাম ছিল উম্মে আবান। তিনি মক্কায় মৃত্যুবরণ করেন।

অর্থ : আমরাহ থেকে বর্ণিত, হযরত আয়েশা রাযি.-এর কাছে একবার আলোচনা করা হলো, হযরত ইবনে উমর রাযি. বলেন, পাড়ার লোকেরা কান্নাকাটি করলে মাইয়েতের আজাব হয়। কথাটি শুনে হযরত আয়েশা রাযি. বললেন, আল্লাহ আবু আবদুর রহমানকে মাফ করুন। শোনো, তিনি মিথ্যা বলেননি; কিন্তু ভুলে গেছেন। ঘটনাটি এই যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার পথ চলছিলেন। পথিমধ্যে এক ইহুদি মহিলার মৃত্যুসংবাদ শুনলেন। তার পরিবারের লোকজন তার জন্য কান্নাকাটি করছিল। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এরা এখানে কান্নাকাটি করছে; আর কবরে মহিলাটির আজাব হচ্ছে।

(*সহীহ বুখারী*, হাদীস নং ১২৮৯; *সহীহ মুসলিম*, হাদীস নং ৯৩২; *জামে তিরমিযী*, হাদীস নং ১০০৬; *মুসনাদে আহমাদ*, হাদীস নং ২৪৭৫৮)

৪. وَ أَخْرَجَ[১] مُسْلِمٌ—

عَنْ عُرْوَةَ قَالَ قِيْلَ لِعَائِشَةَ : إِنَّهُمْ يَزْعُمُوْنَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ كُفِنَ فِيْ بُرْدِ حِبَرَةٍ، قَالَتْ : قَدْ جَاؤُوْا بِبُرْدِ حِبَرَةٍ وَ لَمْ يُكَفِّنُوْهُ.

অর্থ : উরওয়াহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত আয়েশা রাযি.-কে বলা হলো, লোকেরা দাবি করে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইয়েমেনি চাদরে কাফন দেওয়া হয়েছিল। তখন তিনি বললেন, ইয়েমেনি চাদর আনা হয়েছিল; কিন্তু কাফন দেওয়া হয়নি।

(*মুসান্নাফে ইবনে আবি শায়বা*, হাদীস নং ১১০৪৫; *সুনানে ইবনে মাজাহ*, হাদীস নং ১৪৬৯; *সুনানে আবু দাউদ*, হাদীস নং ৩১৫২; *জামে তিরমিযী*, হাদীস নং ৯৯৬; *সহীহ মুসলিম*, হাদীস নং ৯৪১)

৫. وَ أَخْرَجَ الطَّبَرَانِيّ فِي الْأَوْسَطِ—

عَنْ مُوْسَى بْنِ طَلْحَةَ قَالَ بَلَغَ عَائِشَةَ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ يَقُوْلُ: إِنَّ مَوْتَ الْفُجَاءَةِ تَخْفِيْفٌ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَ سَخْطَةٌ عَلَى الْكَافِرِيْنَ.

---

১. أيضا في مسند أحمد ج٦/ص١٤٣

অর্থ : মুসা ইবনে তালহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত আয়েশা রাযি.-এর কাছে সংবাদ পৌঁছল যে, হযরত ইবনে উমর রাযি. বলেন, আকস্মিক মৃত্যু মুমিনদের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে সহজায়ন; পক্ষান্তরে কাফেরদের জন্য তাঁর ক্রোধের বহিঃপ্রকাশ।

(*মুজামে আওসাত*, *তবারানী*, হাদীস নং ৩১২৯)

৬. وَ أَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ—

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: وَقَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى قَلِيبِ بَدْرٍ فَقَالَ: هَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا ثُمَّ قَالَ: إِنَّهُمُ الآنَ يَسْمَعُونَ مَا أَقُولُ، فَذُكِرَ لِعَائِشَةَ، فَقَالَتْ: إِنَّمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّهُمُ الآنَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّ الَّذِي كُنْتُ أَقُولُ لَهُمْ هُوَ الحَقُّ، ثُمَّ قَرَأَتْ {إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ} حَتَّى قَرَأَتْ الآيَةَ.

অর্থ : ইবনে উমর রাযি. বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বদরের জলাশয়ের সামনে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন, তোমাদের প্রতিপালক তোমাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তোমরা কি তা সত্যরূপে পেয়েছ? তারপর তিনি বলেছিলেন, আমি যা বলছি, নিশ্চয় তারা তা শুনতে পাচ্ছে। হযরত আয়েশা রাযি.-কে ইবনে উমর রাযি.-এর হাদীসটি শোনানো হলে তিনি বললেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এভাবে বলেননি; তিনি আসলে বলেছিলেন, তারা এখন নিশ্চয় জানতে পারছে যে, আমি তাদেরকে যা বলতাম তা সত্য ছিল। (*সহীহ বুখারী*, হাদীস নং ৩৯৮০)

৭. وَ أَخْرَجَ الدَّارَقُطْنِيّ—

مِنْ طَرِيْقِ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ: إِذَا أَحَبَّ الْعَبْدُ لِقَاءَ اللهِ أَحَبَّ اللهُ لِقَائَهُ وَ إِذَا كَرِهَ الْعَبْدُ لِقَاءَ اللهِ كَرِهَ اللهُ لِقَائَهُ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِعَائِشَةَ، فَقَالَتْ: يَرْحَمُهُ اللهُ، حَدَّثَكُمْ بِآخِرِ الْحَدِيْثِ وَ لَمْ يُحَدِّثْكُمْ

بِأَوَّلِهِ. قَالَتْ عَائِشَةُ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ: إِذَا أَرَادَ اللهُ بِعَبْدٍ خَيْرًا بَعَثَ إِلَيْهِ مَلَكًا فِيْ عَامِهِ الَّذِيْ يَمُوْتُ فِيْهِ، فَيُسدِّدُه وَ يُبَشِّرُهُ، فَإِذَا كَانَ عِنْدَ مَوْتِهِ أَتَى مَلَكُ الْمَوْتِ، فَقَعَدَ عِنْدَ رَأْسِهِ، فَقَالَ: يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ، أُخْرُجِيْ عَلَى مَغْفِرَةٍ مِّنَ اللهِ وَ رِضْوَانٍ، وَ يَتَهَوَّهُ نَفْسَهُ فَتَخْرُجُ؛ فَذَلِكَ حِينَ يُحِبُّ لِقَاءَ اللهِ وَ يُحِبُّ اللهُ لِقَائَهُ. وَ إِذَا أَرَادَ بِعَبْدٍ شَرًّا بَعَثَ إِلَيْهِ شَيْطَانًا فِيْ عَامِهِ الَّذِيْ يَمُوْتُ فِيْهِ، فَأَغْرَاهُ، فَإِذَا كَانَ عِنْدَ مَوْتِهِ أَتَاهُ مَلَكُ الْمَوْتِ، فَقَعَدَ عِنْدَ رَأْسِهِ، فَقَالَ: أَيَّتُهَا النَّفْسُ، أُخْرُجِيْ إِلى سَخَطٍ مِّنَ اللهِ وَ غَضَبٍ، فَتَفَرَّقُ فِيْ جَسَدِهِ؛ فَذَلِكَ حِينَ يُبْغِضُ لِقَاءَ اللهِ وَ يُبْغِضُ اللهُ لِقَائَه.

-قال الدارقطني: غريب من حديث مجاهد عن أبي هريرة و عائشة؛ تفرد به عطاء بن السائب عنه، ولا أعلم أحدا حدث به عنه غير محمد بن فضيل.

অর্থ : মুজাহিদের সূত্রে বর্ণিত, হযরত আবু হুরায়রা রাযি. বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যখন বান্দা আল্লাহর সাক্ষাৎ কামনা করে তখন আল্লাহও তার সাক্ষাৎ কামনা করেন। পক্ষান্তরে যখন বান্দা আল্লাহর সাক্ষাৎ অপছন্দ করে, তখন আল্লাহও তার সাক্ষাৎ অপছন্দ করেন। বিষয়টি হযরত আয়েশা রাযি.-এর কাছে উত্থাপন করা হলো। তখন তিনি বললেন, আল্লাহ ইবনে উমরকে রহম করুন, তিনি তোমাদের হাদীসের শেষ অংশটুকু শুনিয়েছেন। হাদীসের প্রথম অংশটুকু শোনাননি। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন, আল্লাহ যখন কোনো বান্দার কল্যাণ চান তখন তার মৃত্যুর বছর একজন ফেরেশতা পাঠান, ফেরেশতা তাকে সঠিক পথের দিশা দান করেন এবং সুসংবাদ দান করেন। যখন মৃত্যুর সময় হয়, তখন মৃত্যুর ফেরেশতা তার কাছে আসেন এবং বলেন, হে নফসে মুতমাইন্নাহ (হে ঈমানে আশ্বস্ত প্রাণ), তুমি আল্লাহর মাগফিরাত ও রেজামন্দির ওপর বেরিয়ে এসো। তখন তার প্রাণ অনায়াসে বের হয়ে আসে। এটিই হলো সেই মুহূর্ত, যখন সে আল্লাহর সাক্ষাৎ কামনা করে এবং আল্লাহও তার

সাক্ষাৎ কামনা করেন। পক্ষান্তরে আল্লাহ যখন কোনো বান্দার জন্য অকল্যাণ চান, তখন তার মৃত্যুর বছর তার কাছে একজন শয়তান পাঠান। শয়তান তাকে প্ররোচিত করতে থাকে। মৃত্যুর সময় মৃত্যুর ফেরেশতা তার কাছে আসে এবং তার মাথার কাছে বসে। এরপর বলে, হে নফস, আল্লাহর ক্রোধ ও গজবের দিকে বেরিয়ে আয়। তখন সে শরীরে ছুটোছুটি শুরু করে। এটিই সেই মুহূর্ত যখন সে আল্লাহর সাক্ষাতকে ঘৃণা করে এবং আল্লাহও তার সাক্ষাতকে ঘৃণা করেন। (*দারাকুতনী*; *মুসনাদে ইসহাক ইবনে রাহুইয়াহ*, হাদীস নং ১৫৯১)

৮. وَ أَخْرَجَ أَبُوْ داود وَ ابْنُ حِبَّان وَ الْحَاكِمِ[১] وَ صَحَّحَهُ—

عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّهُ لما حَضَرَهُ الْمَوْتُ دَعَا بِثِيَابٍ جُدُدٍ فَلَبِسَهَا ثُمَّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَقُوْلُ: إِنَّ الْمَيِّتَ يُبْعَثُ فِيْ ثِيَابِهِ الَّتِيْ يَمُوْتُ فِيْهَا.

[قال الزركشي: رأيت في كتاب أصول الفقه لأبي الحسن أحمد بن القطان من قدماء أصحابنا من أصحاب ابن جريج في الكلام على الرواية بالمعنى]

أن أبا سعيد فهم من الحديث أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ أراد بالثياب الكفن و أن عائشة أنكرت ذلك عليه وَ قَالَتْ: يَرْحَمُ اللهُ أَبَا سَعِيْدٍ، إِنَّمَا أَرَاد صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَمَلَهُ الَّذِيْ مَاتَ عَلَيْهِ، قَدْ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ: يُحْشَرُ النَّاسُ حُفَاةً عُرَاةً.

অর্থ : আবু সাঈদ খুদরী রাযি. যখন মৃত্যুবরণ করার উপক্রম হলেন তখন নতুন কাপড় আনালেন এবং তা পরিধান করলেন। এরপর বললেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, মানুষ যেই কাপড়ে মৃত্যুবরণ করে সেই কাপড়েই তার হাশর হবে।... (*সুনানে আবু*

---

১. المستدرك للحاكم ٣٤١/١

দাউদ, হাদীস নং ৩১১৪; *মুসতাদরাকে হাকেম*, হাদীস নং ১২৬০; *সুনানে কুবরা, বাইহাকী*, হাদীস নং ৬৬০৩; *সহীহ ইবনে হিব্বান*, হাদীস নং ৭৩১৬)

(যারকাশী রহ. বলেন, আমি আবুল হাসান আহমাদ ইবনুল কাত্তানের *উসূলুল ফিকহ* কিতাবে দেখেছি) আবু সাঈদ খুদরী রাযি. কাপড় বলতে কাফন বুঝেছেন। হযরত আয়েশা রাযি. তাঁর এ চিন্তাকে প্রত্যাখ্যান করে বলেছেন, আল্লাহ আবু সাঈদের প্রতি রহম করুন। এ কথা বলে মূলত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানুষের আমলকে বুঝিয়েছেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো বলেই দিয়েছেন, হাশরের ময়দানে মানুষ খালি পায়ে খালি গায়ে উঠবে।

৯. وَ أَخْرَجَ أَبُوْ مَنْصُوْرٍ الْبَغْدَادِيُّ مِنْ طَرِيْقِ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدٍ الطَّنَافِسِيِّ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ خَيْثَمَةَ—

عَنْ أَبِيْ عَطِيَّةَ قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَ مَسْرُوْقٌ عَلَى عَائِشَةَ فَقَالَ مَسْرُوْقٌ قَالَ عَبْدُ اللهِ ابن مَسْعُوْدٍ: مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللهِ أَحَبَّ اللهُ لِقَائَهُ وَ مَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللهِ كَرِهَ اللهُ لِقَائَهُ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: يَرْحَمُ اللهُ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمنِ حَدَّثَ بِأَوَّلِ الْحَدِيْثِ وَ لَمْ تَسْأَلُوْهُ عَنْ آخِرِهِ؛ إِنَّ اللهَ إِذَا أَرَادَ بِعَبْدٍ خَيْرًا قَيَّضَ لَهُ قَبْلَ مَوْتِهِ بِعَامٍ مَلَكًا يُوَفِّقُهُ وَ يُسَدِّدُه، حَتَّى يَقُوْل النَّاسُ مَاتَ فُلَانٌ عَلَى خَيْرِ مَا كَانَ، فَإِذَا حُضِرَ وَ رَأَى ثَوَابَهُ مِنَ الْجَنَّةِ تَهَوَّعَ بِنَفْسِهِ أَوْ قَالَ تَهَوَّعَتْ نَفْسُهُ فَذَلِكَ حِينَ أَحَبَّ لِقَاءَ اللهِ وَ أَحَبَّ اللهُ لِقَائَهُ؛ وَ إِذَا أَرَادَ بِعَبْدٍ سُوْءًا قَيَّضَ لَهُ قَبْلَ مَوْتِهِ بِعَامٍ شَيْطَانًا فَأَفْتَنَهُ حَتَّى يَقُوْلَ النَّاسُ مَاتَ فُلَانٌ عَلَى شَرِّ مَا كَانَ، فَإِذَا حُضِرَ رَأَى مَا نَزَلَ مِنَ الْعَذَابِ فَبَلَغَ نَفْسَهُ؛ فَذَلِكَ حِينَ كَرِهَ لِقَاءَ اللهِ وَ كَرِهَ اللهُ لِقَائَهُ.

অর্থ : আবু আতিয়া থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি এবং মাসরুক হযরত আয়েশা রাযি.-এর দরবারে উপস্থিত হলাম। মাসরুক বললেন,

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর সাক্ষাৎ পছন্দ করে, আল্লাহও তার সাক্ষাৎ পছন্দ করেন। পক্ষান্তরে যে আল্লাহর সাক্ষাৎ অপছন্দ করে, আল্লাহও তার সাক্ষাৎ অপছন্দ করেন। কথাটি শুনে হযরত আয়েশা রাযি. বললেন, আল্লাহ আবু আবদুর রহমানকে রহম করুন, তিনি হাদীসের কিছু অংশ বলেছেন, আর তোমরাও বাকি অংশটুকু জানতে চাওনি। আল্লাহ যখন কোনো বান্দার কল্যাণ চান, তখন তার মৃত্যুর পূর্বে একজন ফেরেশতা নিযুক্ত করে দেন। ফেরেশতা তাকে ভালো কাজের সুযোগ করে দেন, সঠিক পথে পরিচালিত করেন। মানুষ তখন বলে, লোকটি ভালো অবস্থায় মারা গেছে। মৃত্যু যখন উপস্থিত হয় এবং সে তার জান্নাতপ্রাপ্তির বিষয়টি অবগত হয় তখন সহজেই প্রাণ সঁপে দেয়। এই সেই মুহূর্ত, যখন সে আল্লাহর সাক্ষাৎ কামনা করে, আল্লাহও তার সাক্ষাৎ কামনা করেন। পক্ষান্তরে আল্লাহ যখন কোনো বান্দার অকল্যাণ চান, তখন তার মৃত্যুর পূর্বে একজন শয়তানকে সুযোগ করে দেন। শয়তান তাকে প্ররোচিত করতে থাকে। এমনকি, লোকে বলে, সে মন্দ অবস্থায় মারা গিয়েছে। যখন মৃত্যু উপস্থিত হয়, আর সে জাহান্নামের আজাব প্রত্যক্ষ করে তখন নফস আর সহজে ধরা দিতে চায় না। এই সেই মুহূর্ত যখন সে আল্লাহর সাক্ষাতকে অপছন্দ করে, আল্লাহও তার সাক্ষাতকে অপছন্দ করেন। (*আযযুহদ ওয়ার রাকাইক, ইবনুল মুবারাক*, হাদীস নং ৯৭২; *মুসান্নাফে আবদুর রাযযাক*, হাদীস নং ৬৭৪৯)

بَابُ الصِّيَامِ

অধ্যায় : রোযা

১. أَخْرَجَ أَحْمَدُ[১]—

عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

---

১. في مسنده، ص ٦/٢٤٣

اَلشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُوْنَ، فَذَكَرُوْا ذَلِكَ لِعَائِشَةَ، فَقَالَتْ يَرْحَمُ اللهُ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمن، إِنَّمَا قَالَ: اَلشَّهْرُ قَدْ يَكُوْنُ تِسْعًا وَعِشْرِيْنَ.

অর্থ : ইয়াহইয়া ইবনে আবদুর রহমান থেকে বর্ণিত আছে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাযি. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করে বলেন, চন্দ্রমাস ঊনত্রিশ দিনে হয়। শিষ্যগণ বিষয়টি হযরত আয়েশা রাযি.-এর কাছে উত্থাপন করলে তিনি বলেন, আল্লাহ আবু আবদুর রহমানকে রহম করুন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন, চন্দ্রমাস অনেক সময় ঊনত্রিশ দিনে হয়। (*মুসনাদে আহমাদ*, হাদীস নং ২৪২৪৭)

২. وَأَخْرَجَ ابْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ—

عَنْ سَعِيْدِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنِ عُمَرَ حَدَّثَهُمْ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ فَلَا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسِبُ؛ الشَّهْرُ كَذَا وَ كَذَا، وَضَرَبَ لِثَالِثَةٍ وَقَبَضَ الْإِبْهَامَ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ يَغْفِرُ اللهُ لِأَبِيْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنَّمَا هَجَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِسَاءَهُ شَهْرًا، فَنَزَلَ لِتِسْعٍ وَعِشْرِيْنَ فَقِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّكَ آلَيْتَ شَهْرًا فَقَالَ: وَإِنَّ الشَّهْرَ قَدْ يَكُوْنُ تِسْعاً وَعِشْرِيْنَ،

অর্থ : সাঈদ ইবনে উমর হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাযি. থেকে বর্ণনা করেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে বলেছেন, আমরা উম্মী—লিখতে পারি না, হিসেব করতে পারি না; মাস হচ্ছে এই, এই; তৃতীয়বার তিনি বৃদ্ধাঙ্গুলি গুটিয়ে রাখলেন। ইবনে উমর রাযি.-এর হাদীস শুনে হযরত আয়েশা রাযি. বললেন, আল্লাহ আবু আবদুর রহমানকে রহম করুন। ঘটনা এই যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক মাসের জন্য স্ত্রীগণকে পরিত্যাগ করেছিলেন। কিন্তু ঊনত্রিশতম দিনে তিনি নেমে আসেন। তখন তাঁকে বলা হলো, হে আল্লাহর রাসূল, আপনি তো এক মাসের শপথ করেছিলেন? তখন তিনি বললেন, চন্দ্রমাস ঊনত্রিশ দিনেও হয়।

(*মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবাহ*, হাদীস নং ৯৬০৯; *মুসনাদে আহমাদ*, হাদীস নং ৪৮৬৬; *সহীহ মুসলিম*, হাদীস নং ১০৮৪; *সহীহ ইবনে হিব্বান*, হাদীস নং ৩৪৫২)

৩. وَأَخْرَجَ مُسْلِمٌ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، يَقُصُّ، يَقُولُ فِي قَصَصِهِ: مَنْ أَدْرَكَهُ الْفَجْرُ جُنُبًا فَلَا يَصُمْ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ - لِأَبِيهِ- فَأَنْكَرَ ذَلِكَ، فَانْطَلَقَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَانْطَلَقْتُ مَعَهُ، حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، فَسَأَلَهُمَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ ذَلِكَ، قَالَ: فَكِلْتَاهُمَا قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ غَيْرِ حُلُمٍ، ثُمَّ يَصُومُ. قَالَ: فَانْطَلَقْنَا حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى مَرْوَانَ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ، فَقَالَ مَرْوَانُ: عَزَمْتُ عَلَيْكَ إِلَّا مَا ذَهَبْتَ إِلَى أَبِي هُرَيْرَةَ، فَرَدَدْتَ عَلَيْهِ مَا يَقُولُ: قَالَ: فَجِئْنَا أَبَا هُرَيْرَةَ -وَأَبُو بَكْرٍ حَاضِرٌ ذَلِكَ كُلَّه- قَالَ: فَذَكَرَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: أَهُمَا قَالَتَاهُ لَكَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: هُمَا أَعْلَمُ، ثُمَّ رَدَّ أَبُو هُرَيْرَةَ مَا كَانَ يَقُولُ فِي ذَلِكَ إِلَى الْفَضْلِ بْنِ الْعَبَّاسِ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: سَمِعْتُ ذَلِكَ مِنَ الْفَضْلِ، وَلَمْ أَسْمَعْهُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: فَرَجَعَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَمَّا كَانَ يَقُولُ فِي ذَلِكَ، قُلْتُ لِعَبْدِ الْمَلِكِ: أَقَالَتَا: فِي رَمَضَانَ؟ قَالَ: كَذَلِكَ كَانَ يُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ غَيْرِ حُلُمٍ ثُمَّ يَصُومُ.

অর্থ : আবু বকর ইবনে আবদুর রহমান থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি হযরত আবু হুরায়রা রাযি.-কে আলোচনা করতে শুনলাম। তিনি আলোচনায় বললেন, যে ব্যক্তি জুনুব (অর্থাৎ স্বপ্নদোষ বা স্ত্রী-সহবাসের কারণে গোসল ফরজ হয়েছে এমন) অবস্থায় সকাল করবে, সে যেন সেদিন রোযা না রাখে। রাবী বলেন, আমি বিষয়টি আবদুর রহমান ইবনে

হারেসকে জানালাম। তিনি আবার তার পিতাকে জানালেন। তার পিতা বিষয়টি মেনে নিতে পারলেন না। তখন আবদুর রহমান ও তার পিতাসহ আমরা হযরত আয়েশা রাযি. এবং উম্মে সালামা রাযি.-এর কাছে গেলাম। আবদুর রহমান বিষয়টি সঠিক কি না জানতে চাইলেন। রাবী বলেন, উম্মুল মুমিনীন—দুজনই—বললেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জুনুব অবস্থায় সকাল করতেন, তারপরও রোযা রাখতেন। এরপর আমরা মারওয়ানের কাছে গেলাম। আবদুর রহমান বিষয়টি তাকেও অবহিত করলেন। মারওয়ান বললেন, আমি নির্দেশ দিচ্ছি, তুমি হযরত আবু হুরায়রা রাযি.-এর কাছে যাবে এবং তাঁকে তাঁর মত প্রত্যাহার করার অনুরোধ জানাবে। রাবী বলেন, আমরা হযরত আবু হুরায়রা রাযি.-এর কাছে গেলাম। আবদুর রহমান তাঁর সঙ্গে কথা বললেন। হযরত আবু হুরায়রা রাযি. বললেন, উম্মুল মুমিনীনগণ একথা বলেছেন? আবদুর রহমান বললেন, হাঁ। তখন তিনি বললেন, তা হলে আর কী? তাঁরাই তো ভালো জানবেন। এরপর আবু হুরায়রা রাযি. তাঁর মতটিকে ফাযল ইবনে আব্বাস রাযি.-এর বলে উল্লেখ করলেন। তিনি বললেন, আমি বিষয়টি ফাযল ইবনে আব্বাস রাযি.-এর কাছ থেকে শুনেছি; স্বয়ং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়সাল্লামের কাছ থেকে শুনিনি। এভাবে আবু হুরায়রা রাযি. তাঁর মতটি প্রত্যাহার করে নিলেন। (*সহীহ মুসলিম*, হাদীস নং ১১০৯; *সুনানে কুবরা*, *বাইহাকী*, হাদীস নং ৭৯৯৬)

بَابُ الْحَجِّ

অধ্যায় : হজ

১. أَخْرَجَ الْبَيْهَقِيّ فِيْ سُنَنِهِ[১]—

عَنْ سَالِمٍ عَنْ بن عُمَرَ، (قال) سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُوْلُ: إِذَا رَمَيْتُمْ وَحَلَقْتُمْ فَقَدْ حَلَّ لَكُمْ كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا النَّسَاءُ، وَالطِّيْبُ ، قَالَ سَالِمٌ: وَقَالَتْ

১. راجع النسخة المطبوعة ٥، ص ١٣٥

عَائِشَةُ: كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا النِّسَاءَ، أَنَا طَيَّبْتُ[১] رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحِلِّهِ. قَالَ سَالِمٌ: وَسُنَّةُ رَسُوْلِ اللهِ أَحَقُّ أَنْ تُتَّبَعَ.

অর্থ : সালেম হযরত ইবনে উমর রাযি. থেকে বর্ণনা করেছেন, ইবনে উমর রাযি. বলেন, আমি হযরত উমর রাযি.-কে বলতে শুনেছি, যখন তোমরা রমি ও হলক করে নেবে, তখন তোমাদের জন্য সবকিছুই হালাল হয়ে যাবে শুধু নারী ও সুগন্ধি ছাড়া। সালেম বলেন, কিন্তু হযরত আয়েশা রাযি. বলেছেন, সবকিছুই হালাল শুধু নারী ছাড়া। আমি নিজে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সুগন্ধি লাগিয়ে দিয়েছি। সালেম বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহই তো অধিক অনুসরণীয়। (*মারিফাতুস সুনানি ওয়াল আসার*, হাদীস নং ৯৪৭৮; *সুনানে কুবরা, বাইহাকী*, হাদীস নং ৯৫৯৭, ৯৫৯২; *মুসনাদে আহমাদ*, হাদীস নং ২৫১০৩; *শরহু মাআনিল আছার*, হাদীস নং ৪০২৭; *সহীহ ইবনে খুযাইমা*, হাদীস নং ২৯৩৮)

২. وَأَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ—

عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّ ابْنَ زِيَادٍ كَتَبَ إِلَى عَائِشَةَ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ، قَالَ: مَنْ أَهْدَى هَدْيًا حَرُمَ عَلَيْهِ مَا يَحْرُمُ عَلَى الْحَاجِّ، حَتَّى يُنْحَرَ الْهَدْيُ، وَقَدْ بَعَثْتُ بِهَدْيِي، فَاكْتُبِي إِلَيَّ بِأَمْرِكِ، قَالَتْ عَمْرَةُ: قَالَتْ عَائِشَةُ لَيْسَ كَمَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «أَنَا فَتَلْتُ قَلَائِدَ هَدْيِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدَيَّ، ثُمَّ قَلَّدَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ، ثُمَّ بَعَثَ بِهَا مَعَ أَبِي، فَلَمْ يَحْرُمْ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْءٌ أَحَلَّهُ اللهُ لَهُ، حَتَّى نُحِرَ الْهَدْيُ.

অর্থ : আমরাহ বিনতে আবদুর রহমান থেকে বর্ণিত আছে, একবার যিয়াদ ইবনে আবু সুফিয়ান হযরত আয়েশা রাযি.-এর কাছে এই মর্মে

---

১. و أخرجه أحمد في مسنده بلفظ آخر ٦، ص ١٧٥

পত্র প্রেরণ করলেন যে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি. বলেছেন, যে ব্যক্তি হেরেমে হাদী প্রেরণ করবে, জবেহ হওয়া পর্যন্ত তার ওপর হজের বিধিনিষেধ আরোপিত হবে। ইতোমধ্যেই আমার পক্ষ থেকেও হাদী প্রেরিত হয়েছে; সুতরাং এ বিষয়ে আপনার মতামত ব্যক্ত করে কৃতার্থ করবেন। আমরাহ বলেন, হযরত আয়েশা রাযি. বললেন, ইবনে আব্বাস রাযি. যথার্থ বলেননি। আমি নিজ হাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়সাল্লামের হাদীর কিলাদা পাকিয়েছি, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরিয়ে দিয়েছেন; এরপর আমার পিতার মাধ্যমে হেরেমে পাঠিয়েছেন। আল্লাহ যা হালাল করেছেন, তার কোনো কিছুই তো তিনি তখন হারাম ধরেননি। (*সহীহ বুখারী*, হাদীস নং ১৭০০; *সহীহ মুসলিম*, হাদীস নং ১৩২১)

৩. وَأَخْرَجَ الْبَيْهَقِيّ فِيْ سُنَنِهِ[১]—

عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَوَّلُ مَنْ كَشَفَ الْعَمَى عَنِ النَّاسِ وَبَيَّنَ لَهُمُ السُّنَّةَ فِيْ ذَلِكَ عَائِشَةُ، فَأَخْبَرَنِيْ عُرْوَةُ وَعَمْرَةُ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ: إِنِّيْ كُنْتُ لَأَفْتِلُ قَلَائِدَ هَدْيِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَيَبْعَثُ بِهَدْيِهِ مُقَلَّدًا، وَهُوَ مُقِيْمٌ بِالْمَدِيْنَةِ، ثُمَّ لَا يَجْتَنِبُ شَيْئًا، حَتَّى يَنْحَرَ هَدْيَهُ، فَلَمَّا بَلَغَ النَّاسَ قَوْلُ عَائِشَةَ هَذَا، أَخَذُوْا بِهِ وَتَرَكُوْا فَتْوَى ابْنِ عَبَّاسٍ.

অর্থ : যুহরী থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এ বিষয়ে প্রথম যিনি অস্পষ্টতা দূর করেছেন এবং প্রকৃত সুন্নাহ মানুষের সামনে তুলে ধরেছেন তিনি হলেন উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা রাযি.। আমাকে উরওয়াহ এবং উমরাহ জানিয়েছেন, হযরত আয়েশা রাযি. বলেন, আমি নিজে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীর কিলাদা পাকাতাম, রাসূল কিলাদা পরিয়ে মক্কায় পাঠিয়ে দিতেন। তিনি মদীনায়ই থাকতেন। হাদী নহর করা পর্যন্ত কোনো কিছু থেকেই বিরত থাকেননি। কথাটি সর্বসাধারণের কাছে পৌঁছলে সকলে হযরত আয়েশা রাযি.-এর

---

১. راجع النسخة المطبوعة ٥، ص ٢٣٤

মতটিকেই গ্রহণ করেন এবং হযরত ইবনে আব্বাস রাযি.-এর ফতোয়ার ওপর আমল করা ছেড়ে দেন। (*সুনানে কুবরা, বাইহাকী*, হাদীস নং ১০১৯১)

৪. وَأَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ—

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الطِّيْبِ عِنْدَ الْإِحْرَامِ، فقَالَ: لَأَنْ أَطْلِيَ بِالْقَارِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَنْضَحَ طِيْبًا، فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لِعَائِشَةَ، فَقَالَتْ: يَرْحَمُ اللّٰهُ أَبَا عَبْدِ الرَحْمَنِ، قَدْ كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَيَطُوْفُ فِي نِسَائِهِ، ثُمَّ يُصْبِحُ مُحْرِمًا يَنْضَحُ طِيْبًا.

অর্থ : মুহাম্মাদ ইবনে মুনতাশির থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি হযরত ইবনে উমর রাযি.-কে ইহরামের সময় সুগন্ধি ব্যবহার করা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, ইহরামের সময় গায়ে সুগন্ধি লাগানোর চেয়ে গায়ে আলকাতরা মাখা আমার পক্ষে শ্রেয়। তখন আমি বিষয়টি হযরত আয়েশা রাযি.-কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, আল্লাহ আবু আবদুর রহমানকে রহম করুন। আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সুগন্ধি লাগিয়ে দিতাম। তিনি পবিত্র স্ত্রীগণকে সঙ্গে নিয়ে তাওয়াফ করতেন। তারপর তিনি মুহরিম অবস্থায় সকাল করতেন। ঘামে সুগন্ধি ভিজে উঠত। (*সহীহ ইবনে খুযাইমা*, হাদীস নং ২৫৯৯; *সুনানে নাসাঈ*, হাদীস নং ২৭০৪; *সহীহ বুখারী*, হাদীস নং ২৬৮; *সহীহ মুসলিম*, হাদীস নং ১১৯২)

৫. وَأَخْرَجَ الشَّيْخَانِ—

عَنْ مُجَاهِدٍ أَنَّ عُرْوَةَ سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ، كَم اعْتَمَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالَ: أَرْبَعَ عُمَرٍ، إِحْدَاهُنَّ فِيْ رَجَبَ، وَكَرِهْنَا أَنْ نَّرُدَّ عَلَيْهِ، وَسَمِعْنَا اسْتِنَانَ عَائِشَةَ فِي الْحُجْرَةِ، فَقَالَ عُرْوَةُ: أَلَا تَسْتَمِعِيْنَ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِيْنَ إِلَى مَا يَقُوْلُ أَبُوْ عَبْد الرَّحْمَنِ؟ قَالَتْ: وَمَا يَقُوْلُ؟ قَالَ: يَقُوْلُ:

اعْتَمَرَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعَ عُمَرٍ، إِحْدَاهُنَّ فِيْ رَجَبَ، فَقَالَتْ: يَرْحَمُ اللهُ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، مَا اعْتَمَرَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا وَهِيَ مَعَهُ، وَ مَا اعْتَمَرَ فِيْ رَجَبَ قَطُّ.

অর্থ : মুজাহিদ থেকে বর্ণিত, উরওয়াহ একবার হযরত ইবনে উমর রাযি.-কে জিজ্ঞেস করলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কতবার উমরা করেছিলেন? তিনি বললেন, চারবার; তার মধ্যে একটি ছিল রজব মাসে। উরওয়াহ বলেন, আমরা প্রতিক্রিয়ায় কিছু বলা অশোভন মনে করলাম। এরই মধ্যে জানতে পারলাম, দরসগাহে হযরত আয়েশা রাযি. উপবেশন করবেন। উরওয়াহ বলেন, আমি হযরত আয়েশা রাযি.-কে জিজ্ঞেস করলাম, মাতা, হযরত ইবনে উমর রাযি. কী বলেন, শুনেছেন? তিনি জানতে চাইলেন, কী বলেন? আমি বললাম, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নাকি চারবার উমরা করেছিলেন; তার মধ্যে একটি নাকি রজব মাসে ছিল। হযরত আয়েশা রাযি. বললেন, আল্লাহ আবু আবদুর রহমানকে রহম করুন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যত উমরা করেছিলেন, সবগুলোতেই আমি তাঁর সঙ্গে ছিলাম। তিনি রজব মাসে কখনোই উমরা করেননি। (*সহীহ মুসলিম*, হাদীস নং ১২৫৫; *সহীহ বুখারী*, হাদীস নং ১৭৭৬; *সহীহ ইবনে হিব্বান*, হাদীস নং ৩৯৪৫; *মুসনাদে আহমাদ*, হাদীস নং ৬৪৩০)

৬. وَأَخْرَجَ أَبُوْ داود وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ—

عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عَمَرَ، كَم اعْتَمَرَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وسَلّمَ؟ فَقَالَ: مَرَّتَيْن. فَقَالَتْ عَائِشَةُ: لَقَدْ عَلِمَ ابْنُ عُمَرَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدِ اعْتَمَرَ ثَلَاثًا، سِوَى الَّتِيْ قَرَنَهَا بِحجَّةِ الْوَدَاعِ.

অর্থ : মুজাহিদ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাযি.-কে জিজ্ঞেস করা হলো, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কতবার উমরা করেছিলেন? তিনি বললেন, দুইবার। হযরত আয়েশা

রাযি. বললেন, ইবনে উমর খুব ভালো করেই জানেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিদায় হজের সঙ্গে যে উমরাটি করেছিলেন, সেটি ছাড়া আরও তিনটি উমরা করেছিলেন। (*সুনানে আবু দাউদ*, হাদীস নং ১৯৯২; *সুনানে কুবরা*, *নাসাঈ*, হাদীস নং ৪২০৪; *মুসনাদে আহমাদ*, হাদীস নং ৫৩৮৩; *সুনানে কুবরা*, *বাইহাকী*, হাদীস নং ৮৮৩৫; *সুনানে ইবনে মাজাহ*)

৭. أَخْرَجَ الشَّافِعِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ—

عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيْهِ، أَنَّهُ كَانَ يُفْتِيْ النِسَاءَ، إِذَا أَحْرَمْنَ أَنْ يَّقْطَعْنَ الخُفَّيْنِ. حَتَّى أَخْبَرَتْهُ صَفِيَّةُ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا تُفْتِي النِّسَاءَ، إِذَا أَحْرَمْن أَنْ لَّا يَقْطَعْنَ. فَانْتَهَى عَنْه.

অর্থ : সালেম তার পিতা সম্পর্কে বর্ণনা করেন যে, তিনি ফতোয়া দিতেন, (পুরুষদের মতো) নারীরাও ইহরাম বাঁধলে মোজা (নিচের দিক থেকে) কেটে ফেলতে হবে। অবশেষে যখন সাফিয়্যা তাঁকে হযরত আয়েশা রাযি.-এর ফতোয়াটি শোনালেন যে, নারীদের জন্য এ হুকুম নয়, তখন তিনি এমন ফতোয়া দেওয়া বন্ধ করলেন। (*মুসনাদে শাফেয়ী*, হাদীস নং ৮৫৬; *সুনানে কুবরা*, *বাইহাকী*, হাদীস নং ৯০৭৭)

৮. وَأَخْرَجَ أَبُوْ داود وَابْنُ خُزَيْمَةَ—

عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، كَانَ يَصْنَعُ ذَلِكَ، ثُمَّ حَدَّثَتْهُ صَفِيَّةُ بِنْتُ أَبِيْ عُبَيْدٍ، أَنَّ عَائِشَةَ حَدَّثَتْهَا، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ كَانَ رَخَّصَ النِّسَاءَ فِي الْخُفَّيْنِ، فَتَرَكَ ذَلِكَ.

অর্থ : সালেম আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাযি. সম্পর্কে বলেন, তিনি নারীদের ইহরামের মধ্যে মোজা কেটে ফেলার নির্দেশ দিতেন। কিন্তু সাফিয়্যা বিনতে আবু উবায়েদ তাঁকে জানালেন, হযরত আয়েশা রাযি. বলেছেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মোজার ব্যাপারে নারীদের ছাড় দিয়েছিলেন। হযরত আয়েশা রাযি.-এর হাদীস শুনে হযরত ইবনে উমর রাযি. এমনটি বলা ছেড়ে দিলেন।

(*সুনানে আবু দাউদ*, হাদীস নং ১৮৩১; *সহীহ ইবনে খুযাইমাহ*, হাদীস নং ২৬৮৬; *মুসনাদে আহমাদ*, হাদীস নং ৪৮৩৬)

৯. وَأَخْرَجَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِيْ كِتَابِ الْمَنَاسِكِ الْكَبِيْرِ—

عَنْ مُجَاهِدٍ، أَنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ تَقُوْلُ: أَلَا تَعْجَبُوْنَ مِنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ، يُفْتِي الْمَرْأَةَ الْمُحْرِمَةَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْ شَعْرِهَا أَرْبَعَةَ أَصَابِعَ، وَإِنَّهَا يَكْفِيْهَا مِنَ ذَلِكَ الطَّرَفُ.

অর্থ : মুজাহিদ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত আয়েশা রাযি. বলতেন, তোমরা ইবনে যুবাইরের কথা শুনে অবাক হও না? তিনি নাকি ফতোয়া দেন, মুহরিম নারীকে চার আঙ্গুল পরিমাণ চুল কাটাতে হবে; অথচ একটু কোনা কাটানোও যথেষ্ট। (আহমাদ)

১০. وَأَخْرَجَ الْبَيْهَقِيّ فِيْ سُنَنِهِ عَنْ أَبِيْ إِسْحَاقَ—

عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: اعْتَمَرَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَ عُمَرٍ، كُلُّهُنَّ فِيْ ذِي الْقَعْدَةِ ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: لَقَدِ اعْتَمَرَ أَرْبَعَ عُمَرٍ، بِعُمْرَتِهِ الَّتِيْ حَجَّ مَعَهَا.

অর্থ : বার ইবনে আযেব থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনটি উমরা করেছিলেন। সবগুলোই করেছিলেন জিলকদ মাসে। হযরত আয়েশা রাযি. বলেন, তবে যেই উমরার সঙ্গে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হজ করেছিলেন, সেটি-সহ হিসাব করলে চারটি উমরা করেছিলেন। (*সুনানে কুবরা*, *বাইহাকী*, হাদীস নং ৮৮৪০)

১১. وَأَخْرَجَ الْبَيْهَقِيُّ فِيْ سُنَنِهِ —

عَنْ أَبِيْ عَلْقَمَةَ قَالَ: دَخَلَ شَيْبَةُ بْنُ عُثْمَانَ عَلَى عَائِشَةَ، فَقَالَ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِيْنَ! إِنَّ ثِيَابَ الْكَعْبَةِ تَجْمَعُ عَلَيْنَا فَتَكْثُرُ، فَنَعْمِدُ إِلَى آبَارٍ،

فَنَحْفِرُهَا فَنُعَمِّقُهَا، ثُمَّ نَدْفَنُ ثِيَابَ الْكَعْبَةِ فِيْهَا، كَيْلَا يَلْبَسَهَا الْجُنُبُ وَالْحَائِضُ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: مَا أَحْسَنْتَ، وَبِئْسَ مَا صَنَعْتَ، إِنَّ ثِيَابَ الْكَعْبَةِ إِذَا نُزِعَتْ مِنْهَا لَمْ يَضُرَّهَا أَنْ يَّلْبَسَهَا الْجُنُبُ وَالْحَائِضُ، وَلَكِنْ بِعْهَا، وَاجْعَلْ ثَمَنَهَا فِي الْمَسَاكِيْنِ، وَابْنِ السَّبِيْلِ.

অর্থ : আবু আলকামা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, শাইবা ইবনে উসমান হযরত আয়েশা রাযি.-এর খেদমতে হাজির হয়ে আরজ করলেন, হে উম্মুল মুমিনীন, কাবা শরীফের অনেক গিলাফ জমা হয়ে যায়। আমরা গভীর গর্ত খনন করে সেগুলো পুঁতে ফেলি। কেননা আমাদের ভয় হয় যে, নাপাক অবস্থায় মানুষ তা পরিধান করবে। এতে কাবা শরীফের অমর্যাদা হবে। হযরত আয়েশা রাযি. বললেন, তুমি ভালো করনি। তুমি যা করেছ, খুবই মন্দ করেছ। গিলাফ যখন খুলে ফেলা হয় তখন মানুষ যদি নাপাক অবস্থায় পরিধান করেও তাতে ক্ষতি কী? তুমি বরং এগুলো বেচে দিয়ো। মূল্য যা পাবে, তা দিয়ে মিসকীন ও বিপদগ্রস্তদের সহায়তা কোরো। (*সুনানে কুবরা*, *বাইহাকী*, হাদীস নং ৯৭৩১)

بَابُ الْبَيْعِ

অধ্যায় : বেচাকেনা

১. أَخْرَجَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي الْمُصَنَّفِ، وَالدَّارَقُطْنِي وَالْبَيْهَقِي فِي سُنَنِهِمَا— عَنْ أَبِيْ إِسْحَاقَ السَّبِيْعِيِّ، عَنِ امْرَأَتِهِ، أَنَّهَا دَخَلَتْ عَلَى عَائِشَةَ فِيْ نِسْوَةٍ، فَسَأَلَتْهَا امْرَأَةٌ فَقَالَتْ، يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِيْنَ! كَانَتْ لِيْ جَارِيَةٌ، إِنِّيْ بِعْتُهَا مِنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ بِثَمَانِ مِائَةٍ إِلَى عَطَائِهِ، وَ إِنَّهُ أَرَادَ بَيْعَهَا، فَأَبْتَعْتُهَا بِسِتِّمِائَةِ دِرْهَمٍ نَقْدًا، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: بِئْسَمَا شَرَيْتِ وَبِئْسَمَا اشْتَرَيْتِ، فَأَبْلِغِيْ زَيْدًا أَنَّهُ قَدْ

أَبْطَلَ جِهَادَهُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِلَّا أَنْ يَتُوْبَ. فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ لِعَائِشَةَ: أَرَأَيْتِ إِنْ لَمْ آخُذْ مِنْهُ إِلَّا رَأْسَ مَالِيْ! قَالَتْ: فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ[১].

অর্থ : আবু ইসহাক আস-সাবীয়ী তার স্ত্রী থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি একবার কয়েকজন নারীর সঙ্গে হযরত আয়েশা রাযি.-এর দরবারে গেলেন। জনৈকা মহিলা জিজ্ঞেস করল, হে উম্মুল মুমিনীন, আমার একটি দাসী ছিল। আমি তাকে যায়েদ ইবনে আরকাম রাযি.-এর কাছে আটশো দিরহামে বিক্রি করেছিলাম; কিন্তু বাকিতে। এরপর তিনি আমার কাছে ওই দাসীকেই বিক্রি করে দিলেন নগদ ছয়শো দিরহামে। একথা শুনে হযরত আয়েশা রাযি. বললেন, বড় মন্দ বেচাকেনা করেছ তোমরা। যায়েদকে বলে দিয়ো, সে যদি তওবা না করে তা হলে রাসূল সাল্লাল্লাহু ওয়াসাল্লামের সঙ্গে থেকে জিহাদ করে যে ফজিলত লাভ করেছিল, তা বিনষ্ট হয়ে গেছে। মহিলাটি বলল, আচ্ছা বলুন তো, আমি যদি শুধু মূলধন ছাড়া আর কিছু না নিই? তিনি এই আয়াতে কারীমাটি তেলাওয়াত করলেন,

فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ فَانْتَهٰى فَلَهُ مَا سَلَفَ

অর্থ : সুতরাং যার কাছে তার প্রতিপালকের উপদেশ এসে গেছে, আর সে (সুদ গ্রহণ থেকে) বিরত থেকেছে; সে ততটুকুই পাবে যতটুকু সে দিয়েছে। (*মুসান্নাফে আবদুর রাযযাক*, হাদীস নং ১৪৮১২; *সুনানে দারাকুতনী*, হাদীস নং ৩০০২; *সুনানে কুবরা*, *বাইহাকী*, হাদীস নং ১০৭৯৯)

بَابُ النِّكَاحِ

অধ্যায় : বিবাহ

১. أَخْرَجَ الْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ—

---

১. هذه رواية دارقطني : ج ٣/ص ٣١١؛ و أخرج البيهقي بألفاظ أخرى ٥/ص ٣٣١

عَنْ أَبِيْ مُلَيْكَةَ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ فَقَالَتْ: «بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ كِتَابُ اللَّهِ» قَالَ: وَقَرَأَتْ هَذِهِ الْآيَةَ {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ} [المؤمنون:٦] مَا زَوَّجَهُ اللَّهُ أَوْ مَلَّكَهُ فَقَدْ عَدَا.

অর্থ : আবু মুলাইকা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি হযরত আয়েশা রাযি.-কে মুতা বিবাহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, আমাদের সামনে তো কুরআন আছে; এরপর তিনি এই আয়াতটি তেলাওয়াত করলেন,

وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ...

অর্থ : (মুমিন তারা...) যারা তাদের লজ্জাস্থানের হেফাজত করে। তবে স্ত্রী ও বাঁদির কথা আলাদা। এক্ষেত্রে তারা তিরস্কৃত হবে না। এর বাইরে যে পা বাড়াল... (সূরা মুমিনূন : ০৫) অর্থাৎ স্ত্রী ও বাঁদি ছাড়া অন্য কারও দিকে, সে সীমালঙ্ঘন করল।[১] (আর মুতাকৃতা নারী স্ত্রীও নয়, বাঁদিও নয়। তা হলে এর বৈধতা আসবে কোত্থেকে?) (*মুসতাদরাকে হাকেম*, হাদীস নং ৩৪৮৪; *সুনানে কুবরা*, *বাইহাকী*, হাদীস নং ১৪১৭৪)

২. وَأَخْرَجَ مُسْلِمٌ وَالْأَرْبَعَةُ—

عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ: فَسَأَلْتُهَا عَنْ قَضَاءِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهَا، فَقَالَتْ: طَلَّقَهَا زَوْجُهَا الْبَتَّةَ، فَخَاصَمَتْهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي السُّكْنَى وَالنَّفَقَةِ، قَالَتْ: فَلَمْ يَجْعَلْ لِيْ سُكْنَى وَلَا نَفَقَةً.

---

১. আয়াতের পরবর্তী অংশ হলো فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُوْنَ—অর্থ : তারাই হবে সীমালঙ্ঘনকারী; হযরত আয়েশা রাযি. সরাসরি আয়াতটি উল্লেখ না করে ব্যাখ্যামূলকভাবে বলেছেন।

অর্থ : শাবি থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি ফাতেমা বিনতে কায়স রাযি.-এর কাছে গেলাম। (স্বামীর সঙ্গে বিচ্ছেদের পর) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার ব্যাপারে কী সিদ্ধান্ত দিয়েছিলেন—জানতে চাইলাম। তিনি বললেন, তার স্বামী তাকে চূড়ান্তভাবে তালাক প্রদান করেছিলেন। তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে (ইদ্দতকালে) স্বামীর ঘরে অবস্থান ও খোরপোশের বিষয়ে বাদী হয়েছিলেন। তিনি আরও বললেন, কিন্তু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার জন্য স্বামীর ঘরে থাকার সিদ্ধান্ত দেননি। (*সহীহ মুসলিম*, হাদীস নং ১৪৮০; *জামে তিরমিযী*, হাদীস নং ১১৮০; *সুনানে নাসাঈ*, হাদীস নং ৩৫৪৮; *সুনানে আবু দাউদ*, হাদীস নং ২২৮৮; *মুসনাদে আহমাদ*, হাদীস নং ২৭৩৪২; *সহীহ ইবনে হিব্বান*, হাদীস নং ৪২৫২; *সুনানে কুবরা*, *বাইহাকী*, হাদীস নং ১৫৭২০; *সুনানে দারাকুতনী*, হাদীস নং ৩৯৫৭)

৩. وَأَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ تَعْلِيْقًا وَأَبو داود—

عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَقَدْ عَابَتْ ذَلِكَ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَشَدَّ الْعَيْبِ - يَعْنِي حَدِيثَ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ - وَقَالَتْ: إِنَّ فَاطِمَةَ كَانَتْ فِي مَكَانٍ وَحْشٍ فَخِيفَ عَلَى نَاحِيَتِهَا، فَلِذَلِكَ رَخَّصَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

অর্থ : উরওয়াহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত আয়েশা রাযি. ফাতেমা বিনতে কায়সের হাদীসটির কঠোর সমালোচনা করে বলেছিলেন, ফাতেমার ঘরটি ছিল অরক্ষিত; সেখানে বিপদাপদের ভয় ছিল; তাই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার ব্যাপারে এমন সিদ্ধান্ত দিয়েছিলেন। (*সহীহ বুখারী* (তালীক) ৫৩২৫ নং হাদীসের অধীনে; *সুনানে আবু দাউদ*, হাদীস নং ২২৯২; *মুসতাদরাকে হাকেম*, হাদীস নং ৬৮৮১; *সুনানে কুবরা*, *বাইহাকী*, হাদীস নং ১৫৪৯৫)

৪. وَأَخْرَجَ مُسْلِمٌ—

عَنْ عُرْوَةَ قَالَ: تَزَوَّجَ يحيى بْنُ سَعِيْدِ بْنِ الْعَاصِ ابْنَةَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ

الْحَكَمِ، فَطَلَّقَهَا، فَأَخْرَجَهَا مِنْ عِنْدِهِ، فَعَابَ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ عُرْوَةُ، فَقَالُوْا: إِنَّ فَاطِمَةَ قَدْ خَرَجَتْ، قَالَ عُرْوَةُ: فَأَتَيْتُ عَائِشَةَ فَأَخْبَرْتُهَا بِذَلِكَ، فَقَالَتْ: مَا لِفَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ خَيْرٌ فِيْ أَنْ تَذْكُرَ هَذَا الْحَدِيْثَ.

অর্থ : উরওয়াহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, সাঈদ ইবনে আস রাযি.-এর পুত্র বিবাহ করেছিলেন আবদুর রহমান ইবনে হাকামের কন্যাকে। কিছুকাল পর তিনি তাকে তালাক দেন। মেয়েটিকে ঘর থেকে বের করে দেওয়া হয়। উরওয়াহ বিষয়টির সমালোচনা করলে লোকেরা জানাল, ফাতেমা বিনতে কায়স তো স্বামীর ঘরে থাকেননি। উরওয়াহ বলেন, আমি তখন হযরত আয়েশা রাযি.-এর কাছে এলাম এবং বিষয়টি অবহিত করলাম। তখন হযরত আয়েশা রাযি. বললেন, ফাতেমা বিনতে কায়সের উচিত নয় যে, সে তার হাদীসটিকে এভাবে ফলাও করবে। (*সহীহ মুসলিম*, হাদীস নং ১৪৮১; *আলমুসতাখরাজ*, *আবু আওয়ানা*, হাদীস নং ৪৬৩৮; *সুনানে কুবরা*, *বাইহাকী*, হাদীস নং ১৫৪৯০)

بَابٌ جَامِعٌ

অধ্যায় : বিবিধ

১. أَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ مِنْ طَرِيْقِ الْقَاسِمِ—

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: مَنْ زَعَمَ أَنَّ مُحَمَّدًا رَأَى رَبَّهُ فَقَدْ أَعْظَمَ: وَلَكِنْ رَأَى جِبْرِيْلَ فِيْ صُوْرَتِهِ وَخِلْقَتِهِ، سَادًّا مَّا بَيْنَ الْأُفُقِ.

অর্থ : হযরত আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যে ব্যক্তি দাবি করল যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর প্রতিপালককে দেখেছেন, সে গুরুতর অপরাধ করল। অবশ্য তিনি হযরত জিবরীল আলাইহিস সালামকে স্ব-আকৃতি ও স্ব-অবয়বে দিগন্ত ছেয়ে থাকতে দেখেছেন। (*সহীহ বুখারী*, হাদীস নং ৩২৩৪; *সহীহ মুসলিম*, হাদীস নং

১৭৭; *জামে তিরমিযী*, হাদীস নং ৩০৬৮; *আল-আসমা ওয়াস সিফাত, বাইহাকী*, হাদীস নং ৯২২)

২. وَأَخْرَجَ مُسْلِمٌ—

عَنْ مَسْرُوْقٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ: يَا أُمَّاه! هَلْ رَأَى مُحَمَّدٌ رَبَّهُ؟ فَقَالَتْ: لَقَدْ قَفَّ شَعْرِيْ مِمَّا قُلْتَ، مَنْ حَدَّثَكَ بِأَنَّ مُحَمَّدًا رَأَى رَبَّهُ فَقَدْ كَذَبَ! ثُمَّ قَرَأَتْ: لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيْفُ الْخَبِيْرُ (أنعام: ١٠٣) وَلَكِنَّهُ رَأَى جِبْرِيْلَ فِيْ صُوْرَتِهِ مَرَّتَيْنِ.

অর্থ : মাসরুক থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি হযরত আয়েশা রাযি.-কে জিজ্ঞেস করলাম, মাতা, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি তাঁর প্রতিপালককে দেখেছেন? তিনি বললেন, তোমার কথা শুনে তো আমার গায়ের লোম খাড়া হয়ে গেল। মুহাম্মাদ তাঁর প্রতিপালককে দেখেছেন বলে যে তোমাকে গল্প শুনিয়েছে, সে মিথ্যা বলেছে। এরপর হযরত আয়েশা রাযি. এই আয়াতটি তেলাওয়াত করলেন,

لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيْفُ الْخَبِيْرُ

অর্থ : দৃষ্টি তাকে ধারণ করতে পারে না। কিন্তু তিনি দৃষ্টিকে ধারণ করেন। (সূরা আনআম, আয়াত : ১০৩)

অবশ্য মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত জিবরীল আলাইহিস সালামকে দুইবার স্ব-আকৃতিতে দেখেছেন। (*সহীহ মুসলিম*, হাদীস নং ১৭৭; *সহীহ বুখারী*, হাদীস নং ৪৮৫৫; *মুসনাদে আহমাদ*, হাদীস নং ২৪২২৭)

৩. وَأَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ—

عَنْ أَبِيْ مُلَيْكَةَ قَالَ: قَرَأَ ابْنُ عَبَّاسٍ: حَتَّى إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوْا أَنَّهُمْ

قَدْ كُذِبُوْا (يوسف:١١٠) خَفِيْفَةً[1]، وَتَلَا حَتَّى يَقُوْلَ الرَّسُوْلُ وَالَّذِيْنَ آمَنُوْا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللهِ، فَلَقِيْتُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ، فَذَكَرْتُ لَهُ ذَلِكَ، فَقَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: مَعَاذَ اللهِ، وَاللهِ مَا وَعَدَ اللهُ رَسُوْلَهُ مِنْ شَيْءٍ قَطُّ، إِلَّا عَلِم أَنَّهُ كَائِن قَبْلَ أَنْ يَمُوْتَ، وَلَكِنْ لَمْ يَزَلِ البَلَاءُ بِالرُّسُلِ،حَتَّى خَافُوْا أنْ يَكُوْنَ مَنْ مَعَهُمْ يُكَذِّبُوْنَهُمْ، فَكَانَتْ تَقْرَؤُهَا: وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِّبُوا مُثَقَّلَةً.

অর্থ : ইবনে মুলাইকা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইবনে আব্বাস রাযি. এই আয়াতটি পড়লেন (তাশদিদ ছাড়া)

حَتَّى إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا

(এভাবে আয়াতের অর্থ দাঁড়ায় : এমনকি, রাসূলগণ নিরাশ হওয়ার উপক্রম হলেন এবং ধারণা করলেন যে, তাদের মিথ্যা বলা হয়েছে।)

এবং এই আয়াতটি তেলাওয়াত করলেন,[2]

حَتَّى يَقُوْلَ الرَّسُوْلُ وَالَّذِيْنَ آمَنُوْا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللهِ

(অর্থ : এমনকি, রাসূল এবং তাঁর সঙ্গে ঈমান আনয়নকারীগণ বললেন, কখন আসবে আল্লাহর সাহায্য?) (ইবনে মুলাইকা বলেন,) তখন আমি উরওয়াহর কাছে গেলাম এবং বিষয়টি আলোচনা করলাম। উরওয়াহ বললেন, হযরত আয়েশা রাযি. আয়াতটির ব্যাখ্যায় বলেছিলেন, আল্লাহ মাফ করুন! আল্লাহর কসম, আল্লাহ তাঁর রাসূলগণকে যে প্রতিশ্রুতিই দিয়েছেন, রাসূলগণ সে ব্যাপারে নিশ্চিত থেকেছেন যে, তা ঘটবেই। মূলত বিষয়টি এই ছিল যে, রাসূলগণের ওপর একের পর এক বিপদাপদের পাহাড় নেমে আসায় তাদের ভয় হয়েছিল যে, এভাবে চলতে থাকলে ঈমানদার উম্মতেরাও হয়তো তাদের প্রতিশ্রুতিকে মিথ্যা মনে

১. في تفسير سورة البقرة

২. তিনি ব্যাখ্যা হিসেবে এই আয়াতটি তেলাওয়াত করেছেন।

করবে। হযরত আয়েশা রাযি. পড়তেন وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِّبُوا (তাশদিদসহ)। (আর এভাবে আয়াতের অর্থ দাঁড়ায় : এমনকি, রাসূলগণ নিরাশ হওয়ার উপক্রম হলো এবং তারা ধারণা করলেন যে, তাদের মিথ্যাবাদী বলা হবে।) (*সহীহ বুখারী*, হাদীস নং ৪৫২৪, ৪৫২৫)

৪. وَأَخْرَجَ الطَّيَالِسِي فِيْ مُسْنَدِهِ—

عَنْ مَكْحُوْلٍ قَالَ: قِيْلَ لِعَائِشَةَ: إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَلشُّؤْمُ فِيْ ثَلَاثَةٍ: فِي الدَّارِ، وَالْمَرْأَةِ، والْفَرَسِ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: لَمْ يَحْفَظْ أَبُوْ هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ دَخَلَ، وَرَسُوْلُ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: قَاتَل اللهُ اليَهُوْدَ، يَقُوْلُوْنَ: إِنَّ الشُّؤْمَ فِيْ ثَلَاثَةٍ: فِي الدَارِ، وَالْمَرْأَةِ، والْفَرَسِ، فَسَمِعَ آخِرَ الْحَدِيْثِ، وَلَمْ يَسْمَعْ أَوَّلَهُ.

অর্থ : মাকহুল থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত আয়েশা রাযি.-কে বলা হলো, হযরত আবু হুরায়রা রাযি. বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, অশুভ তিনটি বস্তু : নারী, বাড়ি, গাড়ি (ঘোড়া)। তখন হযরত আয়েশা রাযি. বললেন, আবু হুরায়রা রাযি. হাদীসটি পুরোপুরি সংরক্ষণ করতে পারেননি। কেননা তিনি পরে ঘরে ঢুকেছিলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন, আল্লাহ ইহুদিদের বরবাদ করুন, তারা বলে, তিনটি বস্তু কুলক্ষুণে : নারী, বাড়ি, গাড়ি (ঘোড়া)। আবু হুরায়রা রাযি. হাদীসের শেষ অংশ শুনেছেন, প্রথম অংশ শোনেননি। (*মুসনাদে আবু দাউদ আততয়ালিসি*, হাদীস নং ১৬৪১)

৫. وَأَخْرَجَ أَحْمَدُ[১]—

عَنْ أَبِيْ حَسَّانِ الْأَعْرَجِ، أَنَّ رَجُلَيْنِ دَخَلَا علَى عَائِشَةَ، فقالا: إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُوْلُ: إِنَّمَا الطِّيَرَةُ

---

১. في نسخة المطبوعة ص ٢١٥

فِي الْمَرْأَةِ، وَالدَّابَّةِ، وَالدَّار. فَقَالَتْ: والَّذِيْ أَنْزَلَ الْفُرْقَانَ عَلى أَبِي الْقَاسِمِ، مَا هَكَذَا كَانَ يَقُوْلُ، وَلَكِنْ كانَ يَقُوْلُ: كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَقُوْلُوْنَ: اَلطِّيَرَةُ فِي الْمَرْأَةِ، وَالدَّابَّةِ، وَالدَّار، ثُمَّ قَرَأَتْ عَائِشَةُ: مَا أَصَابَ مِنْ مُّصِيْبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَ لَا فِيْ أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِيْ كِتَابٍ مِّنْ قَبْلِ أَنْ نَّبْرَأَهَا (الحديد: ٢٢)

অর্থ- আবু হাস্‌সান আল আরাজ থেকে বর্ণিত আছে যে, দুজন লোক হযরত আয়েশা রাযি.-এর দরসগাহে গেলেন এবং বললেন, হযরত আবু হুরায়রা রাযি. বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তিনটি জিনিস অশুভ : নারী, বাড়ি, গাড়ি। তখন হযরত আয়েশা রাযি. বললেন, ওই আল্লাহর কসম, যিনি আবুল কাসেম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়সাল্লামের ওপর কুরআন নাজিল করেছেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এভাবে বলতেন না। বরং তিনি বলতেন, জাহেলি যুগের মানুষেরা বলত, তিনটি জিনিস অশুভ : নারী, বাড়ি, গাড়ি। অতঃপর হযরত আয়েশা রাযি. এই আয়াতটি তেলাওয়াত করলেন,

مَا أَصَابَ مِنْ مُّصِيْبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِيْ أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِيْ كِتَابٍ مِّنْ قَبْلِ أَنْ نَّبْرَأَهَا

অর্থ : যে বিপদই তোমাদের আক্রান্ত করে, জমিনে হোক, তোমাদের জীবনে হোক, সবই লিপিবদ্ধ রয়েছে সেটা ঘটানোর পূর্ব থেকেই। (সূরা হাদীদ, আয়াত : ২২) (*মুসনাদে আহমাদ*, হাদীস নং ২৬০৮৮; *সুনানে কুবরা, বাইহাকী*, হাদীস নং ১৬৫২৫; *মুসতাদরাকে হাকেম*, হাদীস নং ৩৭৮৮)

৬. وَأَخْرَجَ الْبَزَّارُ عَنْ عَلْقَمَةَ—

قَالَ: قِيْلَ لِعَائِشَةَ: إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ يَرْوِيْ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّ امْرَأَةً عُذِّبَتْ فِيْ هِرَّةٍ. فَقَالَتْ عَائِشَةُ: إِنَّ الْمَرْأَةَ كَانَتْ كَافِرَةً.

—قَالَ: وَلَا نَعْلَمُ رَوَى عَلْقَمَةُ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ إِلَّا هَذَا الْحَدِيْثَ.

অর্থ : আলকামা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত আয়েশা রাযি.-কে বলা হলো, হযরত আবু হুরায়রা রাযি. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন, যাতে বলা হয়েছে, একজন নারীকে আল্লাহ তায়ালা একটি বিড়ালের কারণে আজাব দিয়েছিলেন। ঘটনাটি শুনে হযরত আয়েশা রাযি. বললেন, ওই নারী কাফের ছিল। (*মুসনাদে আহমাদ*, হাদীস নং ১০৭২৭; *মুসনাদে আবু দাউদ আত তয়ালিসি*, হাদীস নং ১৫০৩; *মুসনাদে বায্যার*, হাদীস নং ৮০৪৪)

৯. وَأَخْرَجَ قَاسِمُ بْنُ [১] ثَابِتِ السرقسطي فِيْ غَرِيْبِ الْحَدِيْثِ—

عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ عَائِشَةَ، وَمَعَنَا أَبُوْ هُرَيْرَةَ، فَقَالَتْ، يَا أَبَا هُرَيْرَةَ! أَنْتَ الَّذِيْ تُحَدِّثُ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّ امْرَأَةً عُذِّبَتْ بِالنَّارِ فِيْ هِرَّةٍ؟ لَا أَطْعَمَتْهَا، وَلَا سَقَتْهَا، وَلَا هِيَ تَرَكَتْهَا، تَأْكُلُ مِنْ حَشَائِشِ الْأَرْضِ، حَتَّى مَاتَتْ، قَالَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ: سَمِعْتُ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالتْ عَائِشَةُ: اَلْمُؤْمِنُ أَكْرَمُ عِنْدَ اللهِ مِنْ أَنْ يُعَذِّبَهُ فِيْ هِرَّةٍ، أَمَا إِنَّ الْمَرْأَةَ مِنْ ذَلِكَ كَانَتْ كَافِرَةً، يَا أَبَا هُرَيْرَةَ! إِذَا حَدَّثْتَ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَانْظُرْ كَيْفَ تُحَدِّثُ.

অর্থ : আলকামা ইবনে কায়েস থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা হযরত আয়েশা রাযি.-এর দরসগাহে ছিলাম। হযরত আবু হুরায়রা রাযি.-ও আমাদের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন। হযরত আয়েশা রাযি. তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, আবু হুরায়রা, তুমি নাকি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে একটি গল্প বর্ণনা কর, যাতে বলা হয়েছে, জনৈকা নারী একটি বিড়াল ছানাকে আটকে রেখেছিল; তাকে খানাপিনা দিত না, একসময় বিড়ালটি মাটির ময়লা আবর্জনা খেতে খেতে মারা যায়; আর সেই কারণে আল্লাহ ওই নারীকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করেছেন? হযরত আবু হুরায়রা

---

১. مسند، ج ٦، ص ١، ٣٤٦، و أخرج في صفحة ٢٤٠ بلفظ آخر

রাযি. বললেন, মাতা, আমি তো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকেই ঘটনাটি শুনেছি। হযরত আয়েশা রাযি. বললেন, একজন মুমিন আল্লাহর কাছে এরচেয়ে অনেক বেশি মর্যাদার যে, একটি বিড়ালছানার কারণে তাকে জাহান্নামে দেবেন। ওই নারী কাফের ছিল, বুঝলে আবু হুরায়রা! যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে কোনো হাদীস বর্ণনা করবে, ভেবেচিন্তে করবে। (*আদ দালাইল ফী গরীবিল হাদীস*, কাসেম ইবনে ছাবেত, হাদীস নং ৬২৭)

৮. وَأَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ—

عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَت: إِنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ تُوُفِّيَ رَسُوْلُ اللهِ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَدْنَ أَنْ يَّبْعَثْنَ عُثْمَانَ بْن عَفَّانَ إِلَى أَبِيْ بَكْرٍ يَسْأَلْنَهُ مِيْرَاثَهُنَّ منْ رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ لَهُنَّ: أَ لَيْسَ قَدْ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا نُوْرَثُ، مَا تَرَكْنَاهُ صَدَقَةٌ.

অর্থ : উরওয়াহ হযরত আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণনা করেছেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মৃত্যুর পর পবিত্র স্ত্রীগণ হযরত উসমান ইবনে আফফান রাযি.-কে হযরত আবু বকর রাযি.-এর কাছে পাঠাতে চাইলেন। উদ্দেশ্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উত্তরাধিকার প্রার্থনা করা। তখন হযরত আয়েশা রাযি. বললেন, বিষয়টি কি এমন নয় যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলে গেছেন, আমাদের (নবী-রাসূলগণের) কোনো উত্তরাধিকারী হয় না; আমরা যা কিছু রেখে যাই সবই সদকা? (*সহীহ বুখারী*, হাদীস নং ৬৭৩০; *সহীহ মুসলিম*, হাদীস নং ১৭৫৮; *সুনানে আবু দাউদ*, হাদীস নং ২৯৭৬)

৯. وَأَخْرَجَ أَبُو عَرُوبَةَ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْحَرَّانِيُّ، وَأَبُوْ مَنْصُوْرٍ الْبَغْدَادِيُّ—

عَنِ الْكَلْبِيِّ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ : لَأَنْ يَمْتَلِئَ جَوْفُ أَحَدِكُمْ قَيْحًا وَدَمًا، خَيْرٌ

لَهُ مِنْ أَنْ يَمْتَلِئَ شِعْرًا، فَقَالَتْ عَائِشَةُ لَمْ يَحْفَظِ الْحَدِيْثَ، إِنَّمَا قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَأَنْ يَمْتَلِئَ جَوْفُ أَحَدِكُمْ قَيْحاً وَدَمًا، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمْتَلِئَ شِعْرًا هُجِيْتُ[১] بِهِ.

অর্থ : কালবি থেকে বর্ণিত আছে, তিনি হযরত আবু হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণনা করেন, কবিতা দিয়ে পেট ভরানোর চাইতে রক্ত-পুঁজ দিয়ে পেট ভরানোই ভালো। কথাটি শুনে হযরত আয়েশা রাযি. বলেন, আবু হুরায়রা ভালোভাবে হাদীসটি সংরক্ষণ করতে পারেননি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন, আমার কুৎসা রটনা করে কাফেররা যে কবিতা ছড়িয়েছিল, তা দিয়ে পেট ভরানোর চাইতে রক্ত-পুঁজ দিয়ে পেট ভরানো ভালো। (*শরহুস সুন্নাহ, বাগাভী*, হাদীস নং ৩৪১৩ ; *মুসনাদে আবু ইয়ালা আলমাওছিলী*, হাদীস নং ২০৫৬; *আলমাকছিদুল আলী ফী যাওয়াইদি আবী ইয়ালা আলমাওছিলী*, হাদীস নং ১১১৯; *শরহু মাআনিল আছার, ত্বহাবী*, হাদীস নং ৬৯৮৮;)

১৫. وَأَخْرَجَ الْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ وَالْبَيْهَقِيُّ فِيْ سُنَنِهِ—

عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، قَالَ: بَلَغَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَأَنْ أُمَتَّعَ بِسَوْطٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُعْتِقَ وَلَدَ الزِّنَا، وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: وَلَدُ الزِّنَا شَرُّ الثَّلَاثَةِ، وَإِنَّ الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ الْحَيِّ. فَقَالَتْ عَائِشَةُ: رَحِمَ اللَّهُ أَبَا هُرَيْرَةَ أَسَاءَ سَمْعًا فَأَسَاءَ إِصَابَةً، أَمَّا قَوْلُه: "لَأَنْ أُمَتَّعَ بِسَوْطٍ فِي سَبِيلِ اللهِ، أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُعْتِقَ وَلَدَ الزِّنَا" أَنَّهَا لَمَّا نَزَلَتْ: "فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ" [البلد: ١٢] قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا عِنْدَنَا مَا نُعْتِقُ إِلَّا أَنَّ أَحَدَنَا لَهُ جَارِيَةٌ سَوْدَاءُ تَخْدُمُهُ،

---

১. أيضا في مسند الطيالسي في مسند عائشة، ص١٩٩

وَتَسْعَى عَلَيْهِ، فَلَوْ أَمَرْنَاهُنَّ فَزَنَيْنَ، فَجِئْنَ بِالْأَوْلَادِ فَأَعْتَقْنَاهُمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَأَنْ أُمَتِّعَ بِسَوْطٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ آمُرَ بِالزِّنَا، ثُمَّ أُعْتِقَ الْوَلَدَ. وَأَمَّا قَوْلُهُ: وَلَدُ الزِّنَا شَرُّ الثَّلَاثَةِ. فَلَمْ يَكُنِ الْحَدِيثُ عَلَى هَذَا، إِنَّمَا كَانَ رَجُلٌ مِنَ الْمُنَافِقِينَ، يُؤْذِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: "مَنْ يَعْذِرُنِي مِنْ فُلَانٍ؟" قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَعَ مَا بِهِ وَلَدُ زِنًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هُوَ شَرُّ الثَّلَاثَةِ، وَاللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ: "وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى" [الأنعام: ١٦٤] وَأَمَّا قَوْلُهُ: "إِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبُكَاءِ الْحَيِّ"، فَلَمْ يَكُنِ الْحَدِيثُ عَلَى هَذَا، وَلَكِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِدَارِ رَجُلٍ مِنَ الْيَهُودِ قَدْ مَاتَ، وَأَهْلُهُ يَبْكُونَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: إِنَّهُمْ يَبْكُونَ عَلَيْهِ، وَإِنَّهُ لَيُعَذَّبُ، وَاللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ: لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا [البقرة: ٢٨٦].

অর্থ : উরওয়াহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত আয়েশা রাযি.-এর কাছে সংবাদ পৌছল যে, হযরত আবু হুরায়রা রাযি. বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কোনো জারজ সন্তানকে আজাদ করার চাইতে কশাঘাত বরণ করা আমার কাছে অধিক প্রিয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেছেন, জারজ সন্তান তিনজনের নিকৃষ্টজন। তিনি আরও বলেছেন, মহল্লার লোকদের কান্নাকাটিতে মাইয়েতের আজাব হয়।

এই হাদীসগুলো শোনার পর হযরত আয়েশা রাযি. বললেন, আল্লাহ আবু হুরায়রা রাযি.-কে রহম করুন, তিনি ঠিকমতো শুনতে পারেননি; তাই ঠিকমতো বলতেও পারেননি।

প্রথম হাদীসটি সম্পর্কে আমার বক্তব্য এই যে, যখন এই আয়াতগুলো অবতীর্ণ হলো,

فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ. وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ. فَكُّ رَقَبَةٍ.

[অর্থ : কিন্তু সে তো (মানুষ) সেই দুর্গম গিরি পাড়ি দিতে চায়নি; জানো, সে দুর্গম গিরি কী? দাসত্বের শেকল খুলে দেওয়া। (সূরা বালাদ : ১১-১৩)]

তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলা হলো, হে আল্লাহর রাসূল, আমাদের তো মুক্ত করার মতো কোনো দাসদাসী নেই। তবে আমাদের একজনের হাবশি দাসী আছে। সে সেবাযত্ন ও কাজকর্ম করে দেয়। আমরা তাকে নির্দেশ দিলে সে যিনা করতে পারে। এতে যে সন্তানগুলো হবে, আমরা সেগুলো আজাদ করে দেব। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যিনার নির্দেশ দিয়ে কোনো জারজ শিশুকে আজাদ করার চাইতে কশাঘাত বরণ করা আমার কাছে অধিক প্রিয়।

দ্বিতীয় হাদীস—জারজ শিশু তিনজনের (মাতা-পিতা-সন্তান) নিকৃষ্টজন—সম্পর্কে আমার বক্তব্য এই যে, হাদীসটি আসলে এরকম নয়। ঘটনা এই যে, জনৈক মুনাফিক রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কষ্ট দিত। একদিন তার কথা উঠলে জনৈক সাহাবী বললেন, হে আল্লাহর রাসূল, সে শুধু মুনাফিকই নয়; জারজও। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তবে তিনজনের মধ্যে সেই নিকৃষ্ট। (সবার ক্ষেত্রে একথা প্রযোজ্য নয়। কেননা) আল্লাহ তায়ালা বলেছেন,

لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى.

অর্থ : কেউ কারও পাপের বোঝা বহন করবে না।

তৃতীয় হাদীসটিও যথার্থ হয়নি। মূলত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জনৈক ইহুদীর লাশ দেখে বলেছিলেন, ইহুদীর আজাব হচ্ছে। ওই সময় ইহুদীর পরিবারের লোকজন তার জন্য কান্নাকাটিও করছিল। আল্লাহ তো বলেই দিয়েছেন,

لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا.

অর্থ : আল্লাহ কাউকে তার সাধ্যের বাইরে কিছু চাপান না। (*মুসতাদরাকে হাকেম*, হাদীস নং ২৮৫৫; *সুনানে কুবরা*, *বাইহাকী*, হাদীস নং ১৯৯৯১; *মারিফাতুস সুনানি ওয়াল আছার*, হাদীস নং ২০২৩৫-২০২৩৭)

১১. وَأَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ—

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ، فَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُوْمٍ.

অর্থ : হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন, হযরত বেলাল রাতে আজান দেবে; তখন থেকে ইবনে উম্মে মাকতুমের আজান পর্যন্ত তোমরা পানাহার করবে। (*সহীহ বুখারী*, হাদীস নং ২৬৫৬)

১২. وَأَخْرَجَ الْبَيْهَقِي—

عَنْ عُرْوَةَ[১] عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ رَجُلٌ أَعْمَى فَإِذَا أَذَّنَ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ بِلَالٌ" قَالَتْ عَائِشَةُ: وَكَانَ بِلَالٌ يُبْصِرُ الْفَجْرَ. قَالَ هِشَامٌ: وَكَانَتْ عَائِشَةُ تَقُولُ: غَلِطَ ابْنُ عُمَرَ.

অর্থ : উরওয়াহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত আয়েশা রাযি. বলেছেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন, ইবনে উম্মে মাকতুম অন্ধ মানুষ। তাই সে আজান দিলে তোমরা বেলালের আজান পর্যন্ত পানাহার করবে। বেলাল ফজরোদয় ভালোভাবে পরখ করতে পারবে। হযরত আয়েশা রাযি. বলেন, ইবনে উমর রাযি. বলতে ভুল করেছেন। (*সুনানে কুবরা*, *বাইহাকী*, হাদীস নং ১৭৯৪)

---

১. فلأنه ثبت عن عائشة في البخاري، ص ٨٧/١

সংযোজিত

(ইমাম সুয়ূতি রহ. বলেন,) আল্লামা যারাকশী রহ. কর্তৃক সংকলিত ইসতিদরাক (সংশোধনী)-সংবলিত এটিই সর্বশেষ হাদীস। তিনি আরও কিছু হাদীস এনেছিলেন, সেগুলো সরাসরি ইসতিদরাক-সংবলিত না হওয়ায় বক্ষ্যমাণ পুস্তিকায় ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। নিচে ইসতিদরাক-সংবলিত আরও কিছু হাদীস সংযোজিত হলো :

১. أَخْرَجَ الْأَئِمَّةُ الستَةُ إِلَّا أَبَو داود—

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِلَحْمٍ فَرُفِعَ إِلَيْهِ الذِّرَاعُ، وَكَانَتْ تُعْجِبُهُ.

অর্থ : হযরত আবু হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে গোশত হাদিয়া এল। তাঁর সম্মুখে রান উপবেশন করা হলো। তিনি এটা পছন্দ করতেন।

(*সহীহ বুখারী*, হাদীস নং ৪৭১২; *সহীহ মুসলিম*, হাদীস নং ১৯৪; *জামে তিরমিযী*, হাদীস নং ২৪৩৪; *সুনানে ইবনে মাজাহ*, হাদীস নং ৩৩০৭; *সুনানে কুবরা, নাসাঈ*, হাদীস নং ৬৬২৬)

২. وَأَخْرَجَ التِّرْمِذِيُّ—

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: مَا كَانَتْ الذِّرَاعُ أَحَبَّ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَانَ لَا يَجِدُ اللَّحْمَ إِلَّا غِبًّا، فَكَانَ يَعْجَلُ إِلَيْهِ، لِأَنَّهُ أَعْجَلُهَا نَضْجًا.

অর্থ : হযরত আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে রান পছন্দ করতেন তা নয়। আসলে গোশত অনেক দেরিতে পাওয়া যেত। তাই তিনি এটাই খেতেন। তা ছাড়া, এটা তাড়াতাড়ি রান্না হতো। (*জামে তিরমিযী*, হাদীস নং ১৮৩৮)

৩. وَأَخْرَجَ ابْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ—

عَنْ أَبِيْ رَزِيْن قَالَ: خرَجَ[১] إِلَيْنَا أَبُوْ هُرَيْرَةَ يَضْرِبُ بِيَدِهِ على جَبْهتِهِ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّكُمْ تُحَدِّثُوْنَ أَنِّيْ أَكْذِبُ على رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، اشْهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ أَحَدِكُمْ فَلَا يَمْشِ فِي الْأُخْرَى، حَتَّى يُصْلِحَهَا.

অর্থ : আবু রাযীন থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত আবু হুরায়রা রাযি. আমাদের কাছে এলেন। তিনি কপালে হাত দিয়ে আঘাত করে বললেন, তোমরা বলো, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামে মিথ্যা বলি। তোমরা সাক্ষী থাকো, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, যদি কারও জুতার ফিতা ছিঁড়ে যায়, তা হলে সেটা ঠিক না করে অন্যটি পরে যেন কেউ না হাঁটে। (*মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবাহ*, হাদীস নং ২৪৯২৪; *সহীহ মুসলিম*, হাদীস নং ২০৯৮; *সুনানে আবু দাউদ*, হাদীস নং ৪১৩৭)

8. وَقَالَ ابْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ —

عَنْ عَبْدِ الرحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيْهِ[২] أَنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ تَمْشِيْ فِيْ خُفٍّ وَاحِدٍ وَتَقُوْلُ لَأُخِيفَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ .

অর্থ : আবদুর রহমান ইবনে কাসেম তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, হযরত আয়েশা রাযি. একটি মোজা পরে হাঁটতেন আর বলতেন, আবু হুরায়রাকে ভয় দেখাচ্ছি। (কারণ সে বলে, এভাবে এক জুতা বা মোজা পরে হাঁটা যাবে না।) (*মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবাহ*, হাদীস নং ২৪৯৩০; *আখবারে মাক্কা, ফাকিহী*, হাদীস নং ২৫৩৮)

***

---

১. في جامع الترمذي، باب ما جاء في كراهية المشي في نعل واحدة، ص ٣٠١

২. الترمذي أيضا

প্রখ্যাত হাদীসবিশারদ আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতি রহ. সংকলিত অমূল্য রিসালা عَيْنُ الْإِصَابَةِ فِيْمَا اسْتَدْرَكَتْهُ السَّيِّدَةُ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنهَا عَلَى الصَّحَابَةِ এখানেই সমাপ্ত হলো। মহান আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা, তিনি যেন এই মহান মানুষটিকে আপন করুণা ও মার্জনা এবং সন্তুষ্টির চাদরে ঢেকে নেন; এবং তাঁর ইলম ও কামালের বরকতে আমাদের উপকৃত করেন, অনুগ্রহ করেন। আমীন।

(প্রিয় পাঠক, এইমাত্র জালালুদ্দীন সুয়ূতি রহ. কৃত পুস্তিকা *আইনুল ইসাবা* পড়ে শেষ করেছেন। বিভিন্ন সাহাবীর বর্ণনা, বক্তব্য সম্পর্কে উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা রাযি.-এর সংশোধনী বক্তব্য পড়েছেন। পাঠককে বিনয়ের সঙ্গে একটি অনুরোধ করব—কোথায় কোন বক্তব্যটি চূড়ান্ত, কোন বক্তব্য অনুসারে আমল করব, এই সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য কোনো বিজ্ঞ আলেমের শরণাপন্ন হবেন। উম্মুল মুমিনীনের সংশোধনী অবশ্যই শিরোধার্য; কিন্তু 'ইজমায়ে সাহাবা' যদি তাঁর বক্তব্যের বিপরীত হয়, তা হলে অবশ্যই সাহাবীদের সেই সর্বসম্মত মতটিকেই অগ্রগণ্য হিসাবে গ্রহণ করতে হবে। –সম্পাদক)

সমাপ্ত

সীরাতে আয়েশা (রাযি.)

উর্দু ভাষার নতুন বিপ্লব আমাদেরকে যে বিপুল রচনা সম্ভার উপহার দিয়েছে তাতে মুসলিম পুরুষদের কীর্তি ও অবদান অনেকটাই মানুষ জানতে পেরেছে। কিন্তু পর্দানশীন মুসলিম রমণীগণের সুস্পষ্ট অবদান ও কারনামা এখনো রয়ে গেছে পর্দার অন্তরালে। সীরাতে আয়েশাই মুসলিম নারীদের খেদমতে দীনের ক্ষেত্রে তাঁদের ব্যাপক অবদান ও কীর্তি উর্দুভাষীদের কাছে তুলে ধরার প্রথম প্রয়াস।

এই পতনের যুগে মুসলিম জাতির অধঃপতনের যতগুলো কারণ আছে তার বেশি অর্ধেক নারী। ঘরে-ঘরে প্রবৃত্তিপূজা, জড়পূজা-মরপূজা, ইসলাম বিরোধী রসম-রেওয়াজ, শোক ও আনন্দের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে ব্যাপক অপচয়—ইত্যাদি বর্বরযুগীয় ক্রিয়াকলাপ আমাদের সমাজ-সংসারে চালু রয়েছে শুধু এই কারণে যে, মুসলিম মা-বোনদের মন থেকে ইসলামী শিক্ষা-দীক্ষা ও মূল্যবোধ বিদায় নিয়েছে। এর কারণ সম্ভবত এটাই যে, কোনো মুসলিম মহীয়সীর পূর্ণাঙ্গ জীবনাদর্শ তাদের সামনে নেই। তাই আমাদের এবারের নিবেদন এমন এক মহীয়সীর জীবনাদর্শ, যিনি ছিলেন মহানবীর আদর্শ জীবনের আদর্শ সঙ্গিনী, যিনি নবীজীর একান্ত আন্তরিক সাহচর্যে ধন্য হয়েছেন নয় বছর, যাঁর পথনির্দেশের আলোকবর্তিকা স্বর্ণযুগের রমনীকূলকে আলো দিয়েছে প্রায় চল্লিশ বছর।

একজন মুসলিম নারীর জন্য *সীরাতে আয়েশা রাযি.*-তে রয়েছে জীবনের সার্বিক দিক-নির্দেশনা। জীবনের সকল পরিবর্তন, উত্থান-পতন, উন্নতি-অবনতি, শোক-সুখ, বিবাহ-বিরহ, পিত্রালয়-শ্বশুরালয়, স্বামী-সতিন, বৈধব্য, অপত্যহীনতা, ঘরবাস-পরবাস, রান্নাবান্না, সন্তানপালনসহ সংসার জীবনের হাসি-কান্না, আবেগ-অনুভূতি, অভিমান অভিরোষ —এক কথায় জীবন ও জগতের সর্বক্ষেত্রে, সর্বাবস্থায় আদর্শ অনুসরণের উজ্জ্বল দৃষ্টান্তে ভরপুর হযরত আয়েশা রাযি.-এঁর জীবনচরিত। আর জ্ঞান-গুণ, ধর্ম-কর্ম ও চরিত্রমাধুরীর অনুপমতা তো বলাই বাহুল্য। প্রকৃতপ্রস্তাবে তাঁর পবিত্র জীবনচরিত হলো সেই স্বচ্ছ আয়না, যাতে ফুটে ওঠে—একজন মুসলিম নারীর প্রকৃত জীবনের চিত্র?

উল্লেখ্য, উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা রাযি.-এঁর জীবনচরিত অধ্যয়ন শুধু এ-জন্য আবশ্যক নয় যে, তা নবীপরিবারের এক মহীয়সী নারীর পবিত্র জীবনধারার সমষ্টি বরং এ-জন্যও এটা পড়া জরুরি যে, তা পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মানবের শ্রেষ্ঠতম জীবনের এমন অর্ধাঙ্গিনীর জীবন, যা সত্যিকারের পূর্ণাঙ্গ রমনীর সুসজ্জিত স্বরূপ তুলে ধরে আমাদের সামনে।

ISBN 978-984-91118-7-0 MRP
৳ ৫০০.০০
9 789849 111870

প্রকাশনা ও পরিবেশনায়
রাহনুমা প্রকাশনী™
ইসলামী টাওয়ার, দোকান ৩২/এ, আন্ডারগ্রাউন্ড, বাংলাবাজার, ঢাকা।